বাঙালি মনন :
সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

অমিতাভ চক্রবর্তী

উর্বী প্রকাশ

২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্

কোলকাতা-৭০০ ০১২

বাঙালি মনন : সম্প্রীতি ও সাম্প্রদায়িকতা
BANGALI MANAN : SAMPRITY O SAMPRADAYIKATA
by Amitava Chakrabarty

প্রথম প্রকাশ

ডিসেম্বর ২০০০

প্রকাশক
সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, উবুদশ
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

অক্ষর বিন্যাস
মুদ্রাকর, ১৮-এ রাধানাথ মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

মুদ্রক
সিদ্ধার্থরঞ্জন চৌধুরি, ইউডি প্রিণ্টার্স
২৯/৩ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন্, কোলকাতা-৭০০ ০১২

প্রচ্ছদ : সিদ্ধার্থ বসু

বাবা ও মা
রমেশ ও শেফালি চক্রবর্তী

আশৈশব যাদের কাছে
সম্প্রীতির শিক্ষা পেয়েছি

সূচি

লেখকের কথা

সাম্প্রদায়িকতা ও সম্প্রীতির মতো অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে বাংলায় কম গ্রন্থ রচনা হয়নি। এত বইয়ের ভিড়ের মধ্যে আর একটা গ্রন্থ রচনার যৌক্তিকতা নিয়ে উত্তর দেওয়ার দায় লেখকের থাকে। প্রথমত, আমাদের এখানে যত পুস্তক লেখা হয়েছে সে-সবই সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপটে রচিত, এবং এই প্রেক্ষাপট বিচারের ক্ষেত্রে একটা সরল মাত্রা ব্যবহার করা হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে ভারতের জন— জাতিগুলির বিকাশ ও বিস্তার একই সরল মাত্রায় হয়েছে। কবি কল্পনার 'একজাতি এক প্রাণ' যে হয়ে ওঠেনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী তা আজও অনুভূত হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ভারতের পৃথক জন জাতিগুলিকে স্বীকার না করা ও বিকশিত হতে না দেওয়া একটি ঐতিহাসিক ভুল। তৃতীয়ত, বাঙালিজাতির পৃথক সত্তা— ঐতিহাসিকভাবেই তার অস্তিত্ব আছে। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির মিলনের ধারা বংলার লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতি ও লোকধর্মে যত মজুত আছে ভারতবর্ষের আর কোথাও এর পরিচয় পাওয়া যায় না। পৃথক জাতি সত্তা হিসাবে বাঙালির বর্ণ-বিন্যাস গঠন ও বিকাশ, এর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রকাশ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। পৃথিবীর এই অতি প্রাচীন এই সমস্যাটিকে আমাদের দেশে শুধুমাত্র মুসলমান আগমনের সময় থেকেই সূত্রপাত ধরে নেওয়াও একটি তথ্যগত বিকৃতি।

উত্তর ভারতের মতো বাংলায় চতুর্বর্ণের বিকাশ ঘটেনি এবং আর্য সভ্যতা প্রবেশ করেছে অনেক দেরিতে। বাংলাদেশে জাতি বৈরিতা মুসলমান আগমনের পূর্বে বারেবারে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে অন্ত্যজদের সংগঠিত হয়েছে। সংঘাতের ফল স্বরূপ আক্রান্ত অন্ত্যজরা খুঁজে নিয়েছে তাদের নিজেদের লোকধর্ম। যে ধর্মে আচার বিচার-বিভেদের বেড়া নেই। হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে জানে না, জানে শুধু বর্জন করতে। অপরদিকে লোকধর্ম অভাবে কষ্টে জর্জরিত, কখনও সে প্রকৃতির করাল গ্রাসে নিমজ্জিত, রোগ জর্জর, দুঃখের বারমাস্যাই তাঁর চির ঋতু; সেই বাংলার কৃষকের ভেদাভেদহীন লোকধর্ম। অনন্ত সমস্যায় যে ধর্ম একে অপরকে কাছে আনে। আর আনে বলেই আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় সুদুর পারস্য থেকে মিলেছিল— "মজ্‌ম উল-বাহারৈন অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন।"[১] সেই মিলনের ডাকেই বাংলার লোক গায়কের গানে যুগ যুগ ধরে মুখরিত হয়েছে বাংলার নদী-মাঠ-ঘাট। আজও সজীব সেই গান— 'সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।' অথবা 'মুসলমানে বলে গো আল্লা হিঁদু বলে হরি/নিদানকালে যাবরে তাই একই পথে চলি [রে] দোয়া না করিবা আল্লারে।'

---

১. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১০

'কবীর প্রমুখ সাধকেরা নিরক্ষর হতে পারেন, কিন্তু গুরুর কৃপায় তাঁরা সব তত্ত্বই জানতেন আর তাদের ছিল অতুলনীয় প্রতিভা, তাই পণ্ডিত না হয়েও তাদের কোনও ক্ষতি হয়নি। বরং এমন সব অপূর্ব তত্ত্বকথা কবীর প্রমুখ সাধকেরা বলতেই পারতেন না যদি তাঁরা পণ্ডিত হতেন। কবীর ছিলেন জোলা তাদের না আছে হিন্দু না আছে মুসলমান সংস্কারের ভার, সব প্রাচীন সংস্কারের ভার হতে তিনি মুক্ত। সর্ববিধ ভার হতে তিনি মুক্ত বলেই ভগবানের বাণী তার কানে এত সহজে এসে পৌঁছেছে। বাংলাদেশের বাউলরাও এই জন্য এমন মুক্ত। তাঁদের গানে আছে :

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনি সাঁই
চলতে না পাই।
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মরশেদে'।[২]

এই ভক্তিবাদের অপর সিন্ধুর নাম বৈষ্ণব ধর্ম, যে ধর্মের কল্লোলে শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। পির-সুফি-দরবেশ-বৈষ্ণব-বাউলদের মিলন গানে মুখরিত হল বাংলার আকাশ বাতাস। মিলনের বন্যায় ভাসিয়ে দিল বিভেদের বেড়াজাল, এমনটা ভারতবর্ষের আর কোথাও ঘটেনি। সেই প্রেমে মাতোয়ারা হাসান রাজার কাছে ধর্মা-ধর্ম ভেদের সংস্কার মূল্যহীন হয়ে যায় এবং তিনি অন্তরে উপলব্ধি করেন পরম জাগতিক মানব প্রেমের সত্য।

'আমি তোমার কাঙালিগো সুন্দরী রাধা
তোমার লাইগ্যা কাইন্দা ফেরে
হাছন রাজা বাঙালি গো।
হিন্দুরা তোমায় বলে রাধা
আমি বলি খোদা
রাধা নামে ডাকলে
মুল্লা মুন্সীরে দেয় বাধা
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা
মুল্লা মুন্সীর কথা যত সকলই বেহুদা।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আবার Von Kraeman এর Islamiche Straiefnge গ্রন্থ থেকে বৈষ্ণবদের সাথে কনস্টান্টিনোপলস্ এর দরবেশদের ধর্মীয় আচারের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। 'ইনি কনস্টান্টিনোপলস্ এর নৃত্যরত দরবেশ সম্প্রদায়ের একটি দলেব গুপ্ত ধর্মপুস্তক পাইয়া উহার অনুবাদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহা "বেদান্ত সার" পুস্তকের সহিত মিলে। এই সম্প্রদায় জেলালুদ্দিন রুমি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ইহাদিগকে মেলভি সম্প্রদায় বলা হয়। উপরোক্ত দরবেশ দল উর্ধ্বে বাহু তুলিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে এবং দশাপ্রাপ্ত

২. ভারতের সংস্কৃতি : ক্ষিতিমোহন সেন, পৃ. ৭৯

হয়। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের নৃত্যের সহিত এই নৃত্যের সৌসাদৃশ্য আছে। কনস্টান্টিনোপলে বৈষ্ণবদের সহিত এই নৃত্যের সৌসাদৃশ্য দেখিয়া লেখক আশ্চর্যান্বিত হন। তাঁহার ধারণা গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা দরবেশদের নিকট এই বিষয়ে ঋণী।'[৩]

বাংলার এই মণিরত্ন খোচিত সম্পদের ভাণ্ডার চর্চার অভাবে সেভাবে উন্মোচিত হয়নি, পেটিকার মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। অবশ্য একথা উল্লেখের দাবি বাংলার সমাজ ও সাহিত্য করতেই পারে। মধ্যযুগের লোকসংস্কৃতির মিলনের সেই পরম্পরা বাহিত হয়ে এসেছে আধুনিক যুগের বাংলার সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে। সেই সম্প্রীতি যজ্ঞের ঋত্বিক রবীন্দ্রনাথ বাংলার মানবাত্মাকে ভারতাত্মায় রূপান্তরিত করে বিশ্বের দরবারে পৌঁছেছেন—

'এসো হে আর্য এসো অনার্য
হিন্দু-মুসলমান
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ,
এসো এসো খৃষ্টান।

গুরুদেবের সেই গানের রেশ ধরে ভাবশিষ্য নজরুল বলেন—

'এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোনো মন্দির কাবা নাই।'

প্রাগুক্ত বর্ণনা যেমন সত্য, এর বিপরীত ক্রিয়াও সমানভাবে সত্য। আজ থেকে প্রায় শতবষ আগে রবীন্দ্রনাথ বলে গিয়েছিলেন 'হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে।'[৪] সমগ্র ভারতের জাতি বৈরিতার ইতিহাস একই সরলরেখায় বিশ্লেষণ করলে শুধু সরলীকরণ হবে না তা হবে মারাত্মক ভুল। বাংলার জাতি বৈরিতার সূত্রপাত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সাথে অন্ত্যজদের সংঘাতকে কেন্দ্র করে। এখানে আর্য চতুর্বর্ণের বিকাশ ঘটেনি, সুতরাং একে আর্য-অনার্যর সংঘাত যেমন বলা যায় না, তেমনই ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে বাংলায় প্রবেশ করতে দ্বিবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমত, প্রাচীন সাহিত্যে দেখা যায় এ দেশে প্রবেশকারী ব্রাহ্মণদের পতিত বলে ধরা হত এবং তাদের ছোঁয়া জল গ্রহণে উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা অসম্মত ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বাংলার অধিবাসীদের সম্পর্কে অনেক কটু কথা আছে। মঞ্জুশ্রীমূলকল্প নামক একটি অতি প্রাচীন গ্রন্থে বাংলার অধিবাসীদের অসুর বংশজাত বলে উল্লেখ আছে। 'বাংলার কৌম সমাজ ও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্য প্রাণপণে যুঝেছে এবং যখন পারেনি তখনও সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে দেওয়া নেওয়ার ভিতর দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলাদেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে মাথা নোয়ালেও ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দু'একটি সম্প্রদায়ের বাইরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল ও তার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত।'[৫] দ্বিতীয়ত, বাংলার প্রাচীন জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই

---

৩. ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি, তৃতীয় খণ্ড-ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১১৭

৪. বঙ্গবিভাগ রাজাপ্রজা-সমূহ, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৫২, প: ব: স: সংস্করণ

৫. বাঙালীর ইতিহাস- আদিপর্ব (সংক্ষেপিত সংস্করণ) : নীহাররঞ্জন রায়, পৃ. ২০০

দুলে-বাগদি-পোদ-চাঁড়াল-হাড়ি-চামার ও নমশূদ্র বর্ণভুক্ত। স্বাভাবিকভাবেই ব্রাহ্মণরা এদের অসৎ শূদ্র বলে অস্পৃশ্য করে রেখেছিল, ফলে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে সংগঠিত ঘৃণাব তীব্রতা উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। শূন্য পুরাণের ভূমিকা অনুসারে—

এই রূপে দ্বিজগণ সৃষ্টি করে সংহরণ
এযে বড় হোইল অবিচার।

এর ফলশ্রুতিতে অন্ত্যজ দলিতরা নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ও বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। বঙ্গদেশে এই সময় থেকেই সাম্প্রদায়িক সংঘাতের শুরু। মঙ্গল কাব্যগুলিতে লোকধর্মের সাথে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুদেব দেববিশ্বাসের সংঘাত চিত্রই কাহিনির মূল উপজীব্য, যেমন শৈব চাঁদ সদাগরের সর্প (লোক) দেবী মনসার কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হওয়ার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক বিশ্বাসের সংঘাত চিত্র পরিস্ফুট হয়। 'তখন বৌদ্ধধর্মের অবসানের যুগ, বৌদ্ধধর্ম তখন যান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জমান। তুর্কিদের আগমন ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে (বিশেষ করিয়া বঙ্গে) বৌদ্ধ ধর্মের নির্বাণলাভ— এই দুইটি কাকতালীয়ের ন্যায় হইয়াছিল।'[৬] অন্ত্যজরা নিজেদের আর্থিক সমাজিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের তুলনায় এটিও একটি ব্যতিক্রমী ঘটনা কারণ কালক্রমে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিপত্য ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাছে পরাস্ত বৌদ্ধধর্মাশ্রিত অসহায় অন্ত্যজ কৃষিজীবী মানুষ নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য যেমন ইসলাম ধর্মাশ্রয়ে আত্মরক্ষা গ্রহণ করে তেমনই আর্থিক ক্ষমতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্যও অনেকে মুসলমান হয়েছেন। এর ফলে বিদ্বেষ ও পারস্পরিক ঘৃণা এতটাই বৃদ্ধি পায় যে, একের সত্তা অপরের বিনষ্টি করাই প্রাধান্য পায়। এ কারণেই বোধ হয় বাংলার সংস্কৃতিতে বৌদ্ধদের ধর্মীয় সংস্কৃতির আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। হিন্দু মুসলমানের ধর্মান্ধতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়— 'এ কথা মানিতেই হইবে আমাদের দেশে ধর্ম লইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা কঠিন বিরুদ্ধতা আছে। যেখানে সত্যভ্রষ্টতা সেখানেই অপরাধ, যেখানে অপরাধ সেখানেই শাস্তি। ধর্ম যদি অন্তরের জিনিস না হইয়া শাস্ত্রমত ও বাহ্য আচারকেই মুখ্য করিয়া তোলে তবে সেই ধর্ম যত বড়ো অশান্তির কারণ হয় এমন আর কিছুই হয় না'।[৭] ইতিহাসের এই ধারা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন হজরত মির্জা তাহির আহমেদ 'Did the history begain with the course of cain? It is a gory tale of murder, assassination and torture in any event : so much blood has been splited through out the history that the whole world be painted red with it-with plenty to spare. When will man stop killing his fellow men? When will his thrust for blood even be quenched?'[৮] বাংলার

৬. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি : সুনীতিকুমাব চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১১

৭. লড়াইয়ের মূল, কালান্তর, রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড (বিশ্বভারতী) পৃ. ৫৫৬

৮. Murder in the name of Allah · Hazarat Mirja Tahir Ahamed; p. 1 (Letter worth press, crambridge)

ইতিহাসেও একথা সমানভাবে সত্য। আমরা যেন বিস্মৃত না হই সাম্প্রতিক ভারতের ইতিহাসে সর্বাধিক কলঙ্কিত দাঙ্গার মধ্যে অন্যতম একটি হল ১৯৪৬-এর নোয়াখালির দাঙ্গা। সেই সময়ও বাঙালি মনন ভাবের ঘরে চুরি করেছিল। মহাত্মা গান্ধীর সহযাত্রী মাত্র কয়েক জন বাঙালি ছাড়া আর বিশেষ কেউ সেখানে যাবার সাহসও দেখাননি।

এই বিভেদ বাঙালির জীবন চর্চায় কত গভীরভাবে প্রবেশ করেছিল তা অনুধাবন করা যায় বঙ্গভঙ্গের সময়কালে রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে— 'হিন্দু মুসলমানের পার্থক্যটাকে আমাদের সমাজে আমরা এতই কুশ্রীভাবে বেআব্রু করিয়া রাখিয়াছি যে কিছুকাল পূর্বে স্বদেশি অভিযানের দিনে একজন হিন্দু প্রচারক একগ্লাস জল খাইবেন বলিয়া তাহার মুসলমান সহযোগীকে দাওয়া হইতে নামিয়া যাইতে বলিতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেন নাই।'[৯] বাঙালি জীবন চর্চার এই অন্ধকারময় দিককে হয় উপেক্ষা করা হয়েছে, নয় আড়াল করা হয়েছে। বাঙালির ইতিহাসের এই ভিন্ন ভূমিকাকে পৃথক করে সেভাবে আলোচনাই হয়নি। অনালোচিত থাকার প্রধান কারণ হয় আত্মশ্লাঘা বোধ থেকে গোপনের এক প্রচেষ্টা, না হয় বাঙালি আদ্যন্ত অসাম্প্রদায়িক এই অস্মিতাবোধ থেকে উপেক্ষার প্রবণতা। এটাও উল্লেখের দাবি রাখে যে, বাঙালি মুসলমান সমাজ নবজাগরণের সময় হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থানের মোকাবিলা করতে গিয়ে পিছনে হাঁটতে শুরু করে। এর ফলে শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ আরও পশ্চাদ্গামী হয়ে পড়ে, আর ঠিক তখনই সে আঁকড়ে ধরতে চায় মৌল শরিয়তি নিয়মকে। শিক্ষিত বাঙালি আশরাফ মুসলমানদের মতো, শিক্ষিত বাঙালি উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ও চাননি সমাজের এই বৃহত্তর সম্প্রদায় শিক্ষায় অগ্রসর হয়ে সমাজের মূল ধারার সাথে যুক্ত হোক। অতীতের এই শূন্যতা আজও পূরণ হয়নি।

ভ্রান্ত দ্বি-জাতি তত্ত্বের যুগান্তকারী ভুল সিদ্ধান্তের দ্বারা ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগ হয়। একদল সাম্প্রদায়িক স্বার্থান্বেষী নেতা ও চতুর সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ রাজশক্তির চক্রান্তে ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নতুন মাত্রা পায়। এই রাজনীতি ভারত ও পাকিস্তানের জনগণ পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে স্থায়ী শত্রুতে পরিণত হয়। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী শক্তিগুলি হীন ও দুর্বল হয়ে পড়ে। বাংলা ও পঞ্জাব এই দুটি প্রদেশ বিভক্ত হলে অগণিত মানুষের জীবন ও সম্পত্তি হানি, অসংখ্য নারীর সম্মান হানির ঘটনায় আবার কালিমা লিপ্ত হল বাংলার ইতিহাস। উভয় বাংলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অবর্ণনীয় দুর্দশায় পতিত হয়ে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকে পরিণত হয়। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে উভয় বাংলায় বারে বারে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে, এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে তার পরবর্তীকাল থেকে বারে বারে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ভিটেমাটি ত্যাগ করতে হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশও অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ধর্ম নিরপেক্ষতার নামাবলি ত্যাগ করে। সদ্য বিগত শতাব্দীর শেষ

---

৯. লোকহিত, কালান্তর : রবীন্দ্র রচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড (বিশ্বভারতী) পৃ. ৫৩৯

দশকে ভারতীয় জনতা পার্টির উত্থান এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় ও সর্বশেষ গুজরাতের গণহত্যা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতা এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। ভারতীয় জনতাপার্টি, বিশ্ব হিন্দুপরিষদ ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ হিন্দুধর্মকে একমাত্রিক চিহ্নিত করে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির চালকের আসনে বসে। ইতিমধ্যেই বিশ্বজুড়ে সাম্প্রদায়িক রাজনীতিরও এক নতুন পর্যায় শুরু হলে উভয় বাংলায় এর প্রভাব পড়ে। আশার কথা, বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতি তার অতীত ঐতিহ্য রক্ষা করে, প্রগতিমনা মুক্তবুদ্ধির প্রায় সব মানুষই ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতির বিপথগামিতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। বহুমুখী এই আক্রমণের বিরুদ্ধে বাঙালির এখন প্রয়োজন তার অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় বাংলার সমাজ জীবন অগ্রসর হয়েছে। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসীদের একথা ভুলে যাওয়া চরম অন্যায় হবে যে, সাম্প্রদায়িকতার একটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, আর তা শক্তিশালী করে শাসকশ্রেণিগুলির সবচেয়ে নিকৃষ্ট সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল স্বৈর-শক্তিকে। শ্রমিকশ্রেণি ও নিপীড়িত শ্রেণিগুলিকে, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সম্প্রদায়ের সংঘশক্তিকে দুর্বল করাই তার প্রধান লক্ষ্য বলে নির্ধারিত করে; এর মধ্য দিয়ে তারা সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়। সমাজের দ্বন্দ্ব-সমূহকে বিশ্লেষণের সময় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে, সাম্প্রদায়িক শক্তির উত্থান শ্রমিকশ্রেণির সংগঠনের দুর্বলতাই সুচীত করে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার পতন এবং সামুয়েল হারিংটনের Clash of Civilisation গ্রন্থ প্রকাশের পর খ্রিস্টীয় সাম্প্রদায়িকতাবাদের এতদিন দস্তানার আড়ালে থাকা হিংস্র নখ আর গোপন থাকে না, প্রকাশ হয়ে পড়ে। সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান বিশ্ব জনসংখ্যার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রয়াসী হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির বিশেষ লক্ষণই এটা যে, সে বর্তমানে পেট্রো ডলারের আধিপত্য বিস্তার করছে। সাম্রাজ্যবাদ নিজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট সংকট মোকাবিলা করতে পশ্চিম এশিয়ার ইসলামি জন সংখ্যাধিক্য অঞ্চলের তেলের মজুত ভাণ্ডার যেন-তেন প্রকারে দখল করতে সচেষ্ট হয়েছে। খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদের প্রসারণের বর্তমান আর্থিক বুনিয়াদই হল বিশ্বায়ন। বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ইসলামি মৌলবাদী শক্তিগুলি খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিহত করতে বিশ্বজুড়ে ইসলামি সন্ত্রাসবাদী পথ গ্রহণ করায়, দুই-সাম্প্রদায়িক শক্তির সংঘাত বর্তমান বিশ্বে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছে। এর ফলে বিশ্বে সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলন পদানত দেশগুলির মুক্তি সংগ্রাম অধোগামী হয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশেও বিগত কয়েক দশক ধরে নিরবচ্ছিন্নভাবে চলা হিন্দু-মুসলমান, শিখ অকালী-নিরংকারী-হিন্দু, শ্রীলঙ্কার অধিবাসী-বৌদ্ধ ও তামিল হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক সংঘাতে শ্রেণি সংগ্রাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি দুর্বল হয়েছে। এ অবস্থায় বাঙালি জাতিসত্তার যতখানি প্রয়োজন তার অতীত ঐতিহ্যকে তুলে ধরা ঠিক ততখানি প্রয়োজন সমাজের অভ্যন্তরে সুপ্ত হয়ে থাকা কলুষিত দিকগুলি তুলে ধরে তার বিনাশ সাধন। যুগের দাবিও তাই!

বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্য

বাংলার সম্প্রীতি : প্রাককথন

ঐতিহাসিক বাস্তবতার বিপরীতে দাঁড়িয়ে হিন্দু জাত্যভিমানকে প্রশ্রয় দিতেই ইদানীং হিন্দুত্ববাদীরা এখানে সচেষ্ট যে, আর্যাবর্তের মতো বাংলায়ও হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে চিরদিনই ছিল বিদ্বেষ ও বৈরিতার সম্পর্ক। সিদ্ধান্তটি প্রথমত আর্যাবর্তের ক্ষেত্রেও সিকি-সত্য; এবং দ্বিতীয়ত, দেশ ও কাল নিরপেক্ষও নয়। আর তার থেকেও বড়ো কথা, বাংলার ক্ষেত্রে তা আদৌ প্রযোজ্যই নয়। বাংলার হাজার বছরের ইতিহাসক্রম অনেকটাই ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত; কারণ, আমরা জানি, বাংলা ভারতের জীবনের স্রোতের এক পাশে, একটু বিচ্ছিন্নভাবেই বরাবর ছিল; এবং বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির স্বরূপও স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য ও বিচ্ছিন্নতার স্বরূপ সন্ধানে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হয়; এবং সেখানে মুক্তদৃষ্টিতে তাকালেই আমরা দেখব, হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির একটি গণ্ডিকে প্রোথিত শিকড় সেই মধ্যযুগ থেকেই বাঙালি সংস্কৃতির কাঠামোটিকে তার চালচিত্র সযত্নে ধরে রেখেছে। সেখানে বিরোধ ছিল না সংঘাত ছিল না এমন নয়, কিন্তু সর্বোপরি ছিল ঐক্যবদ্ধ, পরস্পরের সঙ্গে ভাবগত সংহতি, জীবনসংগ্রাম একসাথে বলার অভিন্ন অভিমত।

বাংলার আদি ও পরবর্তীকালের সমাজবিন্যাস সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ অতুল সুর জানিয়েছেন : "বাঙলায় ব্রাহ্মণ্য সমাজের অনুপ্রবেশ অনেক পরে ঘটেছিল। আদিতে বাঙলার সামাজিক সংগঠন কৌমভিত্তিক ছিল। এই সকল কৌমজাতির অন্যতম ছিল পুণ্ড্র ও কর্বট। মনে হয় পুণ্ড্রদের বংশধর হচ্ছে বর্তমান পোদ জাতি, ও কর্বটদের বংশধর হচ্ছে কৈবর্ত। এছাড়া, প্রাচীন বাঙলায় আরও কৌমভিত্তিক জাতি ছিল যথা বাগদি, হাড়ি, ডোম, বাউরি ইত্যাদি। বাগদিরাই যে একসময় বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি ছিল, তা আমরা প্রাচীন গ্রিস দেশীয় লেখকদের রচনাবলি থেকে জানতে পারি। এরা ঋগ্বেদে উল্লিখিত 'বঙ্গৃদ' জাতির বংশধর কি না তাও বিবেচ্য।"[১] এই একটি জাতিসমূহের বংশধর ও ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবী মানুষ; এবং বাংলার সংস্কৃতিও পুষ্টিলাভ করেছে গ্রামবাংলাকে অবলম্বন করে। বাংলার সভ্যতা ও সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-প্রসঙ্গে লিখেছেন : "প্রাচীন ভারতে গ্রাম নগর উভয়কেই আশ্রয় করিয়া

সভ্যতার প্রকাশ ঘটিয়াছিল। গ্রামের বড়ো দান ছিল দার্শনিক চিন্তা ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি, নগরের দান ছিল বাস্তব সভ্যতা, কর্মপ্রাণ সভ্যতা। ইউরোপের সভ্যতা অর্থে Civilisation বা civis বা নগরকেই অবলম্বন করিয়া থাকে, 'নাগরিকতার ভাব'; ইউরোপের polis বা নগর হইতে politics-এর উৎপত্তি। কিন্তু বাঙ্গালা দেশে কখনও নগরের প্রাধান্য ছিল না। ভারতের অন্যান্য প্রদেশে শিল্প-সম্ভারপূর্ণ, বিরাট মন্দির ও অন্যগৃহে শোভিত, বড়ো বড়ো নগর প্রাচীন কাল হইতে গড়িয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়; যেমন, প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা; প্রাচীন কালের মহিচ্ছত্র, মথুরা, কাশী, পাটলিপুত্র, তক্ষশীলা সাকেত, সোপর্দ, উজ্জয়িনী, প্রতিষ্ঠান, ধান্যকটক (অমরাবতী), মহাবলিপুর, কাঞ্চীপুর প্রভৃতি, যে-সব নগরীর ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতে পাই; মধ্যযুগের দিল্লি, আগরা লাহোর, মদুরা, পুনা, মাণ্ডু প্রভৃতি। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে নগরাদির ধ্বংসাবশেষ যে-রূপ পাওয়া গিয়াছে, বাঙ্গালা দেশে সেরূপ ততটা পাওয়া যায় নাই, কাশী, মদুরা, পুনা, উজ্জয়িনী, লাহোর প্রভৃতির সহিত একসঙ্গে নাম করা যায় এমন নগর বাঙ্গালা দেশে বেশি গড়িয়া উঠে নাই— বাঙ্গালা দেশের নাগরিক জীবন মুখ্যত গ্রামের জীবনেরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ।"[২]

এবং এই গ্রামভিত্তিক বাঙালি সভ্যতার ক্ষেত্রে স্বভাবতই ভূমিজ শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকা ছিল প্রধান। সমাজ সংগঠনের স্তরবিন্যাস সে-কারণেই বাঙালি সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। সেই গুরুত্বের মাত্রা বুঝতে ঐতিহাসিক কালবিন্দু হিসেবে আমরা এক্ষেত্রে তুর্কি-বিজয়ের পরবর্তী দেড়শো-দুশো বছরের সময়খণ্ডটি চিহ্নিত করে নিই। এই সময়ে সমগ্র উত্তরভারত জুড়ে যখন মুসলমান ভাব-জগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হতে শুরু করে তখন সহজবোধ্য ভক্তিমার্গ আবার প্রকটিত হয়, এবং 'নাম-ধর্ম' প্রসারলাভ করে। নাম-ধর্মের নানা সাধকও দেখা দিলেন,— রামানন্দ, কবীর প্রমুখ উত্তরভারতের সন্ত-মার্গী সাধুগণ; পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ; এবং বাংলায় শ্রীচৈতন্যদেব। বাঙালি সংস্কৃতির অনেকটাই মহাপুরুষ চৈতন্যদেবকে আশ্রয় করে পুষ্টিলাভ করেছে। আর সে-কারণেই আচার্য সুকুমার সেন চৈতন্য পর্বটিকে বাঙালি জাতির প্রথম জাগরণপর্ব বলে শনাক্ত করেছেন। সেই প্রসঙ্গ পরে।

বাংলায় সেনবংশের লক্ষ্মণ সেনের (১১৭৮-১২০৬) রাজত্বকালেই ইসলামের প্রবেশ ঘটে। তখন বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার ঘটেছে এবং বৌদ্ধরা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে। মধ্যভারত থেকে বিপুল সংখ্যক ব্রাহ্মণের আগমন এবং রাষ্ট্র ও সমাজ তাদের আধিপত্য বৃদ্ধির ফলে বাংলায় বেদ ও ব্রাহ্মণ্যবিরোধী বৌদ্ধরা 'পাষণ্ড' নামে অভিহিত হতে থাকে এবং তারা সাংঘাতিকভাবে অত্যাচারিত হয়। এবং বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনা ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের তন্ত্রমার্গী সাধনার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়; পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধর্মের আওতায় একধরনের লোকায়ত বিকৃত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মও প্রচলিত ছিল। যে সকল

শুদ্ধাচারী বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করল না তারা সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে পদমর্যাদা হারাতে থাকে, সর্বক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। তাদের একাংশ তখন বিজেতা মুসলানদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণও করেছিল। পৃষ্ঠপোষণা ও অনুদানের অভাবে বৌদ্ধমঠ ও বিহার অবলুপ্ত হতে থাকে; কোথাও মসজিদে রূপান্তরিত হয়। লক্ষণীয় যে, বাংলার যে সব স্থানে বৌদ্ধদের প্রাধান্য ছিল সেখানেই ইসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

একাদশ থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবে বাংলায় বর্ণভেদ প্রথা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং 'বৌদ্ধধর্মের সাম্য মৈত্রী ও অহিংসা, যা সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত বাস্তব জীবন স্পর্শ করে, একটা সামাজিক ঐক্যবন্ধন এনেছিল, সেখানে বাহুবলের দ্বারা, রাজশক্তির দ্বারা, একটা কঠোর কৃত্রিম বর্ণভেদের গণ্ডি এঁটে দেওয়ায়, নিম্ন-সমাজে গভীর ক্ষত সৃষ্টি হল।'[৩] আর বল্লাল সেনের কৌলীন্য-প্রথার বর্ণবিন্যাস কেউ-কেউ সম্মানিত হলেও অনেক জাতিই সমাজে অধঃপতিত হয়েছে। সেন যুগে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালি সমাজ শুধু স্তরে-উপস্তরে বিভাজিত হয়নি তাকে ঠেলে ফেলা হয়েছিল রক্ষণশীলতার বিবরে। বামুন-পুরুতেরা হল সমাজের সর্বেসর্বা। বিড়ম্বিত সমাজ জীবনে গণৎকার এসে জাঁকিয়ে বসল। নিথর নিশ্চল গ্রামজীবন আর প্রকৃতিনির্ভর কৃষিব্যবস্থায় তাদের নির্দেশ দৈবাদেশ বলে পরিগণিত হয়। এভাবেই চলেছে বর্ণভেদপ্রথার কঠোর শাসন।

ফিরে আসা যাক ধর্মান্তরণের পর্বে। তুর্কি-বিজয়ের পরে বাংলায় স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বিদেশি ও বিদেশি-মিত্র মুসলমান এবং দেশীয় হিন্দু বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে এক ধরনের সংস্কৃতিগত পারস্পরিক সহযোগিতা আরম্ভ হয়; মুসলমান সুফি, দরবেশ, ফকির ও গাজিরা ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে উত্তরভারত থেকে, মাঝে-মধ্যে বাইরে থেকেও বাংলায় আসতে থাকে। তাদের মধ্যে নানা ধরনের লোক ছিলেন। ধর্মোন্মত্ততায় অনেক হিন্দুকে যে বলপূর্বক মুসলমান করা হয়নি তা নয়, কিন্তু যেভাবে হিন্দুত্ববাদীরা তার প্রচার চালায় তা সত্য নয়। সত্য এই যে, পির ফকির দরবেশ আউলিয়া প্রভৃতি সুফি সাধকদের প্রচার ও কেরামতির ফলে এবং অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যের প্রতি বিদ্বেষ থেকে— বর্ণভেদ প্রথার নিষ্ঠুর সামাজিক অর্থনৈতিক সামাজিক উপেক্ষার পরিণতিতে নিম্নবর্ণের বৌদ্ধ ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী বাঙালিরা ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে। তবে সেই ইসলামধর্ম কোরান-অনুসারী খাঁটি শরিয়তি ইসলাম নয়; তা ছিল অনেক উদার ও সহজবোধ্য; এবং সুফি মতের এই ইসলামের সঙ্গে, তার প্রচারের সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতির মূল সুরের কোনও বিরোধ ছিল না,— বাংলায় প্রচলিত যোগ-মার্গ ও অন্যান্য আধ্যাত্মিক সাধন-মার্গের সঙ্গে বরং তার সহজ আপোসই ঘটেছিল। আর এই পর্বের ইসলামও নিজেকে বাঙালির পক্ষে সহজগ্রাহ্য করে নিয়েছিল। তা সহজগ্রাহ্য ছিল এ-কারণেই যে, ইসলামধর্মে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্যধর্মের সূক্ষ্ম বুদ্ধিবাদ বা intellectualism ছিল না; আপামর সাধারণ বাঙালির পক্ষেই তা সহজবোধ্য ছিল। বলার কথা, ব্রাহ্মণ্যবাদের উৎপীড়ন, বর্ণভেদ

প্রথার অমানবিক উপেক্ষা ও অসম্মান, বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কে নিমজ্জন ইত্যাদি কারণে এবং ইসলামির সুফি মতের উদারতায় তাড়িত ও আকৃষ্ট হয়েই সেদিন নিম্নবর্গের বাঙালি হিন্দু ও বৌদ্ধরা কাতারে কাতারে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছে।

এই ধর্মান্তরণ সম্বন্ধে বিশেষভাবে স্মর্তব্য যে, ইসলামে দীক্ষার পরেও এ সকল নিম্নবর্গের বাঙালি তাদের এতদিনের আচরিত ধর্ম কোনওদিনই ত্যাগ করেনি,— মুসলমান হয়েও ধর্মে সহজিয়া যেমন থেকেছে তেমনি লোকবিশ্বাস ও আচারসমূহ মেনে চলেছে। ড. এনামুল হক লিখেছেন : 'বাঙালিদের যে অপ্রতুল নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হয়েছে তাতে বাঙালি মুসলমানদের সঙ্গে বাঙালি হিন্দুদের কোনও পার্থক্য নির্ণয় করা যায় না।'[৪] বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঐতিহাসিক আনিসুজ্জামান আরও বিশ্লেষণ করে লিখেছেন :

> 'ইসলাম দীক্ষিত স্থানীয় মানুষেরা অনেকেই আবার তাদের পুরা বিশ্বাস, আচার-আচরণ আঁকড়ে থাকে। পুরনো হিন্দু লৌকিক দেবদেবী আগের মতোই যথারীতি পূজা পেতে থাকেন যেমন বসন্তের দেবী শীতলা। হিন্দুদের স্থানীয় লৌকিক দেবদেবীর অনুসরণে মুসলমান সমাজেও লৌকিক দেবদেবীর সৃষ্টি হয়, যেমন— ব্যাঘ্র-দেবতা, বনবিবি কিংবা জলযানের দেবতা। মাঝে মাঝে হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমানরা একই দেবতার পূজার্চনা করত; যেমন— সত্যনারায়ণ, যাঁর মুসলমানি নাম হল সত্যপীর।"[৫]

একইভাবে কেমব্রিজ ইতিহাস সংকলনে বলা হয়েছে : "Yet it is perhaps hardly surprising that this decendents of converts whose contact with the main stream of Islam was best thin and intermitteat, should have relained much from their past together with the Bengali language. The way in which Islam developed in Bengal seems to have been yet another expresion of Bengali regional identity" (The cambridge History of India : 11-2, 1987; p. 34)

ধর্মান্তরণ সত্ত্বেও বাঙালির আত্মপরিচয়ের অভিব্যক্তি অনাহত থাকা নিঃসন্দেহ এক ইতিমূলক ঘটনা; কিন্তু ধর্মান্তরণের মধ্য দিয়ে সমাজজীবনে যে একটা সুস্পষ্ট বিভাজনও ঘটেছিল সেদিন তা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের খ্যাতনামা বুদ্ধিজীবী আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী; "যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়েছেন তাঁদের রাগ প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজ ও ধর্মভেদের প্রতি, যাঁরা ধর্মান্তরিত হয়নি, তাঁদের রাগ এই ধর্মান্তরিত স্বজাতি, অন্যবর্ণ ও স্ববর্ণের লোকদের প্রতি। তাদের ধারণা, এরা স্বদেশ-জাতির শত্রু, শত্রুর সহায়ক কালাপাহাড়।"[৬] তবে একথা সত্য, নিম্নবর্গের হিন্দু ও ধর্মান্তরিত মুসলমান শ্রমজীবীর মধ্যে এই বিভেদজনিত বিদ্বেষ বা সংশয় বেশিদিন যেমন স্থায়ী হয়নি তেমনি তা গভীরেও প্রবিষ্ট হয়নি। পাশাপাশি একসাথে দীর্ঘকাল বসবাস এবং জীবন ও জীবিকার অভিন্ন স্বার্থ দুই ধর্মসম্প্রদায়ের মানুষকে-বিশেষত বাংলার গ্রামসমাজের মানুষকে ঐক্যসূত্রে বেঁধেছে। ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছিল বাঁচার সংগ্রাম,— এক আকাশের নীচে

বাংলার শ্যামল মাটির ওপর দাঁড়িয়ে তারা মুখোমুখি হয়েছে কঠিন রূঢ় বাস্তবের, সামন্ততান্ত্রিক শোষণের। এবং একসাথে চলার পথে একে অন্যের পাশে দাঁড়িয়েছে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। আর এভাবে বাঙালির আত্মপরিচয়ের অভিপ্রকাশ ঘটেছিল; ধর্মীয় ভিন্নতার ঊর্ধ্বে বাঙালি জাতীয় সত্তার সাংস্কৃতিক সামাজিক ঐক্যরূপ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

বাংলার মুসলমানদের তিনবর্গে ভাগ করা যায় : (ক) আগন্তুক মুসলমান, (খ) ধর্মান্তরিত মুসলমান, এবং (গ) উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান। স্মর্তব্য, উল্লিখিত দ্বিতীয় বর্গের ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং তাদের বংশধরদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। এবং এই মুসলমান সমাজ প্রতিষ্ঠারও একটা কালপর্ব আছে।

> "বাংলায় মুসলমানসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, বাংলা মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হবার পর। ১২০৩ খ্রিস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি প্রথম বাংলা জয় করেন। সেই সময় থেকে শুরু করে ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক দেওয়ানি গ্রহণের সময় পর্যন্ত এই সার্ধ পাঁচশত বৎসর বাংলা মুসলমানগণের অধীন থাকে। আগন্তুক মুসলমানই বলুন, আর এই দুইয়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন মুসলমানই বলুন, তাদের সকলেরই উদ্ভব হয়েছিল এই সার্ধ পাঁচশো বছরের মধ্যে।"[৭]

ধর্মান্তরণ প্রসঙ্গে আরও বলার কথা এই যে, যবন-দোষ বা সমাজচ্যুতির মতো ঘটনা না ঘটলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা সাধারণত ধর্মান্তরিত হত না। তবে মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোনো হিন্দু জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হত তাহলে তাকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হত। তাছাড়া, রাজানুগ্রহ লাভের আশায় কিছু সংখ্যক উচ্চবর্ণের মানুষও ধর্মান্তরিত হয়েছিল। তবে নিম্নবর্ণের শ্রমজীবী মানুষই বেশি সংখ্যায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল; এবং বাংলার বিগত সাড়ে পাঁচশো বছরের ইতিহাসে এই ধর্মান্তরিত মুসলমান জনগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়ের সংকটও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; তা যেন ঘন কুয়াশায় ঢাকা।

বাংলার সম্প্রীতি : প্রাক আধুনিক যুগ

> মছলমানের 'আল্লা আল্লা'
> হিন্দুয়ে বলে 'হরি হরি'।
> এগো, যে খেলা পাইয়া আইছে হ।
>
> (লোকসঙ্গীত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫১)

ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে বাংলা তথা পূর্বভারতে হিন্দু-মুসলমান বিষম সম্পর্কের একটি বিবরণ ধৃত রয়েছে বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতা'য়—

> "হিন্দু ও তুর্কিরা একত্রে বাস করিতেছে। একের ধর্ম অন্যের উপহাসের খোরাক জোগায়। কেউ আজান ডাকে, কেউ বেদ পাঠ করে। কারো সমাজে মেলামেশা, কারো সমাজে ভেদভাব প্রকট। পণ্ডিতদের কেউ বলে ওঝা কেউ

বলে খোজা। কেউ পালন করে উপবাস, কেউ কেউ 'রোজা' (রমজান)। কেউ ব্যবহার করে তাম্রকুঞ্জ কেউ বা কুজো। কেউ নামাজ পড়ে, কেউ করে পূজা। কত তুর্কি পথে যেতে বেগার ধরে (forced labour)। ব্রাহ্মণ বটুকে (বড়ো) ধরিয়া মস্তকের উপরে গোরুর রাঙ (হাড়) চড়াইয়া দেয় (ধর্মনাশের জন্য) তাহারা ফোঁটা 'চাটে' (তুলিয়া দিয়া), পৈতা ছিঁড়িয়া দেয় ও ঘোড়ার উপর চড়াইতে চাহে। তাহারা ধোয়া উড়িধানে মদ চোলাই করে। মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ তৈরি করে। ধরণী পূর্ণ হইল কবর ও গোমঠে। পা ফেলিবার এতটুকু স্থান নাই। হিন্দুকে বলে 'খাও, দূর নিকালো।' ছোটো হইলেও বড়োকে মারিতে চায়।"[৮]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, বিরোধ কিন্তু ছিল মূলত উচ্চবর্ণের বিশেষত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে আগন্তুক তুর্কিদের; এবং সেই বিরোধও মুসলমান শাসনের প্রথম পর্যায়ের ঘটনা হওয়ায় প্রতিক্রিয়া এতটা বিষম হয়েছে। প্রসঙ্গত, ধর্মাচরণ সূত্রে সাম্যের আদর্শবাহী ইসলামেও জাতিভেদ প্রথার অশুভ বীজ ছড়িয়ে পড়ে। ১৯১১ সালের আদমশুমারিতে বাংলায় মুসলমানদের ৮০টি জাতির উল্লেখ রয়েছে অধ্যাপক আনিসুজ্জামান এক নিবন্ধে জানিয়েছেন : "বাংলায় ইসলামি শাসনের অন্যতম পরিণতি হিসেবে বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্ণের হিন্দুদের ইসলামে ব্যাপক ধর্মান্তকরণ ঘটে। এইসব মানুষের কাছে ইসলাম কেবলমাত্র একটি উন্নত পর্যায়ের সমতাভিত্তিক আদর্শ ছিল না। ধর্মান্তরে পার্থিব সুযোগ-সুবিধা লাভের আশাও ছিল খুব জোরালো। কিন্তু অচিরে দেখা গেল যে বর্ণপ্রথার প্রভাব মুসলমান সমাজেও পড়েছে। বহিরাগত মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদায় অনেক উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছে, আর স্থানীয় ধর্মান্তরিতরা ঠাঁই পেয়েছে মুসলমান সমাজের নীচের তলায়।"[৯] বাঙালি মুসলমান সমাজে অতঃপর দুটি স্পষ্ট স্তরে, আশরাফ-আতরাফ, অভিজাত-অনভিজাত বিভাজিত হয়; বহিরাগত সম্ভ্রান্ত মুসলমানরাই শুধু আশরাফ বা অভিজাত বলে চিহ্নিত হত এবং সেটা ছিল তাদের গর্বের বিষয়। আর অধিকাংশ ধর্মান্তরিত মুসলমানরা ছিল চাষি, কারিগর, মজুর - বাঙালি শ্রমজীবী মানুষ। এরাই কিন্তু ১৯০১-এর আদমশুমারির সময় দাবি করেছিল যে, তারা দেশজ সম্প্রদায়ের নয়, তারা সকলেই বাংলায় আগন্তুক মুসলমানদের বংশধর। তার মানে দাঁড়ায়, সকলেই তারা সৈয়দ মুঘল বা আফগান শাসকমণ্ডলীর বংশধর। নিজেদের অভিজাত আশরাফ বলে জাহির করার এমতো প্রয়াসে প্রচ্ছন্ন থাকে ধর্মান্তরিত বাঙালি শ্রমজীবী মুসলমানদের আত্মপরিচয়ের সংকট সেই সংকটই, pseudo বা মিছা বংশপরিচয়ের প্রকাশ পায়। তৎকালীন সেন্সাস কমিশনার ই.এ. গেট কিন্তু তাদের সেই দাবি গ্রহণযোগ্য মনে করেননি; এবং নৃতাত্ত্বিক লক্ষণসমূহ বিশ্লেষণেও প্রমাণিত হয় যে উত্তরবঙ্গের মুসলমানরা মঙ্গোলীয় কোচ (বর্তমানে রাজবংশী) জাতির এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা দেশজ হিন্দু জাতিসমূহের উত্তরসূরি; কেউই বহিরাগত সৈয়দ মুঘল আফগানের বংশধর নয়।

এভাবেই আমরা এম.এস. আকাশ-এর বয়ানে বলতে পারি যে, "স্থানীয় জনগণের মধ্যে যাঁরা ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতাপে অস্থির ছিল, বিশেষত অত্যাচারিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ এবং শূদ্র বর্গের লোকেরা তাঁরাই প্রধানত ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ স্থানীয়দের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা অধিকাংশই ছিলেন সমাজের অধস্তন জনগোষ্ঠী।"[১০]

ভারতে তথা বাংলায় ইসলামের আগমনের ফলে তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটেছিল। ম্লেচ্ছ ও যবনের স্পর্শ থেকে হিন্দু সমাজের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার নামে ব্রাহ্মণরা তাকে আরও কঠোর গোঁড়ামির খোলসে ঢাকবার উদ্যোগ নেয়; জাতপাতের কঠোরতা আরও বৃদ্ধি পায়। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের সামাজিক অবজ্ঞা ঘৃণা এবং দুয়ের মধ্যে বিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও সহাবস্থান ও সমন্বয়ের এক আশ্চর্য প্রক্রিয়াও সেই প্রথম থেকে লক্ষ করা যায়। আচার্য যদুনাথ সরকার লিখেছেন : "এই যে এত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু মুসলমান একই দেশে একই রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিয়াছে, ইহার ফলে এই দুই ধর্ম ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের কী কী প্রভাব, কী কী আদান-প্রদান ঘটিয়াছে? প্রথমে ইহারা শত্রু ছিল, একের সহিত অপরের অস্তিত্বও যেন অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী। কিন্তু অষ্ট শত বৎসরেও একে অপরটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নাই, লোপ করিয়া দেয় নাই। দুইজনেই জীবিত আছে, কিন্তু অশেষ পরিবর্তন গ্রহণ করিয়া।"[১১]

সামাজিক জীবনে সহাবস্থানের মতন ধর্মীয় জীবনেও সমন্বয়ের এক বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে চতুর্দশ শতকের শেষভাগে রামানন্দ কর্তৃক হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের এক মিলিত উপাসক সম্প্রদায় আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর প্রচার ছিল ঈশ্বরের চোখে সবাই সমান; খুঁটিনাটি আচার বিচার ছেড়ে দিয়ে সকল জাতের লোককে, রামানন্দ শিষ্য বলে গ্রহণ করতে থাকেন। আবার পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে আবির্ভূত হলেন কবীর; হিন্দুর মাতৃপূজা ও ধর্মশাস্ত্র এবং মুসলমানের কোরানশরিফ ও ধর্মসংস্কারের— প্রাচীন ধর্মগ্রন্থের দুর্বোধ্য ভাষা ছেড়ে নব্য চলিত ভাষায় তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করতে থাকেন।

প্রসঙ্গত, হিন্দু-মুসলমান ধর্মসমন্বয়ের ক্ষেত্রে সম্রাট আকবরের 'দীন-ই-ইলাহি'-র এই শাহজাহান পুত্র দ্বারা সুকোহ'র 'মাজথা-ইল-বাহরেইন'-এর অবদান স্মর্তব্য। দারা সুকোহ উপনিষদ ও গীতার অনুবাদ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর মতে হিন্দুশাস্ত্র, উপনিষদ একেশ্বরবাদের সাগর বিশেষ, আর উপনিষদই ঈশ্বর কর্তৃক জগতে প্রেরিত প্রথম প্রত্যাদেশ গ্রন্থ। কোরান শরিফে নিহিত বহু রহস্যেরই ব্যাখ্যা পাওয়া যায় উপনিষদে। তবে এক্ষেত্রে স্মর্তব্য, সম্রাট আকবর বা শাহজাদা দারা সুকোহর মতো উদারমনা ধর্মচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব শাসকবর্গে খুবই বিরল ছিল। বাস্তবত, উচ্চবর্গীয় বা শাসকবর্গীয় সমাজে সাধারণভাবেই পরমত বা পরধর্ম সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতা ও বিদ্বেষই লক্ষ করা গেছে,— বিজিত রাজ্যে নিজ ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার অজস্র দৃষ্টান্তও রয়েছে। তবে এমতো ধর্মীয় অপভাবের সঙ্গে প্রতাপের

রাজনীতি বা সামন্ততান্ত্রিক হেগিমনি বা শ্রেণিক্রমের কোনও সম্পর্ক আছে কিনা তা অন্য প্রশ্ন। এক্ষেত্রে শুধু বলার কথা, কোনও ধর্ম-চেতনা বা ভাবাদর্শই শ্রেণি-বর্ণ, দেশ-কাল, জাত-জাতি নিরপেক্ষ নয়; বরং বিশেষ শর্তেই তার বিন্যাস ও প্রকাশ ঘটে।

ইতিপূর্বে আমরা যে হিন্দু মুসলমান দুই- ধর্মসম্প্রদায়ের শ্রমজীবী নিম্নবর্গের মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনচর্চার ক্ষেত্রে অভিন্নতার বা ধর্মীয় ঐক্য চেতনার— দুই ধর্মচেতনার মধ্যে সংমিশ্রণের উল্লেখ রেখেছি সেখানেও কিন্তু শ্রেণিবর্গ দেশ-কাল, জাত-জাতির শর্ত প্রযোজ্য। বলার কথা এই যে, বাংলার খেটে-খাওয়া চাষি-মাঝি, জেলে-জোলা, কুমোর-কামার— বাংলার লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির সূত্রেই বহমান রয়েছে সম্প্রীতির ধারা। আপতিক কোনও কারণে বা ক্ষোভে-ক্রোধে, প্রখর গ্রীষ্মে হয়তো সেই ধারাটি শীর্ণকায় হয়; আবার নতুন ধানের গন্ধে— উৎসব-পার্বণের উদ্বেল আনন্দে বা বর্ষায় তা আবার স্রোতস্বতী হয়, হয়ে ওঠে। বাস্তব সম্প্রীতির যে নিগূঢ় বন্ধনটি লোকজীবনের একেবারে তলায়— তরঙ্গমুখর সমুদ্রের তলদেশে বা মন্ময়জগতের নীচে অনাহুত রয়েছে তা শুধু অমূর্ত নয়, স্পর্শকাতরও। দেশ-কাল, শ্রেণি-বর্ণের শর্তাধীন সেই সংগুপ্ত বন্ধনটি সম্বন্ধে আমাদের মনে রাখা হয়, ধর্মচেতনা বা জাতীয়তার মতন প্রতিটি ভাবাদর্শই ঘনিষ্ঠভাবে সামাজিক উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে জড়িত; উপরন্তু উৎপাদনসম্পর্ক এবং সামাজিক সংগঠনের মূল কাঠামোর ছাঁদেই যেহেতু তার উপরিকাঠামোটি গড়ে ওঠে তাই তার মূর্ত, রূপটিও সেই ছাঁদেই প্রকাশ পায়, সেমতোই ঘটে তার গঠন ও প্রতিক্রিয়া। বলার কথা, আমাদের মন্ময় জগতের যাবতীয় কর্মকাণ্ড— চিন্তা-চৈতন্য, বোধ-অনুভূতি, কল্পনা-অভিভাব রূপ পায় তন্ময়জগতের শর্তেই, কোনও কিছুই বায়বীয় নয়। আরও স্পষ্ট করে বললে, আমাদের চিন্তা-চেতনা, মূল্যবোধ-নৈতিকতা, ধর্মবিশ্বাস-ধর্মাচার, রীতি-প্রথা, পরিচ্ছদ, খাদ্যাভ্যাস সহ যাবতীয় জীবনচর্চাই উৎপাদন-সম্পর্কের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত; কোনও কিছুই অবিচ্ছিন্নভাবে প্রক্ষিপ্ত নয়।

নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী যে জনগোষ্ঠীর ধর্মীয় চেতনার অভিন্নতার বিষয় আমাদের আধেয় তাদের অধিকাংশের বাস গ্রামে, এবং কৃষি বা ক্ষুদ্র কুটির শিল্প বা উপজীবিকার সঙ্গে তারা জড়িত। এবং একটু পিছিয়ে তাকালে আমরা দেখি, সেগুলি ছিল 'সম্পূর্ণ গ্রাম'— ধোপা, নাপিত, কামার, কুমোর, চাষি, মাঝি বিভিন্ন পেশার মানুষ একই গ্রামের চৌহদ্দির মধ্যে বাস করার ফলে গ্রামগুলি হয়ে উঠেছিল স্বনির্ভর বা সম্পূর্ণ গ্রাম,— জরুরি প্রয়োজন ব্যতিরেকে গ্রামের বাইরে কাউকে বিশেষ যেতে হত না। মার্কস তাঁর ১৮৫৩-এ লেখা 'ভারতে ব্রিটিশ শাসন' প্রবন্ধে এই 'সম্পূর্ণ গ্রাম' সমাজকে প্রাচ্য সমাজের বিবর্তনহীনতার কারণ হিসেবে তুলে ধরেন। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন তখন অবধি অন্যান্য ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতানুসারী। পরবর্তী তিরিশ বছরে ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সমাজ-

ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁর পরিচয় আরও গভীর হয়। সেই সর্বশেষ ধারণাটি ধরা রয়েছে ১৮৮০ থকে ১৮৮২ সালে লেখা 'দি এথনোলজিকাল নোটবুকস অফ কার্ল মার্কস' (১৯৭৪) গ্রন্থের জন বাড ফিয়ার এর 'দি এরিয়ান ভিলেজ' এর ওপর তাঁর নোটে।[১২] আমাদের প্রসঙ্গিক প্রশ্ন হল, এই অনড়তার ঘেরাটোপ ভেঙে কীভাবে সাংস্কৃতিক সংযোগ গ্রামান্তরে স্থানান্তরে ব্যাপক মানুষের মধ্যে বিস্তার করেছিল।

'সম্পূর্ণ গ্রাম'-এর যে ধারণাটির উল্লেখ করা হয়েছে সেটি বাস্তবত বিষয়গত দিক থেকে,— প্রয়োজনীয় উপকরণের জোগান ও সরবরাহের ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার বিষয়। কিন্তু বাংলার গ্রামের মানুষ কোনওদিনই মন্ময়গতভাবে কূপমণ্ডূক ছিল না; আর যে কালপ্রেক্ষাকে দৃষ্টিমূলে রেখে আমাদের আলোচনা সেখানে সুফিবাদ ও ভক্তিবাদে বাত্যা তখন প্রবল বেগে বইছে, বাংলার বাউল একতারা বাজিয়ে গাইছে : কোথা থেকে এলাম, কে গড়েছে, কোথায় যাব— কিছুই জানি না আমি দয়াল, আর কেনই বা ক্ষণিকের বন্ধন! বাংলার শ্যামল প্রকৃতির সহনশীলতার সঙ্গে পারস্য থেকে আসা সুফিবাদের ঔদার্য মিলেমিশে যায়,— ধর্মোধর্ব এক পরমের ধারণায় তারা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। আউল-বাউল-ফকিরদের সেই জীবনবোধ বাংলার লোকজীবনে গভীরে প্রভাব ফেলে এবং হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষকে সংকীর্ণ আচার-বিচারের জীবন থেকে মুক্ত করে দেয়। একই মাটির বুকে হাল চালাতে চালাতে, মহাজন-জমিদারের শোষণে-শাসনে, অভাবে বঞ্চনায়, দুঃখে-বেদনায় দুই ধর্মসম্প্রদায়েরই গরিব মানুষ একই ভাষায় কথা বলেছে, একই ভঙ্গিতে ক্ষোভ-বেদনা প্রকাশ করেছে, আনন্দে মাতোয়ারা হয়েছে। বিষয়গত জীবনের অভিন্ন অভিজ্ঞতায় ও শর্তেই তাদের আধ্যাত্মিক চেতনার জগতেও বিশেষ কোনও বিভেদ বা ভিন্নতা থাকেনি। আর সেই অভিন্ন চেতনার প্রকাশ ঘটেছে লোকসংস্কৃতির মধ্য দিয়ে।

আর সেখানে প্রথম যে নামটি আমাদের স্মরণে আসে সেটি হল লালন শাহ,— লালন ফকির নামে যাঁর খ্যাতি। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের গানে লালন ফকিরের ভাব স্পষ্ট বাঙ্ময় হয়েছে। পরমের কাছে লালনের নিবেদনের যে গান তা ভাবসত্য ও কথায় এতই সমৃদ্ধ ও উদার ছিল যে সাধারণ মানুষও তাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে খুঁজে পেত এক প্রাজ্ঞ জীবনবোধ,— মহামানবের ঐক্য, চেতনা ও পরমের ধারণা। যেখানে জাতপাতের, সম্প্রদায়ের ভেদাভেদ নেই; আজও তাঁর গানের পদ লোক মুখে ফেরে :

> সব লোকে কয় লালন কী জাত সংসারে
> লালন কয় জাতের কী রূপ দেখলাম না এ জগতে।
> যদি খাতনা দিলেই হয় মুসলমান,
> নারীলোকের কী হয় বিধান,
> বামুন চিনি পৈতায় প্রমাণ
> বামনী চিনি কীসে রে?

কেউ মালা কেউ তসবি গলে
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলে
আসা কিম্বা যাবার কালে
জাতের চিন্তা রয় কারে।

এই আউল-বাউলদের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি এক্ষেত্রে স্মর্তব্য : "আমাদের দেশে যাঁরা নিজেদের শিক্ষিত বলেন তাঁরা প্রয়োজনের তাড়নায় হিন্দু-মুসলমানের মিলনের নানা কৌশল খুঁজে বেড়াচ্ছেন।... বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনাই দেখি, এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে, অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি।... এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু-মুসলমানের কথা মিলেছে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্যি পরিচয়, বিবাদে বিরোধের বর্বরতা।[১৩] আর এই আউল-বাউলদের বিরুদ্ধে গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমানদের আক্রোশের প্রকাশে স্পষ্ট হয় তাদের সামাজিক ভূমিকার গুরুত্ব,— ভূমিলগ্ন শ্রমজীবী জনগোষ্ঠীর চৈতন্যে তাদের প্রচারের অনুক্রিয়া।

আর এই চেতনা পরিবাহিত হয়েছে লোকসংস্কৃতির শিরায় শিরায়। একেবারে গোড়ার দিকে সুফি সন্তরা গেয়ে ওঠেন :

"খোদা খোদা আল্লার রাধা দোস্ত মহম্মদ
মনোমোহন ফিরেছেন খুঁজে হিন্দু মুসলমান।
বিধি ফতেমা কালী শিব হল হজরত
জল পানি বায়ু একই হরফ।" (সাহিত্য প্রসঙ্গে; পৃ. ৫৫)

এভাবে শুধু হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নয়, দ্বৈত-অদ্বৈত, আকার-নিরাকারের মধ্যে ভিন্নতার প্রাচীর ভেঙে এক অভিন্ন অধ্যাত্ম চেতনার স্ফুরণ ঘটে। একইভাবে লালন ফকির-এর গানে উচ্চারিত হয় : 'যে যা ভাবে সেই রূপ যে হয়।/রাম রহিম করিম কালা এক আল্ডা জগৎময়।।' আবার, "ভক্তির দ্বারে বাঁধা আছেন সাঁই/হিন্দু কি যবন বলে/তাঁর কাছে জাতের বিচার নাই।"

> "লালন জাতিতে জাতিতে ও ধর্মে ধর্মে কোনো পার্থক্য দেখেন নাই। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মে কোনো বিভেদ বোঝেন নাই। তিনি আল্লাকে 'অধরকালা' এবং মহম্মদ ও চৈতন্যদেব উভয়কেই সমানভাবে ঐশী শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিত মানবশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাঁহারাই মানুষের উদ্ধারের জন্য ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যেই ভগবানের পূর্ণ প্রকাশ হইয়াছে।"[১৪]

লালনের আরও বহু গানে একই সৃষ্টিকর্তার কথা বারবার বলা হয়েছে। রাম আর রহিমের মধ্যে যে কোনও পার্থক্য নেই, ভেদ নেই বারবার সে-কথা তাঁর গানে উচ্চারিত হয়েছে।

'কী এক অচিন পাখি পোষলাম খাঁচায়।
আমি জনম ভরে না পেলাম তার পরিচয়।।
পাখি রাম রহিম বুলি বলে,
ধরে সে অনন্ত লীলে।
বলো তারে কে চিনিলে,
বলো গো নিশ্চয়।"

বলার কথা এই, বাউল মতবাদের উদ্ভব ঘটে সুফিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম, নামধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে। বাউল গানই বাউলের সাধনার অঙ্গ,— অন্য কোনও দর্শন বা শাস্ত্র নেই। রামমোহনের সমসাময়িক লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) বলতেন, জীবদেহেই আরাধ্যের অধিষ্ঠান; পারিভাষিক শব্দে— তাঁকে 'মনের মানুষ', 'অচিন পাখি', 'মন মনুয়ার', 'অধরা', 'অটল'— প্রভৃতি সম্বোধনে তাঁকে ডাকা হয়েছে। সংক্ষেপে, দেহভাণ্ডকে জানলেই ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যায়। বাউলরা জাতির বিচার করে না,— উচ্চ-নীচ ধনী-নির্ধন, কিংবা বর্ণভেদ, শ্রেণিভেদ মানে না। ড. ওয়াকিল আহমদ জানান, "লালন শাহ প্রমুখ বাউলরা শাস্ত্র বা শরিয়তিধর্মের কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা ভেঙে দিয়ে একটি উদার মানবতাবাদ এবং সহজপন্থী মরমিয়াবাদের সৃষ্টি করেন। লালন কুষ্টিয়ার দেঁউড়িয়ায় আস্তানা করে সাধনা করতেন। কৃষক ও তাঁতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউল মতে দীক্ষা নিত। লালনের কয়েক লক্ষ বাউল শিষ্য ছিল। বাউলরা মুখ্যত বিবাগী; তারা চাষাবাদ, তাঁতবোনা প্রভৃতি স্বাভাবিক জীবিকা ছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করত। বাউল মতে দেহসাধনার কথা আছে, তান্ত্রিকদের মতো তারা নারীসঙ্গম ও মদ্যপানাদি সমর্থন করে। এই বামাচারী তমসিক ধর্মাচারণের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউলদের সুনজরে দেখত না, বরং সামাজিক অনাচারের ভয়ে তারা বাউলদের বিরূপতা করে উৎপাত করার চেষ্টা করছে। মুসলমান যুবকেরা সংসারধর্ম ত্যাগ করে বাউলমতে দীক্ষা নিত, শরিয়তপন্থী মুসলমান এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। মোল্লা-মৌলবিরা 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' পর্যন্ত জাহির করেছিলেন। লালন শাহের জীবিতকালেই বাউলবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়।" (দ্রষ্টব্য, 'উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা'; পৃ. ৮২) আরও জানা যায়, "কুষ্টিয়ার হিজলঘাটে গ্রামের মুনশি তোফাজ্জল হোসেনের সাথে লালনের একাধিকবার কোরান-হাদিস নিয়ে বিতর্ক হয়। কাঙ্গাল (ছদ্মনামে) রচিত 'সহি আক্ষেপনামা' পুঁথিতে এ সবের বিবরণ আছে।" (দ্রষ্টব্য খোন্দকার রেয়াজুল হক : লালনশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র, পূর্বাচল, কার্তিক ১৩৮৩) লালন বিদ্যাহীন প্রচার সর্বস্ব শরিয়তপন্থীদের আক্রমণ করে বলেছেন :

'বে-এলম, বে-মুরীদ জনা,
শরিয়তের আঁক চেনে না,
কেবল মুখে তোড় ধরে।'

শুষ্ক আচার-আনুষ্ঠানিকতার বিরোধিতা করে তিনি গেয়েছেন : 'কলমা আর নামাজ/রাজা ডাকাত হজ,/এই করিয়ে আদায় কর শরিয়ত?/আমি ভাবে বুঝতে পাই। এস· আসল শরিয়ত নয়/আরো কিছু অর্থ থাকতে পারে।' এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ওয়াহাবি-ফারায়েজি ধর্ম সংস্কারের সময় থেকে বাউলদের প্রচার তীব্রতর হয়। যশোরের 'মুনশি সাহেব' মেহেবুল্লা খ্রিস্টান মিশনারিদের মতো বাউলদের বিরুদ্ধেও প্রচার অভিযান চালান। তাঁর জীবনীকার শেখ হাবিবর রহমান 'মেহেরুল এসলাম' (১৮৯৭) গ্রন্থে বাউল-বিরোধিতায় লেখেন :

"নাড়ার ফকিব যারা আছে পায় পায়।
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়।
বহুতি আপসোস হয় তাহাদের তরে।
বানাইল পশু তারা বহুতর নরে।।"

প্রগতিশীল লেখক মীর মোশারফ হোসেন পর্যন্ত তাঁর 'সঙ্গীত লহরী' (১২৯৪) গ্রন্থে বাউলদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

"ঠেটা গুরু ঝুটা পির
বালা হাতে নেড়ার ফকির,
এরা আসল শয়তান, কাফের বেইমান
তাকি তোমরা জান না।"

এত করেও কিন্তু বাউলদের ঠেকানো যায়নি,— বাংলার ভূমিলগ্ন শ্রমজীবী মানুষের চিন্তা চেতনায় তাদের সহজ মরমিয়া সঙ্গীতের লহরি অব্যাহতই থেকেছে। আর বিভিন্ন অঞ্চলের বাউল-সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির গভীরতর বাণী বাঙ্ময় হয়েছে। ঢাকার নরসিংদি থেকে সংগৃহীত একটি বাউল গানে সৃষ্টিকর্তার সেই অভেদ রূপই প্রকাশ পায়:

রাম-রহিম একই আল্লাজির নাম,
কৃষ্ণ-বিষ্ণু-বিসমোল্লা—
কেহ বলে কানাই গোপ, গোপিনী রাই,
আখের নিরঞ্জন আল্লা।[১৫]

অন্য একটি বাউল গানেও একই ভাবকল্প উচ্চারিত হয় :

'আমি মরছি খুঁজে সেই দোকানের সহজ ঠিকানা,
যেথা আল্লা-হরি-কালী-গড় এক থালাতে খায় খানা।'

বীরভূমের এক মুসলমান ফকির অবলীলায় গেয়ে ওঠে : 'মরুতে এলেন মোহম্মদ/মথুরাতে গেলেন শ্যাম,/ইমাম খেলা খেলেন, রসুল/লালা খেলেন ঘনশ্যাম।/মা এইসা আয়েষা পাগল হলেন/নবীর প্রেমে মদিনায়/বাঁশির সুরে পাগল হয়ে/রাধা চলে যমুনায়।'

সৃষ্টিকর্তা সম্বন্ধে সাহেবধনী সম্প্রদায়ের যাদুবিন্দু গোঁসাইও বলেন,—

'হিন্দু মুসলমানের গুরু
তিনি বান্ধা কল্পতরু।'

আর কর্তাভজা সম্প্রদায়েও একই কথা বলে, 'ধর্মে সেই ভেদাভেদ জাতের বিচার,/হাড়ি মুচি সব একাকার। দাশরথি রায়ও তাঁর পাঁচালিতে একই কথা বলেন, 'পুরাণ মানে কি কোরান মানে/তার কিছু বুঝতে নারি/সবাই অন্ন পায়স করে/জল ডালে ঝোলে কাটি মারে/এক সঙ্গে অন্ন খেতে বসে।'

আবার কুবির গোঁসাই বলেন,

'ভাইরে যে আল্লা সেই কালা সেই ব্রহ্মবিষ্টু
মুসলমানের আল্লাতাল্লা
হিন্দুর কৃষ্ণ ব্রহ্মা বিষ্ণু ভাবে বিভোলা।'

তেমনি গম্ভীরার প্রখ্যাত গায়ক মহম্মদ সুফি-র গানে রয়েছে

'বলি এক ব্রহ্ম দ্বিতীয় নাস্তি (তবে) দুই ভাবাও কেন।
(আজ) হিন্দু মুসলমান এক করে দাও ভেদ থাকে না যেন।।'

প্রসঙ্গত, মালদহের একটি প্রতিনিধি-স্থানীয় লোক নাটক ডোমনির আসর বন্দনায় গাওয়া হয়।

'পূরব বানহুঁ হ্যাম্মা সূর্যদেবকে চরণ (ভ্যালা)
পশ্চিমা বানহুঁ হ্যাম্মা পির-পয়গম্বর।'

এক সময় এ বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে— বর্ধমান, বীরভূম হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় লেটো গান খুবই জনপ্রিয় ছিল; তার মনোরঞ্জক কলি লোকের মুখে মুখে ফিরত। সেই লেটো গানের শুরুতেও বন্দনা গীত হয়; আর সেই গানেও ধ্বনিত হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য সুর :

"প্রথমে বন্দি আমি দেব গজানন,
এক দন্ত নাহি অন্ত মূষিক বাহন।
তারপরে বন্দি আমি দেবী সরস্বতী,
হংস বাহন যার কমলে বসতি।
সবক মহব্বত কর আল্লাতাল্লা আসিয়া আসরে,
রসলুল্লা পাক পঙ্কাতন সবার খাতিরে।"

যশোরের ফকির পাঞ্জ শাহ ছিলেন প্রগতি চিন্তার অধিকারী এক প্রগতিবাদী ব্যক্তিত্ব। তিনি লেখেন :

'জেতে অন্ন নাহি দিবে
রোগে না ছাড়িবে;
মৃত্যু হলে যাবে চলে
জেতের উপায় কী।'

আর উনিশ শতকের সাধক ব্যক্তিত্ব দুদ্দু শাহর মতে মানুষের প্রকৃত পরিচয় কখনও জাতিগত বা ধর্মগত হতে পারে না,— 'মানুষের জাত ধর্ম সৃজন/ঈশ্বর কিম্বা প্রকৃতির নয় কারণ—।' আবার স্বদেশচেতনায় তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় :

"শূদ্র, বৌদ্ধ, ইতর, মুসলমান
সবি তো এক মায়ের সন্তান;
ভারতের মাটিতে সবারই প্রাণ
কেউ না দেখিলে।"

জাতপাতের বিধানের বিরুদ্ধেও তাঁর গানে ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে; তিনি এই সমস্যাটিকে দেখেছেন সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে—

'শয়তান আর অসাধু মিলে
জগতের বর্বর সকলে
জাত গোত্রের সৃষ্টি করিলে
সৃজনে ধ্বংসের কারণ।"

আত্মগরিমা বা জাতিশ্লাঘার জন্য এমনকী মুসলমানের কঠোর সমালোচনা করেছেন ফকির দুদ্দু শাহ : 'সহস্র বৎসর পূর্বে মুসলমানের গন্ধ দেখি নাই!'

প্রধানত মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রচলিত লোকনাটক 'আলকাপ'-কে সাধারণত মুসলমানের গান বলা হয়। অনেকে আবার 'আলকাপ'-কে চাঁই সমাজের গানও মনে করেন। তবে দুটি ধারণাই ভ্রান্ত। কারণ আলকাপ নিম্নবিত্ত মুসলমান সমাজে প্রচলিত থাকলেও উচ্চবিত্ত সমাজে একেবারেই গ্রহণযোগ্য নয়। উচ্চবর্গীয় শিক্ষিত হিন্দুসমাজেও আলকাপ কুরুচিপূর্ণ বলে গণ্য হয়। "আলকাপের প্রখ্যাত শিল্পী ঝাঁকসু চাঁই-মণ্ডল ছিলেন এবং আলকাপে এই 'চাঁই-মণ্ডলদের বেশি সংখ্যায় অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়, তাই কেউ কেউ এটিকে চাঁই সমাজের গান বলে মনে করেন",— এই মত তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয় না। আলকাপের এক স্মরণীয় শিল্পীর নাম যোনাকানা বা বনমালী সরকার... আলকাপের বহু 'ছড়াগানে' সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ যথেষ্ট সুলভ। আলকাপের শিল্পী নৈমুদ্দিন শেখের কাছ থেকে সংগৃহীত একটি ছড়াগান এই প্রকার :

আমরা নয় গো হিন্দু নয় মুসলমান
জাতিতে সবাই যে সমান
শুধু ধর্মেতে হিন্দু মুসলমান
দেখুন খোদা-হরি একজনা।।[১৬]

দিনাজপুরের 'খন' গান সাধারণত গ্রামীণ জীবনের কোনো অসামাজিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত ও গীত হয়ে থাকে। গ্রামের হিন্দু মুসলমান উভয় পাড়াতেই ওই 'খন' গান গাওয়া হয়। সেই গানেও সম্প্রীতির মর্মবাণী ধ্বনিত হয়—

"এমাম হোসেন হজরত আলি
তাদের রচনা আমরা না ভুলি
জেন্দিনী ভর দরুদ ভেজি
আমি তাদের পায়।
ওমা তোমার চরণ পাব বলে
ডাকছি দুই বাহু তুলে
তবে কেন বলি ভুলে
এসো এই সময়।"[১৭]

মুর্শিদাবাদ অঞ্চল থেকে সংগৃহীত একটি বাউল গানে বলা হয়েছে আল্লা ও হরিকে পৃথকভাবে খোঁজা বৃথা, দুয়ে মিলেই এক সৃষ্টিকর্তা।

"ভোলা মন আমার— কেন তুমি অচেতন।
ও তোমার মনের কোণে সন্দেহ অকারণ।
কেন আল্লা কেন হরি ভাব তুমি অকারণ।
সেই দীননাথ ভবের কাণ্ডারী
ও মন যারে ভজ তারেই পাবে মিলবে তোমার অরূপ ধন।"

অন্যদিকে গাজি গানের লোককবির কণ্ঠেও ধ্বনিত হয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শাশ্বত বাণী—

"মুসলমানে বলে গো আল্লা হিন্দু বলে হরি
নিদানকালে যাবরে ভাই একই পথে চলি (রে)
দোয়া না কবির বা আল্লা রে—।"

ফকির সম্প্রদায়ের গানেও উচ্চারিত হয় অনুরূপ সম্প্রীতির ভাবনা। ধর্মান্ধ মানুষ নিজের জাত বা ধর্ম নিয়ে বিবাদ করে বলে ফকিরের খেদ—

"আমি তোমার কাঙালি গো সুন্দরী রাধা
আমি তোমার কাঙালি গো
তোমার লাইগ্যা কাইন্দা ফিরে
হাছন রাজা বাঙালি গো।
হিন্দুরা বলে তোমায় রাধা
আমি বলি খোদা—
রাধা নামে ডাকলে
মুল্লা মুনশিরে দেয় বাধা।
হাছন রাজা বলে আমি না রাখিব জুদা
মুল্লা মুনশির কথা যত সকলই বেহুদা।'

একই ধরনের সম্প্রীতির ভাবনা প্রকাশ পেয়েছে উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া গানে; সেখানে বন্দনা অংশে রয়েছে :

"আমরা পছিমে বন্দনা করি গো
আমরা আল্লারই ধাম।
তাহারি কারণে তাহারি চরণে
আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা উত্তরে বন্দনা করি গো
ওই না দেবী মায়ের চরণ
তাহারি চরণে আমরা জানাইলাম প্রণাম।
আমরা পূরব বন্দনা করি গো
ওই না ধর্ম নিরঞ্জন
তাহারি চরণে আমরা জানাইলাম সেলাম।
আমরা দক্ষিণে বন্দনা করি গো
ওই না ক্ষীর নদী সাগর
সেখানে বাসাইছে মেরা আলি খেফাড়ি পাথর।"

একটি বাউল গানেও অনুরূপভাবে সৃষ্টিকর্তার অভিন্ন রূপ বাঙ্ময় হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে—

"তুমি কালী, তুমি কৃষ্ণ, তুমি হক বারী—
তুমি সর্বঘটে রও, তুমি সর্বরূপে হও,
ভালকথা মন্দকথা, সকল তুমি কও।...
কয়েছে বিন্দু যাদু দয়াল, তুমি চোর তুমি সাধু
(দয়াল গো) তুমি এই মুসলমান, তুমি এই হিন্দু
আমি যে কুাঁবর চাঁদ বলে ডাকি।"[১৮]

দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর সংকলিত ও সম্পাদিত 'মৈমনসিংহ-গীতিকা'র ভূমিকায় গীতসাহিত্যের সামাজিক বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> "হিন্দু ও মুসলমান যে বহুশতাব্দীকাল পরস্পরের সহিত প্রীতির সম্পর্কে আবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছিলেন, এই গীতিগুলিতে তাহার অকাট্য প্রমাণ আছে। দেওয়ান সাহেবদের অত্যাচারের কথা অনেক স্থলেই পাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা 'মুসলমানি অত্যাচার' বলিয়া অভিহিত করা অন্যায় হইবে। এই অত্যাচার দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার, ব্যভিচারীর ব্যভিচার,— ইহার জন্য কোনো রাষ্ট্রীয় নাম দেওয়া যায় না, ইহা হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম বা

জাতিঘটিত কোনো ঘটনা নহে। একদিকে দেওয়ান জাহাঙ্গীর যেরূপ মলুয়ার উপর অত্যাচার করিতেছেন, তেমনি বিচার না করিয়াই মুসলমান কাজিকে শূলে চড়াইয়া দিতেছেন।" (পৃ. ১৭)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় দীনেশচন্দ্র সেনের মুক্তমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক-সাংস্কৃতিক চেতনা; সে-প্রসঙ্গ আমরা পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচনা করব; আপাতত তাঁর অকপট ঘোষণাটি স্মর্তব্য : 'এই গীতিসাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের...। লেখকদের মধ্যে হিন্দুও যতটি মুসলমানও ততটি। এই সাহিত্যে আবার হিন্দু নায়ক, মুসলমান নায়িকা এবং মুসলমান নায়ক ও হিন্দু নায়িকা পাইতেছি। ...এই সকল পালাগানের শ্রোতা হিন্দু-মুসলমান উভয়ই।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭)

এই সাধারণত্ব স্পষ্টতই এক ঐক্যচেতনাকে ইঙ্গিত করে,— মনোজাগতিক সেই ঐক্যবোধ লোক-কবিদের সহজ সরল ভাষায় বাঙ্ময় হয়েছে। বাংলার গ্রামের চাষি-মাঝি, কুমোর-কামার— শ্রমজীবী মানুষের অন্তরে পৌঁছতেই লোককবিরা কোনও একটি বিশেষ স্থানীয় ঘটনা বা ব্যক্তিকে অবলম্বন করে স্বপ্ন ও কল্পনার, বাস্তব ও অতিবাস্তবের জারনে গান বাঁধতেন, পালা রচনা করতেন। তার বুনন হত সহজ সরল, আবেগময়। এবং সেই সকল পালায় ব্যবহৃত হত মুখের ভাষা, প্রবাদ-প্রবচন, কৌতুক-বিদ্রূপ, রঙ্গ-রসিকতা,— মাঝে-মধ্যে কবিরা ছুঁড়ে দিতেন দু-একটি উর্দু-আরবি শব্দও। গ্রামের শ্রোতাদের মন জয় করার লক্ষ্যে লোককবি ও তাঁর কুশীলবদের এক ধরনের পেশাদারি দক্ষতাও অর্জন করতে হত। তাছাড়া গ্রামজীবনের ছোট গণ্ডির মধ্যে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে চিনত বলে কবি ও কুশীলবদের সহজ সরল জীবনযাপন তাদের পালাগানের গুণকে, তার গ্রহণযোগ্যতাকে প্রভাবিত করত।

আবার এই গীতিসাহিত্যের মধ্য দিয়ে আমরা যেমন একদিকে নতুন করে ইতিহাসকে বিচার করতে পারি— 'তল' থেকে বা লোকজীবনের অনুষঙ্গ সূত্রে নিম্নবর্গীয় ইতিহাস চেতনায় উচ্চারিত হতে পারি তেমনি সে-যুগের জীবনধারার, তার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি প্রতিকল্পও গড়ে তুলতে পারি। এবং শেষোক্তটির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নানাবিধ কর্মকাণ্ডে শুভ-অশুভ বিচার, প্রবল রীতি-প্রথা-সংস্কারসমূহ গীতি-সাহিত্যে ও গানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। মুসলমানদের ক্ষেত্রে পবিত্র দিন বা জুম্মাবার হল শুক্রবার; ক্ষেত্রবিশেষে সেই দিনটিকে হিন্দুরাও 'ভালোদিন' বলে মনে করত; 'মহুয়া' পালায় হুসরা বেদের ভাই মাইনকা বেদের কথায়—

"মাইনকা বেদে কয় ভাই শুন দিয়া মন,
বৈদেশেতে যাব আমরা শুক্রবার দিন।"

আবার 'সুনাই সুন্দরী' পালায় নিষেধ বা বারণের 'ট্যাবুর' দৃষ্টান্ত

"জলের ঘাটে যাইতে আমায় করিছে বারণ,
হাঁচি টিকটিকি আর যত অলক্ষণ।"

বারণ, নিষিদ্ধ, অশুভ বলে বা হারাম হিসেবে গণ্য প্রথা-বিধানগুলি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লোকজীবনে বহু যুগ ধরে প্রচলিত; এই ট্যাবু (taboo) প্রায় সমস্ত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে আদিম যুগ ধরে চলে আসছে। গীতিসাহিত্যে তার বহু উল্লেখ রয়েছে; 'দেওয়ানা মদিনা' পালায় মদিনার কাছে যেতে গিয়ে দুলাল মিঞার অভিজ্ঞতা—

"যাইবার কালে হাঁচির শব্দে বাধা যে পড়িল।
কতক্ষণ দুলাল মিঞা বার যে চাহিল।।
তারপরে মেলা দিয়া সামনে দেখে তেলি।
ডাইনেতে দেখিল এক গাভীন শিয়ালি।।
মাথার উপরে ডাকে কাউয়া চিল রইয়া।..."

'কাফেন চোরা' পালাতেও হাঁচির মতো অশুভ লক্ষণের উল্লেখ রয়েছে :

"উড়িয়া যাইতে আজিমের চউক্ষে পড়ল মাছি।
ঘরের খুন বাহির হইতে মুখে পইড়ন হাঁচি।"

যাত্রাকালে বিশেষ বিশেষ পশু-পাখির দর্শন, খালি কলসি, ঝাঁটা ইত্যাদি চোখে পড়া বাধা বা অমঙ্গলের চিহ্ন বা সংকেত হিসেবে গণ্য হত সেদিনের গ্রামসমাজে। 'নীলাকন্যা কবি কঙ্ক' পালায় বাড়ি ফেরার পথেই গর্গমুনি আভাস পেয়েছিলেন—

"আসিতে পথের মাঝে অমঙ্গল নানা।
চাইব দিকে যেন প্রেত পিশাচের খানা।
কাগায় করে কা কা সাচানে করে রা।
ডাক শুইন্যা গর্গ মুনির কাঁইপ্যা উঠে গা।
পথ কাটি শিবা যায় না চাইল ফিরিয়া।
ঝটিতে চলিল গর্গ আশ্রমে ধাইয়া!!

মুসলমানদের কাছে গর্ভবতী গাভী যাত্রাপথে চোখে পড়া অমঙ্গলজনক। "কাফেন চোরা" পালায় রয়েছে :

"ডাইনার থুন আসি সর্প বামে গেল ধাই।
পন্থের মাঝে দেখে আজিম গর্ভবতী গাই।
দধির ভাণ্ড ভাইঙ্গ্যাছে গোয়ালের ছ্যাওয়াল।
জাইল্যার পুতে কাঁদন করে ঘুট্যাত বাজাই জাল।।
তিন বিবি বসিয়া রে মাথাৎ উকিন চায়।
খাইল্যা কলসি লইয়া নারী জল আনিতে যায়।"

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় গর্ভবতী গাভী শুধু নয় আরও অনেক অমঙ্গলজনক ট্যাবুর উল্লেখে স্বাভাবিকভাবেই বিবৃত রয়েছে আখ্যানিক পরিবেশটির অনিবার্যতা। এই সংকেত বা পূর্বাভাস গোষ্ঠীজীবনের ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ট্যাবু। 'রঙ্গমালা সুন্দরী ও চৌধুরী লড়াই' পালায

দেখি শ্যামাপ্রিয়া বৈষ্ণবী মন্দ অভিপ্রায় নিয়ে রঙ্গমালার কাছে আসে, তার গোপন মতলব কেউ জানে না। কিন্তু সরল মনে রঙ্গমালা যখন দুর্গাদাসীকে হুকুম করে বৈষ্ণবীকে ভিতরে নিয়ে আসতে তখনই প্রকৃতিতে অমঙ্গলজনক ইঙ্গিত ফুটে ওঠে—

"ঘরের চালৎ কাউয়া ডাকিল তেতই গাছে পেঁচা।
গোয়াল ঘরৎ গাই ডাকিল উঠানে আইল ফেচা।"

'দীর্ঘকাল পাশাপাশি বসবাস করার ফলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে যে পারস্পরিক ভাব বিনিময় ঘটেছিল-সেকথা গীতিকার গবেষকমাত্রেই স্বীকার করেছেন। এমনকী, ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছিল। একাধিক গীতিকার বন্দনা অংশে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়েছে হিন্দু-মুসলিমের ধর্মবিশ্বাস এক হয়ে গেছে সত্যপিরের কাছে।'[১৯] বস্তুত, ধর্মবর্ণজাতি নির্বিশেষে আপামর সাধারণ বাঙালি-চিত্তে আলোড়ন তুলেছে সত্যপির। এই জন্যেই সত্যপিরের পাঁচালি লিখে অল্পদিনের মধ্যেই খ্যাতিমান হয়ে উঠেছেন কবি কঙ্ক। কবি কঙ্ক নিজেই জানিয়েছেন যে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির শিক্ষাও তিনি পেয়েছেন সত্যপিরের কাছ থেকে:

"পিরের কাছেতে আমি শিখ্যাছি যেই না কথা।
মোদের শাস্তরে আছে সেই সব বারতা।।
যেই আল্লা সেই ঈশ্বর এক কইর‍্যা জানি।
ভাষা ভেদে ঈশ্বর ভেদ নাই যে আমি জানি।"
('লীলাকন্যা কবি কঙ্ক পালা')

বাংলার সম্প্রীতি : পির সাহিত্য

'হিন্দু কুলে নারায়ণ, মোমিন কুলে পির
দুই কুলে পূজা খেয়ে, হয়েছে জাহির'

এখানে বলার কথা এই, হিন্দু ও মুসলমানের যুক্ত সাধনায় পিরপূজা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পিরপূজা অবলম্বন করে হিন্দুসমাজেও অনেক দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটেছে। তার মধ্যে সত্যপির, গাজি সাহেব, বনবিবির পূজা সর্বাধিক হয়। সত্যপিরের পূজা আবার তার মধ্যে ব্যাপক বিস্তার পেয়েছে। সত্যপিরের 'পূজা-কথা'য় বলা হয়েছে, সত্যপির ও নারায়ণ একই ঈশ্বর সত্তা,— অভিন্ন তাঁদের অস্তিত্ব। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কবিরাই সত্যপিরকে অবলম্বন করে অনেক পাঁচালি লিখেছেন। ফৈজুল্লার পাঁচালিতে বলা হয়েছে, 'তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি নারায়ণ।/গুণ গাজি আপনি আসরে দেহ মন।"[২০] আর তাই তিনি,— 'হিন্দুর দেবতা হল মুসলমানের পির।/দুই কুল সেবা লয় হইয়া জাহির।" প্রসঙ্গত অধ্যাপক আশুতোষ ভট্টাচার্যের উক্তি

> "বাংলাদেশ প্রাচীনকাল হইতে ধর্মসমন্বয়ের দেশ। ...মুসলমান ধর্ম যখন বাংলাদেশের উপর অপনার একচ্ছত্র প্রভুত্ব স্থাপন করিবার প্রয়াস পাইয়াছে তখন হিন্দু সমাজ তাহার সম্মুখে হইতে পালাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করিবার পরিবর্তে তাহার সম্মুখীন হইয়া মুসলমান ধর্মের মৌলিক উপাদানগুলিকে নিজের ধর্মেব মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছেন।
>
> সত্যনারায়ণ উপাসনার মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস অত্যন্ত স্পষ্ট।"[২১]

সত্যপিরকে হিন্দু-মুসলমান, উভয় পক্ষের নির্বিবাদে গ্রহণের মধ্যে যে সমন্বয়মূলক ঘটনা রয়েছে সেই প্রসঙ্গে অধ্যাপক ভট্টাচার্য মনে করেন : "চৈতন্যধর্ম প্রবর্তিত হইবার পর হইতে সমাজে শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণের উপাসনা একটি বিশিষ্ট স্থান লাভ করিল। মুসলমান ধর্মের বলিষ্ঠ একেশ্বরবাদ যখন এদেশে প্রসারলাভ করিতেছিল, তখন, চৈতন্যধর্ম শ্রীকৃষ্ণ বা নারায়ণকে অবলম্বন করিয়া এদেশের মধ্যে এক সুস্পষ্ট একেশ্বরবাদ গড়িয়া তুলিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ বহির্ভূত তৎকালীন বাংলার হিন্দু সমাজের উপরও তাহার প্রভাব স্বভাবতই বিস্তৃতিলাভ করিল। এই যুগে সত্যপির সত্যনারায়ণরূপে হিন্দুর গৃহে পূজা লাভ করিতে লাগিলেন। ইহার বিজাতীয় সকল উপকরণ নারায়ণের নামে শোধিত হইয়া হিন্দুর দেব-মন্দিরে নিঃসংকোচে প্রবেশাধিকার লাভ কবিল।"[২২]

সত্যপিরের জন্ম-পরিচয় নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। 'কিংবদন্তি অনুসারে বাংলার সুলতান হোসেন শাহের কোনো এক কন্যার গর্ভে সত্যপির জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' (দ্রষ্টব্য, দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায়, সম্পাদিত লালা জয়নারায়ণ সেনের 'হরিলীলা; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২৮) কারো মতে আবার বাগদাদের বিখ্যাত সুফি-সাধক মনসুর আল্ হাল্লাজ, যিনি নির্দ্বিধায় 'আমিই সত্য' ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি নাকি মূল সত্যপির। (দ্রষ্টব্য, মুনশি আবদুল করিম সম্পাদিত কবি বল্লভের সত্যনারায়ণের পুঁথির ভূমিকা; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা; ১৩২২)

দীনেশচন্দ্র সেন বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে লিখেছেন,— বহুদিন একত্র বাস নিবন্ধন-হেতু হিন্দু ও মুসলমানগণ পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে কতকটা উদারভাব অবলম্বন করেছিলেন। সত্যপির নামক মিত্র দেবতার আবির্ভাব সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই উপলক্ষে ফকিরি আলখাল্লা গায়ে পরেছেন ও উর্দু জবানে দিতেছেন :

বিশ্বনাথ বিশ্বাস বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসাভি আদমি রহে সাঁচা।।
জাওত সত্যপির মেরা জাওত সত্যপির।
তেরা দুঃখ করতত্তা হাম ফকির।। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য)

আর ড. আহমদ শরিফ-এর বিশ্লেষণ :

"সতেরো আঠারো শতকে সাম্রাজ্যবাদী মুঘল-শাসনকালে পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে দুস্থ-দরিদ্র অজ্ঞ-অসহায় মানুষের পশ্চিম ও দক্ষিণবঙ্গে দুস্থ-দরিদ্র অজ্ঞ-অসহায় মানুষের মধ্যে কাল্পনিক দেবতা পির-নারায়ণ 'সত্য'কে অবলম্বন করে হিন্দু-মুসলিমের শাস্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক মিলন ময়দান তৈরি হয়েছিল। এজন্যে প্রায় ১১৪ জন কবি পির-নারায়ণের সত্যের ও তাঁর চেলা দেবতাদের ও কাল্পনিক পিরদের মহিমাকীর্তন করে কাব্য রচনা করেছেন।...

এই পির-নারায়ণের হিন্দু-মুসলিম চেনা দেবতা হচ্ছেন কালু রায়-কালুগাজি, বনবিবি-বনদেবী, দক্ষিণের রায় বড়গাজি খান, ওলাবিবি-ওলাদেবী, কামরূপ-কামাখ্যার ডাকিনী-যোগিনী প্রমুখ কুমির-বাঘ-ওলা-শীতলা সবই হল হিন্দু-মুসলিমের শরণ, মঠ-মন্দির-মসজিদ, রইল দূরে আশুফল দানে অসমর্থ বলে উপেক্ষিত ও অবহেলিত।"

(বিশ শতকে বাঙালি; সম্পা : প্রথমা রায়মণ্ডল; ১৯৯৯)

দ্বিজ কালিদাস মনে করেন, সত্যপির কোনো মুসলমান পির ছিলেন, পরে সমাজের স্বীকৃতির পর তিনি নারায়ণের সঙ্গে একাকার হয়ে সত্যনারায়ণরূপে পরিচিত হন। 'সত্যনারায়ণ-কথায় যে আলাবাদশাহের উল্লেখ আছে সম্ভবত তিনি আলাউদ্দিন হোসেন শাহ। আমাদের জানা আছে, হোসেন শাহ হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন, তাঁর

উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতা ছিল প্রশ্নাতীত। অনুমান হয়, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপনের উদ্দেশ্যেই তাঁর যত্নে সত্যনারায়ণের পূজা প্রবর্তিত হয়ে থাকবে। (দ্রষ্টব্য, গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর সাহিত্যের কথা; সুবর্ণরেখা, ১৯৯৮) আর সময়টা সম্ভবত ষোড়শ শতকের শেষপাদ বা সপ্তদশ শতকের প্রথমপাদ। সিদ্ধ মুসলমান ফকির বা পিরকে অবলম্বন করে পির-নারায়ণ বা সত্যনারায়ণের পাঁচালিগুলি লেখা হয়। গবেষক গিরীন্দ্রনাথ দাস তাঁর গ্রন্থে এ-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

"এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার নাম জপে
এখনও ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোমকূপে।
হস্ত নাহি পদ নাহি ধরেছে সংসার
মুখ নাহি আছে তার করিতে আহার।
কর্ণ নাহি কথা শোনে, চক্ষু নাহি দেখে
চিনিতে না পারে কেহ সর্বঘটে থাকে।
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।

নিরবয়ব সৃষ্টিকর্তার এরকম অভিন্ন রূপ কল্পনার শেষে পাঁচালিকারের উপদেশ

সত্যপির বলি সবে শিরে দিবে হাত।
নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রণিপাত।।

অন্য এক গবেষক সত্য-নারায়ণের চেলা দেবতাদের সূত্রে তৎকালীন সমাজ বিশ্লেষণে লিখেছেন :

> "হিন্দু-মুসলমানের ধর্ম সমন্বয়ের আর এক দৃষ্টান্ত বনবিবি, গাজি খাঁ ও দক্ষিণ রায়ের পূজা। সমগ্র চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণ ভাগে ব্যস্ত দেবতা বনবিবি, গাজি খাঁ বা দক্ষিণ রায় নামে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকজন পূজা করে থাকে। বাংলার সংস্কৃতিতে লোকাচার প্রাধান্যের প্রভাব থেকে নবদীক্ষিত মুসলমান সমাজও বাইরে থাকতে পারেনি। দক্ষিণ বাংলার বনবিবি, দক্ষিণ রায়, মনসা, শীতলা প্রভৃতি আর্যতর দেবতার পূজা আর আউল-বাউল-দরবেশ আর মহাজিয়াদের স্বকীয় সাধনার ধারা হিন্দু-মুসলমানের নিম্নবর্গীয় সমাজে মিলনের সেতু রচনা করেছে।"[২৩]

এই অভিমতই সমর্থিত হয় আহমদ শরিফের পর্যবেক্ষণে,— 'এই পির-নারায়ণ 'সত্য' আশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিমের মানসিক, আচারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মিলন হয়েছিল দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে। আর নামে হিন্দু বা মুসলিম হলেও অভিন্ন ছিল

আধ্যাত্মিকভাবে ও জীবনযাত্রায় বিভিন্ন গুরুবাদী বাউলরাও।' (বিশ শতকে বাঙালি)

দক্ষিণা রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা,-- দিব্যকান্তি, ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন, হাতে ধনুর্বান। তাঁকে নিয়ে লেখা হয়েছে 'রায়মঙ্গল' নামে একটি মঙ্গল কাব্য। একই আধারে আবার রচিত হয়েছে মুসলমান কবির লেখা কাব্য। কারণ, দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষই বাঘের উপদ্রব থেকে বাঁচবার উপায় হিসেবে একই লোকায়ত বিশ্বাস পোষণ করে। মুনশি বয়নুদ্দিন রচিত 'বনবিবি জহুরানামা' কাব্যে হিন্দুদের কল্পিত ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণা রায়, মুসলমানদের কল্পিত বনবিবিকে নিয়ে একটি মিশ্র কাহিনি গড়ে উঠেছে। বস্তুত, 'বনবিবি জহুরানামা' রায়মঙ্গলেরই মুসলমান সংস্করণ। ধর্মনির্বিশেষে দক্ষিণবঙ্গের মানুষের ব্যাঘ্র দেবতার উপাসনার বাস্তব কারণটি দুর্বোধ্য নয়,— জীবন ও জীবিকার সঙ্গে জড়িত। সুন্দরবন ব-দ্বীপ অঞ্চলে বসবাসকারী গরিব শ্রমজীবী মানুষকে বেঁচে থাকার আবশ্যকতায়— কাঠ কাটতে মধু সংগ্রহে বা মাছ ধরতে গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করতেই হয়; ডাঙায় হিংস্র বাঘ আর জলে কুমিরের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার কারণেই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলে একই পরাশক্তির কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করে; তাঁদের কল্পনা করে বুকে জোর পায়।

এক্ষেত্রে বলার কথা, বহুশ্রুত সাম্প্রদায়িকতা শব্দটি আজ তার ব্যক্তার্থ বহুল পরিমাণে হারিয়ে ফেলেছে,— শুধু হিন্দু-মুসলমান ধর্ম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক বিদ্বিষ্ট সম্পর্ককেই তা সূচিত করে এখন। একই ধর্মের মধ্যেও যে অসংখ্য সম্প্রদায় থাকে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কও যখন অপভাবগ্রস্ত হয় তখন সেই বিদ্বিষ্ট সম্পর্কও নিঃসন্দেহে সাম্প্রদায়িকতা বিশেষত হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। হিন্দুধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম নয়, তার কোনও সুনির্দিষ্ট ধর্মতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনা নেই,— নানা মতাবলম্বী ভারতীয় জনগণ তাদের অব্যক্ত চেতনাকে একটি সাধারণ মঞ্চে সংস্থাপিত করেছে। গোষ্ঠী/সম্প্রদায় ভেদে তাদের মধ্যে বিভেদ বিদ্বেষও কম নেই; মধ্যযুগে তো শৈবদের সঙ্গে শাক্তদের, শাক্তদের সঙ্গে বৈষ্ণবের বারংবার সংঘাত ঘটেছে। হিন্দুধর্মের গঠনটাই এরকম যে উপরিস্তরে বা সাধারণভাবে সমন্বয়মূলক বহু উপকরণ যেমন রয়েছে তেমনি অন্তস্তরে পারস্পরিক বিভেদের উপাদানও কম নেই। এবং তা থেকে সৃষ্ট সম্প্রদায়গত পারস্পরিক বিদ্বেষকেও নিশ্চিতভাবে সাম্প্রদায়িকতা বলতে হয়।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের বাইরে এই যে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরীণ সাম্প্রদায়িকতা, তার শিকড় প্রোথিত রয়েছে আমাদের বিশ্বাসের মূলে, তাকে লালন করছে ব্রাহ্মণ্য সংহিতা হিন্দুধর্মের এই কঠিন ব্যাধির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রবর্তিত জাতিভেদ প্রথার মতো অমানবিক ও বিদ্বেষমূলক ব্যবস্থা। এই দুয়ের সাঁড়াশি চাপে হিন্দুধর্মের অভ্যন্তরে যখন প্রবল অস্থিরতা, অরাজকতা ও দিশাহীনতা চলছে তখনই, আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে, বাংলার বুকে যুগপ্রবর্তক চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ঘটে। সুকুমার সেন বলেছেন যে, চৈতন্যদেবের সূত্রেই বাংলায় প্রথম নবজাগরণ ঘটেছে।

বাংলার সম্প্রীতি : বৈষ্ণব সাহিত্য

নাহাং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্য ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বানস্তো যতি বাঁ
কিন্তু প্রোদ্যন্ নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্দে
গোপীভূর্তঃ পাদকমলোর্দসানুদাসঃ।

(পদ্যবলী : রূপ গোস্বামী : ৭২ অঙ্ক)

প্রত্যক্ষত ইসলাম ধর্মের প্রতিক্রিয়ায় বাংলা দেশে আশ্চর্যজনকভাবে কর্ম বা জ্ঞান মার্গের বিপরীতে বিস্তার পায় ভক্তি মার্গ, যোলো শতকে তারই প্রকাশ ঘটে গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে। আর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রধান প্রবক্তা ও প্রচারক ছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> "তুর্কি বিজয়ের দেড়শত দুইশত বৎসরের মধ্যে যখন সমস্ত উত্তর ভারতময় মুসলমান ভাবজগতের প্রতাপ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভারতের জীবনে অনুভূত হইতে লাগিল, তখন সহজবোধ্য ভক্তিমার্গ পুনরায় প্রকটিত হইল, 'নাম-ধর্ম' প্রসার লাভ করিল নাম-ধর্মের নানা সাধক দেখা দিলেন; রামানন্দ, কবীর প্রমুখ উত্তর-ভারতের সপ্তমার্গী সাধুগণ; বাঙ্গালার শ্রীচৈতন্যদেব; এবং পাঞ্জাবে গুরু নানক ও তৎশিষ্য ও অনুশিষ্য শিখ গুরুগণ।
>
> বাঙ্গালীর সংস্কৃতির অনেকটা মহাপুরুষ শ্রীচৈতন্য দেবকেই আশ্রয় করিয়া পুষ্টি লাভ করে।"[২৪]

চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের প্রাক্কালে বাংলার হিন্দুসমাজে তন্ত্রধর্ম বিকৃত আকার নিয়ে নানা অনাচারমূলক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়; ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোরতা বৃদ্ধি পেয়ে জাতপাতের ভেদাভেদ বৃদ্ধি পায়,— একটা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা হিন্দুমানসে আচ্ছন্ন করে। মানুষের প্রতি কোনও ভালোবাসা করুণা নেই ধর্মাচরণে, শুধু আচার আর সংস্কার নিয়ে পারস্পরিক বিরোধ; আর বিপরীতে তখন ইসলামের একেশ্বরবাদ ও মৈত্রীর আহ্বান। সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভক্তিবাদের আদর্শ প্রচারে আবির্ভূত হন শ্রীচৈতন্যদেব। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূল ভিত্তি ছিল জীবে দয়া, ঈশ্বরে ভক্তি ও নাম-সংকীর্তন। হরি হরয়ে নমঃ যাদবায় নমঃ।/গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।।' হিন্দু-অহিন্দু, উচ্চ-নীচ, পণ্ডিত-মূর্খ আপামর মানুষের মধ্যে নাম-সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভক্তিধর্মের প্রচার করেছেন শ্রীচৈতন্যদেব তা ছিল সদর্থে

নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা,— ভক্ত-হৃদয়ে পরমের উদ্বোধন। আর এই নাম-সংকীর্তনে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের যোগদানে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি তৈরি হয় সেদিনের বাংলা দেশে। সেই বৈপ্লবিক সামাজিক পরিণতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন "চৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলাদেশে বৈষ্ণবধর্ম যে-হিল্লোল তুলিয়াছিল সে একটা শাস্ত্র-ছাড়া ব্যাপার। তাহাতে মানুষের মুক্তি পাওয়া চিত্ত ভক্তিরসের আবেগে আত্মপ্রকাশ করিতে ব্যাকুল হইল।"[২৫] রবীন্দ্রনাথ আরও জানিয়েছেন : 'দেখিতে দেখিতে এমনি একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু-মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।'[২৬] আর বিমলচন্দ্র সিংহ লিখেছেন যে, ইসলামের প্রবল প্রসারে হিন্দু সমাজ প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে রক্ষণশীলতার পথ নেয়; কিন্তু দেখা গেল তাতেও—

> "হিন্দু সংস্কৃতি আত্মরক্ষা করতে পারছে না। বাস্তবিক, ব্রাহ্মণাচার ও জাতিভেদের মধ্য দিয়ে সে আত্মরক্ষা সম্ভবও ছিল না। সেইজন্য যখন বৈষ্ণবধর্ম যজ্ঞক্রিয়া তুলে দিয়ে কেবলমাত্র হরিসংকীর্তনের ব্যবস্থা করল, কোনো জাতের বাধা আর রইল না। এমনকী যবনকে আত্মসাৎ করতেও দ্বিধা হল না। তখনই তা এক প্রবল আন্দোলনের রূপ নিতে পেরেছিল এবং বাইরের আঘাতের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষাও করতে পেরেছিল। সেদিক দিয়ে বলা যেতে পারে এত বড়ো কালোপযোগী বৃহৎ সামাজিক আন্দোলন সে যুগে আর হয়নি।"[২৭]

শ্রীচৈতন্যদেব আপামর মানুষকে ডাক দিয়ে বললেন, এসো, একসঙ্গে ঈশ্বরের নাম গান করি,—

> 'দশ পাঁচ মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া
> কীর্তন করহ সভে হাতে তালি দিয়া।'

কোনও বিগ্রহ নেই, মন্দির নেই, ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরও প্রয়োজন নেই; শুধু ঈশ্বরকে প্রাণভরে ডাকো, তাঁর নাম কীর্তন করলেই তাঁর করুণা লাভ করবে। শ্রীহিতেশরঞ্জন সান্যালও সে-কথাই বলেছেন :

> "নবদ্বীপের সাধারণ লোককে চৈতন্যদেব স্বাবলম্বনের পথ দেখালেন। সিদ্ধি সকলেই লাভ করতে পারে, নিজের চেষ্টাতেই তা সম্ভব। গুরু পুরোহিত মন্দির বিগ্রহের দরকার নেই। কোনও উপকরণও নিষ্প্রয়োজন। শুধু দশ পাঁচজন মিলে একত্রে হয়ে হাতে তালি দিয়ে গান করলেই হল।"[২৮]

আর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সম্বন্ধে গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী জানান যে, ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে বাঙালি যে নতুন ধর্ম আন্দোলন করেছিল তাতে ছিল হিন্দু ও মুসলমানের সমান ভূমিকা ও অধিকার,— উভয় সম্প্রদায় একত্রেই 'এই ধর্ম সৃষ্টি করিয়াছিল, প্রচার করিয়াছিল, গ্রহণ করিযাছিল। ইতিহাস ইহার সাক্ষী।' তিনি আরও জানান :

"বাঙলার অনেক বিখ্যাত হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক ধর্ম ও সমাজের সংকীর্ণতা ত্যাগ করিয়া এই বিদ্রোহে (বৈষ্ণব বিদ্রোহ : লেখক) যোগ দিয়াছিল।"[২৯]

এই বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মুসলমান বংশের সন্তান হরিদাস। তাঁর জন্ম খুলনা জেলায় (অধুনা বাংলাদেশ) ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে, চৈতন্যদেবের জন্মের ৩৬ বছর আগে। তাঁর পৈতৃক নাম জানা যায়নি। তবে জানা যায়, ১৮ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করে তিনি শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অদ্বৈত তাঁর নাম দেন ব্রহ্ম হরিদাস। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ব্রহ্ম হরিদাসের জীবন এক বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। "তখনকার দিনে একজন মুসলমানের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ আর একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মুসলমান শিষ্য গ্রহণ— উভয়ই ছিল বৈপ্লবিক কর্ম। ব্রাহ্মণগণ হরিদাসের সঙ্গে সংস্রব রাখার জন্য শ্রীঅদ্বৈতকে বর্জন করার ষড়যন্ত্র করতে লাগল।... শ্রীঅদ্বৈত কিন্তু তাঁর পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরে এলেন না। বরং তিনি হরিদাসকে নিজ গৃহে এনে নিয়মিত খাওয়াতে লাগলেন।... ধর্মান্ধ মুসলমানরাও হরিদাসের এই ধর্মান্তরকে স্বাভাবিকভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাঁর বিরুদ্ধে কাজির কাছে অভিযোগ করা হল। সেদিন তার উত্তরে যা বলেছিলেন তা যুগযুগ ধরে মানুষকে প্রেরণা জোগাবে।...

"শুন বাপ, সভারই এক ঈশ্বর।
নাম মন্ত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে।
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরাণে।।
এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয়।
পরিপূর্ণ হই বৈসে সভার হৃদয়।।...
এতেক আমারে সে ঈশ্বর যে হেন।
লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি তেন।।
হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।
আপনেই গিয়া হয় ইচ্ছায় যবন।"[৩০]

ব্রহ্ম হরিদাস যিনি পরে বৈষ্ণবগ্রন্থে ঠাকুর হরিদাস ও ব্রহ্মার অবতার বলে খ্যাতি পেয়েছেন, তাঁর এই উক্তি সম্বন্ধে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন—

> "এক ধর্ম হইতে অন্য ধর্ম গ্রহণকালে এরকম বিশ্বজনীন উদার অসাম্প্রদায়িব কথা ইতিহাসে আর শুনি নাই—
> (ক) ঈশ্বর এক, কেবল নামে ভিন্ন। (খ) প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছামতে যে-নামে ইচ্ছা ঈশ্বরকে ভজনা করিবেন। হরিদাসের উক্তিতে এই মহান সত্য— রাজশক্তির নিকট প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীন মতের দাবি— বাঙলার পাঠান একদিন, উত্থাপন ও সমর্থন করিয়া গিয়াছে।"[৩১]

শুধু হরিদাসই নয়, চৈতন্যদেবের সময়ে বহু পাঠান মুসলমান তাঁর দ্বারা বৈষ্ণবধর্মে

দীক্ষিত হয়েছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্যচরিতামৃত'-এ আছে যে, পাঁচজন শিষ্যসহ প্রয়াগ যাত্রাপথে তিনি ভাবাবেগে মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন।

"হেনকালে তাঁহা আসোয়ার দশ আইলা।
ম্লেচ্ছ পাঠান ঘোড়া হইতে উতরিলা।।
প্রভুকে দেখিয়া ম্লেচ্ছ কর যে বিচার।
এই যতী পাশ ছিল সুবর্ণ অপার।।
এই পঞ্চ বাটোয়ার ধুতুরা খাওয়াইয়া।
মারি ডারিয়াছে যতীর সব ধন লইয়া।।
তবে সেই পাঠান পঞ্চজনেরে বান্ধিল।
কাটিতে চাহে গৌড়িয়া সব কাঁপিতে লাগিল।।"

এই দশজন পাঠন ঘোড়সওয়ারের আশঙ্কা হয়েছিল যে পাঁজন দুর্বৃত্ত বুঝি এই সন্ন্যাসীকে ধুতুরা বিষ খাইয়ে অচেতন করে তাঁর সোনাদানা লুট করছে। পাঁচজনের একজন ছিলেন রাজপুত কৃষ্ণদাস; তিনি এই অভিযোগের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। এই বাদানুবাদের সময় চৈতন্যর জ্ঞান ফিরে আসে; তিনি বললেন :

"প্রভু কহে ঠক নহে মোর সঙ্গীগণ।
ভিক্ষুক সন্ন্যাসী মোর কিছুনাহি ধন।।"

ওই দশজনের মধ্যে একজন ছিলেন কালো পোশাক পরিহিত পির। সেই পির চৈতন্যদেবের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিলে প্রভু তাঁর সমস্ত যুক্তি খণ্ডন করলেন। তখন সেই পির বললেন:

'সেইত গোসাঞি তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
মোরে কৃপা কর মুই অযোগ্য পামর।।'

অতঃপর চৈতন্যদেব তাঁকে শিষ্য করে নিয়ে নাম রাখলেন রামদাস।

বহু মুসলমান যেমন বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন তেমনি শতাধিক মুসলমান কবি বৈষ্ণব পদাবলি রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়। অতুল সুর লিখেছেন : "বৈষ্ণব সাহিত্য বিশেষভাবে মুসলমান সমাজকে প্রভাবিত করেছিল। ন্যূনপক্ষে ১২১ জন মুসলমান কবির রচিত বৈষ্ণবপদাবলী আমাদের জানা আছে।"[৩২] আর সেই বৈষ্ণব কবিদের অনেকের কণ্ঠেই হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন গোলাম হুছনের গানে রয়েছে, 'আকাষ্ঠা কাষ্ঠের নাওখানি যমুনার মাঝ।/কাঞ্চুকুরা কালা নিশান শুধু রাধার সাজ।।' শ্রীহট্ট (সিলেট) জেলার হাছন রাজা (চৌধুরী)-র গানের কথা তো আগেই বলা হয়েছে: 'রাধা বলিয়া ডাকিলে মুল্লা মুনশিরে দেয় বাধা।/মুল্লা মুনশির কথা যত সকলই বেহুদা।।' বিস্তারিত তথ্য রয়েছে ক্ষিতিমোহন সেন-এর লেখায় :

> "চট্টগ্রামে পরাগল গ্রামবাসী সৈয়দ সুলতান বৈষ্ণব কবিতা লিখেন। ইঁহার জ্ঞানপ্রদীপ তান্ত্রিক যোগগ্রন্থ। ইনি যে নবীবংশে বারোজন নবীর নাম করিয়াছেন

তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শ্রীকৃষ্ণ আছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক মুসলমান। যথা আফজল, আসান কবীর, ফয়জুল্লা, এবাদুল্লা, আলিমুদ্দিন, মহম্মদ হামীর প্রমুখ।

...আলাওয়লের পূর্বে দৌলৎ কাজী আশরফ খাঁর আদেশে সতী ময়নামতী বা লোর-চন্দ্রানী কাব্য লেখেন। ইহারই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন কবি আলাওল।"[৩৩]

তাছাড়া আবদুল করিম চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের একজন কবি আলি রাজা, তাঁর গ্রন্থ 'ধ্যানমালা'য় আছে :

"সই না লো হে আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর
সর্বজগৎ দেখি-ধান্ধা।
তাই চতুর্ভুজ ধনে আন যে না মানে মনে
সে রাঙাচরণে প্রাণী বাঁধা।।"

আর 'গোষ্ঠবিহার'-এ মুসলমান কবি নসির মামুদ লিখেছেন—

"আগাম-নিগম বেদসার
লীলায় করত গোষ্ঠ বিহার
নসির-মামুদ করত আশ
চরণে শরণ-দান রি।"

সৈয়দ মুর্তজার নিবেদন আরও আবেগময়। 'দুস্ত্যজ প্রেম'-এ তিনি লেখেন—

"মোরে কর দয়া দেহ পদছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুল শীল সব ভাসাইলুঁ জলে
প্রাণ না রহে তোমা বিনু।।
সৈয়দ মুর্তজা ভনে কানুর চরণে
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া ভাসাইলুঁ তুয়া সাথে
জীবন মরণ ভরি।।"

শ্রীচৈতন্যদেবের নাম-সংকীর্তনের এবং ভক্তি-আন্দোলনের পরিণতিতে সমগ্র বাংলা জুড়ে যে উদার মুক্ত চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটেছিল তার প্রভাবে কীভাবে মুসলমান কবিরা একেশ্বরবাদী বৈষ্ণবধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে আর লাভ নেই। এ প্রসঙ্গে আজিজুর রহমান মল্লিক আরও জানান :

"শুধু বৈষ্ণব পদাবলিই নয় আল্লাও শিবের প্রসংসা করেছেন। মীর্জা হোসেন কালী দেবীর স্তুতিবাচক গীত রচনা করেছেন। নবীবংশে সৈয়দ সুলতান ব্রহ্মা,

বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ প্রভৃতি হিন্দু দেবতাদেরকে নবীবংশের অন্তর্ভুক্ত বলে উল্লেখ করেছেন।... অনেক বিদ্রোহী নায়ককে সংহত করার উদ্দেশ্যে হিন্দুর অর্ধকৃষ্ণ মূর্তি এবং মুসলমানের অর্ধমোহম্মদের মূর্তির বর্ণনা পাওয়া যায়।"[৩৪]

বহু মুসলমান পদকর্তার অবদানে যেমন বৈষ্ণবসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে তেমনি বহু মুক্তমনস্ক মুসলমান বাংলায় 'রামায়ণ', 'মহাভারত' ইত্যাদির অনুবাদের ক্ষেত্রে উৎসাহ দিয়েছে, সক্রিয়ভাবে সহযোগিতাও করেছে। তাছাড়া আউল-বাউল-দরবেশদের সহজ জীবন যাপন সঙ্গীত সাধনা বাংলার ভাবজগৎ ও সংস্কৃতিকে প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। ক্ষিতিমোহন সেন জানান : "তাহার উপরে আউল-বাউল-দরবেশদিগের অপূর্ব সঙ্গীত-সাহিত্য, আগমনী প্রভৃতি গানেও গোলাম মৌলা প্রভৃতির সব অপূর্ব গান আছে। বাউলদের মধ্যে তো হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদই নাই। লালন, হাসন, মদন প্রমুখ অনেকে জাতিতে মুসলমান।"[৩৫]

হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মসম্প্রদায়ের এমতো যুক্ত সাধনায় যে সম্প্রীতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছিল, যে ধর্মসমন্বয়ের সম্ভাবনা আভাসিত হয়েছিল তা বাধা পায় দুই ধর্মেরই রক্ষণশীলদের দ্বারা— একদিকে কট্টর ব্রাহ্মণ্যবাদ আর অন্যদিকে আচারবাদী উলেমার দল। তাই বাউল মদন তাঁর মনের দুঃখ প্রকাশ করেছেন :

"তোমার পথ ঢাইক্যাছে মন্দিরে মসজেদে
তোমার ডাক শুনে সাঁই
চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মোরশেদে।"

আর বিশিষ্ট লেখক আজিজুর রহমান তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় জানান :

"উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই মুসলিম লেখকের দৃষ্টিভঙ্গিতে কিঞ্চিত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বিদেশি মতাদর্শের সম্মুখে ওহাবিরা যখন ইসলাম প্রচারের দ্রুত ভূমিকা গ্রহণ করলেন, তখন থেকেই এ পরিবর্তন সূচিত হল। মুসলমান লেখকরা আরবি-ফারসি মহাকাব্যের আদর্শানুযায়ী কাব্য রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। এবং কখনো বা বাংলা ভাষায় তার অনুবাদ।"[৩৬]

তবে গবেষক ড: পঞ্চানন সাহা জানান : "পণ্ডিত আর মোল্লারা যখন ধর্ম নিয়ে বিবাদে মত্ত ছিলেন তখন সমাজের নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে যুক্ত সাধনার ঢেউ বয়ে গিয়েছিল। তারই প্রতিফলন দেখা যায় বহু ক্ষেত্রে। আগমনী গান, ভাসানে, যাত্রায়, নীলপূজার গানে, গ্রাম-গীতে, কবিগানে সর্বত্রই হিন্দু-মুসলমান যুক্ত সাধনার ধারা লক্ষ করা যায়। বাংলার সাধারণ মানুষের এই যুক্ত সাধনার 'পুরোহিতেরা' প্রায় সবাই ছিলেন হয় লালন, হাসন আর মদনের মতো মুসলমান অথবা নিম্নবর্গের হিন্দু।"[৩৭]

বাংলার সম্প্রীতি : মিলনমেলায়

হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে আধ্যাত্ম চেতনার ক্ষেত্রে যে সম্প্রীতির ও সমন্বয়ের বাতাবরণ বাংলার গ্রামজীবনে গড়ে উঠেছিল তার সামাজিক প্রকাশ আমরা দেখি নানা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত মেলায়। মেলা এমনই এক সামাজিক মিলন ক্ষেত্র যেখানে ধর্ম-জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে ধনী-নির্ধনরা স্বচ্ছন্দে যোগদান করে থাকে। আধুনিক লোকবিদ্যা মেলাকে সমাজীবনের দর্পণ বলে গণ্য করে। সমাজে বসবাসকারী মানুষের পারস্পরিক মিলন, হৃদয়ে হৃদয়ে, সেতুবন্ধন, আঞ্চলিক অর্থনীতির উন্নতি সাধন এবং প্রমোদ অনুষ্ঠানাদির মাধ্যমে সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ণ রাখা ইত্যাদি মেলার সার্থকতার দিক নির্দেশ করে। আবার মেলায় মেলায় পার্থক্য আছে,— শহরাঞ্চলের মেলা ও গ্রামাঞ্চলের মেলা; ধর্মীয় মেলা ও ধর্মনিরপেক্ষ মেলা; 'গড়ে তোলা' মেলা ও 'চলে আসা' মেলা ইত্যাদি। তবে ধর্মীয় মেলাই অধিকতর গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। পৌরাণিক হিন্দু দেব-দেবী, আদিবাসী উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, লৌকিক দেব-দেবী, পির-গাজি সাহেবাৎ বিবিসাহেবা, হাজি মওলানামোসেনগুলি, জৈন তীর্থঙ্করদের পূজোৎসব বা বৌদ্ধসন্তদের স্মরণ উপলক্ষে-- এমনকী পাহাড়, নদী, বৃক্ষ, পথ ইত্যাদির মিলনস্থানের মাহাত্ম্য বর্ণন উপলক্ষে ধর্মের ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করেই আমাদের দেশে সারা বছরই এখানে-সেখানে মেলা বসে থাকে। তবে কালের অভিঘাতে তার অনেকগুলি যেমন বন্ধ হয়ে গেছে তেমনি মেলার পূর্বতন চরিত্রও আমূল বদলে গেছে। তবে মেলার সার্বজননী আবেদন এবং গ্রামজীবনে তার সামাজিক ভূমিকা বহুলাংশে আজও অটুট আছে।

পাঁচশো বছর আগে, শ্রীচৈতন্যদেবের সময় থেকে ভক্তি আন্দোলনের যে বিস্তার ঘটে, বাঙালি জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় যখন থেকে নতুন গতি পায় এবং পরমত সহিষ্ণুতার যে বাতাবরণ তৈরি হয়, তারই সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রকাশ বিশেষভাবে চোখে পড়ে মেলা, যাত্রা, কবিগান, উরস, তরজা ইত্যাদি অনুষ্ঠানে ধর্মজাতিসম্প্রদায় নির্বিশেষে সাধারণ মানুষের যোগদানে। মেলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, উপলক্ষ যা-ই হোক সাধারণভাবে সামাজিক উৎসব ও মেলা বসে হেমন্তকালে, ফসল তোলার পর। বাংলার কৃষিজীবী মানুষ বছরের এই সময়টাই একটু সুখের স্বপ্ন দেখে,--- হাড়ভাঙা খাটুনি, জোতদার-মহাজনের শোষণ ভুলে গিয়ে কদিন পেট পুরে ভাত খায়, এটা-সেটা গেরস্থালি জিনিস কেনে, কুটুমবাড়ি যায়। হেমন্তের কুয়াশা আর ভাতের ম-ম গন্ধ, তখনই বাংলাব ঘরে

ঘরে নবান্ন উৎসব, এবং সেই উৎসব উপলক্ষে এ-গ্রামে সে-গ্রামে মেলা বসে, যাত্রাপালা, কবিগান, তরজা চলে রাতভর। আর সেইসব উৎসব-পালায় বা আসরে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে গ্রামের মানুষ যোগদান করে, বিবাহিত মেয়েরা বাপের বাড়ি বসে কদিন আনন্দে কাটায়,— প্রাত্যহিক জীবনের দুঃখকষ্ট, অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ ভুলে থাকার এই সঞ্জীবনী আয়োজনে মেলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণটির অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

হাওড়া জেলার আমতা থানার মানিকপিরের বাজারে এই সময়ে যে উরস অনুষ্ঠিত হয় সেই উপলক্ষে এক মেলা বসে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকে যোগদান করে শিরনি নেয়। প্রসঙ্গত, মানিকপির সুফিদের স্বীকৃত পির। 'তিনি অনেকটা যিশুর স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যিশুর (ঈশা নবির) সঙ্গে অভিন্ন। মানিকপিরের নামে মানিক (মাণিক্য) শব্দের কোনও সংস্পর্শ নেই। এটা এসেছে মানিকি (Manichee; গ্রিক Manikhaios) হতে। তিনি ইরানের লোক ছিলেন এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দে জরথুশত্রীয় ও খ্রিস্টধর্মের সংমিশ্রণে নূতন ধর্মমত প্রবর্তন করেছিলেন।... মানিকপির বঙ্গে একজন মৌলিক দেবতা বিশেষ। মানিকপিরের মূর্তি বিরল। তাঁর প্রতীক-সমাধি বা ক্ষুদ্র স্তূপই বেশি ক্ষেত্রে দেখা যায়।"[৩৮] মানিকপির সাধারণভাবে গোসম্পদ বা পশু-সম্পদরক্ষক দেবতা-স্থানীয় বলে কল্পিত। মানিকপিরের দরগাহ-স্থানে ভক্তগণ নিয়মিত ধূপবাতি জ্বালায়; হাজত মানত ও শিরনি দেন।

বারাসত থানার অন্তর্গত কদম্বগাছির গোসাপুকুরের পাড়ে প্রতি বছর ৩ মাস মেলা ও উরস উৎসব হয়। দুশো বছরের প্রাচীন এই মেলা। কথিত আছে, মানিকপির এই গ্রামে আসেন এবং তাঁরই স্মৃতিবহ এই উৎসব। এই প্রাচীন মেলায় হিন্দু-মুসলমান সকলে যোগ দেয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মগরাহাট থানার শাঁকসহর গ্রামে ভাঙড় পিরের সমাধির কাছে মানিকপিরেরও একটি স্থান আছে। নিকটবর্তী বামনগাছিতে মাঘ মাসে চার দিনের মেলা বসে। হুগলি জেলার উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কোতরং-ভদ্রকালীতে পৌষসংক্রান্তিতে তিনদিনের মেলা বসে। হাবড়া থানার বিড়া-বাথানিয়ায় মানিকপিরের দরগাহে বৈশাখের ২ তারিখে মেলা বসে। হিন্দু-মুসলমান ভক্তরা হাজত মানত শিরনি দেয়।

সত্যপিরের দরগায়ও রোগমুক্তির কামনায় বা সাধারণ মঙ্গলের আশায় হিন্দু-মুসলমান ভক্তরা মানত করে, শিরনি দেয়। বারাসতের কালসরা গ্রামে সত্যপিরের দরগায় প্রতিবছর ১৬ ফাল্গুন এক বিশেষ অনুষ্ঠান হয়, মেলা বসে। হুগলি জেলার পোলবা থানার অন্তর্গত সালুকগড় গ্রামে প্রায় নব্বই বছর ধরে সত্যপিরের গান হয়; রথযাত্রা মেলা বসে।

বীরভূম জেলায় বিখ্যাত দাতাপিরের মেলা। হজরত দাতা মহবুর শাহওয়ালির উরস উপলক্ষে প্রতি বছরই মেলা বসে। সেখানে হিন্দু-মুসলমান সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। ফাল্গুন মাসের শুক্লা পূর্ণিমায় কল্যাণীর ঘোষপাড়ায় বসে এক মহামিলন মেলা। পূর্ণিমার জ্যোৎস্নালোকে বাউল ও সুফিরা এসে জড়ো হয়, গান গায়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের

লোকজনই মেলাটির আয়োজন করে; তবে বাউল গানের সুর-লহরিতে তা সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মনেই আলোড়ন তোলে। সীমান্তের ওপার থেকেও বহু মানুষ এসে এই মেলায় যোগদান করে।

টাকীর ইছামতী নদীর তীরে প্রতি বছর বিজয়া দশমীর দিন বসে এরকমই এক মহামেলা। নদীতে দুর্গা প্রতিমার ভাসান,— নৌকোয় প্রতিমা তুলেছে আর দূর-দূরান্তের মানুষ এসে জড়ো হয়েছে নদীর ধারে— আর নদীর পাড়ে বসেছে বিরাট মেলা।

মুর্শিদাবাদের লালবাগে অনুষ্ঠিত শিয়া সম্প্রদায়ের 'বেড়া' মেলাটিও চমৎকার। 'বেড়া' কথাটি সম্ভবত ভেলা শব্দের অপভ্রংশ। শিয়া-সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে তীব্র বিরোধ থাকলেও এই মেলায় দুই সম্প্রদায়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। এই মেলার প্রধান আকর্ষণ ভেলা ভাসানো। কলাগাছ দিয়ে প্রায় পঞ্চাশ ফুট লম্বা এক ভেলা,— কাঠ, রঙিন কাগজ, বিভিন্ন সজ্জা-সামগ্রী দিয়ে ময়ূরপঙ্খি নৌকার আদলে ভেলা বানিয়ে ভাসানো হয় নদীর জলে। তারিখটা ভাদ্র মাসের শেষ বৃহস্পতিবার; রাত এগারোটায়। আর এই উপলক্ষে নদীর পাড়ে বসে বিরাট মেলা। মেলার আর একটি আকর্ষণ আতস বাজি। গভীর রাত অবধি চলে মেলা আর বাজি পোড়ানো উৎসব।

উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত মহকুমার অন্তর্গত কাজীপাড়া নামক গ্রামে পির হজরত একদিল শাহরাজির এক পবিত্র মাজার শরিফ আছে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির পূর্বরাত্রে যেখানে উরস উৎসব শুরু হয় এবং তা আট-দশদিন, ধরে চলে। সকাল থেকে যেন হিন্দু-মুসলমান ভক্তরা ফুল ও নজরানা, হাজত, মানত, শিরনি নিয়ে দরগাহে দেয়, শান্তিবারি ও প্রসাদ পায়। অনেকে পিরের লুট দেয় কীর্তনের হরির লুটের মতনই।

দরগার সামনের চত্বরে পাঁচ-ছ'টা গানের দল ঢোল হারমোনিয়াম আর জুড়ি নিয়ে পিরমাহাত্ম্যের গান গাইছে। প্রতিটি দলে থাকে একজন মূল গায়েন, পরনে থাকে তার ফকিরি আলখাল্লা। গানের সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিয়ে উপস্থিত সকলকে সে বাতাস করে, 'দোয়া? শিশুদের হাতে নিয়ে আদর করে, নানা ভঙ্গিতে তাদের নিয়ে নাচে, তাদের মঙ্গল কামনা করে। আর মেলা প্রাঙ্গণে বসে সার্কাস থেকে অজস্র মিঠাইয়ের দোকান। এই মেলা উপলক্ষে অঞ্চল জুড়ে সাড়া পড়ে যায়।

পির ভাঙ্গড় শাহের দরগাহে প্রতি বছর উনত্রিশ ফাল্গুন যে উরস উৎসব হয় সেই উপলক্ষে এক বড়ো মেলাও বসে। সেখানে ধর্ম জাতি নির্বিশেষে সকলে যোগ দেয়। এই মেলার দুর্জ্ঞেয় বৈশিষ্ট্য হল, এই মেলা উপলক্ষে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে, এমনকী সুদূর দিল্লি-মুম্বাই-পাটনা-লক্ষ্ণৌ থেকে কাতারে কাতারে হিজড়া এসে এই মেলায় যোগ দেয়। ফলে মেলাটি বিশেষ মাত্রা পেয়েছে। জাতিধর্মনির্বিশেষে স্থানীয় যুবকরা মাজারের আদলে তাজিয়া বানিয়ে শোভাযাত্রা করে, শোভাযাত্রার প্রতিযোগিতা হয়। রাত্রি গভীর হলে ভাঙা খালের দু-ধারে আতস বাজির প্রতিযোগিতা হয়। সম্প্রতি বর্তমান লেখক

মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে বিমূঢ় বোধ করেন। এক রিকশাচালক লেখককে জানায়, তার বাড়িতে এই মেলা উপলক্ষে তেতাল্লিশ জন আত্মীয়-পরিজন এসেছিল। 'কী করলে—?' 'তা আমি গরিব মানুষ। আগেভাগে চাল-ডাল আলু-কুমড়ো কিনে রেখেছিলাম, তা-ই সবাইকে খাওয়ালাম, বাবু। এই মেলা আছে বলেই তো এই গরিবের বাড়িতে সবাই আসে।'

ঔদার্যের, মানবিকতার এরকম মানসভূমিতেই মুক্তমন সম্প্রীতির চেতনা। শত শত বছর ধরে হিন্দু-মুসলমন দুই ধর্মের মানুষের পাশাপাশি বসবাস, জীবনযাপন, জীবিকার লড়াই, সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায় পরস্পরের অংশগ্রহণে যে আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠেছে, সম্প্রীতির যে চেতনা উদ্বোধিত হয়েছে তার আর একটি দৃষ্টান্ত মেলে বারাসত সদরের একদিল শাহের মাজারে। এই মাজারের সেবায়েত হলেন এক উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মণ সন্তান, ডা: বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। আর বারাসতেরই রঘুপুর গ্রামের একদিল শাহের মাজারের সেবায়েতও হিন্দু,— শ্রীনরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। নবান্ন উৎসব কীভাবে হিন্দু-মুসলমানরা একসঙ্গে হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত মানিকপির গ্রামে মানিকপিরের দরগায় পালন করে সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের হিন্দুর যে বারোলিয়া পূজা করেন সেখানে এগারোজন হিন্দু দেবতার পাশে অতি স্বচ্ছন্দে এক মুসলমান পিরও জায়গা করে নেন, পুজো পান।

হাওড়া জেলার বাগনান থানার অন্তর্গত সাবসীট গদী গ্রামে বহুদিন ধরে সয়লা অনুষ্ঠান হয়ে আসছে। সয়লা হল শীতলার গান। ধর্ম-সমন্বয় ও সম্প্রীতির এক দৃষ্টান্ত হিসেবে গদী গ্রামের সামাজিক সম্পর্কের বিন্যাস লক্ষণীয়। লোকসংস্কৃতির গবেষক শেখ মকবুল ইসলাম জানান :

> 'গদী গ্রামে উভয় সম্প্রদায়ের বাস। মজার কথা হল, গদী গ্রামের মুসলমান পাড়ার ভিতরেই শিব-শীতলার মন্দির ও প্রাচীন আটচালা রয়েছে এখানেই মনসার পালাগান হয়। হিন্দু-মুসলিম উভয়েই এই পালাগানের শ্রোতা। শীতলার মন্দির থেকে যখন বাতাসা দিয়ে 'হরিলুঠ' হয় সেখানে মুসলিমরাও অংশ নেয়। সারা বছর ধরেই মুসলমান শিশুরা আটচালাতে এবং শিব ও শীতলার মন্দিরে খেলা করে। স্থানীয় মুসলমানরা কোনওদিনই মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট করেনি। আর আশ্চর্যের বিষয়, পুজোর জল এবং বেলপাতাও প্রয়াত শ্রদ্ধেয় শেখ সাজাদ আলির বাড়ির পুকুর ও বেলগাছ থেকে নেওয়া হত।"[৩৯]

মালদহের জহুরাকালী হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের দ্বারাই পূজিত হয়ে থাকেন। আর তা শুধু স্থানীয় মানুষের মধ্যেই সীমিত নয়, সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশের অসংখ্য মুসলমান এসে এই দেবীর পূজায় অংশ নেয়। সাধন-পূজন আধ্যাত্ম চেতনার

ক্ষেত্রেই শুধু ঐক্য ও সমন্বয়ের অভিজ্ঞতা নয় মুক্ত মনস্কতার বহু দৃষ্টান্ত আমরা দেখি ব্যবহারিক জীবনেও। গম্ভীরা গানের সঙ্গে যে মুখোশের ব্যবহার হয় সেই সকল শিব, দুর্গা, কালী, গণেশের মুখোশ তৈরি করেন মূলত মুসলমান শিল্পী-কারিগররা। মালদহের শিল্পী শেখ সিদ্দিকির নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পেশায় রাজমিস্ত্রী এই শিল্পী থাকেন আইহো গ্রামে— তিনি শুধু মুখোশ তৈরি করেন না, নিজে নাচেনও। কালীনৃত্য, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ ইত্যাদি ভূমিকায় তিনি নাচেন এবং হিন্দু দর্শক-শ্রোতা তাঁকে যথেষ্ট সম্মানও করেন। এই প্রসঙ্গে আরও বলা যায়, গম্ভীরার গানে শিবকে যে সকল নামে সম্বোধন করা হয়, তার অনেকগুলিই মুসলিম প্রভাবপুষ্ট।

আর বাংলার পটুয়া শিল্পীরা তো হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-পরিচয়কেই বস্তুত অস্বীকার করেছেন। ধর্ম সমন্বয়ের আশ্চর্য এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারা। পট ও পটুয়াদের সম্বন্ধে 'ভারতকোষ'-এ বিবৃত যে :

> "চিত্রকরদের মধ্যে জাদু-পটুয়া, বেদিয়া প্রভৃতি শ্রেণির শিল্পীগণকে হিন্দু ও মুসলমানের আচারাদি দুই-ই পালন করিতে দেখা যায় মুসলমান কাজী তাহাদের বিবাহ দেন, আবার বিবাহিতা রমণী শাঁখা-সিঁদুর পরেন। চিত্রকরদের সম্বন্ধে শোনা যায়, বিশ্বকর্মা ও অপ্সরা ঘৃতাচীর মিলনে এই সম্প্রদায়ের জন্ম। পুরাণের মতে (১২শ শতকে) তাহারা ধর্মবিরুদ্ধে কাজ করার শাস্তি হিসাবে জাতিচ্যুত হয়।"[৪০]

তবে এই জাতিচ্যুতি বাংলা ও বাঙালির পক্ষে, তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির পক্ষে পরোক্ষভাবে আশীর্বাদ স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাংলার পটশিল্পের যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার পিছনে তাদের ধর্মোর্ধ্ব মুক্তমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ এবং তাদের জীবন ও জীবিকার সামাজিক পরিবেশের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দরিদ্র এই পটুয়ারা বাস্তব জীবনে সমাজের মূল প্রবাহ থেকে দূরে বাস করে সামাজিকভাবে তারা উপেক্ষিতও; তারা পটুয়া বা চিত্রকর মাত্র, শিল্পীর সম্মান অর্থ কিছুই জোটে না তাদের। বলার কথা, এই পটুয়ারা প্রথাগত ধর্মের পরিধির বাইরে থাকাতে তাদের নিজস্ব সামাজিক বন্ধনটি যথেষ্ট কঠোর; ফলে তারা স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে না। বরং হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মেরই সাধারণ কিছু রীতিপ্রথা, আচার-সংস্কার তারা মেনে চলে। এভাবেই তারা এক আশ্চর্য ধর্ম সমন্বয়ের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

আবার হিন্দু দেব-দেবীর প্রতিমার মাথার পাটের চুল ও ডাকের সাজ যারা তৈরি করে তারা বেশিরভাগই মুসলমান,— তাদের ছোঁয়ায় কিন্তু পবিত্রতা বিন্দুমাত্র নষ্ট হয় না দেব-দেবীর। জীবিকার শর্তের সঙ্গে রীতিপ্রথা আচারের অদৃশ্য যোগসূত্রটি এক্ষেত্রে স্পষ্ট। যে ধর্ম সম্প্রদায়ের মানুষকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যবন-ম্লেচ্ছ বলে দূরে রাখতে বিধান দেয় তারই পুকুরের জলে, তারই গাছের বিল্বপত্রে যেমন শিব-শীতলার পুজো হয় তেমনি

তারই হাতে তৈরি সামগ্রী দিয়ে মা দুর্গা বা জগদ্ধাত্রী দেবীর পরিধান সজ্জিত হয়। দুই ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই যে অন্তর্নিহিত পারস্পরিক নির্ভরশীলতা, তা যেমন বিষয়গত ক্ষেত্রে তেমনি ভাবজগতেও সমন্বয়ের এক অনিবার্য শর্ত হয়ে উঠেছে।

বাঙালি হিন্দু পরিবারে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভাইকে ফোঁটা দেওয়ার, তার শুভকামনার যে প্রথা দীর্ঘদিন চলে এসেছে তা আশ্চর্যজনকভাবে মুসলমান সমাজেও ভিন্নভাবে গৃহীত হয়েছে। নদিয়া জেলার মদনপুর রেলস্টেশনের অদূরে বিরহী গ্রামে যে মদনমোহনের মন্দির আছে সেখানে ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন এতদঞ্চলের মুসলমান মেয়েরা মদনমোহনের বিগ্রহকে ফোঁটা দিয়ে থাকে। কীভাবে এই রীতি প্রবর্তিত হয়েছে তার ঐতিহাসিক সামাজিক কোনও কারণই জানা যায়নি। তবে এখনও সেই প্রথা চলে আসার পিছনে নিশ্চয়ই কোনও মৌলিক শর্ত ক্রিয়াশীল রয়েছে।

নবদ্বীপে মায়াপুরের অদূরে মুসলমান ঐতিহাসিক চরিত্র চাঁদকাজির সমাধি রয়েছে। সেই সমাধি দেখাশোনা করে মায়াপুরের চৈতন্যমঠ। আবার দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে প্রবেশের বর্তমান পথের বাঁ-দিকেই রয়েছে এক ফকিরের 'থান' পুকুরপাড়ে অশ্বত্থ গাছের নীচে। হিন্দুরা এখনও সেখানে ধূপ দেয়, মানত করে। প্রসঙ্গত, এই 'থানে' শ্রীরামকৃষ্ণ দেব ইসলাম সাধনা করেছিলেন। পরে রানি রাসমণি এখানে একজন মুসলমান সেবায়েত নিযুক্ত করেন।

"আসলে হিন্দু-মুসলিম-খ্রিস্টান এই যে বিভাজন, এর অন্তরালেই লুকিয়ে থাকে একজন 'সামাজিক মানুষ' বা 'সাংস্কৃতিক মানুষ'। সে ধর্ম বোঝে না, সংস্কৃতি বোঝে। রাজনৈতিক প্যাঁচ বোঝে না. ঐতিহ্য বোঝে। সেই জায়গাটাতে মানুষের 'কগনিশন'। হিন্দুর পুজো, মুসলমানে নামাজ, খ্রিস্টানের প্রার্থনার অন্তরালে এই 'কগনিশন'ই লোকায়ত মানসে ক্রিয়াশীল থাকে। হিন্দু যে ঠাকুরের থানে গিয়ে ঢিল বেঁধে আসে, মুসলমান মাজারে ঢিল বাঁধে। এখানে থান ও মাজার অবশ্য ধর্মগত পার্থক্যকে প্রকটিত করে, কিন্তু 'ঢিল বাঁধার' উৎস যে মানসিক বিশ্বাস— এইটাই উভয়ের 'কগনিশন', বিশ্বাসের ঐতিহ্য। এই বিশ্বাসসূত্রে দাঁড়িয়ে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান-শিখ সবাই একাকার হয়ে যায়।"[৪১]

এই 'কগনিশন' বা বিশ্বাসের ঐতিহ্যকে তুলে ধরে লোকসংস্কৃতির চর্চা।

লোকায়ত সমাজের হিন্দু-মুসলমান বা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষ মানুষ আজও 'বিশ্বাসমূলক লোকচিকিৎসা'য় আস্থাশীল। এই বিশ্বাসের সঙ্গে আদি জাদুবোধ বা 'ম্যাজিক রিলিফ'-এর যোগ রয়েছে। গ্রামসমাজে ওঝা গুণিন পির মৌলানারা তেলপড়া, জলপড়া, ঔষধপত্র ইত্যাদির সাহায্যে নানা রোগ ও বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করার রীতি চালু রেখেছে। এগুলির ফললাভও হয় সম্পূর্ণ বিশ্বাসের ওপর।

এ নিয়ে বর্তমান লেখকের ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতাও রয়েছে। দুজন মুসলমান ওঝাকে আমি খুব কাছে থেকে ভূত তাড়ানোর মন্ত্র বলতে শুনেছি। সেই অতিদ্রুত

উচ্চারিত ও অঙ্গভঙ্গি সহকারে পরিবেশিত মন্ত্রগুলি আসলে মনসার গান, ধর্মঠাকুরের গান। এখনও গ্রামে-গঞ্জে ভূতে পাওয়া, গৃহপালিত পশুর অসুখ, মরণ আটকানো, শিশুদের অসুখ-বিসুখে বা মঙ্গল কামনায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভাঙা সম্পর্ক জোড়া লাগানোর জন্য, সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য হিন্দুদেরও পিরের মাজারে, ফকিরদের কাছে ছুটে যাওয়া আকছারই ঘটে। এই বিশ্বাসকে অবৈজ্ঞানিক কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়ার আগে আমাদের ভাবতে হয় লোকজীবনের অবলম্বন, তার পরস্পর শিকড় কোন গভীরে প্রোথিত আছে,— তার, যৌথের নির্জ্ঞান সত্তায় কী লুকানো রয়েছে!

বাংলার সম্প্রীতি : আধুনিক যুগ
নব জাগরণ পর্ব

বাংলায় মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়েছিল আরবি-ফারসি সংস্কৃতির সঙ্গে আর আধুনিক এই যুগের সূত্রপাত হয় ইউরোপীয়দের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে,— মধ্যযুগে আমরা পেয়েছিলাম কাগজ, কিতাব আর নতুন যুগে পেলাম মুদ্রাযন্ত্র, কাগজের কল, ডাকবিলি ব্যবস্থা। বস্তুত, বাংলা তথা ভারতের মানসিক বিপ্লবই শুরু হয়েছিল মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাবের ও চিন্তা-চেতনার প্রসারের সঙ্গে,— যেদিন শ্রীরামপুরে মুদ্রাযন্ত্র এল এবং পুস্তক-পুস্তিকা ছাপা আরম্ভ হল সেদিনই সূচিত হয় মধ্যযুগের অবসান আর আধুনিক যুগের আবির্ভাব। আর যাঁরা সেই আধুনিক চিন্তা-চেতনার বর্তিকা বহন করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন রামমোহন রায় (১৭৭২/৭৪-১৮৩৩)।

সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত অনুধাবনে কিছু ঘটনা এক্ষেত্রে রূপরেখাগতভাবে স্মর্তব্য : দ্বাদশ শতকের শেষভাগে তুর্কি-ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে এবং পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতের প্রায় পনেরো ভাগ তার দখলে আসে। ১৫২৬-এ মোগলরা ভারত জয় করে, তবে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত পত্তন হয় আকবরের সময়ে, ১৫৫৬ ইতিমধ্যে পর্তুগিজরা ভারতের উপকূলভাগে হামলে পড়েছে,— গোয়ায় তাদের রাজ্যও পত্তন হয়। ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে ঔরঙ্গজেব প্রায় সমগ্র ভারতের বাদশাহ হন; ১৭০৭-এ তাঁর যখন মৃত্যু ঘটে দক্ষিণ ভারতে তখন মোগল সাম্রাজ্যের এমনই অবস্থা যে পারস্যের দস্যুসর্দার নাদির শাহ অবলীলায় দিল্লি এসে মহানগরী তছনছ করে দেয়, কেউ তাকে রুখতে পারে না। তারপর, দু-দশক কাটতে না কাটতে বাংলার গঙ্গাতীরে পলাশিতে বাংলার নবাব সিরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ফৌজের কাছে হার স্বীকার করলেন। বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের অবসান সূচিত হয়,— ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ভাষায় : In June 1757 we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal.'[৪২] যুদ্ধ নয়, ক্লাইভের এই সাফল্যকে আজকের রাষ্ট্রনীতির ভাষায় বলা যায় Coup dietat। পরের ধাপে দিল্লি থেকে বিতাড়িত ও এলাহাবাদে সাময়িকভাবে আশ্রয়প্রাপ্ত দুর্বল মোগল-সম্রাটের কাছ থেকে ক্লাইভ যখন বার্ষিক মোটা অঙ্কের রাজস্বের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাংলা সুবার 'দেওয়ানি' পদ আদায় করে নিলেন তখন থেকেই শাসন ও শাসনের দ্বৈরাজ্যের সৃষ্টি হল। কিন্তু দেখা গেল দ্বৈরাজ্যও

নয়, বহু রাজকের আধিপত্য,— ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিটি কর্মচারী কিংবা কোম্পানির সঙ্গে যে কোনওভাবে যুক্ত প্রত্যেকে— ইংরেজ, হিন্দু, মুসলমান, আর্মানি ফিরিঙ্গি সকলেই মনে করত যে সে-ই কোম্পানি। কর্মচারী, দালাল, ফড়ে, বানিয়া— প্রত্যেকেই কোম্পানির নিশান উড়িয়ে শুল্ক এড়াচ্ছে বা কোম্পানির নাম ভাড়িয়ে অবৈধ উপার্জন করে চলেছে। প্রশ্ন জাগে, 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী রাজদণ্ড রূপে',— এরকম এক অবস্থা কেন ঘটল। ইংরেজ কর্মচারীদের সাহসিকতা, আগ্রাসী মনোভাব চাতুর্য ইত্যাদি গুণগুলি যেমন ছিল তেমনি দেশীয় ও স্থানীয় কর্মচারীদের বেশিরভাগই ছিল লোভী নীতিহীন, পদলেহনকারী ভাগ্যান্বেষী,— কোম্পানির ছত্রছায়ায় থেকে তারা ধনবান ও বলবান হয়েছেন,— রাজা, রায়বাহাদুর, এমনকী স্যার পর্যন্ত উপাধি পর্যন্ত পেয়েছে।

সেদিনের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অপশাসনের স্বরূপ বুঝতে মাত্র দুটি গ্রন্থই যথেষ্ট তথ্য জোগায়,— উইলিয়াম বোলট্স্-এর 'কনসিডারেশন অন ইন্ডিয়ান অ্যাফায়ার্স' এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাস। বোলটস (১৭৪০-১৮০৮) ছিলেন এক সাহসী ও উদ্যোগী পুরুষ। তরুণ বোলট্স্ ১৭৫৯ সাল নাগাদ ভাগ্যান্বেষণে কলকাতায় আসেন, বয়স তাঁর তখন উনিশ-কুড়ি। ইস্টি ইন্ডিয়া কোম্পানির কাজকর্ম তখন অনেক বেড়ে গেছে অথচ কাজ-জানা লোকের খুবই অভাব তাই বোলট্স্-কে সিভিল সার্ভিসে 'রাইটার' পদে নিয়োগ করা হয়। চাকুরির পাশাপাশি ব্যবসা করে কয়েক বছরের মধ্যেই বোলট্স্ বিপুল অর্থের মালিক হয়ে উঠলে কোম্পানির কর্তাদের রোষ-দৃষ্টি তাঁর ওপর পড়ে। বোলট্স্-কে তাঁরা এ-কারণে ভর্ৎসনাও করেন। ১৭৬৬-তে বোলট্স্ চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় নানা ধরনের ফাটকা ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ আরও বিরক্ত হয়ে ওঠে; এবং ১৭৬৮-তে গভর্নর ভেরেলস্ট্-এর আদেশক্রমে বোলট্স-কে পাকড়াও করে দেশে ফেরত পাঠানো হয়, এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। এরপরই বোলট্স্ কোম্পানির অপশাসনের দিনগুলি উন্মোচন করে লিখলেন 'Consideration on Indian Affairs (1771) বইটি। তাঁর সেই বিস্ফোরক উন্মোচনে ব্রিটিশ জনগণ এবং পার্লামেন্ট প্রবলভাবে আলোড়িত হয়। প্রসঙ্গত, বাংলার দক্ষ তাঁতিদের আঙুল কেটে দেওয়ার যে কাহিনি প্রচলিত আছে তারও অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে ওই গ্রন্থে। কোম্পানি কর্তাদের ওপর রাগ-বিদ্বেষের কারণে সম্ভবত বোলট্স্-এর গ্রন্থে অতিকথনও ঘটেছে, তবে সবই ভিত্তিহীন ছিল এমনও নয়; কারণ Dow-এর ইতিহাস গ্রন্থেও একই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এরপরই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে Regulating Act (1773) পাশ হয়।

উইলিয়াম বোলট্স্-এর গ্রন্থটি যেমন ইংলন্ডবাসীদের সামনে বাংলায় কোম্পানি-শাসনের নগ্নরূপ উন্মোচন করেছে তেমনি বাঙালি পাঠক তার আখ্যানিক রূপের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। আপাত সুশাসন,— দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার বিপরীত দৃশ্য—

> "লোকে প্রথমে ভিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল, তারপর কে ভিক্ষা দেয়?— উপবাস করিতে আরম্ভ করিল। তারপর রোগাক্রান্ত হইতে লাগিল। গোরু বেচিল, লাঙল-জোয়াল বেচিল, বীজধান খাইয়া ফেলিল, ঘরবাড়ি বেচিল, জোতজমা বেচিল। তারপর মেয়ে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর ছেলে বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর স্ত্রী বেচিতে আরম্ভ করিল। তারপর মেয়ে, ছেলে, স্ত্রী কে কেনে? খরিদ্দার নাই। সকলেই বেচিতে চায়।"

ঐতিহাসিক তথ্য হল এই, ১৭৭০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই থেকে দু'মাসে দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু— ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের আর্থসামাজিক বিপর্যয়, মূল্যবোধের ভাঙচুর ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের দায় কিন্তু সরাসরি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ওপরই বর্তায়। 'আনন্দমঠ'-এর সূচনায় আখ্যানিক পটভূমি নির্মাণে এই করাল বাস্তবতার উপস্থাপন ব্রিটিশ-শাসনের স্বরূপই শুধু উন্মোচন করে না, বাংলার মানুষের দারিদ্র্য, অসহায়তা,— কৃষকদের ওপর ভূস্বামীদের উৎপীড়নকেও তুলে ধরে। এক গবেষক কালিক বাস্তবতা সম্বন্ধে লিখেছেন :

> "এই সময়ের ইতিহাস পড়তে পড়তে বিস্ময় জাগে। দেওয়ানি পাবার কয়েক বছরের মধ্যে ইংরেজ কী শক্তি অর্জন করেছিল যাতে করে সে নন্দকুমারের মতো নামজাদা হিন্দু ব্রাহ্মণকে মুর্শিদাবাদ থেকে পাকড়ে এনে কলকাতায় বিচারের অভিনয় করে ফাঁসিতে লটকে দিতে পারলে (১৭৭৫)। কলকাতার লোকে বা বাংলার লোকে উপবাস করে গঙ্গাস্নান করে দিনটা কাটিয়ে দিলে। নগরে প্রতিবাদ হয়নি, দাঙ্গা হয়নি, বিদ্রোহ হয়নি। সবাই সেদিন negative— নিষ্ক্রিয় বৃত্তি।"

কোম্পানি-শাসনের সূচনাপর্বের এই নঞর্থক বাস্তবতার উল্লেখ এই কারণে যে, তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের অনেকেই ইংরেজদের কৃপাদৃষ্টি পাবার জন্য উন্মুখ ছিল এবং ফাঁক-ফোকরে আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগে ছিল। সমাজের অগ্রণী অংশের এই মনোভাব পরবর্তী পর্বে কী প্রকরণে দেখা দিয়েছিল সে প্রসঙ্গে পরে।

ইতিহাসের পরিহাস এই যে, আঠেরো শতকের শেষভাগে ইংরেজ আমেরিকা হারায়,— আমেরিকার তেরোটি কলোনি সংঘবদ্ধ হয়ে যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলে এবং ইংরেজের শাসন-শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে যায়; আর ভারতের বিশ কোটি মানুষ বিচ্ছিন্ন বলে দেশটা ইংরেজের অধীন হয়। এক্ষেত্রে প্রথমত লক্ষণীয়, ব্রিটিশ নৌবাহিনী ও সৈন্যদল 'কোম্পানি'-কে যুদ্ধ অভিযানে সহায়তা করেছিল বলেই একটি ব্যবসায়ী কোম্পানির পক্ষে ভারতজয় সম্ভবপর হয়েছিল। আর দ্বিতীয়ত, আমেরিকার বিদ্রোহের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল মুক্তির দর্শননির্ভর বিপ্লবের বাণী, ফলে সেই বিদ্রোহ হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। সেই দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তক ছিলেন টমাস পেইন (১৭৩৭-১৮০৯),— তাঁর 'কমন সেন্স' পুস্তিকাটিই (১৭৭৬)

আমেরিকার স্বাধীনতার সপক্ষে প্রথম আহ্বান। মানুষের জন্মগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় এবং বুদ্ধিমুক্তির জন্য এই মহান চিন্তক আচার-প্রথার পরিবর্তে বিচার-বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেন। আর সেই অচিরেই পৌঁছে গিয়েছিল ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে, ফ্রান্সে এবং তা মূর্ত রূপ পায় ফরাসি-বিপ্লবে। তবে ফ্রান্সে বিপ্লবের পটভূমি রচিত হচ্ছিল আগে থেকেই,— ভলতের শোনাচ্ছিলেন চার্চের কুসংস্কার থেকে মুক্তির মন্ত্র, দা আলেমবাই, দিদেরো প্রমুখ দার্শনিকগণ মানুষের মনের মুক্তি আনলেন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা ও তথ্য জুগিয়ে, আর জনগণের মনের সব দরজা ভেঙে ফেললেন রুশো তাঁর উচ্ছ্বাস ও ভাবুকতার আদর্শবাদে। আর চিন্তা-চেতনার সামগ্রিক উদ্বোধনে টমাস পেইন-এর অবদানও ছিল অবিস্মরণীয়। এভাবেই পুরাতন জীর্ণ যুগের অবসান ঘটল,— আর তার তরঙ্গাঘাত ভারতেও অনুভূত হল কিছুকাল বাদে।

সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক কিরণে উদ্ভাসিত আধুনিক যুগ গড়নে মুদ্রাযন্ত্র স্বভাবতই এক বড় ভূমিকা নিয়েছিল— বাংলায় সেটা ঘটেছে শ্রীরামপুরের মিশনারিদের উদ্যোগে। পাদরি কেরির লেখা 'নিউ টেস্টামেন্ট' দিয়ে ১৮০১-এ যে শ্রীরামপুর প্রেসের যাত্রা শুরু হয়েছিল তা অচিরেই বাংলার শিক্ষা-সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিক জগতে এক আলোড়ন নিয়ে আসে। প্রসঙ্গত, "১৮০১ থেকে ১৮৩৪ অব্দের মধ্যে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে ৪০টি ভাষায় মোট ২ লক্ষ ১২ হাজার গ্রন্থের কপি মুদ্রিত হয়েছিল; মুদ্রিত পুস্তকের সংখ্যা ২২৬১। আর এই প্রেস থেকেই ১৮১৫ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় রামমোহন রায়ের দুটি পুস্তিকা,— (১) বেদান্ত গ্রন্থ এবং (২) বেদান্ত সার। শ্রীরামপুর প্রেস থেকে কিন্তু ধর্মপুস্তকই শুধু ছাপা হয়নি, লোকশিক্ষার প্রচারে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে বাঙালি পাঠকদের পরিচিত করার উদ্দেশ্যে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক গ্রন্থও ছাপা হয়েছে, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় জানান :

> "পিয়ার্সের 'ভূগোল বৃত্তান্ত' (১৮১৮) বাংলা ভাষায় প্রথম গ্রন্থ যাতে পৃথিবীর দেশ-মহাদেশের কথা প্রকাশিত হয়। জন ক্লার্ক মার্শম্যানের 'জ্যোতিষ ও গোলাধ্যায়' (২য় সংস্করণ, ১৮১৯) বোধহয় এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছিল। ফেলিক্স কেরি-কৃত 'ব্রিটিশ দেশীয় বিবরণ সঞ্চয়' (১৮২০) ও তাঁর 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮২০) বাংলা ভাষায় প্রথম বিশ্বকোষ। জন লসন-লিখিত পশ্বাবলী (১৮২০), 'রবিনসন ক্রুসোর জীবনচরিত', ইয়েটসের 'পদার্থবিদ্যা' (১৮২৪), 'পদার্থবিদ্যাসার' (১৮২৫), মার্শম্যানের 'সদগুণ ও বীর্যের ইতিহাস' (১৮২৯), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৮৩১), 'পুরাবৃত্তের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৩৩), জন ম্যাক-কৃত 'কিমিয়া বিদ্যাসার' (১৮৩৪) বাঙালির বুদ্ধিমুক্তির পক্ষে এই গ্রন্থগুলি বিশেষ সহায় হয়।"[৪৫]

এছাড়া বাঙালি লেখকদের মধ্যে তারিণীচরণ মিত্রের 'নীতিকথা' (১৮১৮), তারাচাঁদ দত্তের 'মনোরঞ্জনেতিহাস' (১৮১৯), রামকমল সেনের 'হিতোপদেশ' (ঈশপের গল্পের অনুবাদ, ১৮২০), 'ঔষধসার সংগ্রহ' (১৮১৯) প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে পুরাতন জীবনে এভাবেই পশ্চিমের বাতায়ন দিয়ে আলো এসে পড়ে, দূরের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত হয়, চিন্তনে-জীবনচর্চায় পরিবর্তন ঘটে এক জাগরণস্পৃহা দেখা দেয়।

বাংলার সেই নবজাগরণের পথিকৃৎ নিঃসন্দেহে রামমোহন রায় (১৭৭২?-১৮৩৩)— তাঁকে কেন্দ্রে রেখেই সাধারণভাবে বাংলার নবজাগরণের বিকাশক্রমটি দেখা হয় ওই পর্বের দুই বিশিষ্ট ব্যক্তির,— রাধাকান্ত দেব ও ডেভিড হেয়ার-এর অবদানও, বিশেষত শিক্ষা-বিস্তারের ক্ষেত্রে স্মর্তব্য। রামমোহনের চিন্তা-চেতনার আততি এবং যুগসন্ধির বিষয়ীগত পরিপ্রেক্ষিত অনুধাবনে ফিরে তাকাতে হয় ইউরোপীয় হিউম্যানিস্টদের দিকে মনীষী বেন্থাম, রিকার্ডো, রিচার্ড ওয়েন, মিল পিতা-পুত্রের দিকে। বস্তুত, জ্ঞানের বিশ্ববোধে রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। বিদেশি চিন্তকগণের মনের স্পর্শ পেয়েছিলেন বলেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষা-বিস্তারই পিছিয়ে থাকা জনসাধারণের মনোমুক্তির পরম পথ। জেরমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রচারিত utilitarianism বা উপযোগিতাবাদ— 'প্রচুরতম লোকের প্রভূততম সুখ সাধন'-এর নীতি অনুসরণ করেছিলেন রামমোহন রায় মানব-হিতসাধনে। তাছাড়া মজুরি, খাজনা, অবাধ বাণিজ্য নীতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি বিষয়ে রামমোহন যেসব মতামত ব্যক্ত করেন তাতে বোঝা যায় ম্যালথাস (১৭৬৬-১৮৩৪), রিকার্ডো (১৭৭২-১৮২৩), অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ অর্থনীতিবিদদের প্রভাব তাঁর ওপর পড়েছিল। অবশ্য মন্টেস্কু, ব্লাকস্টোন ও বেন্থামের প্রভাবও তাঁর উপর যে ছিল সেকথা ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। তাছাড়াও ১৮৩২ বা ১৮৩৩-এ ইংল্যান্ডের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা রবার্ট আওয়েনের সঙ্গে পরিচয় সূত্রে রামমোহন সমাজতান্ত্রিক প্রোগ্রামের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তবে এক্ষেত্রে স্মর্তব্য, রামমোহন মনে করতেন মানবজাতির সামাজিক, রাজনৈতিক ও পারিবারিক উন্নতির ক্ষেত্রে ধর্মের এক সাহায্যকারী ভূমিকা আছে।

কোনো কোনো লেখক 'জমিদার রামমোহন'-কে ইংরেজ-সৃষ্ট মূল কাঠামো টিকিয়ে রাখার জন্য সমালোচনা করেন : তাঁদের মধ্যে একাংশ আবার বলেন : 'তথাকথিত স্বাধীনতার পূজারি রামমোহন' গ্রামাঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ চলাকালীন ইংরেজ শাসন সুদৃঢ় করতেই ব্যস্ত ছিলেন। এই প্রসঙ্গে বলার কথা, একথা ঠিকই যে রামমোহন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবসান দাবি করেননি; কিন্তু তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সরকার ও জমিদারদেরই সুবিধা হয়েছে, অন্যদিকে লক্ষ লক্ষ কৃষকের দুরবস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে অথবা তাদের সর্বনাশ হয়েছে। রামমোহনের কথায় : "The power of imposing new leases and reats, given to the proprietors by Regulation I and VIII of 1993, and subsequent Regulations, has considerably enriched, compara-

tively, a few individuals the proprietors of land, to the extreme disadvantage or rather ruin of millions of their tenants; and it is productive of no advantage to government" (Susobhan chandra Sarkar (ed) Rammohon Roy on Indian Economy; p. 223)

উপযোগিতাবাদী, রামমোহন কারিগর ও শ্রমিকদের এবং সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মান, শহরের শিক্ষিত বাবুদের এবং গ্রামের সাধারণ মানুষের নৈতিকতার মান, ভারতবর্ষের শ্রমজীবী মানুষ ইত্যাদি বিষয় নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তবে আমরা এক্ষেত্রে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব তাঁর ধর্মভাবনায়।

ত্রিশ বছর বয়সে রামমোহন রায় ফারসি ভাষায় লেখেন 'তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন (১৮০৩); আরবি ভাষায় লেখা তাঁর 'মনজারাত-উল-আদিয়ান' গ্রন্থটির উল্লেখ পাওয়া গেলেও তার হদিশ মেলেনি। অনুমান হয়, 'তুহ্‌ফাৎ' পুস্তিকায় সংক্ষেপে বলতে গিয়ে যা অস্পষ্ট বা অনুক্ত থেকেছিল সেগুলিই সম্ভবত আরবি গ্রন্থটিতে ছিল। 'তুহ্‌ফাৎ'-এর বঙ্গানুবাদ করেন কোরান শরিফের অনুবাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এবং তা প্রকাশ পায় 'ধর্ম্মতত্ত্ব' (বৈশাখ-ভাদ্র, ১৮২১ শকাব্দ) পত্রিকায়। ক্ষুদ্র এই পুস্তিকাটিতে ধরা হয়েছে রামমোহন রায়ের জীবনভর সাধনার সারাৎসার,— তাঁর কোরান অধ্যয়ন, আরবি ভাষাচর্চার সূত্রে গ্রিক দার্শনিকদের মত ও চিন্তনের সঙ্গে পরিচয়; এবং পরবর্তীকালে ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের গ্রন্থাদি পাঠের সূত্রে তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল কঠোর যুক্তিবাদী মন। 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন'-এ রয়েছে তাঁর সাধনার প্রস্তাবনা :

> "বর্তমানকালে ভারতে অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস লোকেদের মধ্যে এমন বেড়েছে যে, একটা অভিনব বস্তু দেখলেই সেটাকে পুরাকালের বীর অথবা বর্তমান যুগের মহাপুরুষ বা সন্তদের কীর্তি বলে আরোপ করা হয়; সেইসব কার্যের কারণ স্পষ্টত বর্তালেও তারা সেগুলিকে অগ্রাহ্য করে। কিন্তু যাদের মন সুস্থ ও যারা ন্যায়ের পক্ষপাতী তাদের কাছে এ-তথ্য (কার্যকারণ সম্বন্ধ) প্রচ্ছন্ন থাকে না। ইউরোপীয় লোকেদের বহু অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার এবং বাজিকরের কেরামতি প্রভৃতির ন্যায় এমন অনেক জিনিস আছে যার কারণ দৃশ্যত অজ্ঞাত এবং মানুষের বুদ্ধির অগম্য বলেই মনে হয়; কিন্তু তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি ও শিক্ষা পাবার পর, কারণগুলি (কার্যসমূহের) সন্তোষজনক ভাবেই জানা যায়। বুদ্ধিমান লোক অনুমানী যুক্তির (inductive reason) প্রভাবে যথেষ্টই সুরক্ষিত থাকে— এইসব অতিপ্রাকৃত ঘটনার দ্বারা তারা প্রতারিত হয় না। তবে এ বিষয়ে আমরা যতদূর বলতে পারি সেটা হচ্ছে এই, তীক্ষ্ণ ও অন্তর্প্রবেশী বিচারশক্তি থাকা সত্ত্বেও কতকগুলি আশ্চর্য ঘটনার কারণ কতক লোকের কাছে অজ্ঞাতই থেকে যায়। সে-সব ক্ষেত্রে আমাদের

স্বীয় আন্তরবোধের (intuition) শরণাপন্ন হয়ে এই প্রশ্ন করতে পারি, আমাদের কার্যকারণ-সম্বন্ধ বুঝবার অক্ষমতা অথবা প্রাকৃতিক বিধির বিরুদ্ধে কোনো অসম্ভব মাধ্যমের উপর কারণ আরোপ করাটা এর মধ্যে কোনটা যুক্তির সঙ্গে মানায় ভালো? আমি মনে করি আমাদের অন্তর্বুদ্ধি বা সুযুক্তি প্রথমোক্ত পথই বেছে নেবে। তাছাড়া যে জিনিস ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা-প্রসূত নয়, যা প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিধিবহির্ভূত ঘটনা— যেমন বহু শত শত বছর পূর্বের কোনো এক মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা হয়েছিল বা কেউ স্বর্গারোহণ করেছিলেন প্রভৃতি— সে-সব বিশ্বাস করবার প্রয়োজনটা কী?

"সাংসারিক ব্যাপারে এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ না জানলে মানুষ একটাকে কারণ ও অন্যটাকে তার ফল বলে মেনে নিতে রাজি নয়, কিন্তু যখন ধর্মের বা ধর্মবিশ্বাসের প্রভাব এসে পড়ে তখন যেখানে কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই, সেখানেও একটা কারণ ও অন্যটা কার্য বলে স্বীকার করতে সে দ্বিধাবোধ করে না। যেমন একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে— কোনো সংগ্রাম না করে, অথবা কোনোরকমের প্রতিকারের চেষ্টা না করেই কেবল প্রার্থনার জোরে, বা তুকতাক তাগা-তাবিজের গুণে, দুর্গতি দূর হয়েছে বা অসুখ সেরেছে, এ-সবের মধ্যে কোনো কার্যকারণ-সম্বন্ধ নেই।"

"ধর্মনেতারা তাদের শিষ্যদের সন্তোষের জন্য ব্যাখ্যা করেন— ধর্ম ও বিশ্বাসের ব্যাপারে যুক্তিতর্কের স্থান নেই; এবং ধর্মের ব্যাপারে শুধু বিশ্বাস ও ঈশ্বরের কৃপাই একমাত্র নির্ভর। যে বিষয়ের কোনো প্রমাণ নেই, যা যুক্তিবিরুদ্ধ তা একজন যুক্তিবাদী কী করে গ্রহণ বা স্বীকার করতে পারেন?"[৪৪]

এ হেন যুক্তিবাদী রামমোহন রায় কিন্তু সদর্থে আস্তিকই ছিলেন; কারণ ওই 'তুহ্ফাৎ'-এরই অন্যত্র রয়েছে :

"জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের হৃদয় পরস্পরের প্রতি প্রীতি ভালোবাসা দিয়ে জয় করাই প্রকৃতির সৃষ্টিকর্তা একমাত্র ঈশ্বরের নিকট গ্রহণীয় বিশুদ্ধ পূজা। এই হৃদয়জয়ের চেষ্টা না করে যাঁরা ঈশ্বরপ্রদত্ত স্বাভাবিক ও সহজ প্রেরণার চাইতে তথাকথিত মনগড়া যে প্রত্যাদেশ— যা শুধু তাদের সমজাতীয় জীবের সামাজিক জীবনের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে— সেই প্রত্যাদেশেরই অধিক মূল্য দেয়, তারা কোনো বিশেষ তন্ত্র-মন্ত্র যোগাদি অঙ্গচালনাকেই মোক্ষের কারণ, এবং সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছ থেকে পুরস্কার লাভের উপায় মনে করে। প্রকৃতপক্ষে তারা যেন তাদের দেবতাতেই একটা পরিবর্তন আনার ভান করে এবং মনে করে যে তাদের বাহ্যিক প্রক্রিয়া ও মানসিক উচ্ছ্বাসের প্রভাবে অপরিবর্তনশীল ঈশ্বরের মধ্যেও পরিবর্তন আনতে পারে। আমাদের তুচ্ছ প্রচেষ্টা

কিছুতেই ঈশ্বরের রাগ প্রশমনের কিংবা তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহ লাভের কারণ হতে পারে না একটু চিন্তা করলেই এই মতের অসারতা ধরা পড়বে।"[৪৫]

রামমোহন 'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদিন' রচনা করেছিলেন ঐসলামিক 'বিশ্বধর্মের' আদর্শে আর সেখানে প্রতিফলিত হয়েছে উদারপন্থী ইসলাম-ভাবনা। সেই উদারপন্থা দু'শ্রেণির সাধক গ্রহণ করেছিলেন,— একটি 'মোতাজল' এবং অপরটি 'সুফিবাদ'— যথাক্রমে যুক্তিবাদী ও ভক্তিবাদী। ইসলামধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত রামমোহন ছিলেন বাস্তবতা মোতাজলপন্থী অর্থাৎ সংশয়বাদী। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর যুক্তিবাদী বিশ্বধর্মবোধ সম্বন্ধে লেখেন:

> "ইসলামের মধ্যে যে-সব মতামত আধুনিক বিজ্ঞানী বুদ্ধি দ্বারা সমর্থিত হতে পারে না, অথবা যে-সব কথা বিশ্বধর্ম বোধের বাধা বলে তাঁর মনে হয়েছিল, তারই সমালোচনা রূপে এই পুস্তিকা ('তুহফাৎ') লিখিত হয়েছিল। কোরানের মধ্যে পৌত্তলিকদের নিধন করবার কথা আছে, 'এখন প্রশ্ন এই যে যিনি স্রষ্টা সর্বজ্ঞ ও দয়ালু, অনাসক্ত ও বদান্য এবং সেই ভগবানের পক্ষে বিরুদ্ধ মতের উপদেশ ও আদেশ দেওয়া কি সম্ভব? রামমোহন বলতে চান, 'এ-সবই কি ধর্মানুবর্তীদের মনগড়া জিনিস? আমার তো মনে হয় যে সুস্থমনের লোক কেউই শেষেরটি মানতে ইতস্তত করবে না।' রামমোহনের ইচ্ছা ছিল ইসলামের যা শ্রেষ্ঠ বাণী তাই প্রচারিত হোক সেটাই ইসলামের বিশ্বধর্ম-চেতনা। পরে হিন্দু ও খ্রিস্টান ধর্মগ্রন্থ থেকেও তিনি ওই দুটি ধর্মের মহৎ ভাবনা সংকলন করবার চেষ্টা করেন। সেখানেও বিশ্বধর্মের শ্রেষ্ঠ বাণী আবিষ্কার ছিল (তাঁর) অন্তরের একমাত্র কামনা।"[৪৬]

ধর্মসমন্বয়ের যে প্রয়াসটি আধুনিক যুগের আগেই তৃণমূল স্তরে এবং সন্তদের মধ্যে শুরু হয়েছিল সেটি রামমোহন রায়ের যুক্তিনিষ্ঠ বিশ্বধর্মচেতনায় নতুনতর রূপ পেল উনিশ শতকের সূচনায়। রামমোহন রায়ের প্রত্যেক জীবনীকারই বলেছেন যে 'তুহ্ফাৎ'-পরবর্তী পর্বে তিনি গভীর মনোযোগে বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র গ্রন্থসমূহ থেকে শ্রেষ্ঠ বাণী সংগ্রহ করে উপস্থাপিত করেছিলেন সর্বমানবের এক বিশ্বধর্ম বা Universal Religion; পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ তাঁর আন্তরদৃষ্টি থেকে অনুভবের দ্বারা সেই সত্যের নাম দিয়েছিলেন মানুষের ধর্ম বা Religion of human,— এই ধর্ম হিন্দুর নয়, মুসলমানের নয়, খ্রিস্টানের নয়— এ হল শাশ্বত মানবের ধর্ম। রবীন্দ্র ধর্মতেনার এই ব্যাপকতার মূল ছিল রামমোহন রায়ের সর্বধর্মের অনুক্রিয়া,— পাশ্চাত্যের খ্রিস্টধর্ম, ও ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির বাণীসমূহ আত্মীকৃত করে নিয়ে রামমোহন বললেন যে,—

> "...যে দেবতা সর্বদেশে সর্বকালে সকল মানুষের দেবতা না হইতে পারেন, অর্থাৎ যিনি আমার কল্পনাকে তৃপ্ত করেন, অন্যের কল্পনাকে বাধা দেন, যিনি আমার অভ্যাসকে আকর্ষণ করেন, অন্যের অভ্যাসকে পীড়িত করেন, তিনি

আমারও দেবতা হইতে পারেন না, কারণ সকল মানুষের সঙ্গে যোগ কোনোখানে বিচ্ছিন্ন করিয়া মানুষের পক্ষে পূর্ণ সত্য হওয়া একেবারেই সম্ভব হয় না, এবং এই পূর্ণ সত্যই ধর্মের সত্য।"[৪৭]

বাস্তবত এ দেশে রামমোহন রায়ের ধর্ম ও কর্ম-জীবন মাত্র পনেরো বছরের ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত; অবশ্য তার আগেই তিনি ফারসি ভাষায় 'তুহ্‌ফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদিন' (১৮০৩) পুস্তিকাটি লিখে ফেলেছেন। ১৮১৩ সালের পর অবাধ বাণিজ্য চালু হলে ব্যবসায়ীরা বিদেশ থেকে এদেশে অন্যান্য শিল্পোৎপন্ন পণ্য আমদানির সঙ্গে মুদ্রণ সম্বন্ধীয় দ্রব্যাদিও আনতে শুরু করে। ফলে কলকাতায় ও তার আশেপাশে অনেকগুলি ছাপাখানা স্থাপিত হয। আর তখনই ফেরিস সাহেবের ১৭৯৯-এ স্থাপিত প্রেসটি নতুন যন্ত্রপাতি পেয়ে বাংলা সহ অন্যান্য ভাষায় বই ছাপতে থাকে। সেই প্রেস থেকেই রামমোহন রায়ের 'বেদান্ত গ্রন্থ' ও 'বেদান্তসার' গ্রন্থদুটি মুদ্রিত হয়।

'বেদান্তসার' গ্রন্থটির লেখক-কৃত ইংরেজি অনুবাদ এবং তার সঙ্গে তাঁর বন্ধু ডিগবি'র মুখবন্ধ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিলেত থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ততদিনে রামমোহন রায় পাশ্চাত্য সারস্বত সমাজেও এক বিশিষ্ট ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয় Jena থেকে 'বেদান্তসার' গ্রন্থটির জর্মন অনুবাদ 'Anflosing des Wedent' (১৮১৭) প্রকাশিত হয়। ইংরেজি গ্রন্থটিতে রামমোহন রায়ের লেখা একটি ভূমিকা রয়েছে,— গ্রন্থটির সারাৎসার এবং দ্বিতীয় পর্বে রামমোহন রায়ের ধর্মভাবনার পরিচয় রাখতে সেই ভূমিকা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

"একমাত্র অদ্বিতীয় সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে-বিশ্বাসীদিগের নিকট নিবেদন"—

"ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের এবং হিন্দুসমাজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তিই, আজ পর্যন্ত যে পৌত্তলিক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, সেই পৌত্তলিকতাকে যুক্তিপ্রদর্শনপূর্বক সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। এই বিষয়ে তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা তাঁহাদের আচরণ সমর্থন করিবার জন্য যুক্তিপূর্ণ বিচার পরিদর্শনের পরিবর্তে প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ তাঁহাদের পূর্বপুরুষের দোহাই দেওয়াই যথেষ্ট মনে করেন। এবং আমি একমাত্র নিত্যসত্য ঈশ্বরের পূজার জন্য পৌত্তলিকতাকে পরিহার করিয়াছি বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন।"...

"হিন্দু যে বেদসমূহকে বিশ্বসৃষ্টির সহিত সমকালীন বলিয়া বিশ্বাস করেন, হিন্দুর সমগ্র তত্ত্বশাস্ত্র, ব্যবহারিক ধর্মশাস্ত্র এবং সাহিত্য— সমুদায়ই সেই বেদসমূহের মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। এই বৈদিক গ্রন্থগুলি অতীব বৃহৎকায় এবং অতিশয় দুরূহ ও আলংকারিক বা রূপকাচ্ছন্ন রীতিতে লিখিত হওয়ায় তাহার ফলও সহজেই অনুমেয়— অনেক স্থলেই আপাত-বিভ্রমজনক এবং পরস্পরবিরোধী।"

"দুই সহস্র বৎসরেরও অধিককাল পূর্বে মহামতি বেদব্যাস এই সকল মৌলিক শাস্ত্রসমূহ হইতে নিরন্তর যে বৈষম্য বা বুদ্ধিব্যাঘাত উপস্থিত হইতেছিল তাহা চিন্তা করিয়া অতিশয় বিচারপূর্বক (উপাসনাকাণ্ড, কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত) সমগ্র বেদগ্রন্থরাজির একখানি পরিপূর্ণ অথচ সংক্ষিপ্তসার গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন এবং বেদের মধ্যে যে সকল স্থান আপাতবিরুদ্ধার্থক ছিল, তাহাদেরও সামঞ্জস্যময় মীমাংসা করিয়া দিয়াছিলেন।"

"বেদ এবং অন্ত— এই দুইটি সংস্কৃত শব্দের সমবায়ে তিনি তাঁহার গ্রন্থের নামকরণ করেন বেদান্ত— অর্থাৎ সমগ্র বেদসমূহের মীমাংসা, সন্দিগ্ধার্থ নিরসন। আজ পর্যন্ত (১৮১৬) এই গ্রন্থ (বেদান্ত) সমগ্র হিন্দুজাতির প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লাভ করিয়া আসিয়াছে এবং বেদসমূহের অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিকীর্ণার্থের পরিবর্তে এই গ্রন্থখানিই তাহাদের সমপ্রমাণরূপে আশ্রিত হইয়া থাকে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষারূপ অন্ধকারময় যবনিকার অন্তরালে ইহা লুক্কায়িত থাকায়, এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকেই এই গ্রন্থের ব্যাখ্যায়, এমনকী এতাদৃশ পুস্তকের স্পর্শের অধিকারী করিয়া রাখায়, এই বেদান্ত গ্রন্থ, যদিও ইহা নিরন্তর প্রমাণরূপে বিধৃত হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণের নিকট অল্পই পরিচিত, এবং বাস্তবিক অতিশয় অল্পসংখ্যক হিন্দুরই আচরণ ইহার উপদেশের কথঞ্চিৎ অনুযায়ী।..."

"...যাহা হউক, এ-বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, এবং আমিও সর্বান্তকবণে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে চাই যে, আমাদের (হিন্দুদের) পূজার প্রত্যেক অনুষ্ঠানটি এক অদ্বিতীয় সত্যদেবতার রূপকাবৃত বা লাক্ষণিক পূজাপদ্ধতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই তথ্যটির বিস্মৃতি ঘটিয়াছে এবং অনেকের নিকট এই বিষয়ের উল্লেখ পর্যন্ত নাস্তিকতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে।..."[৪৮]

'তুহ্ফাৎ-উল-মুয়াহ্হিদিন' (১৮০৩) এবং 'বেদান্তসার' (১৮১৫) রচনা দুটি সূত্রে রামমোহন রায়ের এবং তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের ধর্মভাবনার ছাঁদ ও অভিমুখীনতা ধরা পড়ে। ইসলামিক বিশ্বধর্ম এবং বেদান্ত-কথিত একেশ্বরবাদের ধারণা একই ভাববিন্দুতে এসে মিশে গেছে,— সেখানে মূর্তের পরিবর্তে বিমূর্ত, আচারের পরিবর্তে বিচার, বিশ্বাস ও ভক্তির পরিবর্তে যুক্তিরই ছিল প্রাধান্য। আর সেই ধর্মভাবনা থেকেই উদ্ভূত হয় ব্রাহ্মধর্ম; বাস্তবত, রামমোহন প্রবর্তিত এই ব্রাহ্মধর্ম উনিশ ও বিশ শতকের প্রথমার্ধের বাঙালিজীবনের সামাজিক বিন্যাসে ও সাংস্কৃতিক চর্চায় এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সে প্রসঙ্গ পরে, আপাতত আমরা বুদ্ধিমুক্তি চৈতন্যের বিস্তার— উনিশ শতকীয় নবজাগরণের মর্মবস্তুর দিকে বিহঙ্গ-দৃষ্টিতে তাকাব।

'বঙ্গের নবযুগপ্রবর্তক' বলে শিবনাথ শাস্ত্রী কর্তৃক অভিহিত হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-৩১) তাঁর ক্ষণস্থায়ী জীবনে বাংলার চিন্তনভূমিতে মুক্তবুদ্ধি ও আধুনিক

জীবনবোধের এক অভূতপূর্ব চর্চা ঘটিয়েছেন। তৎকালীন নবোদিত মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনে, বিশেষত তার নাগরিক ও প্রগত অংশ যখন রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের ও সনাতনপন্থী হিন্দুধর্মের আচার-সংস্কার-বিধান অনিঃশেষ তর্ক করছিল তখন দৃশ্যান্তরালে থেকে হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সামনে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের, আধুনিক চিন্তা-চেতনার ও জীবনচর্চার কথা শোনাতে থাকেন ডিরোজিও। সে এক বৈপ্লবিক শিক্ষকতা।

পোর্তুগিজ বংশজাত ফিরিঙ্গি হয়েও ডিরোজিও নিজেকে সদম্ভে একজন ভারতীয় বলে দাবি করেছেন। কবি ডিরোজিও 'To My Native Land' কবিতায় প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে লেখেন : "My Country! In Thy days of Glory Past/A beauteous halo circled round they brow/And worshipped as deity thou wast,/Where is that Glory, where that reverence Now?" মাত্র তেইশ বছরের জীবন, তার মধ্যেই ইতিহাস, দর্শন ও ইংরেজি সাহিত্যে অভাবনীয় ব্যুৎপত্তি, শিক্ষক হিসেবে অবিশ্বাস্য দক্ষতা এবং কবি হিসেবে সাফল্য লাভ কী করে সম্ভব হয়েছিল তা-ই বিস্ময়কর। নানা তথ্য থেকে জানা যায়, অ্যাডাম স্মিথ, বেন্থাম, বার্কলে, লক্, মিল, হিউম, রিড, স্টুয়ার্ট, ব্রাউনি প্রমুখ বিখ্যাত মনীষীদের রাজনৈতিক দর্শন তাঁর চর্চার বিষয় ছিল; তবে ধারণা হয়, টমাস পেইন-এ এবং ফরাসি বিপ্লব পর্বের চিন্তা-চেতনার অনুরণন তাঁর মধ্যে শৈশবেই তুলে থাকবেন তাঁর শিক্ষক যুক্তিবাদী ডেভিড ড্রমন্ড। "ড্রমন্ডের প্রতিভার একপ্রকার জ্যোতি ছিল যাহা তিনি বালকদিগের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিতেন এবং স্বীয় হৃদয়ের ভাব তাহাদের হৃদয়ে ঢালিয়া দিতে পারিতেন। তাঁহার সংস্রবে আসিয়া বালক ডিরোজিওর প্রতিভা ফুটিয়া উঠিল।"[৪৯]

ডাক্তার গ্রান্টের 'ইন্ডিয়া গেজেট' পত্রিকায় ডিরোজিওর কবিতা ও প্রবন্ধ প্রকাশ পেলে গুণিজনের দৃষ্টি তাঁর দিকে পড়ে। এই সময়ে তিনি কিছুদিন ভাগলপুরে বাস করেন। ভাগলপুরে অবস্থানকালেই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Fakir of Jhungeera'। আর এই কবিতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত ইংরেজ-সমাজে ডিরোজিওর কবি-খ্যাতি প্রচার পায়। ১৮২৮-এ কবিতার বই ছাপতে ডিরোজিও কলকাতায় আসেন; তখনই হিন্দু কলেজে একটি শিক্ষকের পদ খালি থাকায় ডিরোজিওকে সেই পদে নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষক ডিরোজিও তৎকালীন সমাজে কী আলোড়ন এনেছিলেন তা আমরা শিবনাথ শাস্ত্রীর পরিবেশিত তথ্য থেকে জানতে পারি :

> "ডিরোজিও চতুর্থ শ্রেণির সাহিত্য ও ইতিহাসের শিক্ষক হইলেন বটে, কিন্তু চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করে তেমনি তিনিও অপরাপর শ্রেণির বালকদিগকে আকৃষ্ট করিলেন। তিনি স্কুলে পদার্পণ করিবারমাত্র বালকগণ তাঁহার চারিদিকে ঘুরিত তিনি তাহাদের সহিত কথা কহিতে ভালোবাসিতেন। স্কুলের ছুটি হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ বসিয়া তাহাদিগের পাঠে সাহায্য করিতেন;

এবং নানা বিষয়ে তাহাদের সহিত কথোপকথন করিতেন। তাঁহার কথোপকথনের এই রীতি ছিল যে, তিনি এক পক্ষ অবলম্বন করিয়া বালকদিগকে অপরপক্ষ অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিতেন; এবং স্বাধীনভাবে তর্ক-বিতর্ক করিতে দিতেন। এই রূপে বালকগণের স্বাধীন চিন্তা-শক্তি বিকাশ হইতে লাগিল।...

'ডিরোজিও'র সংস্রবে আসিয়া হিন্দুকলেজের ছাত্রগণের মনে মহা বিপ্লব ঘটিতে লাগিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া 'একাডেমিক অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সভা স্থাপন করিলেন। তিনি তাহার সভাপতিত্ব করিতেন এবং তাঁহার শিষ্যদল প্রধন বক্তা হইত। এই সভা বঙ্গদেশের সামাজিক ইতিবৃত্তের একটি প্রধান ঘটনা।...

কলেজের বালকগণের মধ্যে যে নব অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল যে নবজীবনের সঞ্চয় হইল, তাহা নানা দিকে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ..ডিরোজিওর শিষ্যদল একত্র হইয়া 'Athenium' নামে (মতান্তরে 'পার্থেনন' নামে) এক মাসিক ইংরাজি পত্রিকা বাহির করিলেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল। এই পত্রে মাধবচন্দ্র মল্লিক নামে একজন ছাত্র লিখিলেন— 'If there is anything that we hate from the bottom of our heart, it is Hinduism'— যদি হৃদয়ের অন্তরস্থ তল হইতে কিছুকে ঘৃণা করি, তবে তাহা হিন্দুধর্ম।"[৫০]

ডিরোজিওর শিক্ষণ প্রণালী সম্বন্ধে যথার্থ বলেছেন শাস্ত্রী মহাশয়; তা ছিল কথোপকথন-মূলক,— ছাত্রদের মধ্যে বিতর্ক উসকে দিয়ে বিষয়ের গভীরে পৌঁছল। একপত্রে ডিরোজিও নিজেই বলেছেন : "আমি ছেলেদের শিক্ষার ভার লইয়া তাহাদের (ছাত্রদের) মন হইতে সঙ্কীর্ণতা ও গোঁড়ামি দূর করিতে তৎপর হইলাম। আমি এক একটি বিষয় লইয়া তাহার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কী কী যুক্তি থাকা সম্ভব তাহা বুঝাইয়া দিতাম। এ বিষয়ে মনীষী বেকনই আমার আদর্শ। মনে একটি সন্দেহের পরে সন্দেহের উদয় হইবে, ফলে সকল বিষয়েই অবিশ্বাস জন্মিবে।"[৫১] এই শিক্ষা পুঁথির শিক্ষা নয়, সত্যজিজ্ঞাসায় দীক্ষা। ও দীক্ষার মূলমন্ত্র 'Doubt everything'।

তবে শাস্ত্রীমহাশয়ের শেষোক্ত উক্তিটি— 'প্রচলিত হিন্দুধর্মকে আক্রমণ করা ইহার এক প্রধান কাজ ছিল'— কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিকর। 'পার্থেনন' পত্রিকার বিষয়সূচিটি এক্ষেত্রে লক্ষণীয় : স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা; ভারতকে ইউরোপীয় উপনিবেশে পরিণত করার চেষ্টার বিরোধিতা; আন্দোলনের বিচারকার্যে ব্যয়বাহুল্য কমানো; হিন্দুধর্মে প্রচলিত বিবিধ কুসংস্কার ইত্যাদি। সমগ্রকে না দেখে খণ্ড বিষয়কে বিচার্য করা, বিষয়ভাবনার কালিক তাৎপর্য উপেক্ষা করা, এমনকী তাদের রাজনৈতিক সচেতনতাকে পর্যন্ত উনগুরুত্বে দেখার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকে এক ধরনের fallacy বা হেত্বাভাস; আর সে-কারণেই তারুণ্যের স্বভাবজ দ্রোহে উচ্চারিত মাধবচন্দ্র

মল্লিকের নগণ্য উক্তিটিকে আদ্যতা দিয়ে ডিরোজিও ও তাঁর শিষ্যদলের সুবিচার হয়নি। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হয়, শাস্ত্রী মহাশয় আলোচনা করছিলেন তৎকালীন সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিবেশ নিয়ে,— সেই সূত্রেই এসেছে কীভাবে ডিরোজিওর প্রশ্রয়ে হিন্দু কলেজের একদল ছাত্র সুরাপান ও নিষিদ্ধ খাদ্যবস্তু আহারে অভ্যস্ত হয়েছিল সেই প্রসঙ্গটি। ডেভিড হেয়ার বা ডিরোজিওর মতন ধর্মবিরোধী শিক্ষাব্রতী ও মানবতাবাদী ব্যক্তিত্বের বাংলায় আবির্ভাব ঘটেছিল এমনই এক কালপর্বে যখন হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীরা তর্কাতর্কি আর তাদের উদারপন্থীরা চাইছে শুধু সংস্কার আর সংস্কার। ফলে 'ইয়ং বেঙ্গল'-দের ধর্মবিরোধিতা— প্রচলিত ধর্মতান্ত্রিকতাকে অস্বীকার ও তার ওপর তীব্র আঘাত হানায় যে সামাজিক অরাজকতা তৈরি হয় তাতে সমাজপতিরা স্বভাবতই শঙ্কিত হয়ে পড়েছিল।

ফলে 'পার্থেনন' পত্রিকার বিদ্রোহাত্মক প্রচারে কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়, এর পিছনে অশুভ শক্তির ছায়াও দেখতে পায়। কর্তৃপক্ষ তাই অবিলম্বে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ করে দিল। 'স্বাধীন চিন্তা'র ওপর বিধিনিষেধ আরোপের উনিশ শতকীয় এই দৃষ্টান্তটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ; কারণ শিক্ষাক্ষেত্রেও যে সমান্তরাল এক হেসিমনি ক্রিয়াশীল তা সংস্কৃত কলেজ, হিন্দু কলেজ বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে বারবার দেখা গেছে। সে অন্য প্রসঙ্গ। হিন্দু কলেজের 'হেড মাস্টার' বা কয়েকজন শিক্ষক মাত্রই ডিরোজিওর মতো অতি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের প্রতিকল্পে ম্লান নিরবলম্ব বোধ করেননি আর সে-কারণেই তাঁর অপাসারণের উদ্যোগ নেননি, বস্তুত তাঁর ধর্মবিরোধিতাকে সেদিনের বঙ্গীয় সমাজ কোনওভাবেই মেনে নিতে পারছিল না। আর এই সূত্রেই এসে পড়ে মহামতি ডেভিড হেয়ার (১৭৭৫-১৮৪২) আর ডিরোজিওর পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাপার ডা: অমলেন্দু দে জানান : "হেয়ার ডিরোজিওর প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। দুজনের চিন্তাধারায় অনেক মিল ছিল। তাই তাঁরা পরস্পরের এত নিকটে ছিলেন। আর এই কারণেই হিন্দু কলেজের হেডমাস্টার হেয়ারকে 'a vile sycophant' (of Derozio) বলে গালাগালি দেন।"[৫২] আর সেখানেই থেমে থাকেননি হেডমাস্টার বা ডিরোজিওর প্রতিপক্ষ, তাঁকে পদত্যাগেও বাধ্য করা হয়।

কবি ডিরোজিওর এই মুক্তবুদ্ধি মানসগঠনে অনুমান হয় যে, টমাস পেইন-এর 'অধিকার' (right) ও 'বিচার (reason)-এর শর্তদ্বয় এবং ফরাসি-বিপ্লবের আদর্শনৈতিক ধারণাসমূহ যথেষ্ট প্রভাব ফেলেছিল। কিন্তু ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার-এর মানসগঠন— বাংলায় শিক্ষা ও মানবসেবায় আত্মোৎসর্গ কিংবা ন্যায় ও আদর্শের পক্ষে অবিচল থাকার প্রেরণা ও শিক্ষা এই মহান স্কচ ভদ্রলোক কী করে আয়ত্ত করেছিলেন তা জানা যায়নি।

সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠায় গোঁড়া হিন্দুদের অবদান বেশি থাকলেও তার পাঠ্যতালিকা নির্ধারণে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসৃত হতে দেখে ধারণা হয় সেখানে ডেভিড হেয়ার-এর উদ্যোগ ছিল। উনিশ শতকের নবজাগরণে ডেভিড হেয়ার-এর অবদান অক্ষয়কুমার দত্তের বয়ানে এরকম :

"এইক্ষণে আমরা যে কিছু জ্ঞান উপার্জন করিতেছি, সে কেবল তাঁহারই প্রসাদাৎ। তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা সৃষ্টির নিয়ম সকল জ্ঞাত হইতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ সূর্য নক্ষত্রাদির স্বভাব জানিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ গ্রহ-চন্দ্র-ধূমকেতুর দূর, পরিমাণ এবং গতিবিধি সকল শিক্ষা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ পৃথিবীস্থ স্বদেশ বিদেশাদি সমূহ স্থানের বৃত্তান্ত আলোচনা করিতেছি, তাঁহার প্রসাদাৎ আমরা আপনাদিগের শরীরের নিয়ম, মনের স্বভাব, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি নানা বিদ্যালাভ করিতেছি, অধিক কি কহিব, তাঁহার, প্রসাদাৎ আমরা এক নূতন প্রকার জ্ঞান-ভূমিতে আরোহণ করিয়াছি।... তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্র গুণ— কোটি গুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টার দ্বারা আমরা— জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারী, তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।"[৫৩]

ডেভিড হেয়ার স্বম্বন্ধে, শিক্ষা ও সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের এমতো উল্লেখে অক্ষয়কুমার দত্তের অভিভাষণে বিন্দুমাত্র অতিকথন নেই। সেই যুগে এক ভিনদেশি মানুষ কলকাতায় এসে বাঙালিদের সঙ্গে মিশে গেলেন, বাঙালিজাতির সার্বিক কল্যাণচিন্তায় নিজের দোকানপাট সব বিক্রি করে দিয়ে হিন্দু কলেজ স্থাপনে, স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সক্রিয় ভূমিকা নিলেন। সে-কারণেই সম্ভবত প্রচণ্ড বর্ষণ সত্ত্বেও তাঁর প্রয়াণের দিন শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পাঁচ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল কলেজ স্কোয়ারে। কোনও গোরস্তানে নয়, এখানেই শায়িত রয়েছেন তিনি,— 'তাই ছাত্রপল্লী মাঝে বিরাজিছ তুমি, ছাত্রের দেবতা।'

ডেভিড হেয়ার যখন মারা যান (১ জুন, ১৮৪২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) তখন বাইশ বছরের যুবক। সবে তাঁর ছাত্রজীবন শেষ হয়েছে,— ডেভিড হেয়ারের প্রয়াণ উপলক্ষে আয়োজিত প্রায় প্রতিটি স্মরণসভায় বিদ্যাসাগর সবান্ধব উপস্থিত থেকেছেন। ধারণা হয়, মহান এই শিক্ষাব্রতী ও মানবদরদি ভিনদেশি বাংলাপ্রেমিক মানুষটির প্রতি বিদ্যাসাগরের তরুণমনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

সে সময়ে সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ একই গৃহে অবস্থিত ছিল বলে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ঈশ্বরচন্দ্র হিন্দু কলেজের অনেক ছাত্রের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন। বিশেষত 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর দাপুটে স্বভাবের এবং অতি মেধাবী কিছু ছাত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল; সেই দলে ছিলেন কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র, শিবচন্দ্র দেব, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, উমেশ বসু প্রমুখ উজ্জ্বল তারকারা। এঁরা সকলেই ছিলেন ডিরোজিওর ছাত্র, গুণগ্রাহী ও অনুগামী। পরবর্তীকালে এই গোষ্ঠীটিই 'ইয়ং বেঙ্গল' নামে পরিচিত হয়েছে।

এঁদের অনেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবনেই ডিরোজিওর চিন্তাধারার সঙ্গে পরোক্ষভাবে পরিচিত হয়েছিলেন। কিন্তু সেই পরিচয় ঈশ্বরচন্দ্রের মনে কোনও কৌতূহল জাগায়নি,— ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর জীবনধারা তাঁদের উচ্ছৃঙ্খলতা ও অস্মিতাবোধ তাঁকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেনি। বরং যে দীর্ঘকায় ঋজু ভিনদেশি মানুষটিকে কলেজস্ট্রিট পাড়ায় দূর থেকে হাঁটতে চলতে দেখেছেন, দেখেছেন বাঙালি মস্তানদের শিক্ষার উৎকর্ষে সর্বস্ব উজাড় করে দিয়ে নিঃস্ব অবস্থায় দিনযাপন করতে, বাধ্য হয়ে চাকরি নিতে অথচ কোনও ধনী বাঙালি বন্ধু বা স্বজাতির সাহায্য প্রত্যাখ্যান করতে, সেই মহামতি ডেভিড হেয়ারকেই হয়তো মনে মনে আদর্শ করে নিয়েছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

যাঁর জ্যোতির্ময় আলোকে উনিশ শতকের বাঙালিজীবন প্রদীপ্ত হয়েছে, যে মহাপ্রাণকে নিয়ে বাঙালির গৌরববোধের শেষ নেই, দয়ার সাগর বলে কথিত যে ব্যক্তিকে নিয়ে বাঙালি গল্পকথা রচনা করে সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'দয়া নহে, ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। শিক্ষাব্রতী ঈশ্বরচন্দ্র,— তাঁর শিক্ষা ও শিক্ষণ সংক্রান্ত ভাবনা-চিন্তা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদে বৃত হয়ে শিক্ষা-সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে যে উদ্যোগসমূহ তিনি নিয়েছিলেন তার মধ্য দিয়ে : বিরতির দিন পরিবর্তন, মাসিক মাইনে প্রবর্তন, পাঠক্রম-সংস্কার, জটিল ব্যাকরণ গ্রন্থ মুগ্ধবোধের পরিবর্তে স্বরচিত সহজবোধ্য, নতুন ব্যাকরণ সৃষ্টি, গণিতে ইংরেজি ব্যবহার, দর্শনে পাশ্চাত্য যুক্তিবিদ্যা বা লজিক পাঠ্য নির্বাচন, সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রবেশাধিকার ইত্যাদি। স্ত্রী-শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল বিপুল; সরকার তাঁকে স্কুল ইন্‌স্পেক্টর পদে উন্নীত করলে তিনি গ্রাম-গ্রামান্তরে ৬ মাসে বিশটি স্কুল স্থাপন করেন এবং এইসব স্কুলের শিক্ষকদের শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার জন্য নিজের তত্ত্বাবধানে 'নর্ম্যাল স্কুল' প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার পরিচালনায় ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। এক্ষেত্রে স্মর্তব্য, স্ত্রী-শিক্ষার সেই প্রথমপর্বে বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলির ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০০; বেথুন স্থাপিত স্কুলেরও সেক্রেটারি ছিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়।

স্কুল বিভাগে সর্বস্তরে শিক্ষার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বহু গ্রন্থ লিখেছেন যেমন 'বোধোদয়', 'বর্ণ পরিচয়', 'কথামালা', 'চরিতাবলী', 'ঋজুপাঠ' ইত্যাদি। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, শিক্ষার্থীদের জ্ঞান বোধ ও চেতনার বিকাশক্রমের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পাঠক্রম নির্ধারণ, আখ্যান, রচনা, শিক্ষণ-প্রণালী নির্দেশ ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবস্থা একক প্রচেষ্টায় করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র মহাশয়। আবার তিনিই বুঝেছেন যে, স্কুল পাঠক্রমেই ছাত্রছাত্রীদের মানস সম্পূর্ণ গঠিত হয় না; তাই তিনি অনেকগুলি সহায়ক গ্রন্থ রচনা করেন,— 'শকুন্তলা', 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'সীতার বনবাস', ইত্যাদি। আর এইসব গ্রন্থ রচনার জন্য তিনি বাংলা গদ্যভাষাকে তৎকালীন সংস্কৃতবাহুল্য থেকে মুক্ত করে স্বচ্ছন্দ গতিময় করেন। আর

সাহিত্য-সাধক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ধ্রুপদী সাহিত্য থেকে নির্বাচিত গ্রন্থাদি অনুবাদ ও সম্পাদনা করে উত্তরসূরিদের জন্য রেখে গেছেন,— যেমন, 'রঘুবংশ', 'কুমারসম্ভব', 'মেঘদূত' 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম', 'কাদম্বরী' ইত্যাদি।

সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর, পরোপকারী, গরিব মানুষের সহায় বিদ্যাসাগরকে ঘিরে কত না কিংবদন্তি—। বস্তুত, তৎকালীন যে কোনও সামাজিক ঘটনাক্রমেই তাঁর একটা ইতিমূলক ভূমিকা থাকত, তবে বিধবা বিবাহ আইন পাশে তাঁর অবিচল শ্রম ও প্রচার তাঁকে সাধারণ মানুষের কাছে পরিচিত করে। তিনি নিজেই এক চিঠিতে স্বীকার করেছেন : 'বিধবাবিবাহ প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই।'[৫৪] এই চিঠির উপলক্ষ ছিল তাঁর পুত্র নারায়ণচন্দ্রের এক বালবিধবার পাণিগ্রহণ। তবে এরপরেও তিনি অনেক 'সৎকর্ম' করেছেন, তার মধ্যে প্রথম হল 'হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফান্ড' প্রতিষ্ঠা। উপার্জনক্ষম সাধারণ গৃহস্থের মৃত্যুতে তার পরিবার নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়ে,— এই অভিজ্ঞতা থেকে প্রাক্-সঞ্চয়ের এক পদ্ধতি প্রবর্তন করতে চাইলেন। সেই কাজে অবশ্য বেশিদিন থাকেননি তিনি।

আবার বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের সময় থেকেই বহুবিবাহ নিরোধকল্পে দেশে আর একটি আন্দোলন যখন দেখা দেয় তারও নেতৃত্ব দিয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র। তার সাফল্য তিনি দেখে যাননি ঠিকই তবে জনগণের মধ্যে চেতনা সঞ্চার করে যেতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গে যোগেশচন্দ্র বাগল লিখেছেন : "...দেশের মধ্যে চেতনা সঞ্চারের জন্য যেমন পূর্ববর্তী আন্দোলন উপলক্ষে বিদ্যাসাগর 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (জানুয়ারি ও অক্টোবর, ১৮৫৫ খ্রি.) রচনা করেন এই নূতন আন্দোলনের জন্যও তেমনই তিনি দুই খণ্ডে 'বহু-বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয় প্রস্তাব' (আগস্ট, ১৮৭১ ও এপ্রিল, ১৮৭৩ খ্রি.) প্রকাশ করিলেন। পণ্ডিতমহল এইসব গ্রন্থকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করিলে বিদ্যাসাগর 'কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য' ছদ্মনামে 'অতি অল্প হইল' (সে ১৮৭৩ খ্রি.) এবং 'আবার অতি অল্প হইল' (সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খ্রি.) নামে বিদ্রূপ কৌতূক পরিপূর্ণ দুইখানি প্রতি-আক্রমণ রচনা করিয়াছিলেন।"[৫৫]

উনিশ শতকের বঙ্গীয় সমাজজীবনের এরকম নানা দ্বন্দ্বের,— উদারপন্থা ও সনাতনপন্থার, ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের, ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উদ্ধত ও সমাজপতিদের হা-হুতাশের দৃষ্টান্ত রয়েছে এসময়ের রচনাসম্ভারে, ইতিহাসে। সে যে কী ভয়ানক আলোড়ন, চাপান উতোর তা চমৎকার এঁকেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে,— তাঁর দানশীলতা, সামাজিক কর্মতৎপরতা, শিক্ষাবিস্তারে ও সাহিত্যসাধনায় অবিচল নিষ্ঠা বিষয়ে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাশীল মধুসূদন লেখেন : 'The genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.'

"অন্য এক ধারায় বা সব ধারা ভেঙে উনিশ শতকের মধ্যগগনে প্রদীপ্ত হলেন মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩)। তাঁর জীবনটাই যেন এক বিরোধালঙ্কার : উচ্ছৃঙ্খল যাপন আর সংহত সৃষ্টিশীলতা, প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর মেদুর স্বদেশকাতরতা, মহাকাব্যিক উদ্ভাসন আর ভক্তিরসের সিঞ্চন,— এক দুর্লভ প্রহেলিকা চরিত্র!"[৩৬] উনিশ শতকের বাংলায় সবে যখন মুক্তবুদ্ধি চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটছে,— রামমোহন রায়, ডেভিড হেয়ার, রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিও, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ জ্যোতিষ্কের আবির্ভাবে বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনের পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিক্ষার আলোকের উদ্ভাসন ঘটছে তখন মধুসূদনের কাব্যভাবনার স্ফূর্তি; আর তা এমনই বিচিত্র ও ঋদ্ধ যে তার রসাস্বাদনের অভিজ্ঞতা বাঙালি পাঠককে বিমূঢ় করল। হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ, আবার তিনিই লেখেন 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' : 'নাচিছে কদম্বমূল,/বাজায়ে মুরলী, রে,/রাধিকারমণ!/চল, সখি, ত্বরা করি,/দেখি সে প্রাণের হরি,/ব্রজের রতন!" আর তার অমিত্রাক্ষর ছন্দ, পৌরাণিক প্রচল মিথ ভাঙা, বিশ্ব সাহিত্যের ভাববস্তু ও শিল্পপ্রকরণকে বাংলা সাহিত্য প্রবর্তন ইত্যাদি বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড তো ছিলই। এই প্রহেলিকা চরিত্রটিই নৈর্ব্যক্তিক ও নির্মোহ ভঙ্গিতে ইয়ং বেঙ্গল ও তাদের অনুসারীদের কার্যকলাপ, চিন্তাচেতনার নৈরাজ্য এবং তৎকালীন সামাজিক জীবনকে তুলে ধরেছেন তাঁর একটি প্রহসনে। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনের একটি দৃশ্য :

> "নব জেন্টেলম্যেন, এই সভার নাম জ্ঞানতরঙ্গিনী সভা, আমরা সকলে এর মেম্বর— আমরা এখানে মিট করে যাতে জ্ঞান জন্মে তাই করে থাকি— অ্যান্ড উই আর জলি গুড ফেলোজ্।
>
> সকলে। হিয়ার, হিয়ার। উই আর জলি গুড ফেলোজ।
>
> নব। জেন্টেলম্যেন, আমাদের সকলের হিন্দুকুলে জন্ম, কিন্তু আমরা বিদ্যাবলে সুপারস্টিশনের শিকলি কেটে ফ্রি হয়েছি; আমরা পুত্তলিকা দেখে হাঁটু নোয়াতে আর স্বীকার করি যে, জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েচে; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোশিয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।
>
> সকলে। হিয়ার, হিয়ার।
>
> নব। জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এডুকেট কর— তাদের স্বাধীনতা দেও— জাতভেদ তফাত কর আর বিধবাদের বিবাহ দেও— তা হল, এবং কেবল তা হলেই আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলন্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে নচেৎ নয়।
>
> সকলে। হিয়ার, হিয়ার।

নব। কিন্তু জেন্টেলম্যেন, এখন এদেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান; এখানে যার যে খুশি সে তাই কর। জেন্টেলম্যেন, ইন দি নেম্ অব ফ্রিডম, লেট অস এনজয় আওরসেল্ভস্। (উপবেশন)

সকলে। হিয়ার, হিয়ার— হিপ, হিপ, হুরে, হু-রে; লিবরটি হল— বি ফ্রি-লেট অস এনজয় আওরসেলভস্।

নব। ওরে বলাই, একবার সকলকে দেও না।

বলাই। আচ্ছা,— এই এসো (সকলের মদ্যপান)।"[৫৬]

এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ইয়ং বেঙ্গলের অনাচারের শুধু সমালোচনা মাত্র নয় তাঁদের ঐতিহ্য-বিস্মৃতি এবং পরস্ব সাংস্কৃতিক বোধের মিছা-অভিমান, সামাজিক সচেতনতার অভাবকে কটাক্ষ করেছেন মধুসূদন; হয়তো এই সমালোচনায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে আত্মধিক্কারও। উনিশ শতকের নাগরিক জীবন ও তথাকথিত 'প্রোজ্জ্বল' মননচর্চার বিপরীত তামস দিকটিই তুলে ধরেছেন মধুসূদন।

প্রসঙ্গত, ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহের পাশাপাশি সামাজিক ব্যাধি নিরাময়ের ক্ষেত্রে 'সমাচার দর্পণ' ও 'জ্ঞানান্বেষণ' পত্রিকা দুটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বস্তুত ইয়ং বেঙ্গলের উন্মাদনার দিনে (১৮৩১-৪৩) ধর্ম-সংস্কার-ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের সংঘাত, হিন্দুধর্মের পৌত্তলিকতা বা প্রচলিত কুসংস্কারগুলির প্রতি তাদের কটাক্ষ, আইনি ব্যবস্থায় সে-সকল দূরীকরণে প্রচ্ছন্ন মদত ইত্যাদি অপেক্ষা সমাজ-সংস্কারই সকলের বেশি মনোযোগ ছিল। আব ইয়ং বেঙ্গল শুধু দু-একটি কুসংস্কার দূর করতে বা বহু-বিবাহ রোধ করতে চায়নি, তাঁরা চেয়েছিল স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে 'মানুষের অধিকার'; বাস্তবত, ওরকম তেজে আর কেউ এদেশে তা দাবি করেছিল কিনা সন্দেহ। গোপাল হালদার লিখেছেন :

"বলা বাহুল্য, 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় শুধু সংস্কারে তৃপ্ত হবার মতো লোক ছিলেন না। তাঁরা বিদ্রোহী টম পেন-পড়া যুবক। প্যারীচাঁদ মিত্র, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ীর মতো স্থিরচিত্ত ধীরনামী সংস্কারক তাঁরা সকলে নন। বিদ্যাসাগর-অক্ষয়কুমারের মতো আত্মস্থ পুরুষও তাঁরা হতে পারেননি। শুধু ধর্ম ও সমাজের বিধি-নিয়ম কেন, তাঁরা প্রাচীন ও মধ্যযুগের সমস্ত নীতিবোধ ও মূল্যবোধকে উড়িয়ে দিয়ে, তার স্থলে Age of Reason ও Rights of Man প্রতিষ্ঠা করবার জন্য অধীর হয়ে উঠেছিলেন। এই দুঃসাহসের সেদিন প্রয়োজন ছিল।"[৫৭]

উনিশ শতকীয় নবজাগরণের উদ্ভাসন তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক আয়তি,— মননচর্চা ও সৃষ্টিশীলতার অভিপ্রকাশ আর কয়েকটি চরিত্র-বিম্বে দেখতে পাই আমরা। ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) এক স্বশিক্ষিত বিরল প্রতিভা, বাল্যে পিতৃবিয়োগে পড়াশুনা ছাড়তে বাধ্য হলেও সারা জীবনই বিদ্যাচর্চা করে গেছেন এবং বিবিধ বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেছেন, ফরাসি, জার্মানি প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। কৈশোরেই সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় ব্যুৎপত্তি এবং হিন্দুশাস্ত্রে বিশেষ শিক্ষা লাভ করেন। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালার শিক্ষকতা, 'বিদ্যাদর্শন' মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা এবং পরে তাঁরই সম্পাদনায় পেতে থাকে তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা। অক্ষয়কুমারের সুচারু সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী' হয়ে ওঠে শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িকপত্র। কী না থাকত পত্রিকাটিতে! তত্ত্ববিদ্যা, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, বিজ্ঞান, ভূগোল প্রভৃতি নানা বিষয়ে যেমন সারগর্ভ প্রবন্ধ থাকত তেমনি থাকত স্ত্রী-শিক্ষার প্রসার ও হিন্দু বিধবাদের সমর্থনে এবং বাল্যবিবাহ ও বিবিধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ লেখা। নীলকর সাহেব ও জমিদারদের প্রজাপীড়নের বিরুদ্ধে অক্ষয়কুমার এই পত্রিকায় নির্ভীক লেখনী চালনা করেছেন।

বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী অক্ষয়কুমার দত্ত বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করতেন না, এবং তাঁরই আন্দোলনের ফলে দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্রের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস বর্জন করেন। তাছাড়া ব্রাহ্মসমাজে সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে বাংলা ভাষায় ঈশ্বর উপাসনারও অন্যতম প্রবর্তক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত।

অক্ষয়কুমারের শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'ভারতবর্ষীয়, উপাসক-সম্প্রদায়' (১ম ভাগ ১৮৭০, ২য় ভাগ ১৮৮৩) গ্রন্থ রচনা; এই গ্রন্থের সুদীর্ঘ উপক্রমণিকায় আর্যভাষা ও সাহিত্যের প্রধান শাখা-তিনটি (ইন্দো-ইউরোপীয়, ইন্দো-ইরানীয় এবং বৈদিক ও সংস্কৃত) সম্বন্ধে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে আলোচনাটি করেছেন সেরকম কোনও আলোচনা এর আগে কোনও ভারতবাসী ভাষাবিজ্ঞান নিয়ে করেননি। জর্জ কুম্ব-এর 'Constitution of Man' অবলম্বনে রচিত 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ ১৮৫৩), 'ধর্মনীতি' (১৮৫৫) এবং প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য-বিস্তার' (মরণোত্তর, ১৯০১), 'চারুপাঠ' (১ম ভাগ ১৮৫২, ২য় ভাগ ১৮৫৪, ৩য় ভাগ ১৮৫৯), 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬) প্রভৃতি গ্রন্থে অক্ষয়কুমারের বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মানসগঠনের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ রচনাকালে অক্ষয়কুমার অসংখ্য পরিভাষা তৈরি করে নিয়েছিলেন।

অক্ষয়কুমারের স্বাদেশিকতার বৈশিষ্ট্য হল, তিনি চেয়েছিলেন মাতৃভূমি থেকে যাবতীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারকে দূর করে বৈজ্ঞানিক চেতনার বিস্তার। তাঁর মধ্যে উক্ত ছিল বাঙালি জাতীয়তাবোধের অঙ্কুর,— জাতীয় ভাষা, জাতীয় ধর্ম ও জাতীয় সংস্কৃতির বিকাশের আকাঙ্ক্ষা আবার তা ভাবোচ্ছ্বাস মাত্র থাকেনি, তাকে রূপ দিতেই তাঁর সাংবাদিকতা, গ্রন্থ রচনা, তত্ত্ববোধিনী সভায় সন্দর্ভ পাঠ।

আর এক ক্ষণপ্রভা জ্যোতিষ্ক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮২৪-৬১)। স্বশিক্ষিত হরিশ্চন্দ্র চাকরি করতে করতে নিজ অধ্যবসয়ে ইতিহাস, রাজনীতি, আইন ও ইংরেজিতে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা হরিশ্চন্দ্রের প্রথম সাংবাদিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ 'হিন্দু ইন্টালিজেন্সার' ও 'দি বেঙ্গল রেকর্ডার' পত্রিকায়; এবং ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার শুরু থেকেই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তিনি। আর সেখানেই তাঁর প্রতিভা স্ফুরিত হয়; সিপাহি বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ সরকার ও বিদ্রোহী উভয় পক্ষের সমালোচনা করে তিনি লেখেন : '...The time is nearly come when all Indian questions must be solved by Indians. The mutinies have made patent to the English public what must be the effects of politics in which native is allowed to voice.' ১৮৫৫ খ্রি: 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট' পত্রিকার কর্তৃত্ব ও সম্পাদনা আসে হরিশ্চন্দ্রের হাতে। এসময়ে গ্রামবাংলার গরিব চাষিদের ওপর নীলকর সাহেবদের বীভৎস অত্যাচারের ঘটনাবলি নির্ভীকভাবে হরিশ্চন্দ্র তুলে ধরতে থাকেন হিন্দু প্যাট্রিয়ট-এর পাতায়। বাংলার শিক্ষিতজনরা তার ফলে আলোড়িত হয়। আবার হরিশ্চন্দ্র নিজ ব্যয়ে দরিদ্র চাষিদের পক্ষে বহু মামলাও চালান। বাস্তবত, এসময়ে তাঁর ভবানীপুরের গৃহ নীলচাষিদের মুক্তির একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে ওঠে। ১৮৬০ খ্রি: নীল কমিশনের সম্মুখে তাঁর সাক্ষ্যে নীলকরদের অত্যাচার সাক্ষ্য-প্রমাণসহ উপস্থাপিত করেন। হরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পর প্রজাদের একটি গানে তাঁর অবদান বাঙ্ময় হয়েছে : 'অসময়ে হরিশ ম'ল লঙের হল কারাগার। চাষির এবার প্রাণ বাঁচানো ভার।'

উল্লিখিত রেভারেন্ড জেমস লঙ (১৮১৪-৮৭) চরিত্রটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়; পাদপ্রদীপের আলোয় না এলেও সাজঘরে তাঁর উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। লঙ বাংলায় এসেছিলেন খ্রিস্টধর্ম প্রচারে, তারপর প্রাচ্য সংস্কৃতির প্রবল টানে শ্যামল বাংলার জীবনধারা ও জায়মান চেতনার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন আষ্টেপৃষ্ঠে। অনুমান করা যায়, অত্যাচারিত নীলচাষিদের পক্ষে 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট'-এর প্রচার তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠী দীনবন্ধু মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বের সঙ্গে মিলে নীলচাষিদের পক্ষে দাঁড়ানো, 'আঘাতের পূর্বে কোনো' পুস্তিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে লঙের মানস পরিবর্তন ঘটে। সম্ভবত লঙ স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই 'নীলদর্পণ'-এর মধুসূদনকৃত ইংরেজি অনুবাদ স্বনামে প্রকাশের দায়িত্ব বহন করেছিলেন আর তার ফলও ভোগ করতে হল তাঁকে,— সুপ্রিম কোর্টের বিচারে তাঁর এক মাসের কারাবাস ও এক হাজার টাকা জরিমানা হয়। জরিমানার অঙ্কটি তৎকালীন মূল্যে বিপুল; তৎসত্ত্বেও কালীপ্রসন্ন সিংহ রায় ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার টাকা দাখিল করেন। জনজীবনে এ ঘটনা প্রবল আলোড়ন তোলে। আর লঙের সেই কারাবাসকালেই হরিশচন্দ্রের প্রয়াণ ঘটে। তাছাড়া লঙের মূল্যবান কাজ হল 'পুরাতন কলিকাতা', 'অপ্রকাশিত সরকারি বিবরণ', 'প্রাচ্য প্রবচন' ইত্যাদি গ্রন্থ প্রণয়ন।

বাড়ি-পালানো বালক গন্ধর্বনারায়ণই বহু বাধা পেরিয়ে একদিন দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-৭৩) নামে উনিশ শতকের বাংলার সাহিত্যাকাশে দীপ্যমান হয়েছেন। জেমস লঙ-ই তাঁর নাম দিয়েছিলেন দীনবন্ধু, লঙের অবৈতনিক স্কুলেই তখন পড়ছিলেন তিনি। পরে হেয়ার স্কুল থেকে বৃত্তি নিয়ে পাশ করে পড়েন হিন্দু কলেজে। সেখানে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। কিন্তু স্নাতক হবার পূর্বেই পোস্ট মাস্টারের চাকরি নিয়ে চলে যান পাটনায়। কর্মক্ষেত্রেও যথেষ্ট যোগ্যতা প্রদর্শন করেন দীনবন্ধু : এবং তাব স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিও প্রদান করা হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকা দুটিতে গদ্য-পদ্য রচনার মধ্য দিয়ে সাহিত্যজগতে আত্মপ্রকাশ ঘটে দীনবন্ধুর। তাঁর 'সুরধুনী কাব্য' ১ম ভাগ (১৮৭১) ও ২য় ভাগ (১৮৭৬) হিমালয় থেকে গঙ্গার সাগরসঙ্গমে যাত্রার ছন্দোবদ্ধ বর্ণনা। উত্তর ভারতের বিভিন্ন জনপদ, বাংলাদেশ ও সমকালীন কলকাতার বিশিষ্ট স্থান ও স্মরণীয় মনীষীদের চমৎকার বর্ণনা রয়েছে এই কাব্যে। তবে দেবীপদ ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে : "নাট্যকাররূপেই দীনবন্ধু সমধিক খ্যাত। তাঁহার 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) 'কস্যচিৎ পথিকস্য' ছদ্মনামে প্রকাশিত হইয়া নীলকরদের বিরুদ্ধে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। মাইকেল মধুসূদন ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া গোপনে তিরস্কৃত হন, পাদ্রী লঙ সাহেব ইহা প্রকাশ করিয়া অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং অপদস্থ হন। বঙ্কিম ইহাকে 'আংকল টমস্ কেবিন'-এর সহিত তুলনা করিয়াছেন। বাঙালির জাতীয় রাজনৈতিক চেতনার উপর এই নাটকের প্রভাব অসামান্য। বাংলার কৃষকদের বিদ্রোহ ও গণ-অভ্যুত্থানকে নাটকে রূপায়িত করার যে ধারা দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ'-এ প্রবর্তিত করিলেন, বিংশ শতাব্দীতে তাহা বহু নাট্যকার কর্তৃক অনুসৃত হইয়াছে।[৫৮] বস্তুত, 'নীলদর্পণ'-এ গ্রামবাংলার আর্তস্বরই শুধু উঠে আসেনি, নীলকরদের উৎপীড়ক ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রাগ্রসর মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিবাদও উচ্চারিত হয়েছে; পরিশেষে তা ঋদ্ধ করেছে জাতীয় চেতনা।

আর এক ক্ষণপ্রভা জ্যোতিষ্ক কালীপ্রসন্ন সিংহ (১৮৪০-৭০) তাঁর মাত্র তিরিশ বছরের জীবনে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি কবেছেন। হিন্দু কলেজে ভর্তি হয়েও সেখানে পড়াশুনা করলেন না, তাঁর শিক্ষালাভ হয়েছে গৃহে, ইংরেজ গৃহশিক্ষক ও সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে। এই জমিদার-পুত্রটির মেধার স্ফুরণ ঘটেছিল অতি অল্প বয়সে,— মাত্র তেরো বছরের বালক কালীপ্রসন্ন বাড়িতে প্রতিষ্ঠা করেন 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (১৮৫৫) প্রকাশ পায়, 'বিদ্যোৎসাহিনী রঙ্গমঞ্চ' (১৮৫৬) স্থাপিত হয়। এই রঙ্গমঞ্চেই তাঁর লেখা 'বিক্রমোর্ব্বশী' ও 'সাবিত্রী সত্যবান' নাটক দুটি অভিনীত হয। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য প্রকাশিত হলে কালীপ্রসন্নর উদ্যোগে 'বিদ্যোৎসাহিনী সভা'র পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'নীলদর্পণ' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রচারের কারণে রেভারেন্ড জেমস লঙের

একমাস জেল এক হাজার টাকা জরিমানা হলে আদালতেই জরিমানার টাকাটা দিয়ে দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ। তাছাড়া লঙের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকালে বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষে কালীপ্রসন্নই তাঁকে অভিনন্দনপত্র দিয়ে সংবর্ধনা জানান। হিন্দু কলেজের খ্যাতনামা শিক্ষক ডি.এল. রিচার্ডসন-এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে যে সংবর্ধনা ও অর্থ প্রদান করা হয় তাতেও কালীপ্রসন্ন অগ্রণী ভূমিকা নেন। বস্তুত, তৎকালীন প্রতিটি সামাজিক সাংস্কৃতিক কাজে তিনি সবার আগে এগিয়ে এসেছেন— আর্থিক দায়িত্ব বহন করেছেন। বিদ্যাসাগর প্রবর্তিত বিধবা-বিবাহকে জনপ্রিয় করা, বহু-বিবাহ রোধ করা, বারবণিতা স্থানান্তরীকরণ ইত্যাদি আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং 'জাস্টিস অফ দি পিস' রূপে কালীপ্রসন্নের দক্ষতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে তাঁর সংকলিত 'দি ক্যালকাটা পোলিস অ্যাক্ট' (১৮৬৬) বইটি উল্লেখযোগ্য।

তবে কালীপ্রসন্ন সবিশেষ খ্যাত তাঁর বিদ্যাচর্চা ও সাহিত্যকর্মের জন্য। তাঁর রচিত নাটক 'বাবু' (১৮৫৪), 'বিক্রমোর্ব্বশী' (১৮৫৭), 'সাবিত্রী সত্যবান' (১৮৫৮), 'মালতী মাধব' (১৮৫৯); তাঁর সর্বাধিক আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' (১ম ভাগ ১৮৬২; দুভাগ একত্রে ১৮৬৪)। এ ছাড়া কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের সহযোগে 'পুরাণসংগ্রহ' (১৮৬০-৬৬) নামক সতেরো খণ্ডে সমাপ্ত মহাভারতের অনুবাদ তিনি নিজ ব্যয়ে ছেপে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। এ-কাজে তাঁকে উৎসাহিত করেছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং সহযোগিতা করেছেন হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য। রামায়ণ অনুবাদ করার পরিকল্পনাও তাঁর ছিল। তাঁর বিদ্যাচর্চার পরিধি এবং মননশীলতার গভীরতা ধরা পড়ে তাঁর রচনায় ও সম্পাদনায় : বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা (১৮৫৫, মাসিক), বিবিধার্থ-সংগ্রহ (১৭৮৩ শকাব্দের বৈশাখ থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত কালীপ্রসন্ন সম্পাদনা করেছেন) এবং পরিদর্শক (১৮৬১; দৈনিকপত্র; ১৮৬২ থেকে কালীপ্রসন্ন দ্বিতীয় সম্পাদক)।

প্রখর মেধাসম্পন্ন এই জমিদার তনযটি তৎকালীন সারস্বতসমাজে এক ধূমকেতুর মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন; একদিকে তিনি যেমন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতন ব্যক্তিত্বের সস্নেহ উৎসাহ ও সমর্থন পেয়েছেন অন্যদিকে তেমনি হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, রেভারেন্ড জেমস লঙ প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতাও পেয়েছেন। বাস্তবত কালীপ্রসন্নর মধ্য দিয়ে উনিশ শতকীয় জাগরণের ভাবরূপ,— তার বিদ্যাচর্চা ও মননচর্চার, তার জাতীয় ঐতিহ্য চেতনার স্বরূপ ধরা পড়ে।

এবং সেই আয়ত্তিরও একটা পারম্পর্য আছে,— আর সে কারণেই এই পরিক্রমণ। আধুনিক যুগধর্মের মূল সত্য যে মানবনিষ্ঠ জীবন-জিজ্ঞাসা ও কর্মপ্রেরণা, বিদ্যাসাগরের তাই ছিল জীবনবেদ-- রবীন্দ্রনাথের কথায় তিনি একক, এবং সেই বিস্ময়কর যুগেরও বিস্ময়। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসুর প্রসঙ্গও আসে, আর আসে ইয়ং বেঙ্গলের বিদ্রোহ ও তত্ত্ববোধিনী সভা ও পবিত্রতার ভূমিকার প্রসঙ্গ।

তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫) সে-পর্বের প্রধান পুরুষ বলে গণ্য হবার অধিকারী। ধর্মান্দোলনে, হিন্দুসমাজের সংস্কারমূলক সংরক্ষণে, শিক্ষাবিস্তারে, এমনকী রাজনৈতিক চেতনা-প্রসারেও দেবেন্দ্রনাথ উনিশ শতকীয় প্রস্তুতি পর্বে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছেন।

হিন্দু কলেজের প্রাক্তন এই জমিদার-তনয়টিও প্রথম যৌবনে কিছুটা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলেন,— পিতা দ্বারকানাথ ঠাকুরের মনে তাঁর ভবিষ্যৎ বিষয়ে উৎকণ্ঠা জাগে, তাঁকে এনে বিষয়কর্মে ব্যবসায়ে শিক্ষানবিশ করে দেন, এবং বিয়েও দিয়ে দেন। এই সময়ে তাঁর জীবনের গতি পরিবর্তিত হয়,— ক্রমে সংস্কৃত ভাষা শিখে মূল মহাভারত এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ধর্ম ও দার্শনিক গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'— ঈশোপনিষদের শ্লোকটি তাঁর মনে আলোড়ন ঘটায় এবং তিনি উপনিষদ পাঠে রত হন। ক্রমশ তাঁর বিষয়স্পৃহা ও ভোগাসক্তি হ্রাস পায় এবং তিনি ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ধর্মতত্ত্ব আলোচনার উদ্দেশ্যেই তিনি 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (প্রথমে নাম ছিল 'তত্ত্বরঞ্জিনী সভা' ১৮৩৯) স্থাপন করেন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই সভায় যোগদান করেন; এবং তাঁরই উৎসাহে 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' (১৮৪০) স্থাপিত হয়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মশাস্ত্র বিষয়ক উপদেশ দেওয়া এই পাঠশালার উদ্দেশ্য ছিল।

১৮৪২ খ্রি: থেকে তত্ত্ববোধিনী সভা ব্রাহ্মসমাজের ভার গ্রহণ করে এবং পরের বছর থেকে দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে ও অক্ষয়কুমার দত্তর সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রকাশ আরম্ভ হয়। বাস্তবত, এই পত্রিকাটি বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনকে জাতীয় ধারায় সংগঠিত ও বাহ্যবস্তুর জিজ্ঞাসায় সংহত করেছে। এই পত্রিকায় লেখা নির্বাচনের দায়িত্ব ছিল 'গ্রন্থাধ্যক্ষদের' হাতে— আজকের ভাষায় সম্পাদকমণ্ডলীর হাতে। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র গ্রন্থাধ্যক্ষ ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়দের মতো মনীষী। তাঁদের স্বাধীনতাও ছিল অবাধ,— এমনকী দেবেন্দ্রেনাথ ঠাকুরের লেখাও তাঁরা প্রকাশিত করতে সময়ে সময়ে বাধা দিতেন। প্রথম ১২ বছর সম্পাদক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত; তাঁর বিজ্ঞান ও নীতিবিষয়ক আলোচনাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে শীর্ষস্থানীয় করে তোলে। তারপর পত্রিকা সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তবে নিঃসন্দেহে অক্ষয়কুমার সম্পাদিত তত্ত্ববোধিনীই সেদিনের বাঙালি মনে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। এই বিষয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন : 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সমস্ত বাংলায় ইউরোপীয় ভাব-প্রচারের মিশনারি ছিল। বাঙালির ছেলেদের মধ্যে ইংরেজির ভাব প্রবেশ করানো সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বারা সাধিত হয়।' উত্তর-ঔপনিবেশিক যে দৃষ্টিকোণ থেকে যেভাবে আজ আমরা এই পরকীয় মানসিকতাকে সমালোচনা করি বা উনিশ শতকীয় নবজাগরণের মর্মবস্তুকে ব্যবচ্ছেদ করি ঠিক সেখান থেকে না হলেও অক্ষয়কুমারের এই 'ইউরোপীয় ভাব-প্রচারের' মিশনটি তত্ত্ববোধিনীর প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অভীষ্ট ছিল না। তাঁর মুখ্য

উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় তত্ত্বজ্ঞান ও ভগবৎ-চিন্তা প্রচার দ্বারা ইউরোপীয় ভাব-বন্যাকে প্রতিহত করা। কর্মাধ্যক্ষমণ্ডলীর সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলেও দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমার দত্ত বা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্পাদনাকর্মে কোনওপ্রকার হস্তক্ষেপ করেননি,— এই না-করার পিছনে কতটা তাঁর অধিকার সচেতনতা কাজ করেছে আর কতখানি সম্পাদকদের ব্যক্তিত্ব ও দৃঢ়তা কাজ করেছে তা বলা মুশকিল; তবে তাঁরই লেখা তাঁর পত্রিকার সম্পাদকরা ছাপছে না, এই অসম্মান ও ক্ষোভ তাঁকে যে পীড়িত করেছিল তা প্রকাশ পায় রাজনারায়ণ বসুকে লেখা দেবেন্দ্রনাথের এক পত্রে (মার্চ, ১৮৫৪) : 'কতকগুলান নাস্তিক গ্রন্থাধ্যক্ষ হইয়াছে, ইহারদিগকে এ পদ হইতে বহিষ্কৃত না করিয়া দিলে আর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের সুবিধা নাই।'' জোড়াসাঁকোর বাড়িতেও পৌত্তলিক পূজাদি নিয়ম অব্যাহত থাকায় দেবেন্দ্রনাথ বিরক্ত হয়ে ওঠেন। ১৮৫৬-এর অক্টোবর মাসে আধ্যাত্ম শান্তির খোঁজে তিনি হিমালয় চলে যান; সংসারবিমুখ না হলেও এরপর তিনি ব্রাহ্মধর্ম ছাড়া অন্য কোনও কাজে আর মন দেননি। হিমালয় তাঁকে খুবই আকৃষ্ট করেছিল; 'স্বরচিত জীবনচরিতে' সিমলা পাহাড় অঞ্চলের চমৎকার বর্ণনা আছে। ১৮৫৮-এর নভেম্বরে দেবেন্দ্রনাথ কলকাতায় ফিরে আসেন এবং ছ'মাসের মধ্যেই 'তত্ত্ববোধিনী সভা' তুলে দেন। এরপর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (১৭৮১ শকাব্দের জ্যৈষ্ঠ থেকে) ব্রাহ্মসমাজের সম্পত্তি ও মুখপত্র হয়ে ওঠে। ফলত বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে তত্ত্ববোধিনীর পর্ব শেষ হয়ে গেল।

এরপরে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্রাহ্মসমাজের সাংগঠনিক ও ধর্মপ্রচারের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। ১৮৫৯-এ ব্রহ্মবিদ্যালয় স্থাপন করেন। ওই সভায় কেশবচন্দ্র সেন ইংরেজিতে এবং দেবেন্দ্রনাথ বাংলায় বক্তৃতা দিতেন। ১৮৬০-এ দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের বেদিতে বসেন। আর এই বছরই দ্বিতীয়া কন্যাকে বিবাহ দিলেন ব্রাহ্মমতে। সেই বিবাহে শালগ্রাম শিলা ইত্যাদি বর্জিত হলে সমাজে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। দেবেন্দ্রনাথ অতঃপর ব্রাহ্মধর্ম পালনের সর্ববিধ আয়োজন করেন; হিন্দু পূজা-পার্বনাদি বাদ দিয়ে মাঘোৎসব (১১ মাঘ), নববর্ষ, দীক্ষা দিবস (৭ পৌষ) ইত্যাদি কয়েকটি উৎসবের দিন প্রবর্তন করেন। ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের অর্থানুকূল্যে 'ইন্ডিয়ান মিরর' পত্রিকা প্রকাশিত হল। ইতিমধ্যে শিষ্য কেশবচন্দ্রের কয়েকটি সমাজ-সংস্কারমূলক কাজে দেবেন্দ্রনাথ সম্মতি দিতে না পারায় সনাতনপন্থী ও নব্যপন্থীর বিরোধ প্রকাশ্যে চলে আসে এবং কেশবচন্দ্র সেন নতুন সমাজ গঠন করেন (১৮৬৬)। দেবেন্দ্রনাথ প্রবর্তিত সমাজ তারপর থেকে 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে প্রচলিত হয়। মর্মাহত দেবেন্দ্রনাথ আর দায়িত্ব বহন করলেন না: রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ নবীনদের হাতে কার্যভার দিয়ে তিনি উপাসনায় মন দেন। ব্রাহ্মগণ তাঁকে 'মহর্ষি' উপাধিতে ভূষিত করে (১৮৬৭)।

বাংলার নবজাগরণের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সাংস্কৃতিক দান, রামমোহনের ব্রাহ্মধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও

প্রচণ্ড খ্রিস্টান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দুসমাজের আত্মরক্ষা-বৃদ্ধির উদ্বোধন এ সকল প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে। আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার আছে। পরবর্তী 'হিন্দু জাতীয়তাবাদে'র উন্মেষ ক্ষেত্রটি অনেকটাই প্রস্তুত করে গেছেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রাজনারায়ণ বসুর মতন ব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গত গোপাল হালদার লেখেন : "এদিকে থেকে তাঁরা শুধু খ্রিস্টানদের প্রতিপক্ষ নন; খ্রিস্টীয় ভক্তিবাদ ও সংস্কারবাদের প্রবক্তা— নিজেদের সহযোগী কেশবচন্দ্রেরও বিরোধী এবং শুধু যুক্তিবাদী 'ডিরোজিয়ান' বিদ্রোহীদের প্রতিপক্ষ নন এমনকী, তত্ত্বোধিনীরও অক্ষয়কুমার বিদ্যাসাগরেরও প্রতিপক্ষ। দ্বিতীয়ত, তিনিই বাংলায় ভাবুকতার ধারায় গদ্য (reflective prose) প্রথম রচনা করেন, আর সে-ধারায় তাঁর তুলনা নেই।"[৫২]

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্মবিদ্যার কঠিন সমালোচক ছিলেন রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-৮৫)। মাত্র আঠেরো বছর বয়সে কৃষ্ণমোহন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং খ্রিস্টধর্ম প্রচারে অত্যুৎসাহী হয়ে ওঠেন। অপর দিকে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের প্রতিরোধে বাঙালি শিক্ষিত যুবকদের ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষাদানে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরও ছিলেন বদ্ধপরিকর। পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ দিয়েই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথ ও তাঁর অনুগামীরা বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন। সে-কারণেই পাদ্রি কৃষ্ণমোহন দেবেন্দ্রনাথের ধর্মমতকে 'বিলিতি বেদান্তবাদ' বলে বিদ্রূপ করতেন। এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিরোধিতা ও সমালোচনার ফলে দেবেন্দ্রনাথের বিচারবুদ্ধি যে মার্জিত হয়েছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। আবার কৃষ্ণমোহন উনিশ শতকীয় বাঙালি জাগরণে শুধু অ্যান্টিথিসিসের বা বিরোধের ভগ্নাংশ মাত্র নন, তাঁর অবদান ছিল অস্ত্যর্থক ও বিপুল।

দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে কৃষ্ণমোহনের জন্ম (১৮১৩)। প্রতিভার বলেই তিনি ডেভিড হেয়ার সাহেবের ঠনঠনিয়ার পাঠশালা থেকে হিন্দু কলেজে পড়বার সুযোগ পান (১৮২৪)। প্রখর মেধাসম্পন্ন হেয়ারের স্নেহধন্য এই ছাত্রটি হিন্দু কলেজের শিক্ষা শেষ করে বিশেষ বৃত্তি পান (১৮২৮)। ডিরোজিওর প্রত্যক্ষ ছাত্র না হলেও তিনি ছিলেন একজন ডিরোজিয়ান,— ইয়ং বেঙ্গলের প্রধান পুরুষ। বাড়ি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি যখন প্রায় ভবঘুরে অবস্থায়, তখন ডাফ সাহেবের প্রভাবে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হলেন (১৮৩২)। এবং তারপর শুরু হল তাঁর উদ্দীপনাময় জীবন,— পাদ্রি কৃষ্ণমোহনের জীবনের প্রধান ব্রতই হয়ে উঠল খ্রিস্টধর্ম প্রচার। স্ত্রীকে তাঁর পিতৃগৃহ থেকে এনে তিনি তাঁকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করলেন; ছোট ভাইও খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করলেন; তাছাড়া মধুসূদন দত্ত (১৮৪৩) ও জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুরের (১৮৫১) মতো হিন্দু কলেজের ছাত্রদেরও তিনি খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের জন্য উৎসাহিত করেছেন। ১৮৪০-এর পর থেকে নব-শিক্ষিতদের মধ্যে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণের যে হিড়িক পড়ে সেখানে তাঁর প্ররোচনা কম ছিল না। ফলে হিন্দু সমাজ, বিশেষত নাগরিক মধ্যবিত্ত শ্রেণি কৃষ্ণমোহনের বিরুদ্ধে সবসময়ে, সতর্ক থাকত। বিভেদ ও বিদ্বেষের এরকম এক পাঁচিল গড়ে ওঠায় জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, প্রাচ্যবিদ্যায়, সাহিত্যে, জাতীয় চেতনার উদ্বোধনে কৃষ্ণমোহনের

প্রবল প্রতিভার অবদান কৃষ্ণমোহন তখন প্রসন্ন হস্তে দিতে পারেননি আর বাঙালি সমাজও তা স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করতে পারেনি। খ্রিস্টান কলেজে অধ্যাপনায় (১৮৬২-৬৮) তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ইয়ং বেঙ্গলের মুখপত্র 'দি এনক্যোয়ারার' (১৮৩১), 'হিন্দু ইউথ' (১৮৩১), 'গভর্নমেন্ট গেজেট' (১৮৪০), 'সংবাদ সুধাংশু' (১৮৫০) পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'এশিয়াটিক সোসাইটি', 'বেথুন সোসাইটি', 'ফ্যামিলি লিটারারি ক্লাব', 'বঙ্গীয় সমাজবিজ্ঞান সভা', 'ভারত সংস্কার সভা' প্রভৃতি সংগঠনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ইংরেজিতে লেখেন 'দি পারসিকিউটেড' (নাটক), 'ডায়ালগস অন দি হিন্দু ফিলসফি', 'দি ওরিযান উইটনেস', 'টু এসেজ অ্যাজ সাপ্লিমেন্টস টু দি এরিয়ান উইটনেস' প্রভৃতি গ্রন্থ। তাঁর 'ষড়দর্শন সংবাদ' (১৮৬৭) পাণ্ডিত্য ও প্রাচ্য বিদ্যানুরাগের প্রমাণ— বাংলা ভাষার সম্পদ। তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' (১৮৪৬-৫১)-এর মতো জ্ঞান-প্রস্রবণের রচয়িতা হিসেবে। এই বিবিধ বিষয়ের রচনা— বিশ্বকোষ জাতীয় ক্রমশ প্রকাশিত গ্রন্থমালার অন্য নাম 'এন্‌সাইক্লোপিডিয়া বেঙ্গলেনসিস্' এক সংস্করণ ছিল বাংলায়, অন্য সংস্করণে বাঁ দিকে ইংরেজিতে ও ডানদিকে বাংলায় লেখা মুদ্রিত হয়েছিল। ১৮৪৬ থেকে ১৮৫১ পর্যন্ত মোট ১৩ কাণ্ডে বিদ্যাকল্পদ্রুমে কৃষ্ণমোহনের দ্বারা রোম ও ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশের পুরাবৃত্ত, জীবনবৃত্তান্ত, বিবিধ বিষয়ক পাঠ, ভূগোল, যোত্রতত্ত্ব, নীতিবোধক ইতিহাস, চিত্তাকর্ষক বিষয়ে লেখা সংগৃহীত হয়। 'বিদ্যাকল্পদ্রুম'-এ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ছাড়াও ছিল তাঁর বন্ধু ইয়ং বেঙ্গল-এর প্যারীচাঁদ মিত্রের লেখা। সেকালের সকল মনীষীর মতন কৃষ্ণমোহনও শিক্ষাবিস্তারে উদ্যোগী ছিলেন। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, ধর্মে খ্রিস্টান ও ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের প্রবল প্রচারক হয়েও কৃষ্ণমোহনের ধারণা ছিল বাংলাই একদিন বাঙালির শিক্ষার বাহন হবে। এই দূরদর্শিতা নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবোধের পরিচায়ক।

কৃষ্ণমোহনের পাণ্ডিত্যের সমাদর কিন্তু কম হয়নি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় প্রতিষ্ঠান থেকেই তিনি তার সিনেটের ফেলো মনোনীত হন; ক্রমে সিন্ডিকেটের সদস্য ও আর্ট বিভাগের 'ডিন' হন। সিলেবাস প্রণয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর পরমার্শ অপরিহার্য ছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট উপাধি দিয়ে (১৮৭৬) সম্মানিত করে। কলিকাতা কর্পোরেশনের সদস্য পদে তাঁকে জনসাধারণই বরণ করে (১৮৭৬)। মুদ্রাযন্ত্র আইন, অস্ত্র আইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করতেন এই 'পক্বকেশ পাদ্রি'— ইয়ং বেঙ্গলের প্রথম বিদ্রোহী, অকপটতাব প্রতীক, সে যুগের র‍্যাডিক্যাল অকৃত্রিম দেশপ্রেমিক।

তবে প্রাচ্যবিদ্যার প্রথম ভারতীয় দিকপাল রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১)। দেবেন্দ্রনাথের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অন্যতম গ্রন্থাধ্যক্ষ রাজেন্দ্রলাল ওই পত্রিকাতেই প্রথম বাংলা রচনায় হাত দেন। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান কীর্তি 'বিধিবার্থ সংগ্রহ'

(১৮৪৬-৬০)-এর সম্পাদনা থেকে 'রহস্যসন্দর্ভ'-এর সম্পাদনা। তাছাড়া 'ভার্নাকিউলার লিটারেচার কমিটি' (বঙ্গসভায় অনুবাদক সমাজ)-এর প্রয়োজনে বা শিক্ষার তাগিদে 'প্রাকৃত ভূগোল' (১৮৫৪), 'শিল্পিক দর্শন' (১৮৬০) বা 'শিবাজীর চরিত্র' (১৮৬০), 'পত্রকৌমুদী' (১৮৬৩) প্রভৃতি যে সকল বাংলা বই লেখেন তা আজ হারিয়ে গেছে। প্রথমে এশিয়াটিক সোসাইটির সহকারী সম্পাদক ও গ্রন্থাগারিক (১৮৪৬) নিযুক্ত হয়ে ধাপে ধাপে তিনি তাঁর প্রথম ভারতীয় সভাপতিরূপে (১৮৮৫) আমৃত্যু সোসাইটির সঙ্গে যুক্ত থেকে কাজ করেছেন। জর্মন প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ ম্যাক্সমুলারের মতে রাজেন্দ্রলাল তাঁর জীবিতাবস্থায় ভারততত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত ছিলেন। বিবিধার্থ-সংগ্রহের প্রথম ৬টি পর্ব রাজেন্দ্রলালের এবং ৭ম ও শেষ পর্বটি কালীপ্রসন্ন সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। প্রসঙ্গত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত-সমাজ'-এর রাজেন্দ্রলাল সভাপতি (১৮২২) রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক ছিলেন। এই অসামান্য পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদকে সরকার প্রথমে রায়বাহাদুর, এবং পরে সি. আই. ই. ও রাজা (১৮৮৫) উপাধি দেয়। তাঁর প্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মৃতিধার্য : '...রাজেন্দ্রলাল মিত্র সব্যসাচী ছিলেন। তিনি একাই একটা সভা। তিনি কেবল মননশীল লেখকই ছিলেন না ...তাঁহার মূর্তিতে মনুষ্যত্ব প্রত্যক্ষ হইত। অথচ যোদ্ধৃবেশে তাঁর রুদ্রমূর্তি বিপদজনক ছিল। মিউনিসিপ্যাল, সেনেটের সভায় সকলেই তাঁহাকে ভয় করিত। ...রাজেন্দ্রলাল ছিলেন বীর্যবান-কখনো পরাভূত হইতে জানিতেন না।'

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-৯৮), উনিশ শতকের নবজাগরণের অতি উজ্জ্বল এই জ্যোতিষ্কটি আমাদের আলোচনায় অন্য মাত্রা যোগ করেন তাঁর জীবনদর্শনের স্বাতন্ত্র্যে, সৃজনশীলতার বহুমাত্রিকতায়, স্বাদেশিকতা ও ধর্মচেতনার ভিন্নতা অত্যন্ত মেধাবী বঙ্কিমচন্দ্র নবস্থাপিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এ. পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন (১৮৫৮)। আইন পড়ার সময়ই তিনি যশোহরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে চাকরি পান (১৮৫৮)।

১৮৬০-এ তিনি যখন কাঁথিতে কর্মরত তখনই 'কপালকুণ্ডলা'র ভাবকল্পটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনে আলোড়ন তোলে। ওই বছরই তিনি খুলনায় বদলি হয়ে এলেন; সেখানে তখন নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্য চলছিল অবাধে। খুলনার মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র কঠিন হাতে তাদের অত্যাচার বন্ধ করেন। কর্মক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠ, নির্ভীক, কর্তব্যপরায়ণ শাসক ও বিচারক ছিলেন। ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' ও সি.আই.ই. উপাধিতে সম্মানিত করে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দীর্ঘ নয়, অথচ তার মধ্যেই তাঁর সাহিত্যসাধনা ৪২ বছরের। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন'। ছাত্রজীবন থেকেই (১৮৫৩-৫৬) গদ্য-পদ্য লিখতে শুরু করেন বঙ্কিমচন্দ্র, আর শেষ লেখা লেখেন মৃত্যুর কদিন

আগে (১৮৯৪)। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা ৩৪। খুলনায় অবস্থানকালে ইংরেজি ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন 'Rajmohan's wife' (১৮৬৪); তবে তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে। আর বাঙালির রোমান্টিক সত্তার নবজাগরণ ঘটে বঙ্কিমের প্রথম তিনটি উপন্যাসে— 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫), 'কপালকুণ্ডলা' (১৮৬৬) এবং 'মৃণালিনী' (১৮৬৯)-তে।

এই প্রদীপ্ত প্রতিভা মধ্যগগনে পৌঁছায় 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২-৭৬) পত্রিকার প্রকাশনা ও সম্পাদনায়। এই মাসিক পত্রে তিনি পর পর 'বিষবৃক্ষ' (১৮৭৩), 'ইন্দিরা' (১৮৭৩), 'যুগলাঙ্গুরীয় (১৮৭৪), 'চন্দ্রশেখর' (১৮৭৫) ইত্যাদি উপন্যাসের সঙ্গে বিবিধ বিষয়ে নানা প্রবন্ধ রচনা করেন; যথা, 'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' 'সাম্য' প্রভৃতি। বাস্তবত, 'বঙ্গদর্শন'-এর প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে এক যুগান্তর আনে। প্রবন্ধ ও সমালেলাচনা সাহিত্যের বিকাশ ও বিস্তার সম্পাদক বঙ্কিমচন্দ্রের বিশিষ্ট অবদান। দ্বিতীয় পর্যায়ের বঙ্গদর্শনে 'রাধারানী' (১৮৭৬), 'রজনী' (১৮৭৭), 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৮৭৮) এ পর্বের রচনা। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যপর্বের রচনায় সৌন্দর্য ও লোকশিক্ষার সংশ্লেষণ লক্ষ করা যায়। কিন্তু তাঁর শেষপর্বের রচনায় প্রাধান্য পেয়েছে লোকশিক্ষা এবং ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক চিন্তাভাবনা। আর সে-কারণেই 'নবজীবন' ও 'প্রচার' পত্রিকাদ্বয়ের প্রকাশ। এই পর্বের প্রধান উপন্যাস 'রাজসিংহ' (১৮৮২), 'আনন্দমঠ' (১৮৮২), 'দেবী চৌধুরানী' (১৮৮৪), 'সীতারাম' (১৮৮৭)।

"জীবনের শেষ দশ বৎসর তিনি [বঙ্কিমচন্দ্র] ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুধর্মের যেরূপ আলোচনা করিয়াছেন, তাহা আধুনিক সময়ের একটি লক্ষণ— একটি চিহ্নস্বরূপ। অনৈক্য স্থলে ঐক্য সংগঠন, অনুদার মত ও আচারের স্থলে উদার মত ও আচার সংস্থাপন, নির্জীব অনুষ্ঠানের স্থলে প্রাচীন ধর্মের সঞ্জীবনী শক্তি প্রচারকরণ, অজ্ঞানতার ও মূর্খতার স্থলে হিন্দুধর্মের জ্ঞানবিতরণ, অবনতির স্থলে উন্নতির পথ প্রদর্শন— এইরূপ ইচ্ছা, এইরূপ ভাব, এইরূপ আশা, আজি বঙ্গসমাজে কিছু কিছু অনুভূত হইতেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলি এই ইচ্ছা, এই ভাব ও এই আশার বিকাশ মাত্র।"[৬০] হিন্দু জাতীয়তাবাদের জাগরণস্পৃহা সাহিত্যসম্রাট ও সমসময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবীর দ্বারা কীভাবে পরিমার্জিত, পরিপুষ্ট ও পরিবেশিত হয়েছিল তা আমরা এই পর্বের রচনায় স্পষ্ট দেখি। তবে সেদিকে তাকাবার আগে বঙ্কিমচন্দ্রের মানসগঠনের, বিশেষত শেষপর্বের মননশীলতার একটু পরিচয় পেতে আমরা বিপিনচন্দ্র পালের অভিজ্ঞতার কথা মনে করতে পারি :

> "বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়িবার সময়, তিনি যে সে সময়ের কোন তত্ত্বটা জানিতেন না, এদেশের বা ইউরোপের কোনও লেখকের বা পণ্ডিতের সঙ্গে যে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না, ইহা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। এ দেশের

বেদ, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র, শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, মঘাদিস্মৃতি, সাংখ্যবেদান্তাদি দর্শন, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, ভবভূতি প্রমুখের কাব্য, রামায়ণ মহাভারতাদি ইতিহাস, ভাগবতাদি পুরাণ, নানাবিধ তন্ত্র, বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ ও সকলের সঙ্গে তাঁর কতটা যে পরিচয় ছিল, তাঁর উপন্যাসে প্রবন্ধাবলিতে কৃষ্ণচরিত্রে, গীতাভাষ্যে ইহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যদিকে ইউরোপীয় দার্শনিক ক্যান্ট, হেগেল, কুঁজো, কোম্‌টে এবং ইংরাজ চিন্তানায়ক স্পেনসার, মিল, বেন্থাম, হাকসলি, টিন্ডেল, ফ্রেডরিখ হ্যারিসন প্রমুখ, আর একদিকে মেথু আরনল্ড, রেনাঁ প্রমুখ, এমনকী আধুনিক প্রত্নতত্ত্ব বা spiritualism বা মেসমেরিজম (mesmerism) পর্যন্ত তাঁর কতটা কেবল জানা নয়, আয়ত্ত ছিল,— এ সকলের বিস্তর প্রমাণ তাঁর লেখার মধ্যে রহিয়াছে। অথচ কোথাও একটু অপপ্রয়োগ বা পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা দেখা যায় না।"[৬১]

সাধারণভাবে এ কথা জানা যে, বঙ্কিমচন্দ্রও সেকালের একজন শিক্ষিত যুবক হিসেবে স্টুয়ার্ট মিল ও জেরেমি বেন্থামের দার্শনিক চিন্তার ধারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের আলোচনায় বেন্থামের হিতবাদী দর্শনের উল্লেখ আমরা করেছি। অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পবিমাণ হিত বা মঙ্গল সাধন (greatest good of the greatest member)। উনিশ শতকের বাংলার নব্যশিক্ষিত যুবকরা প্রথমে পাশ্চাত্য যুক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে; ক্রমশ তাঁদের একটা বড়ো অংশের মধ্যে হিতবাদের মূল কথা প্রচারিত হতে থাকে। সেই অগ্রণী অংশ দেশ ও সমাজের কল্যাণে যে সেই সময় অতখানি এগিয়ে এসেছিল— শিক্ষাবিস্তার ও সমাজ সংস্কারে আত্মনিবেদন করা ছিল তার মূল প্রেরণা ছিল হিতবাদ। ব্যতিক্রম নন বঙ্কিমচন্দ্রও। কিন্তু তাঁর ক্ষেত্রে ঘটনা হল, হিতবাদ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অগাস্ত কোঁত-এর ধ্রুববাদ (positivism)-এ দীক্ষিত হন। যোগেশচন্দ্র বাগল জানান : "বঙ্কিমচন্দ্র হিতবাদের সমর্থক বটে, কিন্তু কোঁত-প্রদর্শিত ধ্রুববাদের মধ্যেই ইহা সমাহিত বলিয়া— শুধু অধিক সংখ্যক লোকের অধিক পরিমাণ হিতসাধন নহে, সমগ্র মানব সমাজেরই কল্যাণ-সাধন ইহার আদর্শ বলিয়া— বঙ্কিমচন্দ্র ধ্রুববাদকে অতীব শ্রদ্ধার সঙ্গে মনেপ্রাণে প্রথম হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৬২] 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিম নিজেই কোঁতের প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন :

"গুরু। ...জ্ঞানের দ্বারা সমুদয় ভূতকে আগলাতে এবং ঈশ্বরে দেখিতে পাওয়া যায়, ইতিবাক্যে কাহার কাহার সম্বন্ধ জ্ঞেয় বলিয়া কথিত হইয়াছে?

শিষ্য। ভূত, আমি এবং ঈশ্বর।

গুরু। ভূতকে জানিবে কোন শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীতে কোমতের (কোঁতের) চারি Mathematics,

Astronomy, Physics, Chemistry গণিত, জ্যোতিষ, পদার্থতত্ত্ব এবং রসায়ন। এই জ্ঞানের জন্য আজিকার দিনে পাশ্চাত্যদিগাকে গুরু করিবে। তারপর আপনাকে জানিবে কোন শাস্ত্রে?

শিষ্য। বহির্বিজ্ঞানে এবং অন্তর্বিজ্ঞানে।

গুরু। অর্থাৎ কোম্‌তের শেষ দুই— Biology, Sociology, এ জ্ঞানও পাশ্চাত্যের নিকট যাঞা করিবে।

শিষ্য। তারপর ঈশ্বব জানিব কিসে?

গুরু। হিন্দুশাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে, প্রধানত গীতায়।"

(পঞ্চদশ অধ্যায়— ভক্তি; বঙ্কিম রচনাবলী)

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় অগাস্ত কোঁত (১৭৯৮-১৮৫৭) এবং তাঁর Positive Philosophy— কিংবা বেন্থাম-এর হিতবাদ, কিংবা দার্শনিক মিল, হাক্সলির চিন্তন বঙ্কিম-মানসের ওপর যতই রশ্মিপাত ঘটাক তা অন্তস্তরে পৌঁছতে পারেনি, সেখানে শুধু হিন্দুশাস্ত্র, উপনিষদ, পুরাণ। এই হিন্দু-বঙ্কিমচন্দ্র শুধু শাস্ত্রচর্চা বা পুজো-আচ্চা করেন না, তিনি হিন্দু জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে কলম ধরেন। সেই কলম শুধু 'ধর্ম্মতত্ত্ব' বা 'কৃষ্ণচরিত' রচে না, উপন্যাসকেও প্রচারমূলক করে তোলে।

'ধর্ম্মতত্ত্ব। ১ম ভাগ। অনুশীলন' (১৮৮৮) গ্রন্থে গুরু-শিষ্য কথোপকথনস্থলে বঙ্কিমচন্দ্র জানান : 'তোমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক— ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাষাতেই তোমাদিগকে বুঝাইতে হয়। ভাষার প্রভেদ হইতেছে বটে কিন্তু সত্য নিত্য।' (একাদশ অধ্যায়) আর হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বিচারে— 'বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বোত্তম দার্শনিক অবদান তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব'। (দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র; পৃ. ৬১) ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় বঙ্কিমের ভাষায় :

"১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ। (দ্রষ্টব্য, উপক্রমণিকা, 'কৃষ্ণচরিত্র', পৃ. ৪০৮)

'কপাকুণ্ডলা'র ঔপন্যাসিক বা 'সাম্যে'র বিদ্রোহী লেখকসত্তা কৃষ্ণচরিত্র-এর প্রস্তাবনায় স্বভাবজ গদ্যভাষায় লেখেন :

"ভাবতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দুর, বাঙ্গালা দেশের সকল হিন্দুর বিশ্বাস যে শ্রীকৃষ্ণ ঈশ্বরের অবতার। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং— ইহা তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাঙ্গালা প্রদেশে, কৃষ্ণের উপাসনা প্রায় সর্বব্যাপক। গ্রামে গ্রামে কৃষ্ণের মন্দির, গৃহে গৃহে কৃষ্ণের পূজা, প্রায় মাসে মাসে কৃষ্ণোৎসব, উৎসব উৎসবে কৃষ্ণযাত্রা, কণ্ঠে কণ্ঠে কৃষ্ণগীতি সকল মুখে কৃষ্ণনাম।...

কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং। যদি তাহাই বাঙ্গালীর বিশ্বাস, তবে সর্বসময়ে কৃষ্ণারাধনা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকথা ধর্ম্মেরই উন্নতিসাধক।... কিন্তু ইহারা ভগবানকে কী রকম ভাবেন? ভাবেন, ইনি বাল্যে চোর— ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক— অসংখ্য গোপ-নারীকে পতিব্রাত্যধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ— বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণহরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ?...

ভগবচ্চরিত্রের এইরূপ কল্পনায় ভারতবর্ষের পাপস্রোত বৃদ্ধি পাইয়াছে, সনাতনধর্ম্মদ্বেষিগণ বলিয়া থাকেন। ...আজি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কীরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি। তাহার ফল এই পাইযাছি যে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধীয় যে সকল পাপোপাখ্যান জনসমাজে প্রচলিত আছে, তাহা সকলই অমূলক বলিয়া জানিতে পারিয়াছি, এবং উপন্যাসকারকৃত কৃষ্ণসম্বন্ধীয় উপন্যাস সকল বাদ দিলে যাহা বাকি থাকে, তাহা অতি বিশুদ্ধ, পরম পবিত্র, অতিশয় মহৎ, ইহাও জানিতে পারিয়াছি। জানিয়াছি— ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপসংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই।..."

এই বয়ানের অন্তস্থলেই কি প্রচ্ছন্ন থাকে না হিন্দুধর্ম ও তার শাস্ত্রসমূহ সম্বন্ধে এক অহংকার বোধ! অন্য এক বয়ানে তা আরও স্পষ্ট : "...পৌরাণিক ধর্ম্মে বিশ্বাস কি এরূপ ঘোরতর মূর্খতা? যাহা তিন সহস্র বৎসর অবাধে কোটি কোটি মানুষের ভক্তির বিষয় হইয়া আসিতেছে, সর্ব্ববিজয়ী বৌদ্ধধর্ম্ম যাহার নিকট পরাভূত হইল, তাহা কি কেবল মূর্খতার ফল? তাহার কি কোনো নৈসর্গিক ভিত্তি নাই? না থাকিলে এত বল হইবে কেন?"[৩৩] এই ভাবোচ্ছ্বাস ও অহংকারবোধ— হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক প্রচার স্পষ্টতই হিন্দুজাতীয়তাবাদী মানসেরই লক্ষণ।

বঙ্কিমচন্দ্র সখেদে বলেছেন : 'সাহেবরা যদি পাখী মারিতে যান, তাহারও ইতিহাস লিখিত হয়, কিন্তু বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।' আরও লেখেন : '...যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্ত, সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত, গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।' (দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালার ইতিহাস' ব.র. ২; পৃ. ৩৩০) বঙ্কিমের এমতো ইতিহাসচেতনার আলোচনা করেছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়; তিনি লেখেন :

আসলে তাঁর ক্ষোভ হল, বাঙালির স্বরচিত বাংলার ইতিহাস নেই। 'আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরাজী গ্রন্থেরও বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।'

কেন? সাহেবরা কেবল বিজাতীয় মুসলমানদের সাক্ষ্য অবলম্বন করে বাংলার ইতিহাস লিখেছেন, তাতে বাঙালির সাখ্য নেই। বাঙালির কাছে এই ইতিহাস গ্রহণীয় নয়। 'আত্মজাতিগৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানেব কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙ্গালী নয়।' তার পর এই 'স্বকপোলকল্পিত' ইতিহাসের মুসলমান লেখকদের ওপর বঙ্কিমের উষ্মা— 'গোহত্যাকারী, ক্ষৌরিতচিকুর' ইত্যাদি— তৎসম শব্দের গাম্ভীর্য সত্ত্বেও এগুলো নিছকই গালাগাল...।

বিদেশি শাসকের লেখা ইতিহাসে পরাধীন জাতি তার নিজের কথা খুঁজে পাবে না, নিজেদের ইতিহাস নিজেদের লিখতে হবে— জাতীয়তাবাদের এ হল প্রাথমিক স্লোগান। স্বরচিত ইতিহাসের অভাব নিয়ে বঙ্কিমের ক্ষোভ নিঃসন্দেহে তাঁর জাতীয়তাবাদেরই প্রকাশ।"[৬৪]

আর সেই জাতীয়তাবাদে প্রতিপক্ষ বিদেশি ইংরেজ শাসকরা নয়, 'ক্ষৌরিতচিকুর' ও 'গোহত্যাকারী' মুসলমান। পূর্বতন মুসলমান শাসক ও সাধারণভাবে মুসলমানদের প্রতি এমতো বর্ষিত ইতর বিশেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু সত্তার ক্রোধ ও দ্রোহেরই প্রকাশ ঘটেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইতিহাস বিষয়ক আক্ষেপটি ১৮৮০ সালের; তাঁর দু-বছর বাদে প্রকাশিত হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সাড়া-জাগানো 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) এবং সেখানে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অনিবার্য শর্তে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতি অভিভাব— তার শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ক অহংকারবোধ এবং প্রতিপক্ষ হিসেবে মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ ও অপভাব একটি আখ্যানিক অবয়ব পেয়েছে।

'আনন্দমঠ'-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন: "সমাজবিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী ইংরেজরা বাঙ্গালাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। ..."তৃতীয় সংস্করণে তিনি লিখলেন : 'এবার পরিশিষ্টে বাঙ্গালার সন্ন্যাসীবিদ্রোহের যথার্থ ইাতহাস ইংরেজি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল। পাঠক দেখিবেন, ব্যাপার বড় গুরুতর হইয়াছিল। আরও দেখিবেন যে, দুইটি ঘটনা সম্বন্ধে উপন্যাসে ও ইতিহাসে বিশেষ অনৈক্য আছে।..." এক্ষেত্রে পাঠক কিন্তু অস্বস্তিতেই পড়েন। দ্বিতীয় সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের 'The Liberal' (8th April, 1882) পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনার উদ্ধৃতি এবং তৃতীয় সংস্করণে ইংরেজ ইতিহাসবিদদের বক্তব্যকে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের 'যথার্থ ইতিহাস' হিসেবে পরিশিষ্টে সংস্থাপন কি তাঁব পূর্বোক্ত ইতিহাস বিষয়ক ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে যায় না? বুঝতে অসুবিধা হয় না, 'আনন্দমঠ' লিখে উচ্চপদস্থ বাঙালি আমলা বঙ্কিমচন্দ্র একটু বিপাকেই পড়ে গিয়েছিলেন। 'উপন্যাস উপন্যাস, ইতিহাস নহে।'— স্বীকারোক্তি মাত্র নয় তাঁকে আরও অনেক কিছু করতে হয়েছে। "১৮৮২ থেকে ১৮৯২, এই দশ বছরে আনন্দমঠের পাঁচটি সংস্করণ বেরোয়, তার প্রতিটি সংস্করণে বঙ্কিম বহু ক্ষেত্রে পরিমার্জন,

সংযোজন, বর্জন করেছেন, কথকের স্বরকে মোলায়েম করেছেন। নিঃসন্দেহে তাঁর এই তৎপরতার পিছনে ছিল ইংরেজ সরকারের কাছে নিজেকে নির্দোষ ও অনুগত প্রমাণের চেষ্টা এবং যবন ও বিধর্মী শব্দদুটি দ্ব্যর্থবোধক হওয়ায় তাঁর তৎপরতা আরও বেড়ে গিয়েছিল। এই প্রসঙ্গে শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন : 'সত্যানন্দের বিবৃতি ও কথকের বিবৃতি যাতে মিলেমিশে জট না পাকায় সে-জন্যেই কি প্রথম সংস্করণের কথনাংশে যেখানে যেখানে ইংরেজ বিষয়ে কটূক্তি ছিল, সেগুলো ঈষৎ বদলে নেন অথবা একেবারে মুছে দেন বঙ্কিম, জুড়ে দেন ইংরেজস্তুতি, অনেক জায়গায় 'ইংরেজ', 'গোরা' বা 'ব্রিটিশ' কেটে বসান 'মুসলমান' 'যবন', 'নেড়ে', 'বিধর্মী'? ...এ ধরনের পরিবর্তনের ফলে ইংরেজ অবমাননার অভিযোগ থেকে কথক অন্তত নিস্তার পায়।...''[৬৫]

উপর্যুপরি পরিমার্জনের পরও 'আনন্দমঠ'-এর শেষ পরিচ্ছেদে আজও পাঠক পড়েন:

> ''ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্ম্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।... তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতনধর্ম্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম্ম; তাহার এভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম্ম, ম্লেচ্ছরা যাহাকে হিন্দুধর্ম্ম বলে— তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম জ্ঞানাত্মক-ধর্ম্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার; বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান আগে না জন্মিলে, আন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। ...ইংরেজ বহির্বিষয়ক জ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম্ম প্রচারে আর বিঘ্ন থাকিবে না।''

বস্তুত, 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের চিকিৎসক-চরিত্রের বয়ানে বঙ্কিমচন্দ্রই সনাতনধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। আর উল্লিখিত উক্তিটি বিশ্লেষণ করলেও তাই দেখা যাবে : (ক) লৌকিক ধর্ম অপকৃষ্ট ধর্ম; (খ) ম্লেচ্ছ বা মুসলমানরাই সনাতনধর্মকে হিন্দুধর্ম আখ্যা দিয়েছে; (গ) প্রকৃত হিন্দুধর্ম কর্মাত্মক নয় জ্ঞানাত্মক; (ঘ) বহির্বিষয়ক জ্ঞান সঠিকভাবে অর্জিত হলেই অন্তর্বিষয়ক জ্ঞানার্জন সম্ভব; (ঙ) ইংরেজরা বহির্বিষয়ক জ্ঞান ও লোকশিক্ষায় পণ্ডিত ও পটু; (চ) 'সুতরাং ইংরজেকে রাজা করিব।'

এমতো যুক্তিবিন্যাস ও বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজ-আনুগত্য এবং হিন্দুজাতীয়তাবাদী চেতনারই নিরাবরণ প্রকাশ ঘটে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, দর্শনে-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের জীবনদর্শন ও সমাজভাবনায় সনাতনধর্মের পক্ষে নিরলস প্রচার,— 'ধর্ম্মতত্ত্ব', 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং বিভিন্ন প্রবন্ধে— 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারাম'-এ ঔপন্যাসিক বয়ানে-কাঠোমোয় উপস্থাপন আমাদের সামনে কিছু অস্বস্তিকর প্রশ্ন তুলে ধরে।

উনিশ শতকের সূচনাকাল থেকে রামমোহন রায়ের সময় থেকেই বাংলায় যে যুক্তিবাদী মুক্তমনস্ক চেতনার বিকাশ ঘটেছে— আধুনিক চিন্তা-চেতনার ও বুদ্ধিবাদের যে দৃষ্টান্ত হিন্দু

কলেজ-ডিরোজিও-ইয়ংবেঙ্গল কিংবা ডেভিড হেয়ার-বিদ্যাসাগর সহ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সকল তুলে ধরে নবজাগরণের ভূমি নির্মাণ করেছিলেন সেখানে একটি অন্তর্বিরোধও শুরু থেকে যে ছিল তা ধরা পড়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবাদর্শের আলোকে। এ কথা অবিদিত নয়, তৎকালীন বঙ্গীয় সমাজের প্রগত অংশ ছিলেন ইংরেজি শিক্ষায়-চর্চায়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধায় লালিত নাগরিক ও অবচ্ছিন্ন মানুষ। রামমোহন ও বঙ্কিমচন্দ্রকে দুই প্রান্তে রাখলে মধ্যবর্তী মনীষীগণ প্রায় সকলেই সমাজ ও শিক্ষার সপক্ষে প্রচার চালিয়েছেন— পাশ্চাত্য সাহিত্য দর্শন ইতিহাসের আলোকে আমাদের সমাজের সংস্কার, জ্ঞানার্জন ও স্বদেশচেতনার উদ্বোধন ঘটাতে চেয়েছেন: এমনকী সংস্কৃত ভাষায় বিশারদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ও হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবনের তার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণের জন্য যেখানে তৎপরতা দেখাননি সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হন। বঙ্কিমচন্দ্র এক্ষেত্রে যেন সনাতনপন্থী রাধাকান্ত দেব (১৭৮৪-১৮৬৭)-এরই ঐতিহ্যবাহী;[৬৬] তবে অনেক বেশি দক্ষ, সংবেদী ও পণ্ডিত তিনি।

জাতীয়তাবাদ তার স্বভাবধর্মে বহুত্ব ও বৈচিত্র্যকে অস্বীকার করে— শ্রেষ্ঠতার গুণকীর্তন করে, বাঙালি জাতির মনগড়া ইতিহাস ও বীরগাথা রচনা করে; জাতির আত্মবিকাশের পথে বাধা স্বরূপ কোনও এক শক্তিশালী পীড়নকারী শক্তিকে প্রতিপক্ষ হিসেবে দাঁড় করায় এবং নিপীড়ন ও অত্যাচারের পল্লবিত কাহিনি পুনঃপুনঃ প্রচার করে জনমানসে একমুখীন অপভাব জাগিয়ে তোলে, সোনালি অতীতের স্বপ্ন দেখায়; এবং স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্যেই জাতির মুক্তির দিশা খোঁজে; অধিকন্তু, সর্বরোগহর এই জাতীয়তাবাদের নেতৃত্বে ও প্রচারে থাকে নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকরা, যাদের অন্যভাবে পেটি-বুর্জোয়া বলা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালি তথা ভারতীয় হিন্দুজাতির মুক্তির পথে তৎকালীন শাসকবর্গ ইংরেজদের প্রতিবন্ধক ভাবেনি; যেহেতু তারা বহির্বিষয়ক জ্ঞানে সুপটু— যেহেতু 'ইংরেজরা বাংলাদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন' (এবং, যেহেতু তিনি নিজে ইংরেজ শাসনাধীনে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটও) তাই প্রতিপক্ষ হয় মুসলমানরা, দু'শতক আগের মুসলমান শাসকরা। কথক স্বরের আড়ালে আনন্দমঠ-এ লেখক বলেন : "সকল দেশে রাজার সঙ্গে রক্ষণাবেক্ষণের সম্বন্ধ; আমাদের মুসলমান রাজা রক্ষা করে কই? ধর্ম্ম গেল, জাতি গেল, কুল গেল, এখন এই প্রাণ পর্যন্তও যায়। এ নেশাখোর নেড়েদের না তাড়াইলে আর কি হিন্দুর হিন্দুয়ানি থাকে?" 'সুতরাং ইংরেরজকে রাজা করিব'। এখানে আরও লক্ষণীয়, উল্লিখিত উদ্ধৃতির 'গেল'-র পৌনঃপুনিক উচ্চারণ-সংবলিত হিন্দুধর্ম রক্ষার আহ্বানটি বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণ দক্ষতায় পাঠকের মগ্নচৈতন্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেন। আর হিন্দুজাতির মুক্তির পথে বাধা মুসলমানরা— 'গোহত্যাকারী', 'ক্ষৌরিতচিকুর', 'ম্লেচ্ছ', 'যবন', 'নেড়ে'দেরই বঙ্কিম হিন্দু পুনর্জাগরণের পথে অন্তরায় জাতি হিসেবে চিহ্নিত করে গেছেন।'

এবার আমরা নবজাগরণের একটি প্রতিকাল্পিক আলোচনায় অগ্রসর হব। সেখানে দুটি ভাগ,

(ক) তথাকথিত আধুনিক যুগের আগের ধর্ম-সমাজ সংস্কারের পরিচয় সন্ধান;

(খ) মুসলমান সমাজে ধর্ম-সমাজে সংস্কারের আন্দোলন।

> প্রথমটি সম্বন্ধে-প্রাক্ আধুনিক যুগের ধর্ম-সমাজ সংস্কার বিষয়ে ইতিপূর্বে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা অধ্যাপক অমলেন্দু দে-র অভিমতটি প্রথমে পেশ করব 'প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে উদার যুক্তিশীল মননের পরিচয় আমরা পাই। আর নানাভাবে তার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। মধ্যযুগেও আমাদের জীবনে উদারতা ও যুক্তিশীলতার একটি প্রবাহ বিদ্যমান ছিল। ধর্ম ও সমাজ সংস্কাররূপে রামমোহনের আবির্ভাবের পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে হিন্দুসমাজের মধ্যে কয়েকটি ধর্মীয় গ্রুপ পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদের সপক্ষে, জাতিভেদ প্রথা ও অন্যান্য কুসংস্কারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়।"[৬৭]

সেই গ্রুপ বা গোষ্ঠী/সম্প্রদায়গুলির নাম: কর্তাভজা, বলরামী, খুশী বিশ্বাসী, সাহেবধনী, রামবল্লভী, জগমোহিনী, ন্যাড়া, সহজী, আউল, বাউল, দরবেশ, সাঁই, সংযোগী, যদুপাতিয়া প্রভৃতি। শ্রীদে আরও লেখেন : 'হিন্দুসমাজের নিচুতলার অব্রাহ্মণ সংস্কারকরাই কলকাতার বাইরে মফস্বল অঞ্চলে এই সব ধর্মীয় গ্রুপ গঠন করেন। অবশ্য কোনো কোনো গ্রুপের শাখা কলকাতাতেও ছিল।'

এইসব গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ওপর মুসলমান ভাব ও সাধনার প্রভাবও লক্ষ করা যায়; কবীর, দাদু প্রমুখেরও প্রভাব পড়ে। ইতিপূর্বেই আমরা নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে এই গোষ্ঠীগুলির সম্বন্ধ এবং তাদের প্রচারিত হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির ভাবাদর্শ সম্বন্ধে উল্লেখ করেছি। তাদের গণভিত্তি সম্বন্ধে বলার কথা এই কর্তাভজাদের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে অক্ষয়কুমার দত্ত জানান যে 'লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।' এবং এই সকল গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অমলেন্দু দে লেখেন—

> "...ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে ভারতবর্ষের সবটাই মধ্যযুগীয় তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল না। আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতি থেকে রস আহরণ করে অনেক সাধক ও সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটেছিল যাঁরা গ্রামবাংলায় আলো বিকিরণ করেছিলেন— এক উদার মানবতাবাদী ভাবধারা প্রচার করেছিলেন।..."[৬৮]

এবং আত্মসমালোচনা করে বলেছেন যে আমরা কলকাতা মহানগরীর শিক্ষিত ও নামী বাঙালিদের কথা মনে রেখেছি, গ্রামবাংলার সংস্কারকদের কথা মনেই রাখিনি, অথচ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহজ-স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনে এদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

অধ্যাপক অমলেন্দু দে গ্রামবাংলার ভাবাদর্শের ধারাটির আলোচনায় উত্তর বাংলার বাউল ও জিকির মণ্ডলের উল্লেখ করেছেন; এনেছেন রামমোহন রায়ের সমসাময়িক লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০)-র প্রসঙ্গ; তারপর অন্যান্য বাউলদের কথা; পরিশেষে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধার করেন : "এই গানের ভাষায় ও সুরে হিন্দু মুসলমানের কণ্ঠ মিলেচে, কোরান পুরাণে ঝগড়া বাধেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার প্রেরণা ইস্কুল কলেজের অগোচরে আপনা-আপনি কি রকম কাজ করে এসেচে, হিন্দু মুসলমানের জন্য এক আসন রচনার চেষ্টা করেচে, এই বাউল গানে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।"[৬৯]

বলার কথা এই যে বহু প্রচলিত উনিশ শতকের রেনেসাঁস বা নবজাগরণ বা তথাকথিত আধুনিকতার বিকাশ সম্বন্ধে বহু প্রশ্নই রয়ে গেছে। তবে উনিশ শতকের শুরুতে সম্প্রীতির যে বাতাবরণটি বঙ্গীয় সমাজের শহরে বা গ্রামে ছিল, প্রাক-উপনিবেশিক সংস্কৃতির ও জীবনধারার যে অবশেষটুকু মহানগরীতে উৎসবে-পার্বণে দেখা যেত তা প্রতীচ্যের ভাবাদর্শের এবং জীবনধারার অনুস্মৃতিতে অনেকটাই আড়ালে পড়ে গিয়েছিল। তবে মনে রাখতে হয়, উনিশ শতকের এই নবজাগরিত বাঙালি চেতনা থেকেই জন্মলাভ করেছিল স্বাদেশিকতা; বস্তুত বাংলার প্রগত অংশ এই পর্বের মধ্য-পর্যায়ই জাতির আত্মপরিচয় সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়: তার একটি ধারা, বলিষ্ঠ ধারাটি হিন্দুধর্মের সংস্কার-পুনর্জীবনে চালিত হয় প্রথমে রামমোহন রায় এবং পরে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে; আর অপর ধারাটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিত্বের অবদানে ভারতীয় তথা বাঙালি জাতীয় চেতনাকে সংগঠিত ও ঋদ্ধ করে। সেই ঋদ্ধি বাস্তবিকই ছিল ঈর্ষণীয় ও অভূতপূর্ব।

পাঠক লক্ষ করে থাকবেন, উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের প্রসঙ্গে আমরা একজনও মুসলমান বুদ্ধিজীবী বা সমাজসংস্কারকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি, বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠী সম্বন্ধে নীরবই থেকেছি। বস্তুত নবজাগরণের ভাবকল্পটির প্রতিকল্পক ভাবনা হিসেবেই বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবস্থান, বিকাশ, প্রতিক্রিয়া উপস্থাপন জরুরি। আর সে-কারণেই এমতো স্বতন্ত্র অধ্যায় রচনা।

আমরা জানি, পলাশির যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমান শাসকশ্রেণি থেকে শাসিত শ্রেণিতে পরিণত হয়— নবাব, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষ— বনেদি মুসলমানরা যেমন পুরনো গৌরব হারায় তেমনি রাজভাষা হিসেবে ইংরেজি প্রবর্তন ও ফারসি রহিত হলে রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা বিভাগে কর্মরত মুসলমানদের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে। সেই অবনমন প্রক্রিয়ায় একদা বিত্তবান বা সম্পন্ন মুসলমানরা অচিরে বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষে পরিণত হয়। উইলিয়াম উইলসন হান্টার তাঁর 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান' (১৮৭১) গ্রন্থে বাংলার মুসলমানদের অবনতির কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

"(ক) রাজ্য হারিয়ে মুসলমানরা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে; এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কাজ করেছে।

(খ) শাসক শ্রেণি হিসেবে নিষ্ফল অহংকার, যার ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সহিত খাপ-খাওয়াতে পারেনি।

(গ) রাজভাষা ইংরেজি শিক্ষা না করায় তারা সরকারি সওদাগরি চাকরির সুযোগ হারিয়েছে।

(ঘ) ধনীদের কাছ থেকে উৎকোচ, ভেট, অত্যধিক কর নিয়ে ইংরেজরা মূলধন আত্মসাৎ করেছেন। ফলে তারা দরিদ্র-দশায় পতিত হয়েছে।

(ঙ) প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বাঙালি হিন্দুদের কাছে পরাজিত হয়েছে।

(চ) জনশিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার স্থান না থাকায় তারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়েছে।"[৭০]

আর 'মোসলেম ক্রনিকল' পত্রিকায় জনৈক প্রবন্ধলেখক মুসলমানদের পতনের কারণ আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে—

(ক) মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে 'ভাববাদী' হয়ে ওঠে, তারা অতীতের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং তার গৌরবের কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করত; ইংরেজদের প্রভু বলে স্বীকার করতে পারেনি, ফলে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে দেরি হয়ে যায়।

(খ) চাকরি-বাকরি হারিয়ে যারা কৃষিকার্য গ্রহণ করেছিল, তারা অদক্ষতার কারণে কৃষিতে উন্নতি করতে পারেনি।

(গ) অর্থকরী ব্যবসায়ে তারা অমনোযোগী ছিল। সুদের ব্যবসা 'হারাম' (নিষিদ্ধ) বলে মহাজনি করতে বিরত হয়।

(ঘ) বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য গরিব হয়ে পড়ে।

(ঙ) ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, ফলে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনে।

(চ) সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে।"[৭১]

এক্ষেত্রে শেষোক্ত কারণটি— 'সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভ' ব্যর্থতার সঙ্গে প্রথম কারণটি— অতীতে 'গৌরবের কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ' যুক্ত হয়ে গিয়ে মুসলমান মানসে যে আত্মগত ও পরাভূত মনোভাব প্রকাশ পায় তা কিন্তু তৎকালীন হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রগত অংশ বা তথাকথিত রেনেসাঁসের মনীষীগণের চোখে পড়েনি। বস্তুত তাঁরা বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই— তাদের স্বতন্ত্র ধর্ম ও সমাজ-জীবন, তাদের পশ্চাৎমুখিতা নিরক্ষরতা বিষয়ে নীরবই থেকেছে; অথবা, বাঙালি জাতীয়তার অভিভাবে একরূপতায় দেখেছে। অন্যদিকে উপরতলার মুসলমানরাও নীচের

দিকে ফিরে ফিরে তাকায়নি, গার্ডেনরিচের মুর্শিদাবাদের নবাব, পরিবার, টালিগঞ্জের মহীশূরের রাজ পরিবার এবং মেটিয়াবুরুজের অযোধ্যার নবাব পরিবার— কেউই বাঙালি ছিলেন না— বাংলার সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মনোভাবও তাদের ছিল না; তাঁরা বৃত্তির টাকায় প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করেছেন। ঢাকার নবাব পরিবার ছিল উঠতি নব্য জমিদার; তাঁরা অর্থের জোরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও সমাজের হিতের জন্য বেশি কাজ করেননি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিছু কিছু মুসলমান সন্তান লেখাপড়া শিখে চাকরিতে প্রবেশ করতে থাকেন; ছোটোখাটো ব্যবসায়ে নামেন,— এদের সমবায়ে ক্ষীণকায় একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভবও লক্ষ করা যায়। প্রথম মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করেন; বস্তুত সেটি ছিল সামন্ত অভিজাত শ্রেণির সংগঠন,— তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাই হয়েছে সেখানে, বাংলার সাধারণ মুসলমানের ভালো-মন্দের কথা তাঁরা ভাবেননি। তারপর সৈয়দ আমির আলি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান অ্যাসোসিয়েশন' (১৮৭৮)-এর মাধ্যমে নবোদিত মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণিকে সংঘবদ্ধ করেন। 'বলতে গেলে, উনিশ শতক পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও উঠতি মধ্যবিত্তের মিশ্র নেতৃত্ব ছিল; কোনো কোনো সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাদের যৌথ প্রয়াস লক্ষ করা যায়, যেমন স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন, প্রেস ও পত্রিকা পরিচালনা, সভা-সমিতি গঠন ইত্যাদি। নতুন যুগের নতুন চেতনা ও উপলব্ধির সংঘাতে পুরাতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়।"[৭২] এবং সেই দ্বন্দ্ব,— রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে বাদানুবাদ সূত্রে আলোচিত হয় সমাজের দুর্গতির কথা এবং বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মনোভাব ও আচরণের কথা। সে-সবের সুষ্ঠু সমাধান খোঁজা ও দেওয়ার দায়িত্ব বর্তায় নব্যপন্থীদের ওপর। আর 'সমাজ-সংস্কার ও সমাজোন্নয়নের' প্রয়াস থেকেই জেগে উঠেছে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ।'[৭৩]

আর সেই জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্র নির্মাণে মুসলিম সমাজের দুর্গতির কারণ অনুসন্ধান শুরু হয়। 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) পুস্তকে শেখ আবদুস সোবহান বাংলার মুসলমান জমিদারদের পতনের কারণ হিসাবে তাদের বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা, দায়িত্বহীনতা ও শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতার কথা বলেছেন। জমিদারদের প্রতি তাঁর পরামর্শ : 'পরিশ্রম করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব বাঙ্গালা শিক্ষা করুন এবং পরিবারস্থ ছেলে-পিলেদিগকে জাতীয় বিদ্যা এবং রাজভাষার (ইংরেজির) সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষা দিউন।'[৭৪]

> 'ইসলাম প্রচারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বর্তমান অবনতির কথা বলা হয় এবং তৎসঙ্গে উন্নতির উপায় সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়। 'জাতীয় উন্নতি বিধানের উপায়' (সম্পাদক), 'মুসলমান জাতির অবস্থা' (ইসমাইল

হোসেন শিরাজী), 'আমাদের কর্তব্য' (সৈয়দ এমদাদ আলি), 'উন্নতির উপায় কি?' (শেখ ফজল করিম), 'আমাদের কি করা উচিত?' (এবনে মাতীজ), 'আমাদের অধঃপতন' (সম্পাদক ও মোজাম্মেল হক ইত্যাদি রচনায় এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।) আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ বলেছেন, বাঙালী মুসলমান রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাদপদ।"[৭৫]

এই পশ্চাদপদতা নিরসনে সমাজে যোগ্য ব্যক্তির অভাব কায়কোবাদ অনুভব করেছিলেন। তিনি তাঁর 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) কাব্যের 'উৎসর্গপত্রে' লেখেন—

"এই সুবিশাল বঙ্গভূমির যে দিকেই চক্ষু সঞ্চালন করি, সেই দিকে সেই একই দৃশ্য। সকলেই নিজেকে লইয়া ব্যস্ত; কেহই পরের দিকে— পরের অশ্রুসিক্ত মলিন মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, দেখিয়া দেখে না, সেই হা-হুতাশপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াও শোনে না। হায়, দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নিরাশার তীব্র নিষ্পেষণে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু একটি লোকও আমার মনের মতো মিলিল না। দুঃখ হইল, ঘৃণা জন্মিল; বাঙ্গালী জন্মে ধিক্কার দিয়া আমার এই ভগ্ন হৃদয় শান্তি লাভ করিল।"

আর শেখ ফজলল করিম বলেছেন : "শিক্ষার অভাবে লোকের রুচি, সভ্যতা ও অবস্থা এত অধোগামী হইয়াছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইতে নামিয়া এই দেশেই মজুরি খাটিতেছি।"[৭৬] এবং তারপর বলেন, সমাজে যা আছে, তা খল-নেতৃত্ব; তিনি চান সৎ নেতার নেতৃত্ব,— "জাতীয় একতার অভাবে সমাজিক বীর্যে যে তিমিরাবরণ পড়িয়াছে তাহা আমাদের পাণ্ডু কলুষিত নেত্রের পক্ষে কম কুহেলিকাচ্ছন্ন নহে। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া জাগিয়া উঠি— কর্মসাধনের পথের কঠোর বিপত্তিরাশি অতিক্রমের জন্য সচেষ্ট হই, তবে উন্নতি কত দূরে?"[৭৭]

'ধর্মের উষ্ণ রক্তস্রোত' সমাজে-দেহে প্রবাহিত করার প্রস্তাব করেন শেখ ফজলল করিম, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ প্রমুখ ব্যক্তিগণ,— 'বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইসলামের পবিত্রসীমা বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতেই আজ তাহাদের ঈদৃশ শোচনীয় দুর্দশা।' আবার অল্প-শিক্ষিত মোল্লাদের ধর্মান্ধতা সমাজের সর্বনাশ সাধন করে বলে কাজী ইমদাদুল হক মন্তব্য করেন। শিক্ষার অভাবে 'ধর্মজ্ঞান, কর্মজ্ঞান-সর্বজ্ঞান হারা' মুসলমান জাতি অদৃষ্টনির্ভর হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাই মুক্তির পথ— 'যে শিক্ষার স্রোতে আজ পৃথিবী প্লাবিত তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সভ্যতার সমীর হিল্লোলে নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে কেন আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না?'[৭৮] আবার 'মুসলমানের সর্বনাশ' নামে একটি প্রবন্ধে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা রাজনীতি সম্পর্কে মুসলমানদের উদাসীনতার প্রতি দোষারোপ করেছেন।[৭৯]

এই আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, উনিশ শতকের শেষপাদে এবং বিশ শতকের সূচনায় সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন বাঙালি মুসলমান লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণ। এবং মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শটিও ধীরে ধীরে অবয়ব পায়। তাঁদের লক্ষ্য ছিল পতনশীল সমাজের উন্নতি বিধান; কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ভাবাদর্শ অবলম্বন করে তাঁরা এগোতে পারেননি। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চেয়েছেন আবার তার সঙ্গে চেয়েছেন ধর্মশিক্ষাও। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ এই অবস্থাটির বর্ণনায় লিখেছেন :

"সমাজে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন নেতার অভাব ছিল; আবার 'ইয়ং বেঙ্গলে'র মতো ধর্ম ও সমাজের অচলায়তন বন্ধনগুলি ভেঙে দেওয়ার মতো কোনও নব্যদলেরও আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গে দগ্ধ হিন্দু সমাজের একটি অংশ যেভাবে নিকষিত হেমরূপ লাভ করেছিল, মুসলমান সমাজের বিশুদ্ধীকরণ ওইভাবে সম্পন্ন হয়নি। সমাজের নব্য চেতনার বীজ অতি মন্থরগতিতে সঞ্চারিত হয়েছে।"[৮০]

মন্থর গতিতে এগোলেও বিকাশমান মুসলিম সমাজকে অনিবার্যভাবে তাদের প্রতিপক্ষ হিন্দু সমাজের— পুনর্জাগরিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে অসম দ্বৈরথে নামতে হয়েছে। ডক্টর ওয়াকিল আহমদ তাঁর মূল্যবান গ্রন্থে 'হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক' উপশিরোনামে এ-বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তানের মুসলমানগণ হিন্দুদের হাত থেকে রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়ে এদেশের শাসকশ্রেণিতে পরিণত হয়েছে। আর রাজনৈতিক ক্ষমতা অপপ্রয়োগে সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে কলুষিত করেছে,— সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস মুসলমান শাসক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আওরঙ্গজেব মথুরার মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন; আলাউদ্দিন পদ্মিনীকে লাভের চেষ্টা করে হিন্দু পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করেন ঐতিহ্য সচেতন জাতির কাছে তা মর্মদাহের কারণ হতে বাধ্য। ধর্মাদর্শ ও আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে হিন্দুধর্ম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে; বিশেষত, পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে হজরত মহম্মদ নিরাকার একেশ্বরের উপাসনার প্রচলন করেন; আর হিন্দুরা মৃন্ময়-মূর্তির পশ্চাতে চিন্ময় পরমেশ্বরকে দেখেন, এক্ষেত্রে তত্ত্বগত ঐক্য থাকলেও ভিন্নতাও আছে "প্রচারশীল ইসলামধর্মের সাথে সনাতন হিন্দুধর্মের দ্বন্দ্ব ছিল বলেই বারবার আপোস বা ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা ভারতভূমিতে হয়েছে। স্বয়ং বাদশাহ আকবর 'দীন-ই-এলাহি' (১৫৮২) প্রচার করেছিলেন।" 'কবীর, নানক, দাদু, রজব, চৈতন্যদেব, লালন এই ধর্ম-সমন্বয়ের সাধক ছিলেন।'[৮১]

এ সকল দ্বন্দ্ব ও সমন্বয় নিয়েই এদেশের হিন্দু-মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসিত ভারতের আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, বহিরাগত মুসলমান শাসকবর্গ এদেশে এসে সমাজপত্তন করে এখানেই পাকাপাকি থাকেন এবং ভারতীয় হয়ে যান। ইংরেজরা কিন্তু এদেশকে কখনও হোম বা নিজ দেশ মনে করেনি; ফলে ইংরেজদের শাসন ও শোষণনীতিতে

ঔপনিবেশিক ছাপ পড়েছে; এবং নিপুণ দক্ষতায় তারা হিন্দু মুসলমান বিবাদমান দুই পক্ষকে প্রথমে রাজ্যজয়ের কাজে এবং পরে শাসন ও শোষণের কাজে ব্যবহার করেছে। ফলে, ইংরেজদের ক্ষমতা দখলে,—

> "হিন্দুর প্রভুর বদল হয়, মুসলমানের প্রভুত্ব যায়। প্রভুত্ব ও ক্ষমতা হারানোর বেদনা তাদের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ইংরাজদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দুগণ অগ্রগামী ও মুসলমানগণ পশ্চাদবর্তী হলেন। তাঁরা বিক্ষুব্ধ মুসলমান অপেক্ষা প্রলুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়েকে আত্মিক নির্বিষ, বিশ্বস্ত ও অনুগত মনে করলেন।"[৮২]

ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, ব্রিটিশ রাজের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে উদীয়মান হিন্দু নেতৃবৃন্দ ধর্ম সমাজসংস্কার শিক্ষাবিস্তারের আন্দোলন করেন। তাঁরা প্রথমে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ-বুদ্ধিবাদ-মানবতাবাদের আদর্শে এবং পরে বাঙালি ও হিন্দু-জাতীয়তাবাদের প্রচার করেন; এবং ইংরেজ পণ্ডিত ও ঐতিহাসিকদের প্রদত্ত মুসলিম-বিদ্বেষী ও পক্ষপাতমূলক বিবরণ অনুসরণে ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য রচনা করেন। যে-গানটি স্বদেশি যুগের বিপ্লবীরা গাইতেন,— 'স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়/দাসত্ব শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায়'— সেই গানটি রয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' (১৮৫৮)-এ আর রঙ্গলাল নির্ভর করেছেন টডের রাজস্থানের পুবকাহিনির ওপর। ঠিক সেভাবেই ইংরেজ ইতিহাসবিদরা সিরাজদ্দৌলাকে দুশ্চরিত্র, লম্পট, অত্যাচারী হিসেবে চিত্রিত করেছেন,; আর সেই চিত্রেরই বিম্বরূপ ফুটে উঠেছে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫)-এ। এমনকী আমাদের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজদের পরিবেশিত তথ্য অনুসরণে উপন্যাস লিখেছেন। ফলে কোনও কোনও মুসলমান চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে, মুসলমানদের হীন করে দেখানো হয়েছে। হিন্দুজাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ পর্বে এরকম ঘটনা বহু ঘটেছে; বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ'-এর পরিমার্জনায় ইংরেজের বদল মুসলমানের নাম বসিয়েছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' (১৮৭৮) নাটকে শুভসিংহের উক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ব্যবহৃত হয় : 'ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক, আমরা গাব না'। নাটকে কবিতাটি ব্যবহারের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ব্রিটিশ'-এর স্থলে 'মোগল' শব্দ বসিয়ে ইংরেজদের কোপানল থেকে বাঁচেন। কিন্তু এভাবে তিনি কঠিন আঘাত দিলেন প্রতিবেশী মুসলমানদের অন্তরে। সেই আঘাতের পরিণাম একুশ শতকের বাঙালিও পোহাচ্ছে।

আধুনিক শিক্ষালাভের পর বাঙালি মুসলমান যখনই নিজেদের কথা ভাবতে শিখেছেন— আত্মপরিচয় খুঁজছেন তখনই হিন্দুসমাজের এরূপ মনোভাব তাদের পীড়িত করেছে; তারা প্রতিবাদ করেছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ নয়, বিপরীত ভাবের কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার দ্বারা প্রতি-আক্রমণ করেছেন মুসলমান লেখকরা। তৎকালীন সাময়িক পত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় পক্ষর বাদ-প্রতিবাদ, দ্বন্দ্ব-কলহের বাণীরূপ

যেমন ধরা আছে তেমনি হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধেও মতামত ব্যক্ত হয়েছে। তৎকালে মিহির ও সুধাকর, ইসলাম-প্রচারক, কোহিনূর, নবনূর, হাফেজ ইত্যাদি পত্রিকা মুসলমানদের প্রতিবাদকে তুলে ধরেছিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তা-চেতনার উত্তরাধিকার বুঝতে আমরা কিছু কিছু প্রসঙ্গ উত্থাপন করব।

'ভারতী' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩০১) ভূতনাথ ভাদুড়ী 'শক্তিসাধনা ও তাহার পরিণাম' প্রবন্ধে একস্থানে মন্তব্য করেন যে, ইসলামধর্ম শক্তিরূপিনী রমণীগণকে বিলাসের উপাদানে পরিণত করেছিল। নবনূর এর সম্পাদক এমদাদ আলি প্রতিবাদ করে লেখেন : 'ইহা তো প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান নহে, ইহা মুসলমানের দেহে ইচ্ছাকৃত অস্ত্রাঘাত। লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি মুসলমান ধর্মের শ্লেষপূর্ণ সমালোচনায় অপব্যয় করিয়াছেন।... ইসলাম রমণীদিগকে যেসব অধিকার প্রদান করিয়াছে, অন্য কোনো ধর্ম তাহা করিয়াছে কি?' (নবনূর, বৈশাখ ১৩১০) 'ভারতী' পত্রিকায় (আশ্বিন, ১৩১০) প্রকাশিত 'রাজসেবায় হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধে পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, মুসলমানরা সরকারি চাকরি পান না শিক্ষাগত অযোগ্যতার কারণে, যারা কর্মরত আছেন, তারা রাজানুগ্রহেই আছেন। এর জবাব দেন নবনূর সম্পাদক; লেখেন, মুসলমানদের মধ্যে অযোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু সে সঙ্গে হিন্দু-আমলারও বঞ্চনা আছে আজকাল বহু কার্যেই শিক্ষিত মুসলমান কর্মপ্রার্থী উপস্থিত হন, কিন্তু এসব বিষয়ে লক্ষ্মী হিন্দুর প্রতি প্রসন্না। রেড ট্যাপিজম-এর প্রতাপ যথায় অক্ষুণ্ণ আছে, সেরূপ স্থলে সাদা মানুষ কর্মদাতা হইলেও মুসলমানের দাবি শূন্যে পর্যবসিত হয়। ...আত্মীয় বাৎসল্যরূপ অন্যায়টা হিন্দু রাজপুরুষগণই বেশি করিয়া থাকেন।' (নবনূর, অগ্রহায়ণ, ১৩১০)।

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষ'-এর ১৫শ ভাগে 'মুসলমান' ও 'মুসলমান ধর্ম' শিরোনামে মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলামধর্ম সম্পর্কে যে আলোচনা আছে তা তথ্যের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং বক্তব্যের দিক থেকে আপত্তিকর বিবেচনায় মোহাম্মদ ইসহাক এর প্রতিবাদে 'বিশ্বকোষে বসুজ' প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রথমেই অভিযোগ করে বলেন, 'তিনি (নগেন্দ্রনাথ) কতক ইসলামদ্বেষী খ্রিস্টান ইতিহাসবেত্তাদের, কতক অজ্ঞ গ্রাম্য কাটমোল্লাদের, কতক না-মাজহানিদের ও কতক শিয়াদের মত সংগ্রহ করিয়া তৎসহ স্বকপোলকল্পিত ঘৃণিত মত মিশাইয়া ইসলাম ধর্মকে একটি কদর্য পদার্থে পরিণত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।' (নবনূর, আষাঢ় ১৩১০) "মুসলমানের পতন সম্পর্কে বিশ্বকোষে লক্ষ্যভ্রষ্টতা, উদ্যমশূন্যতা, সুখানুষ্ঠান, পরকালে সুখপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহকালে নারী ও মদ্যে ভোগাসক্তি, কাফের দমন ও ধর্মান্তীকরণ ইত্যাদি কারণের কথা বলা হয়। প্রবন্ধকার এগুলির প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হয়নি, ধর্মের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যরাশিই ইসলামের সাফল্যের কারণ।

নগেন্দ্রনাথ বসু একটি পত্রে তথ্যগত ত্রুটির কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন।... তিনি বলেন, 'হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোনো বিদ্বেষ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার জানা নাই, সাহিত্যের যে অংশ জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি বা পোষণ করে, তাহা আমার ঘৃণ্যই। মুসলমান সম্প্রদায়কে আমি সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তাহাদের অপ্রীতিভাজন হওয়া আমার পক্ষে প্রীতিকর নহে।" (নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১)[৮২]

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভারতী' পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩১১) 'অনুকরণ ও অনুসরণ' প্রবন্ধটি লেখেন; সেখানে তিনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। তাঁর একটি উক্তি ছিল এরূপ : "তাঁহার (মহম্মদের) শিষ্যগণ যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছেন, তখন এই বলিয়া বাহির হইয়াছেন যে জগতের সকল জাতিকে এক ছাঁচে ঢালিব। অপরের যাহা কিছু, তাহা বিনষ্ট করিতে হইবে, কোরানে যাহা আছে, তাহাই প্রবর্তিত করিতে হইবে। এই আধ্যাত্মিক সংকীর্ণতাবশতই মহম্মদীয় শাসনশক্তি জগতে দাঁড়াইল না।" (নবনূর, মাঘ ১৩১১) 'ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামে একটি প্রবন্ধে ইমদাদুল হক ইসলামের 'আধ্যাত্মিক সংকীর্ণতার' অভিযোগটি খণ্ডন করতে কলম ধরেন। ইসলামের আধ্যাত্মিক নীতিসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা ইসলাম প্রচারের নির্দেশ কোরানে নেই। স্পষ্ট বলা আছে : "বল 'তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করিবে?' ইহাতে যদি সে গ্রহণ করে, সে সুপথ প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু যদি প্রত্যাখ্যান করে, তবে তোমার কর্তব্য শুধুই প্রচার করা। সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমদৃষ্টি।" (৩ সুরা ১৯ আয়াত)

হিন্দুদের লেখা গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য ইত্যাদিতে মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত ও মুসলমান সমাজকে অপমানিত করার যে প্রবণতাটা চলে আসছিল নবোদিত মুসলমানসমাজ এবার সরাসরি তার প্রতিবাদে শামিল হয়। এসব রচনাই যে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফাটল সৃষ্টি করেছে তাও তাঁরা স্পষ্ট বলেন।" ১৮৯৯ সালের মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স-এ সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী 'বাংলার মাতৃভাষা শিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধে বাংলার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে তিনি হিন্দুগণের মুসলিম বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, এ সভায় 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' একটি প্রস্তাবও পাশ করেন। তিনি তাঁর লেখায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, ক্ষীরোদচন্দ্র রক্ষিত, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকের মুসলমান বিদ্বেষমূলক রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন।"[৮৩] এগুলির অধিকাংশই বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছিল। জনাব চৌধুরী বলেন যে, এসব রচনা পাঠ করে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দু ছাত্রদের মনে বিরূপ ধারণা জন্মায়; আবার মুসলমান ছাত্রদের মনে স্বসমাজ সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার ভাব জন্মায়।

ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষে আপোসহীন তিনটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করা আবশ্যক, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা', শ্রীঅরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্র পালের

পরিচালনায় 'Bande Mataram' এবং ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ কৃত যুগান্তরের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপদের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ও অবর্ণনীয় আর্থিক কষ্টের সাথে পত্রিকা পরিচালনার দায়িত্ব তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন। তিনটি কাগজের তিন সম্পাদক রাজদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হন। যুগান্তর পত্রিকার 'সিদিশানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ' শীর্ষক নিবন্ধে পাওয়া যায়— 'বিগত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯০৭ হইতে আজ পর্যন্ত ইংরেজের আইনের হস্তে সিদিশান অভিযোগে নিম্নলিখিত সংবাদপত্রের প্রকাশক এবং প্রিন্টারদিগকে দণ্ডিত হইতে হইয়াছে—

(৫) "যুগান্তরের" সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যে "সশস্ত্র সিদিশান" প্রচারের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন— তাহা সকলেই জানেন।

(৬) শ্রীযুক্ত বাবু অরবিন্দ ঘোষ মহাশয়কে লইয়া "বন্দে মাতরম" সংবাদ পত্রের সম্পাদক বলিয়া যথেষ্ট টানাটানি করা হয়। যদিও কোনও প্রমাণ ছিল না। বিপিনবাবুকে সেই প্রসঙ্গে জেলে পাঠানো হয়। উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।

(৭) "যুগান্তর" আবার অভিযুক্ত হয়।...

(৮) "সন্ধ্যার" সম্পাদক স্বর্গগত ব্রহ্মবান্ধবও সিদিশানের দোষে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন। বিচারের পূর্বেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করায় আইনের কবল হইতে মুক্তিই পান। অত্যাচারীর হস্ত তাহার শরীর স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

[দ্বিতীয় বর্ষ ৪০ সংখ্যা; ৭ মার্চ ১৯০৮, ২৪শে ফাল্গুন শনিবার ১৩১৪; অগ্নিযুগের অগ্নিকথা 'যুগান্তর', সংকলক ও সম্পাদক অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পৃ. ৭৭০-৭৭১]

ইংরেজ সৃষ্ট হিন্দু মুসলমানের বিরোধ নিরসনে ও সম্প্রীতি রক্ষায় বন্দে মাতরম ও যুগান্তর বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণ করে ও ইংরেজের বিভাজন নীতি জনমানসের সামনে তুলে ধরে। এমনকী দাঙ্গা সংক্রান্ত খবরেও ইংরেজ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করে।' In its alarm Anglo-Indian turned for help to that turbulent Mahomedan fanaticism which they had so dreaded\ hoping to drive out poison by poison, they menaced the insurgent religion of Patriotism with the arming of Mahomedan Prejudices against what its enemies declared to be an essentially Hindu movement. The first fruit of this policy we have seen at Mymensingh, Serajgunge and Comillia.' [Bande Mataram-March 15, 1907; Sri Aurobinds Ashram Prakashen page ?16]

'হে ভারতীয় মুসলমানগণ! বিধাতা ভারতবর্ষকেই তোমাদের গৃহরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন, এই ভারতের মৃত্তিকা হইতেই তোমাদের জন্ম; তোমাদের ধর্মগ্রন্থে সেই সমুদ্র তীরবর্তী বৃক্ষাশ্রিত পক্ষীর উপাখ্যান স্মরণ কর, সেই পক্ষীর দৃষ্টান্তে স্বদেশ ধর্মের তাৎপর্য বুঝিয়া

লও। হিন্দু ভ্রাতৃগণের সহিত অবস্থান বিধাতার দ্বারাই বিহিত হইয়াছে, অতএব তাহাদের সহিত স্বদেশধর্মরূপ মিলনক্ষেত্রে সম্মিলিত হওয়াই শ্রেয়স্কর; ধর্মগত পার্থক্যের দোহাই দিয়া, পৃথকভাবে রাজনীতিক উন্নতির চেষ্টা করিয়া উভয়েরই গৃহ শত্রুর আনন্দের কারণ হইও না।' [গৃহবিবাদ, যুগান্তর ১ম বর্ষ ৩৮ সংখ্যা ১৮ই ডিসেম্বর ১৯০৬, ১লা পৌষ রবিবার ১৩১৬; অগ্নিযুগের অগ্নিকথা 'যুগান্তর', পৃ. ২২৩]

তৎকালীন সময়ে এই পত্রিকা দুটি প্রগতিশীলতায় নতুন মাত্রা যোগ করে। ১৯০৬ সালের ১৮ ডিসেম্বর (১লা পৌষ ১৩১৩) যুগান্তর পত্রিকায় এক প্রেরিত পত্রে জনৈক লেখক লেখেন '১৮৫৭ সালের সিপাহী যুদ্ধ, সিপাহী বিদ্রোহ নহে, সে যুদ্ধ ভারতবাসীর স্বাধীনতা লাভের প্রথম যুদ্ধ।' [অগ্নিযুগের অগ্নিকথা যুগান্তর, পৃ. ২০৩] পরবর্তীতে এই কাগজের ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে মিরাট শীর্ষক এক নিবন্ধে লেখা হয়— 'যে দিন ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু-মুসলমান ভয়ে সমবেদনা সূত্রে গ্রথিত হইয়া ধর্ম্মের ধ্বজা ভারতের আকাশে উড়াইয়াছিল; সেদিন স্মরণ করিলে তাহাদের শিরায় শিরায় আবার উত্তপ্ত শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকে। সে দিনের প্রতীক্ষায় "কমলাকান্ত" দিবস গণিয়া গণিয়া চলিয়া গিয়াছে; সে দিনের মূল মন্ত্র বন্দেমাতরম্ বিজয় শঙ্খ গগন মণ্ডলে বাজিয়া উঠিয়াছে; সে দিনের নামে শ্বেতাঙ্গ ইংরেজ শিহরিয়া ওঠে, আমি আজ তোমাকে সেই পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার— বেশীদিনের কথা নয় ইংরাজী সেই ১৮৫৭ অব্দের ঘটনা চিত্র খুলিয়া দেখাইব। [যুগান্তর দ্বিতীয় বর্ষ ৩৪ সংখ্যা ৪ঠা জানুয়ারী ১৯০৮ ১৯শে পৌষ শনিবার ১৩১৪; তদেব, পৃ. ৬৯৮]

রুশ বিপ্লবের প্রতিটি খবর সেই সময় এই পত্রিকা পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে তুলে ধরে, যা ভাবলে আজও আমাদের বিস্মিত হতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিদ্রোহ-বিপ্লব, এমনকী শ্রমিক আন্দোলন প্রসঙ্গে মার্কস-এর উক্তিও এই কাগজে বিবৃত হয়। লেখা হয়—

> 'বিপ্লবের উপকারিতা সকলের হৃদয়ঙ্গম হয় না— অথবা হইলেও সকলের সাহসে কুলায় না; সুতরাং এই পবিত্র বীরজনোচিত কার্য্য কয়েকজন দৃঢ়চিত্ত স্বার্থত্যাগী লোকের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। রুশিয়ার বিপ্লব অতি অল্প সংখ্যক লোকেই সমাধা করিতেছে।' [বিপ্লব তত্ত্ব : যুগান্তর ১ম বর্ষ ৪২ সংখ্যা ১৩ই জানুয়ারী ১৯০৭, ২৯শে পৌষ রবিবার ১৩১৩; তদেব, পৃ. ২৮২]

মুসলমান সমাজের একাংশ বঙ্গভঙ্গের পক্ষাবলম্বন করায় ও মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার কারণে, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি হয়। হিন্দু মুসলমান উভয়ে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হলে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠাতা খাজা সালিমউল্লা, ভ্রান্ত ধারণা নিরসন কল্পে এই কাগজে তাঁর লিখিত বিবৃতি জানান যে, জনরব উঠিয়াছে যে আমি হিন্দুগণের বিধবাদিগের বলপূর্ব্বক নেকা করিতে, তাহাদিগকে প্রহার করিতে এবং তাহাদের প্রতিমা ভাঙ্গিতে মুসলমান ভ্রাতাগণকে আদেশ করিয়াছি। আমি এতদ্বারা মুসলমান ভ্রাতাগণকে জানাইতেছি

যে এই জনরব সম্পূর্ণ মিথ্যা। দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা দুরভিসন্ধিমূলক হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ ভাবের উত্তেজনা করিবার নিমিত্ত এবং মুসলমানগণকে বিপদে ফেলিবার জন্য ইহা করিতেছে।... যখনই এইরূপ প্রচারকদিগকে আপনারা দেখিতে পান কিংবা এইরূপ প্রচারকগণ আপনার নিকট যায় তখনই আপনারা তাহাদের নাম-ধাম ইত্যাদি লিখিয়া আমাকে স্থানীয় পুলিশ কার্যকারগণকে এবং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে জানাইবেন।... অতএব আমি প্রিয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে এই প্রচারিত মিথ্যা জনরবের এবং এই সমস্ত অনিষ্টকর এবং আইন বিরুদ্ধ কার্যের উত্তেজনাকারী প্রকৃত ভণ্ড মোল্লাগণের বিষয় জানাইয়া দেওয়া ও সতর্ক করিয়া দেওয়া সঙ্গতবোধ করিয়া এই বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম।

খাজা ছালমউল্লা

নবাব ঢাকা

[মুসলমানগণের প্রতি ইস্তাহার, যুগান্তর দ্বিতীয়বর্ষ ২০ সংখ্যা; ৩০শে জুলাই ১৯০৭, ১৪ই শ্রাবণ রবিবার ১৩১৪, অগ্নিযুগের অগ্নিকথা যুগান্তর, পৃ. ৬১৭-৬১৮]

তৎকালীন সময়ে ঘনায়মান সাম্প্রদায়িক বিরোধের প্রেক্ষিতে, স্বাধীনতা আন্দোলন প্রসারের প্রয়োজনে হিন্দু-মুসলমান বিরোধের নিরসন অত্যন্ত জরুরি ছিল। যুগান্তর ব্যতীত অন্য পত্রিকার উক্ত বিবৃতি প্রকাশের মহানুভবতা ও চিন্তার ধীশক্তি ছিল না।

প্রসঙ্গত, সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরীর এমতো সমাজচেতনা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় সম্প্রচারিত হয়; এবং এ ব্যাপারে নেতৃত্ব দেয় নবনূর পত্রিকা। সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরীর লেখাটি পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।[৮৪] বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের গলদ থেকে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিদ্বেষভাব জন্মায় বলে হাতেমউল্লা-ও অভিযোগ তুলেছিলেন 'কোহিনূর' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১৩)। চতুর্থশ্রেণীর পাঠ্য 'বাংলার ইতিহাস' গ্রন্থের দৃষ্টান্ত তুলে তিনি লেখেন : "বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি মুসলমান ছাত্রের একরূপ কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।... হিন্দু ছাত্রগণ তাহাদের স্বজাতীয় লোকদিগের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে নানাবিধ জ্ঞান-লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জাতিকে একান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে শিখিয়া থাকে।"

সৈয়দ এমদাদ আলি বিরচিত 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' প্রবন্ধে (নবনূর, পৌষ ১৩১০) তৎকালীন বাঙালি শিক্ষিত মুসলমানের জাতীয় বেদনার উচ্চারণ ঘটেছে; "বঙ্কিমবাবু সর্বপ্রথম মুসলমান সমাজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহা সত্য। অনেক কংগ্রেস ভক্ত লেখককে যখন আমরা মুসলমান সমাজের আদর্শ খর্ব করিয়া গল্প ও গাথা রচনা করিতে দেখি, তখন কি আমাদের মুসলমানীয় গর্বে একটুও আঘাত অনুভব করি না?" তিনি আরও লেখেন : "কেবল এক রিজিয়া নাটক কেন, আজকাল নাট্যমঞ্চে অভিনীত বহু নাটকের মধ্যেই মুসলমানের প্রতি অজস্র বিষদগ্ধ বাক্য বর্ষিত হইতে দেখা যায়। যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কংগ্রেস করেন, কনফারেন্স করেন এবং বক্তৃতামঞ্চে

মুসলমানকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আবার গৃহে আসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন।" এরূপ রূঢ় ভাষাতেই শিক্ষিত হিন্দু নেতৃত্বের সমালোচনা সেদিন বহু মুসলমান লেখক করেছেন। তাঁরা কিন্তু একই সঙ্গে বিদ্বেষ ভাব পরিহারেরও প্রস্তাব করেছেন।

'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার' শিরোনাম প্রবন্ধে 'কেনচিৎ মর্মাহতেন হিতকামনা' ছদ্মনামে জনৈক লেখক লেখেন : "সাহিত্যরথী বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তদ্ সমাজকে চিরকলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছে এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা?... মুসলমানের নামে কুৎসা রচনা করিতে না পারিলে কি ঐতিহাসিক, কবি বা নাট্যকার হওয়া যায় না?"[৮৫] লেখকের চূড়ান্ত ক্ষোভের প্রকাশ,— 'সাহিত্য রাজ্যে ঘুষির বদলে ঘুষি যদি আমরাও দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারত ইতিহাসে ইসলাম-মস্তকের এমন শোচনীয় চর্বন কদাচ দেখিতে হইত না।" (নবনূর ভাদ্র, ১৩১০) ওইরকম আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়া তখন আরও বহু মুসলমান লেখকের মধ্যে প্রকাশ পায়; যেমন মোহাম্মদ ইসাহাক বলেন, 'যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে তাহাতে মুসলমানরাও পাল্টা গীত গাহিতে আরম্ভ না করিলে আর সমাজের মঙ্গল নাই, দেখিতেছি। (নবনূর; আষাঢ় ১৩১০) ওসমান আলি লিখেছেন, 'মানুষের হস্তে তুলিকা থাকিলে সিংহের চিত্র এইরূপেই অঙ্কিত হয়। কিন্তু সিংহও লেখনী ধরিতে শিখিয়াছে, একথা যেন স্মরণ থাকে।' (নবনূর; ফাল্গুন ১৩১০)

সুসংগঠিত হিন্দু জাতীয়তাবাদের সঙ্গে বিকাশমান মুসলিম জাতীয়তাবাদের এই বাদানুবাদের পর্বেও কিন্তু দুপক্ষের মধ্যে মিশন বা সমন্বয়ের প্রস্তাব ছিল। 'কেনচিৎ মর্মাহতেন হিতকামনা' ছদ্মনামের লেখকও তাঁর শানিত আক্রমণের শেষে লিখেছিলেন, 'বস্তুত আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত একতারই আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ তদ্ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় ভারতের মঙ্গল নাই।' (নবনূর; ভাদ্র ১৩১০)

তবে হিন্দু জাতীয়তাবাদের সেই জাগরণপর্বে মনোমোহন গোস্বামী তাঁর 'শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা' নাটকের ভূমিকায় নিঃশঙ্কচিত্তে লিখতে পারেন : 'ন্যায়পরায়ণ সর্বধর্ম প্রতিপালক সুসভ্য ইংরাজ রাজত্বে যাঁহারা পুত্রকলত্র বেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য।... এই গ্রন্থ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষ জাগাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে।" এরূপ নির্লজ্জ হিন্দু জাত্যভিমান এবং মুসলমান-বিদ্বেষ প্রচারের বিরুদ্ধে ইমদাদুল হক 'নবনূর' পত্রিকায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩১০ এবং আশ্বিন ১৩১২) কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করেন। ইমদাদুল হক ক্ষীরোদপ্রসাদ রচিত 'প্রতাপাদিত্য' (১৩০৩)-এর অভিনয় দেখেও প্রতিবাদ করেছেন। তাঁর বক্তব্য ছিল, হীন বা খল চরিত্র মুসলমান সমাজে

থাকতে পারে এবং তাতে মুসলমানের ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়, ক্ষোভের কারণ তখনই দাঁড়ায় যখন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করে সমাজের আদর্শকে ছোটো করা হয়। প্রতিবাদ জানিয়েও তিনি হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মধ্যে মিলনের আশা কামনা করেছেন। ইমদাদুল হক লেখেন : "যখন এত বড়ো বড়ো রাজনৈতিক বজ্র আমাদের উভয়ের মাথার উপর পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে, তখন আমাদের যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্ধিত হয়, তজ্জন্য অতীত ইতিহাসের ভালো অংশের যথাসাধ্য আলোচনা করা এবং উভয়ের জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ যাহাতে উভয়ের নিকট যথারীতি সম্মান লাভ করিতে পারে তাহার উপর বিধান করা কি কর্তব্য নহে?" (নবনূর; আশ্বিন ১৩১২)

ওসমান আলি সমন্বয়ের দিশায় লিখলেন 'হিন্দু মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' শীর্ষক একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ, 'কোহিনূর' পত্রিকায় সেটি চার সংখ্যায় প্রকাশ পায়। সেই প্রবন্ধে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত ও জাতিগত ভিন্নতা ছাড়াও 'ইংরাজজাতির ভেদনীতি' ও 'হিন্দু জাতীয়তার পুনরুত্থান'কে বিরোধ সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। জনাব আলির মতে, গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই, বিরোধের জন্মদাতা শহরের শিক্ষিত মানুষেরা। হিন্দু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকরা ইংরেজের লেখা বই থেকে তথ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনায় তৎপর হন, অথচ তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করে দেখেন না। তাঁদের হাতে 'দুর্দান্ত, নৃশংস অত্যাচারী, জাতিধর্ম নাশকারী, দুরন্ত যবন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতে লাগিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ প্রথমে ধূমায়িত হইয়া পরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে'। (কোহিনুর, মাঘ ১৩১০)

সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি অবিচার যে বাস্তবিকই চলছিল তা কোনও কোনও উদারচেতা ও সমন্বয়বাদী হিন্দু লেখকও স্বীকার করেছেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় খুঁজেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মনে করেন 'প্রভুশক্তির অপব্যবহার' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব' হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে। হিন্দু রচিত সাহিত্যে কেন মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে, তার জবাবে তিনি ওইরূপ যুক্তি দেখান।"[৮৬] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিচারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ 'প্রীতির অভাব'; 'নবনূর' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩১১) তিনি লিখেছেন : "হিন্দু সম্প্রদায় মুসলমানদিগের প্রতি এখনও প্রাণমন খুলিয়া ভালোবাসা জানাইতে শিখে নাই; মুসলমান সমাজও কাজে কাজেই ততটা মিশামিশি করেন না। ভালোবাসার বদলে ভালোবাসা মিলে।" রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, "হিন্দু লেখকগণ অনেক সময় মুসলমানের অযথা নিন্দা করিয়া লেখনীর অপব্যবহার করিয়াছেন তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চারিদিকে বিদ্বেষের আগুন আপনাদিগকে উত্তাপিত করিতেছে, ইহা প্রেমের বারিসিঞ্চনে নির্বাপিত করিতে হইবে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহা আমার 'জীবন-স্বপ্ন'।" (নবনূর; আশ্বিন ১৩১০) আর নির্মলচন্দ্র ঘোষ বলেছেন, "সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য

ক্ষেত্রে মধু ধারার সহিত এমন এক বিষধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে কতিপয় বিষগ্রাহী শিষ্য মুসলমানদ্বেষে অন্ধ হইয়া নির্ভয়ে ইতিহাসের সোনার অঙ্গে পদাঘাত করিতেছেন।... গুরুদেব কেবল উপন্যাস রচনা করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, শিষ্যসমাজের উপন্যাস তো আছেই আছে, তাহা ছাড়া তাঁহারা 'ঐতিহাসিকতত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক আবিষ্কার', 'ঐতিহাসিক চিত্রোদ্ধার' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাম দিয়া কল্পিত উপন্যাসে মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন।... (নবনূর; মাঘ ১৩২০) অন্যদিকে ধর্মগত, প্রকৃতিগত ও ভাবগত পার্থক্যের জন্যই হিন্দু-মুসলমান মিলন ব্যাহত হচ্ছে বলে জীবন্দ্রেকুমার দত্ত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। উভয়ের রাজনৈতিক স্বার্থ এক,— স্বাধিকার অর্জন ও ঔপনিবেশিক শোষণ রোধ; ফলত উভয়ের দায়িত্বও সমান আর সেই দায়িত্ব পালন শুধু উভয়ের মিলনেই সম্ভব। (নবনূর; অগ্রহায়ন ১৩১১)

সৈয়দ নওয়াব আলির গ্রন্থের আলোচনায় (ভারতী : কার্তিক ১৩০৭) রবীন্দ্রনাথ পূর্বাভাষ করেছিলেন, "বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দাই তাহা সমালোচক কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক. কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোনও সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।" পূর্বাভাষ ফলতে দেরি হল না,— 'সাহিত্য রাজ্যে ঘুষির বদলে ঘুষি' শুরু হয়ে গেল আর্জুমন্দ আলির 'প্রেমদর্পণ' (১৮৯৯)-এ। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করলেন, 'হিন্দু যোদ্ধাগণের সঙ্গে মুসলমান যুবতীর প্রেম নিয়ে হিন্দু লেখকগণ দীর্ঘদিন যাবত উপন্যাস লেখার সুবিধা পেয়ে আসছেন। এখন মুসলমান লেখকগণ মুসলমান ভদ্রসন্তানের সহিত হিন্দু যুবতীর প্রেম ও ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে উপন্যাস লিখেছেন। আর্জুমন্দ আলির 'প্রেমদর্পণ' এরূপ একটি দৃষ্টান্ত।" (মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত প্রেমদর্পণ, ঢাকা, ১৯৬৫, ভূমিকা) এবং এই ধারাটি অনুসরণ করেছেন; যেমন 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলি 'বিমলা' গল্পে হিন্দু বালিকা ও মুসলমান যুবকের প্রণয় দেখলেন। আর তাতে দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও সুধার' পত্রিকায় (৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০) আপত্তি তোলেন এই বলে যে, এতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাকে অপমান করা হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের বিভেদ-বিরোধের প্রকট রূপ ধরা পড়েছে গো-হত্যা ও গো-রক্ষা সমস্যায়। গো-হত্যা নিয়ে দাঙ্গা হয়েছে, খুন, মোকদ্দমা হয়েছে এবং সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে তা এক সাংঘাতিক স্পর্শকাতর ইস্যু হয়ে উঠেছে। মুসলমানরা গো-হত্যা করে কোরবানি উৎসব এবং সাধারণভাবে খাওয়ার জন্যে। অন্যদিকে হিন্দুরা গোরুকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করে, গো-হত্যা তাদের কাছে মহাপাপ। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো-হত্যা নিবারণী সভা' স্থাপন করে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। তারপর তা ক্রমশ

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস-এরও ইস্যু হয়ে ওঠে; এবং সাম্প্রদায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তা স্পষ্টত স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে ওঠে। সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মীর মোশারফ হোসেনের 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধটি (আহমদী; ১ শ্রাবণ ১২৯৫) প্রবল আলোড়নই শুধু তোলেনি বাঙালি জনমানেসের সুপ্ত চেতনারও প্রকাশ ঘটিয়েছে।

মীর মোশারফ হোসেন (১৮৪৭-১৯২২) ছিলেন এক উদারপন্থী, এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সমন্বয়বাদী লেখক। উক্ত প্রবন্ধটি লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি লেখেন : "ভারতের অনেক (স্থলে) গো-বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভাসমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজী, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধ সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজী পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এ সময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।" তিনি প্রস্তাব করলেন যে মুসলমানরা গো-কোরবানি বন্ধ করবে এবং গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করবে। তিনি বললেন:

> "এই রঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক— সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে-দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?"[৮৭]

'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে টাঙ্গাইলের অপর একটি পত্রিকা 'আখবারে এসলামীয়া' প্রতিবাদ করে; পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া মুসলমান,— ধর্মসভায় বক্তৃতা ও পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে তিনি মোশারফ হোসেনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'আখবারে এসলামীয়া'য় জনৈক পত্র-প্রেরক লেখেন : "সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। উপসংহারকালে একটি হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনি তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।"[৮৮] এসকল উক্তিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে মশারফ হোসেন তাঁর দ্বিতীয় প্রস্তাব 'গোধন কি সামান্য ধন' লিখলেন (শ্রাবণ ১২৯৫); সেখানে তিনি লেখেন, "অত্রস্থ কোনো মৌলবী মহামতির কথার আভাষে বুঝিয়াছি যে, ঐ কথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোনো কথা নাই। ঐ কথাটুকু আশ্রয় করিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধ্য। কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভাসমিতির ভয়ে, এ অত্যাচার, অন্যায়াচার, হৃদয় বিদারক, মর্মাহত ভীষণ ব্যাপার স্বরূপ গো-হত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব শিখিতে অধমের লেখনী ক্ষান্ত হইবে না।"[৮৯]

'আহমদী'তে শ্রাবণ সংখ্যায় লেখাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ২ ভাদ্র, ১২৯৫-এ টাঙ্গাইল

এক ধর্মসভা হয়; সেখানে টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী ও 'আখবারে এসলামীয়া'র সম্পাদক নঈমুদ্দীনের সহযোগী মৌলবি সুলতান আহমদ 'মোসলমান ধর্মসভার সভ্যগণের সম্মুখে' গোকুল নির্মূল-এর লেখক মশারফ হোসেনকে 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উপস্থিত সভ্যগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন। 'ভারতে গোবধ' শিরোনামে মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন; এবং সেখানে মোশারফ হোসেন ও আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর লেখার কঠোর সমালোচনা করেন। তাঁরও বিচার, 'এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি (মোশারফ) খোদাতালার সত্য-ধর্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করত, নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন।' তাঁর আর একটি মন্তব্যে প্রাণনাশের প্রচ্ছন্ন হুমকি আছে : 'এসলামী ধর্ম বিগর্হিত অন্যায় কথা শুনিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে?... অধিক কি বলিব, ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া থাকে ইহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।''[২০] 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' এরূপ ফতোয়ার বিরুদ্ধে মশারফ হোসেন টাঙ্গাইলের মুন্সেফ আদালতে মানহানির মামলা করলেন। এবং মৌলবাদীদের হুমকিকে তুচ্ছ করে 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা', 'গোধন কি সামান্য ধন', 'গোমাংস' ও 'গোদুগ্ধ' প্রবন্ধ চতুষ্টয় এবং 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত উল্লিখিত প্রতিবাদপত্রটি এবং একটি প্রবন্ধ একত্র করে মশারফ হোসেন 'গো-জীবন' (১৫ ফাল্গুন ১২৯৫) প্রকাশ করেন।

মোশারফ হোসেন-এর এবম্বিধ প্রস্তাবসমূহে বাঙালি মুসলমান সমাজ সেসময়ে কী পরিমাণে আলোড়িত হয়েছিল তার বিবরণ রয়েছে ড. ওয়াকিল আহমদ-এর গ্রন্থে। সাময়িক পত্র-পত্রিকায় পক্ষে-বিপক্ষে যেমন বহু লেখা ছাপা হয়েছে তেমনি জনমতও সংগঠিত হয়েছে। তবে উল্লিখিত মোশারফ হোসেন-এর দায়ের করা মানহানির মামলাটির শেষ পর্যন্ত আপোস নিষ্পত্তি ঘটে। কিন্তু তার ফলে গো-হত্যা সমস্যা দূরীভূত হয়নি; বাদ-প্রতিবাদমূলক বহু লেখা তার পরেও প্রকাশ পেয়েছে।

পরিতাপের কথা এই যে, উনিশ শতকের বাঙালি নবজাগরণের আলোচনায় বাঙালি মুসলমান সমাজের চিন্তা-চেতনার বিকাশ এবং দুই ধর্মসম্প্রদায়ের আন্তঃসম্পর্কের বিষয়টি মূল ধারার আলোচনায় প্রত্যাশিত গুরুত্ব পায়নি। মীর মোশারফ হোসেন-এর মতো অসংখ্য উদারপন্থী মুক্তমনা বাঙালি মুসলমানের কথা আলোচনাতেই আসে না। যেমন আসে না ছোটো ছোটো কৃষক বিদ্রোহের কথা, কাঙাল হরিনাথের কথা। মশারফ হোসেনের জীবনীকার জানাচ্ছেন : ''যে সকল প্রগতিশীল লেখক সাহিত্যকে কৃষক-সংগ্রামের অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন মীর মশারফ তাঁদের অন্যতম। তাঁর রচিত 'জমিদার দর্পণ' নাটকটির বিষয়বস্তু ছিল ১৮৭২-৭৩ খ্রিস্টাব্দের পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের কৃষক-বিদ্রোহ। এই নাটকের প্রচার বন্ধ করার চেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্রও ছিলেন, যদিও সাহিত্যিক হিসাবে মীর মশারফ অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রেয়, অক্ষয়কুমার সরকার ও বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত হন।''[২১] প্রসঙ্গত উল্লেখ

থাকে, মশারফ হোসেনের সাহিত্যগুরু ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। গুরু-শিষ্য দুজনেই সাধারণভাবে বিদ্যায়তনিক আলোচনায় উপেক্ষিত। সম্প্রতি কাঙাল হরিনাথ (হরিনাথ মজুমদার; ১৮৩০-৯৬)-কে বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে উদ্ধার করা হয়েছে (সৌজন্যে ড. অশোক চট্টোপাধ্যায়)। কাঙাল হরিনাথ বিরচিত 'হরি দিন তো গেল সন্ধ্যা হল—' গানটি বাঙালির মুখে মুখে ফিরছে, 'পথের পাঁচালি'-তে ইন্দিরা ঠাকুরুন গাইছেন, অথচ কাঙাল হরিনাথ সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা' পত্রিকা— সেই পত্রিকার পাতায় নীলকর ও জমিদার শ্রেণির কৃষক-শোষণের তথ্যনির্ভর কাহিনি প্রকাশ এবং তৎকালীন গ্রামবাংলার সমাজজীবনে তার প্রভাব কিংবা কাঙাল হরিনাথের আপসহীন নির্ভীক সাংবাদিকতা কোনওকিছুই বিদ্যায়তনিক আলোচনায় ওঠে না। তেমনি ওঠে না তাঁর ভাবশিষ্য মীর মোশারফ হোসেনের শাসক শ্রেণিবিরোধী নিরলস সংগ্রামের কথাও।

বস্তুত, উনিশ শতকের বঙ্গীয় নবজাগরণের মূলধারার আলোচনায় সমৃদ্ধিই ঘটবে যদি সেখানে প্রতাপের বা হেজিমনির রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কাঙাল হরিনাথের নিম্নবর্গের মানুষের পক্ষে সংগ্রাম কিংবা ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে গিয়ে মীর মশারফ হোসেনের 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাব উত্থাপন ও তাঁর সমন্বয়বাদী চিন্তাকে গুরুত্ব সহকারে বিচার করা হয়। আজ যখন নবজাগরণের লক্ষ্যার্থ নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে তখন নির্মোহ দৃষ্টিতে পুনর্বিচারে আপত্তি কোথায়।

সেই দৃষ্টিবীক্ষায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা বিচার করতে গিয়ে ড. ওয়াকিল আহমদ তাঁর গ্রন্থে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অক্ষয়কুমার সরকারের একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন :

> "বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ— একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক-পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলমানের ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।"[১২]

বাঙালি জাতীয়তাবোধের স্বপক্ষে এই উচ্চারণ তৎকালীন বাস্তবতায় নিঃসন্দেহে প্রসংসাই। আর মুসলমানদের উপরিউক্ত উচ্চমন্যতার পরিচয় ধরা পড়েছে ড. মুহম্মদ/এনামুল হক-এর উক্তিতেও,— "মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌববের গোরস্থানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানের ভাষা 'বাংলা কি উর্দু' সে বিচার লইয়া মশগুল। কিছুদিন পরেই সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা বাংলার

জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, বাঙালী মুসলমানের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী বাংলা'-ও নহে, একেবারে সরাসরিভাবেই উর্দু।"[১৩]

মোগল শিবিরে সেনাবাহিনীর মৌখিক ভাষা উর্দু সম্রাট শাহজাহনের আমলে (১৬২৬-৫৭) দরবারে স্বীকৃতি পায়। উত্তর ভারতের আঞ্চলিক হিন্দুস্থানি ভাষার কাঠামোয় আরবি বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি এবং আরবি-ফারসি শব্দমালা আত্মসাৎ করে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। 'প্রথমে কবি গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯), কবি হালি (১৮৩৭-১৯১৪) এবং পরে আলিগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮), শিবলী নোমামী (১৮৫৭-১৮১৪) প্রমুখের চেষ্টায় উর্দু সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।'[১৪] মোগল বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত বা নিযুক্ত নবাব-সুবেদার-মনসবদার-জায়গীরদার-আয়মাদার ও তাদের পরিবার পরিজন, সৈন্য ও ধর্মপ্রচারকরা মুর্শিদাবাদে এসেও উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলত। এদের সকলকে নিয়েই উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলমানের একটি গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। আধুনিক শহর হিসেবে কলকাতা গড়ে উঠলে জীবিকার সন্ধানে ব্রিটিশ ভারতের সব অঞ্চলের ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা এসে কলকাতায় ভিড় করতে তাকে; তাদের অনেকেই ছিল উর্দুভাষী। তাছাড়া ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের, ১৭৯৯ সালে মহীশূরের ও ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতন হলে বিদ্রোহ এড়াবার জন্য কোম্পানি ওইসব রাজপরিবারকে সরকারি ব্যয়ে যথাক্রমে কলকাতার গার্ডেনরিচে, টালিগঞ্জ এবং মেটিয়াবুরুজে এনে রাখে। তাদের সঙ্গে এসেছিল বহু সংখ্যক চাকর-বাকর, দাস-দাসী ও অনুগামী। এরা সকলেই ছিল উর্দুভাষী।

আবার ঢাকার নবাব পরিবার থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঞ্চলের বনেদি বা নতুন, উভয় শ্রেণির জমিদার বংশ-কৌলিন্য, সামাজিক প্রতিপিত্তি ও আর্থিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য তারা পুরনো মোগল-সংস্কৃতি ও উর্দুভাষা আঁকড়ে ধরেন। আরবি-ফারসি শিক্ষাকে তাঁরা সংস্কৃতিবানের শিক্ষা বলে মনে করতেন। এছাড়াও কিছু পরিবারে উর্দু ভাষা প্রচলিত ছিল।[১৫]

পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন কিন্তু সেখানে বংলার স্থান ছিল না। হান্টারের শিক্ষা কমিশনের কাছে তাঁর প্রস্তাবেও (১৮৮২) ছিল মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণির মুসলমানের শিক্ষার মাধ্যম হবে উর্দু আর গ্রামের নিম্ন শ্রেণির মুসলমানের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা।[১৬] এই প্রস্তাবের মধ্যেই তৎকালীন অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমান মানসের জটিল গঠনটি ধরা পড়ে। এভাবে তিনি বাংলার মুসলমানের ভাষার সঙ্গে জাতিকেই দুটি শ্রেণিতে ভাগ করে ফেলেছেন। অভিজাত ও মধ্যবিত্তদের জন্য উর্দু আর গরিব খেটে-খাওয়া বিপুল বাঙালির জন্য বাংলা; আবার সেই বাংলাকে আবার সংস্কৃত ভাষার উপরিকাঠামো থেকে সরিয়ে মুসলমানি করে নিতে হবে। বস্তুত, আবদুল লতিফের ধারণা সেকালের প্রভাবশালী সমাজপতিদের ধারণা। এর মধ্য দিয়ে শুধু সেকালের সাংস্কৃতিক

সংকটের স্বরূপই ধরা পড়ে না, বাংলার মুসলমান জনগোষ্ঠীর শ্রেণিবিন্যাস, এবং নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের প্রতি চূড়ান্ত অবজ্ঞাও ধরা পড়ে। উর্দুভাষী ধনবান এই উচ্চবিত্ত গোষ্ঠী, এবং তাদের সহযোগী নবোদিত মধ্যবিত্তরা গ্রামের চাষি-মাঝি, জোলা-কলুদের অবজ্ঞা করত তারা ধর্মান্তরিত মুসলমান বলে— তারা তাদের পূর্বতন হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের আচার-সংস্কার-বিশ্বাস আঁকড়ে ছিল, প্রতিবেশী হিন্দুদের সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কে জড়িত ছিল বলে। সেই বন্ধনের ঐতিহাসিক-সামাজিক শর্তটি ছিন্ন করার প্রস্তাবই দিয়েছিলেন আবদুল লতিফ! এই সাংস্কৃতিক সংকট সম্বন্ধে বদরুদ্দিন উমর বলেন :

> "বাংলাদেশের মুসলমানেরা আরও বেশ কিছুকাল মাতৃ ভাষাকে অবজ্ঞা করে শুধু আরবি, ফারসি, উর্দু জবান রপ্ত করার চেষ্টা চালালেন। তার ফলে ইংরেজ শাসনের নতুন কাঠামো এবং আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে জীবিকার উপযুক্ত সংস্থানের অভাবে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানেরা মাদ্রাসা-মক্তবে মৌলবিগিরি, মসজিদে ইমামতি, পির-মুর্শিদি ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হলেন এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও সংস্কৃতির প্রগতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করলেন।"[৯৭]

আর এই উর্দুভাষীদের কিছুটা মদত দিয়েছিল ইংরেজ শাসকরাও। একটি তথ্য সূত্রে জানা যায়, কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ (১৯০৩-১১) এডওয়ার্ড ডেনিসন রস একটি প্রস্তাবে বলেছিলেন : 'মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলে।'[৯৮] এ-কথা সমর্থন করলেন সভাস্থ সৈয়দ আলি, স্যার আবদুর রহিম, সৈয়দ শামসুল হোদা, দেলওয়ার হোসেন প্রমুখ বিশিষ্টজন। ফলে মিহির-এর সম্পাদক আবদুর রহিম সক্রোধে লেখেন : 'বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলিতে যাও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ওপাড়ার কয়েকজন নবাব বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার কবিরাজ ও অনেক বড় বড় x y z এঁরা পর্যন্ত ইহাকে এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই।'[৯৯] তীব্র বিদ্রূপের সঙ্গে মোজফফর আহমদ লেখেন : "আর একদল লোক আছে, যাহারা বক্রাক্ষর দেখিলেই আত্মহারা হইয়া যায়। অর্থাৎ আরবি অক্ষরে যাহাই লিখিত হউক না কেন তাহাদের নিকট তাহাই সত্য, তাহাই পবিত্র; উর্দু যখন আরবি অক্ষরে লিখিত হয় তখন ইহার সব কথাই ধর্মের কথা।.. আবার কেউ কেউ মনে করেন উর্দু-সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাই বাঙালি মোসলমান মাত্রেরই উর্দু শেখা উচিত। তাহা না হইলে তাঁহার ইসলামী সভ্যতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"[১০০]

কোনও কোনও বাঙালি লেখকও উর্দুকে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বা সর্বভারতীয় মুসলমানের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম মনে করতেন। আকরম খাঁ তা-ই বিবেচনা করতেন; তবে মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ খুবই আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন : উর্দু ভাষা না থাকিলে

আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয় ভাবহীন ও কীরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙ্গালা হওয়াতে বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তা বিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে।... বঙ্গের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মুসলমান সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক বাঙ্গালা লইয়া একেবারে মাটি।...”[১০১]

বাংলা-উর্দু ভাষা নিয়ে বিরোধটা ওইসময় কোন মাত্রায় পৌঁছেছিল তার এই আভাসিক পরিচয়ের পর বাংলার মুসলমান লেখকগণকে একটি অবস্থান বেছে নিতে হয়। 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে মীর মোশারফ হোসেন বলেন, “বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা বাঙ্গালা। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা, সে মানুষ নহে।' (দ্রষ্টব্য 'হিতকরা'; ১০ পৌষ ১৮৯৭) আর বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদই সম্ভবত প্রথম বঙ্গদর্শন-এর ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি লেখেন : “কোনো অধঃপতিত সমাজের বা জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে, তবে তাহা জাতীয় ভাষার সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। বঙ্গভাষা ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও তা ত্যাগ করা হইবে।... যাহাই বলুন না কেন? হিন্দু মুসলমান একই পাদপের দুইটি প্রধান শাখা বা একই দেহের দুইটি অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।” (দ্রষ্টব্য ইসলাম প্রচারক; জানুয়ারি ১৯০৩)

উপসংহারে আমাদের বলার কথা, আধুনিক যুগে প্রবেশ করেও বাংলার মুসলমান সমাজ নবযুগের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকেছে, আর তারই ফলে অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়েছে। ড. ওয়াকিল আহমদ লেখেন : 'সমাজজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধর্মজীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর্থিক জীবন বিধ্বস্ত, শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত, সাংস্কৃতিক জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট, রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন। জাতির এরূপ ভগ্নদশা ও দুরবস্থা থেকেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেন।'[১০২] তারপর ড. আহমদ মুসলিম জাতীয়তাবাদের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনায় লেখেন:

> “উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে; দ্বিতীয়ার্ধে এই রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যায়। আঞ্চলিক ও সামরিক ছোটোখাটো বিদ্রোহ ছাড়া তিনটি বড়ো ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ হয়েছে; সেগুলি হল ওয়াহাবি আন্দোলন, ফারায়েজি আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ। ওয়াহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চলভিত্তিক ছিল। ফারায়েজি আন্দোলন মূলত বাংলাদেশে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষক আন্দোলন ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয়; গ্রাম-শহরের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে ছিল। উভয়ই একান্তভাবে মুসলমানের আন্দোলন ছিল; হিন্দুগণ আন্দোলনের সম্পূর্ণ

বাইরে ছিলেন।... সিপাহী বিদ্রোহ ছিল সর্বভারতীয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম— ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভু ও বঞ্চিত দেশীয় সিপাহীর মিলিত সংগ্রাম।"[১০৩]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের রাজনৈতিক-সামাজিক ইতিহাসের গতিধারা, ইংরেজ শাসনের চরিত্রবদল, বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির হিন্দু ও মুসলমান অংশের গঠন ও এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিষয়ে ড. আহমদ লেখেন :

"হিন্দু মধ্যবিত্তের ও মুসলমান মধ্যবিত্তের বিকাশ সমকালে সমতালে এবং সমপরিমাণে না হওয়ার দরুন সরকারি সুযোগ-সুবিধা লাভের ও ভোগের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জেগে উঠে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিন্নমুখী ও ভিন্নগামী হয়। সুতরাং হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিতে ঐক্য স্থাপিত হয়নি।"[১০৪]

বাংলার সম্প্রীতি : বঙ্গভঙ্গের সময় কাল

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ ঝরছে মায়ের দু'নয়ান
আজ, এক করে দে সন্ধ্যা নমাজ
মিশিয়ে দে আজ বেদ-কোরান! (রজনীকান্ত সেন)

এবং বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫)-কে কেন্দ্র করে সেই অনৈক্য প্রকট হয়।

বাংলার হিন্দু-মুসলমানের ভেতর বিরোধ বাধিয়ে রেখে নির্বিঘ্নে শাসন করার দুরভিসন্ধি নিয়ে ইংরেজ তথাকথিত প্রশাসনিক সুবিধের নামে বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব করে। সরকারের তরফ থেকে বলা হয় যে সমগ্র বঙ্গপ্রদেশ (ছোট নাগপুর ও ওড়িশা সহ) একজন শাসকের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন। "ইংরেজ যে কারণটিকে মূল প্রস্তাবের অঙ্গীভূত করে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছে তা হলো, বঙ্গভঙ্গের ফলে একটা আলাদা মুসলিম প্রদেশ হবে, যা তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ মুসলমান সমাজকে আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে এগিয়ে আসতে সহায়তা করবে। এই কারণটিই শেষ পর্যন্ত গোটা আন্দোলনকে একটা আত্মঘাতী পথে টেনে নিয়ে যায়-— যা ইংরেজ অভিপ্রায়ের পরিপূরক।"[১০৫] উক্ত গবেষক নির্মোহ ভঙ্গিতে লিখেছেন :

> "তিনটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে লর্ড কার্জন এই কাজটি করেছিলেন। এক, বাঙালি মধ্যবিত্ত হিন্দুসমাজের ক্রমবর্ধমান আন্দোলন-প্রবণতার মূলে বাধা সৃষ্টি করা। কারণ এতে একটা আলাদা মুসলিম প্রধান প্রদেশ (পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ) সৃষ্টি হবে এবং হিন্দুঅধ্যুষিত প্রদেশে (পশ্চিমবঙ্গ, ছোটনাগপুর ও ওড়িশা) বাঙালি শিক্ষিত হিন্দুসমাজ সংখ্যালঘুতে পরিণত হবেন— যাঁরা এখন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা বিরাট হুমকি স্বরূপ। দুই, হিন্দু-মুসলমানের ভেতর স্বার্থের সংঘাত সৃষ্টি করে পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা। এতে অন্য অর্থে ইংরেজ শাসনতান্ত্রিক সুবিধে পেতে পারে। তিন, আসামের চা-প্রধান অঞ্চল এবং পূর্ববঙ্গের পাট-প্রধান অঞ্চলকে একই শাসনকাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করা।"[১০৬]

১৬ অক্টোবর ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ বিধিবদ্ধ হল।

আর অঙ্গচ্ছেদের কথা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী এক প্রবল

আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শিক্ষিত অগ্রসর হিন্দুসমাজ বঙ্গভঙ্গকে কোনওভাবেই মেনে নিতে চাইলেন না, বিশেষত যখন বাংলায় শাসন-পরিষদ গঠনের কথা চলছে সেই সময়েই পশ্চিমবঙ্গে বিহার ও ওড়িশাবাসীদের দ্বারা এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান ও অসমীয়াদের দ্বারা তাদের সংখ্যালঘুতে পরিণত হতে হচ্ছে! তারা তাদের ক্ষোভ জানাতে থাকে ছোটো-বড়ো জনসভা ও বিক্ষোভের মধ্য দিয়ে। ১৬ অক্টোবর প্রতিরোধ দিবস হিসেবে পালিত হয়। 'উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখিবন্ধন'-এর প্রস্তাব দেন রবীন্দ্রনাথ আর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী দিলেন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশের জন্যে 'অরন্ধন পালনের' আহ্বান। জাতীয় শোকের প্রকাশ হিসেবে সেদিন বাঙালি উপবাস পালন করবেন, এবং স্থির হয় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি কবতে করতে সকলে গঙ্গাস্নানে শুদ্ধ হয়ে আন্দোলন সূচনা করবেন। হলও তাই। ১৬ অক্টোবর (১৯০৫) হরতাল পালিত হল; রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি সহযোগে বিশাল শোভাযাত্রা বেরুল।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-বিরোধী জনরোষ বাংলায় জমাট বাঁধে এবং অভূতপূর্ব এক গণজাগরণের সূচনা হয়। আর তাতেই এদেশে বিলাতি পণ্য-বর্জন তথা স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত। কিন্তু ভাবাবেগ তাড়িত এই আন্দোলন ধীরে ধীরে ধর্মীয় রূপ লাভ করে। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই আন্দোলনে তীব্রতার কারণ হিসেবে 'বিদেশের দ্রব্য বর্জনকে হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত করা এবং মন্দিরে দেবমূর্তির সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করা'-র কথা উল্লেখ করেছেন।[১০৭] তবে এই আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য অবদান হল জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যন্তরে চরমপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি এবং সেটা সুরাট অধিবেশনে (১৯০৭) চূড়ান্ত রূপ পায়। ফলত স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ জুড়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে।

তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হয়, স্বদেশি আন্দোলন বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বিশ শতকে ব্যাপকতা লাভ করলেও তার সূচনা ঘটেছিল উনিশ শতকেই।[১০৮] "এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য হল জনজীবনের বিভিন্ন স্তরে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করা এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ভেতর দিয়ে অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি করা। 'সঞ্জীবনী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা' প্রথম বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করে এবং 'হিতবন্ধু' অর্থনৈতিক চাপে কাজ হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে এত ব্যাপক আকার ধারণ করে যে, সমাজের নিম্নস্তরের শ্রমজীবী মানুষ মুচি, ঠাকুর, চাকর, ধোপা প্রমুখের ভেতরও ছড়িয়ে পড়ে। এই আন্দোলনের ফলে শুধু বিদেশি পণ্যই বর্জিত হল না, বিদেশি শিক্ষার স্থলে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠল এবং চারিদিকে জাতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল।"[১০৯] আর এমতো জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সুবোধচন্দ্র মল্লিক এক লক্ষ টাকা দান করলে কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করে। বিখ্যাত জননেতা বিপিনচন্দ্র পাল সিলেটে জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করলেন; আর অরবিন্দ ঘোষ বহু

টাকার চাকরি ত্যাগ করে নামমাত্র বেতনে জাতীয় কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করলেন। 'এভাবে গোটা আন্দোলনটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জাতীয় আন্দোলনে পর্যবসিত হয়।'

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে স্পষ্টত তিন ধরনের মনোভাব কাজ করেছে। প্রথমত, মুসলমান বুদ্ধিজীবীদেব এক বড় অংশ— আবদুর রসুল, আবদুল হালিম, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মজিবুর রহমান খাঁ, মওলানা আকরাম খাঁ, মওলানা ফররোখ আহমদ নেজামপুরী, আবদুল কাশেম, লিয়াকৎ হোসেন ব্যক্তিবর্গ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে প্রত্যক্ষত যোগদান করেছিলেন। তাছাড়া মহমেডান ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন, সেন্ট্রাল মহমেডান অ্যাসোসিয়েশন-এর সেক্রেটারি আমির হোসেন এবং মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশেন-এর সভাপতি খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ প্রভৃতি সংস্থা ও ব্যক্তি ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী মনোভাব ব্যক্ত করেছে। বহুল প্রচারিত 'মোসলেম ক্রনিকল' পত্রিকাটি এই সময়ে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন সম্বন্ধে সংবাদাদি পরিবেশন করে পাঠক সাধারণকে সচেতন করায় উদ্যোগ নিয়েছিল। খায়েরুন্নেসা নাম্নী জনৈকা মহিলা এই সময়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে বিদেশি দ্রব্য বর্জন আন্দোলনে অংশগ্রহণের জন্য মুসলিম নারীসমাজের কাছে আবেদন রাখেন। উল্লিখিত 'প্রতিরোধ দিবসে' (১৬ অক্টোবর) কলেজ স্কোয়ারের সমাবেশে পাঁচ শতাধিক মুসলমান শ্রোতা উপস্থিত ছিলেন।[১১০]

দ্বিতীয়ত, বঙ্গভঙ্গের ন্যায্যতার প্রশ্নে যে বিতর্ক ও আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সেখানে সাধারণভাবে মুসলমানরা ছিল নীরব বা অনুপস্থিত। তাদের অনেকেই তৎকালীন জটিল রাজনৈতিক ঘটনাক্রম ও সেগুলির সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল। আর এই অজ্ঞতা ও নিষ্ক্রিয়তা বিশেষভাবে লক্ষ করা গেছে বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার ও বর্জনের প্রশ্নে।

শেষত, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং তার উপজাত স্বদেশি ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সরাসরি বিরোধিতা করেছে। তার সঙ্গত কারণ ছিল। "...মুসলমানেরা যখন শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর তখন তুলনামূলকভাবে অগ্রসর সমাজের প্রতি ক্ষোভ, ভয় বা ঘৃণা থাকা স্বাভাবিক। এই অবস্থায় বঙ্গভঙ্গ তাদের মনে আশার সঞ্চার করেছে, তাদের সামনে ভবিষ্যৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের পথ খুলে দিয়েছে। এবার তারা কোনোপ্রকার প্রতিযোগিতা ছাড়াই নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার সুযোগ পাবেন। ...অন্যদিকে সমসাময়িক হিন্দু নেতৃবৃন্দ বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের অন্তরালে যে ধর্ম ও সম্প্রদায়বোধ প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন তা মুসলমানদের এই আন্দোলনের বিরোধী করে তোলার পথে সহায়তা করেছে।"[১১১] বাস্তবত, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে তখন হিন্দু মুসলমান উভয়েরই বিকৃত ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটেছিল; আর সেই বিকৃতি বিদ্বেষের সুযোগ নিয়েছে ইংরেজ। অধ্যাপক অমলেন্দু দে মনে করিয়ে দেন : "এমনকী অধিকাংশ তফশিলি হিন্দুরাও এই স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দেননি। পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে নমঃশূদ্র জাতি হিন্দুসমাজের

কঠোর জাতিভেদ প্রথার ফলে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের প্রতি বিরূপ ছিলেন। তাই এই আন্দোলনকে তফশিলি হিন্দুরা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যাপার মনে করে তা থেকে দূরে থাকেন।"[১১২] শুধু তাই নয়, নমঃশূদ্র জাতি নিজেদের উন্নয়নকল্পে ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতায় উদ্যোগী হয়।

বঙ্গভঙ্গের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ফলপ্রাপ্তি আপেক্ষিক হলেও স্বদেশি আন্দোলন মুসলমানদের আর্থিক নিরাপত্তা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দের ওপর প্রত্যক্ষভাবে আঘাত হেনেছিল কারণ, বাংলার গ্রামের চাষি-মাঝি, কলু-জোলা-শ্রমজীবী মুসলমান জনগোষ্ঠী ছিল খুবই গরিব; আর যারা ছোটো ব্যবসা করত তারাও ছিল স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ী,— এক হাটে মাল কিনে অন্য হাটে বেচত। এরা বিদেশি দ্রব্যও কেনাবেচা করত। বিদেশি দ্রব্য বর্জনের ফলে তাদের ওপর এসে সরাসরি আঘাত পড়ে— তাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। এসব আন্দোলন ওই সকল মুসলমান ছোটো ব্যবসায়ীদের কাছে 'অমানুষিক জোরজুলুম ও অত্যাচার' বলে মনে হয়েছিল।

স্বদেশি আন্দোলনে হিন্দুধর্মীয় প্রাধান্য মুসলমান মানসে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ঘটিয়েছে। সেদিনের বিশিষ্ট চিন্তানায়করাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, শিবাজী উৎসব বা মুসলমান ধর্মবিরোধী এই প্রকার উৎসবকে তিলক, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব প্রমুখ চরমপন্থী নেতারা "সেদিন প্রাণপণ করিয়া যেরূপভাবে জাতীয়তাবাদের বেদিতে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, তাহাকে তো ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ বলিতে পারি না। এই নূতন জাতীয়তাবাদ পৌরাণিক হিন্দুদের উপর প্রতিষ্ঠিত।"[১১৩]

প্রসঙ্গত, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সে-কথা আমরা আগেই বলেছি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আঙ্গিক সম্বন্ধ গড়ে তোলার লক্ষ্যে তাঁর রাখিবন্ধন উৎসবের কথাও বলা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর আত্মচরিতে রবিকাকার সেদিনের উন্মাদনার স্মৃতিরোমন্থন করে লিখেছেন : "...পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি ধীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখি পবিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানের হাতে রাখি পরালে— এইবার একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কি! রাখি পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব কাণ্ড দেখে। আসছি, হঠাৎ রবিকাকার খেয়াল গেল চিৎপুরের বড়ো মসজিদে গিয়ে সবাইকে রাখি পরাবেন। হুকুম হল চলো সব। এইবারে বেগতিক— আমি ভাবলুম, গেলুমরে বাবা মসজিদের ভিতরে গিয়ে মুসলমানদের রাখি পরালে একটা রক্তারক্তি ব্যাপার না হয়ে যায় না। তার উপর রবিকাকার খেয়াল, কোথা দিয়ে কোথায় যাবেন, আর আমাকে হাঁটিয়ে মারবেন। আমি করলুম কী, আর উচ্চবাচ্য না করে যেই না আমাদের গলির মোড়ে মিছিল পৌঁছল, আমি সট করে একেবারে নিজের হাতের মধ্যে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। রবিকাকার

খেয়াল নেই, এগিয়ে চললেন, মসজিদের দিকে, সঙ্গে ছিল দিনু সুরেন আরো সব ডাকাবুকো লোক।...

...আমরা সব বসে ভাবছি— এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা বাদে, রবিকাকারা সবাই ফিরে এলেন। আমরা সুরেনকে দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলুম, কী কী হলো সব তোমাদের। সুরেন যেমন কেটে কেটে কথা বলে। বললে, কি আর হবে, গেলুম মসজিদের ভিতরে, মৌলবি-টোলবি যাদের পেলুম হাতে রাখি পরিয়ে দিলুম। আমি বললুম আর মারামারি। সুরেন বললে, মারামারি কেন হবে— ওরা একটু হাসল মাত্র।"

পরে আবার আক্ষেপ করে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছেন,— 'এখন হলে— এখন করতো দেখিনি, মসজিদের ভিতর গিয়ে রাখি পরাও তো— একটা মাথা ফাটাফাটি কাণ্ড হয়ে যাবে।...'

বাঙালি জাতীয়তাবোধে আবেগতাড়িত রবীন্দ্রনাথ গান বেঁধেছেন, মিছিলে হেঁটেছেন, বক্তৃতা করেছেন ঠিকই কিন্তু স্বদেশি আন্দোলনের নঞর্থক দিকগুলিও তাঁর সজাগ চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসের কাহিনিবিবরণে ও বয়ানে বাস্তবত রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি আন্দোলনের ব্যবচ্ছেদই করেছেন। '...একটা বড়ো চৌকির ওপর বসিয়ে দশ-বারোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম! বন্দে মাতরম্।' শ্লেষাত্মক এই উপস্থাপনার পর 'নিখিলেশের আত্মকথা'য়—

> "...এমন সময়ে স্বদেশির বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে-সব ছেলে কলকাতার স্কুলে-কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিল। তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশি-প্রচারে মেতে উঠল।"

'সন্দীপের আত্মকথা'য় পাঠক পড়েন :

> "তারপর নুন-চিনি-কাপড়ের লড়াইয়ের খবর।... কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে, চলো রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম ব্যোম!
>
> খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে-সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেছে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তরটিপুনি দিচ্ছে। মাড়োয়ারিরা বলছে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানছে না।"...

এরপর বাগ-না-মানা মিরজানের নৌকা ডোবে; এবং অসহায় মিরজান বলতে বাধ্য হয়: 'এখন আমার হুঁশ হয়েছে, এবারকার মতো কসুর যদি মাপ করেন—।'

স্বদেশি আন্দোলনের নঞর্থক দিকের এমতো আখ্যানিক উদ্‌ঘাটনের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ 'রাজা প্রজা' (১৩১৫) সংকলনভুক্ত 'পথ ও পাথেয়' নিবন্ধে লিখেছিলেন :

"আমরা সাধ্যমত বিলাতি পণ্যদ্রব্য ব্যবহার না করিয়া দেশীয় শিল্পের রক্ষা ও উন্নতিসাধনে প্রাণপণে চেষ্টা করিব, ইহার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলিব এমন আশঙ্কা করিবেন না। বহুদিন পূর্বে আমি যখন লিখিয়াছিলাম—

'নিজহস্তে শাক অন্ন তুলে দাও পাতে,

তাই যেন রুচে—

মোটা বস্ত্র বুনে দাও যদি নিজ হাতে,

তাই লজ্জা ঘুচে—

তখন লর্ড কার্জনের উপর আমাদের রাগ করিবার কোনো কারণই ঘটে নাই এবং বহুকাল পূর্বে যখন স্বদেশি ভাণ্ডার স্থাপন করিয়া দেশি পণ্য প্রচলিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম তখন সময়ের প্রতিকূলতার বিরুদ্ধেই আমাদিগকে দাঁড়াইতে হইয়াছিল। তথাপি দেশে বিদেশি পণ্যের পরিবর্তে স্বদেশি পণ্যের প্রচার যত বড়ো কাজই হউক লেশমাত্র অন্যায়ের দ্বারা তাহার সমর্থন করিতে হইবে এ কথা আমি কোনোমতেই স্বীকার করিতে পারি না।" (র. র.; খণ্ড ৫; বি-ভা (সুলভ); পৃ. ৬৭৪)

আর সে কারণেই সম্ভবত চন্দ্রনাথবাবু বা মাস্টারমশাই-এর কণ্ঠে আমরা শুনি—

"...তোমাদের মনে রাগ হয়েছে, জেদ হয়েছে, সেই নেশায় তোমরা যা করছ খুশি হয়ে করছ। তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দু-পয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিনছ ওরা তো বাধা দিচ্ছে না। কিন্তু ওদের তোমরা যা করতে চাচ্ছ সেটা কেবল জোরের উপরে।... কিন্তু ওই গরিবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয় পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার।..." (ঘরে বাইরে)

তারপর ক্রোধ হিংসা ও গণবিকার অসহনীয় হয়ে উঠলে কোলাহলমুখর জনজীবন থেকে নীরবে সরে গেলেন রবীন্দ্রনাথ; রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে এক চিঠিতে এই সময়ে তিনি লেখেন : "উন্মাদনায় যোগ দিলে কিয়ৎ পরিমাণে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতেই হয়, এবং তাহার পরিণামে অবসাদ ভোগ করিতেই হয়। আমি তাই ঠিক করিয়াছি যে অগ্নিকাণ্ডের আয়োজনে উন্মত্ত না হইয়া যতদিন আয়ু আছে, আমার এই প্রদীপটিকে জ্বালিয়া পথের ধারে বসিয়া থাকিব।"[১১৪]

আবার স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল সেটাও ছিল একই রকমের হিন্দুধর্মের বিধান অনুসারী। রশীদ আল ফারুকী লিখেছেন : "হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযমী থাকিয়া পরের দিন গঙ্গাস্নান করিয়া... ধূপ

দীপ নৈবেদ্য চন্দনাদি সাজাইয়া ছন্দোগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে গীতা স্থাপন করে যাতে দীক্ষা নেওয়া হয় তাতে মুসলমানের অংশগ্রহণের কোনো উপায় নাই।''[১১৫] হিন্দু পুনরুত্থানবাদীদের প্রশ্রয়ে পুষ্ট সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন— তাঁদের 'হর হর ব্যোম ব্যোম' বা 'বন্দে মাতরম্' স্লোগান তাই কোনোভাবেই বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীকে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি; তবে পরবর্তীকালে যখন আন্দোলনটিতে ধর্মীয় অভিভাবের হ্রাস ঘটে তখন বেশ কিছু দেশপ্রেমিক মুসলমান তরুণ ওই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। বিপরীতক্রমে, যে ফরাজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনকে এদেশে সংঘটিত প্রথম সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বলে আখ্যায়িত করা হয় সেই আন্দোলনও বাস্তবত ছিল মুসলিম ধর্মবোধের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

বঙ্গভঙ্গ রদ হয় ১২ ডিসেম্বর ১৯১১ সালে।

বাংলার সম্প্রীতি : রবীন্দ্রযুগ

'এসো হে আর্য, এসো অনার্য,
হিন্দু মুসলমান
শক হুন দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।'

রবীন্দ্রনাথ ইউটোপিয়ান ছিলেন ঠিকই, কিন্তু তিনিই সর্বপ্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন এবং তৎসৃষ্ট স্বদেশি আন্দোলনের সীমাবদ্ধতা ও তার অশুভ প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বাঙালি জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে কলম ধরেছিলেন। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করেছি। সেখানে দেখাতে চেষ্টা হয়েছে কেন গ্রামবাংলার শ্রমজীবী বাঙালি-মুসলমানরা ওই আন্দোলনে নিস্পৃহ থেকেছে। মুক্তবুদ্ধি, উদার মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের একটি গল্পে, 'মুসলমানীর গল্প' (২৪-২৫ জুন ১৯৪১)-এ আঁকা হয় প্রকৃত মুসলমানের চরিত্র গুণ; কমলার উদ্ধারকর্তা হবির খাঁর উক্তি : "বুঝেছি, তুমি হিন্দু ব্রাহ্মণের মেয়ে, মুসলমানের ঘরে যেতে সংকোচ হচ্ছে। কিন্তু একটা কথা মনে রেখ— যারা যথার্থ মুসলমান, তারা ধর্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণকেও সম্মান করে, আমার ঘরে তুমি হিন্দুবাড়ির মেয়ের মতোই থাকবে...।" তাঁর বাড়িতে গিয়ে কমলা দেখে— 'আশ্চর্য এই, মুসলমান বাড়ির আট-মহলা বাড়ির এক মহলে আছে শিবের মন্দির আর হিন্দুয়ানির সমস্ত ব্যবস্থা। তারপর কথক-স্বরে রবীন্দ্রনাথ ভারত-ইতিহাসকথা শোনান : "এই বাড়ি সম্বন্ধে পূর্বকালের একটু ইতিহাস ছিল। এই মহলকে লোকে বলত রাজপুতানির মহল। পূর্বকালের নবাব এনেছিলেন রাজপুত্রের মেয়েকে কিন্তু তাকে তার জাত বাঁচিয়ে আলাদা করে রেখেছিলেন।

সে শিবপূজা করত, মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণেও যেত। তখনকার অভিজাত বংশীয় মুসলমানেরা ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুকে শ্রদ্ধা করত। সেই রাজপুতানি মহলে থেকে যত যত হিন্দু বেগমদের আশ্রয় দিত, তাদের আচার-বিচার থাকত অক্ষুণ্ণ। শোনা যায় এই হবির খাঁ সেই রাজপুতানির পুত্র।...”

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পটি শেষ করেন হবির খাঁর মেজো ছেলে করিমের সঙ্গে কমলার মিলনে; এবং তার কাকার মেয়ে সরলাকে আশ্রয়দানে,— ‘বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয়ে নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন! যিনি কারও জাত বিচার করেন না।’ আবার ‘সমস্যাপূরণ’ (১৩০০) গল্পে বিধবা-পুত্র অছিমদ্দিন আর বিপিনবিহারী দুজনেই কৃষ্ণগোপালের বয়ানে পুত্র বলে ঘোষিত হয়,— ‘...যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক মনে কর তো বলিয়ো অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।’ অতঃপর বিপিনবিহারীর বিহ্বলতা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন : বিপিন কী বলিবে কী করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সে-কালের ধর্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে। শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপ্‌ল্ না থাকার এই ফল।” ‘প্রিন্সিপ্‌ল্’ শব্দটি নৈতিকতার যে ব্যঞ্জনা এখানে বহন করছে সেটি শ্লেষাত্মক; কৃষ্ণগোপালের নীতিবোধ ও ধর্মনিষ্ঠা তার থেকে অনেক বড়ো। ‘যবনীর গর্ভে?’ পুত্রের এরকম কঠোর প্রশ্নের সামনে দাঁড়িয়েও অকপট তাঁর স্বীকারোক্তিটি কৃষ্ণগোপাল চরিত্রকে মহিমান্বিত করে।

রবীন্দ্রনাথের এরকম সব গল্পে-প্রবন্ধে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের আন্তরিক সম্পর্ক,— দুয়ের মধ্যে সংঘাত ও মিলনের নানা শর্ত ব্যক্ত হয়েছে। তবে তাঁর অমর সৃষ্টি ‘গোরা’ উপন্যাসটিতে চলমান ভারতবর্ষের জীবনধারাকে— তাঁর বহুত্ব বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্য,, তার উত্থান-পতন ও বাঁক-পরিবর্তন— তার উপরিস্তরিক বুদ্বুদ ঘূর্ণন উদ্দামতা যেমন আমাদের বিমূঢ় ও ভীত করে তেমনি তার অন্তস্তরিক নিস্তরঙ্গতা প্রশান্তি ঔদার্য প্রজ্ঞা আমাদের স্থির ও সমাহিত করে, মনে আশার সঞ্চার ঘটায়। আত্মপরিচয়ের সত্য প্রকাশ হবার পর গোরার মধ্যে নতুন এক চেতনার সঞ্চার হয়, সে নতুন এক সত্তায় জারিত হয় : আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান, কোনো সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকল জাতই আমার জাত, সকলের অন্নই আমার অন্ন।[১১৬] এবং তারপর সে পরেশবাবুর কাছে গিয়ে দীক্ষা নিতে গিয়ে আরও জানায় : “আপনি আমাকে আজ সেই দেবতারই মন্ত্র দিন, যিনি হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান ব্রাহ্ম সকলেরই— যাঁর মন্দিরের দ্বার কোনো জাতির কাছে, কোনো ব্যক্তির কাছে কোনোদিন অবরুদ্ধ হয় না— যিনি কেবলই হিন্দুর দেবতা নন, যিনি ভারতবর্ষের দেবতা।”

সেই ভারতাত্মার সন্ধান পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক অপর বাঙালি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬০-১৯০২)-ও। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে অভিধানকার যথার্থ

লিখেছেন : 'তিনি সংস্কার ও আচারের বহিরাবরণ সরিয়ে ভারতাত্মাকে জাগ্রত করেছেন, দেশকে নূতন জাতীয়তা ও মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং বিশ্বের কাছে ভারতের ভাবমূর্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।'[১১৭] অনেকেরই জানা আছে, স্বামী বিবেকানন্দ ভগিনী নিবেদিতাকে বলেছিলেন যে তিনি রামমোহন রায়ের তিনটি নির্দিষ্ট বিষয় অনুমোদন ও অনুসরণ করেন; সেগুলি হল, (ক) বেদান্ত অনুশীলন ও তার প্রচার; (খ) দেশভক্তি ও দেশসেবা; এবং (গ) হিন্দু মুসলমানের প্রতি সমদৃষ্টি। (দ্রষ্টব্য : ড. পঞ্চানন সাহা : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক; পাদটীকা পৃ. ১১৪) আর হোসেনুর রহমান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

> "বিবেকানন্দ কোনো অর্থেই ইসলামিস্ট ছিলেন না। কিন্তু তিনি সামাজিক ইসলামকে যথার্থই বুঝেছিলেন। ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব তাঁকে আকর্ষণ করেছিল। সর্বোপরি ইসলামের পরমসত্য— ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়— তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। এখানেই তিনি হিন্দুর অদ্বৈতবাদ ও বেদান্তের সঙ্গে ইসলামের একেশ্বরবাদের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেন এবং তা উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন।"[১১৮]

আর স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বিবেকানন্দের উক্তি উদ্ধার করে লিখেছেন : "আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই... একমাত্র আশা। আমি মানসচক্ষে দেখিতেছি... ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ লইয়া মহামহিমায় ও আপরাজেয় শক্তিতে জাগিয়া উঠিতেছে।'[১১৯] প্রসঙ্গত, সানফ্রানসিসকো-র বে-এরিয়ায় এক ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, শ্রীকৃষ্ণের সুপ্রাচীন বাণীই পরবর্তীকালে বাঙ্ময় হয়েছে বুদ্ধ, খ্রিস্ট ও হজরত মহাম্মদের উচ্চারণে। তিনি বলেছিলেন যে, পাপাচার, পৌত্তলিকতা, উপাসনার প্রহসন, কুসংস্কার ইত্যাদি কদাচারের বিরুদ্ধে ছিলেন মহম্মদ। বিবেকানন্দের স্বভাবজ বাগ্মিতায় : '...সেই ধর্মই মহৎ যা আপনার স্বপ্রকৃতির সঙ্গে সত্য হয়ে অবস্থান করে। ...নিজেদের উপব বিশ্বাস রাখুন— আপনারাই যদি না থাকেন তাহলে ঈশ্বর কোথায় থাকবেন? দেবতারাই বা কোথায় খাকবেন? যেখানেই থাকুন না কেন আপনাদের মন সর্বদা সেখানেই অনুভব করবে সেই অনাদি ও অনন্তকে।... মহাপুরুষগণই আমাদের যাত্রাপথের দিকচিহ্নস্বরূপ; প্রকৃতপক্ষে, তাঁরা আমাদের দিশারি।... তাঁরা (নবীরা) আমাদের বলেন, (ওঠো জাগো) আর আমরা কী করি, বড়োজোর তাঁদের বাণী মনে রাখি, তারপর আবার নিদ্রামগ্ন হই।' (দ্রষ্টব্য, বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র; দ্বিতীয় খণ্ড)

সেই ভাষণ দুটিতে স্বামী বিবেকানন্দ বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধধর্মের মূলনীতিগুলিও বিশ্লেষণ করেছিলেন। সেখানে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট : "বুদ্ধ যখন জন্মেছিলেন, ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতবর্ষের প্রয়োজন হয়েছিল একজন ধর্মনেতার। কারণ, পুরোহিতকুল তখন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। ইহুদিদের ইতিহাস মনে করলেই বোঝা যায় যে তাদের দু ধরনের ধর্মনেতা ছিলেন— এক পুরোহিত, দুই ধর্মগুরু। পুরোহিতরা জনসাধারণকে অন্ধকারে রেখে তাদের উপর কুসংস্কারের বোঝা চাপিয়ে দিত। তাদের অনুমোদিত সবকটি উপাসনা পদ্ধতিই ছিল

মানুষের উপর নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখার অপকৌশল মাত্র। ওল্ড টেস্টামেন্টের সর্বত্রই দেখা যায় ধর্মগুরুরা পুরোহিতদের কুসংস্কারের বিরোধিতা করছেন। এবং এই বিরোধিতার পরিণতিতেই ধর্মগুরুরাই হয়েছেন বিজয়ী আর পুরোহিতদের ঘটেছে পতন। (দ্রষ্টব্য, প্রাগুক্ত) তিনি আরও বলেছেন, ভারতবর্ষে পুরোহিত এবং ধর্মগুরুদের মধ্যে যে বিরোধ চলছিল তার মাঝে বুদ্ধদেব মূর্তিমান বিজয়রূপে আবির্ভূত হলেন। তাঁর উপদেশাবলির মধ্যে মানবমৈত্রীই হয়ে উঠল অন্যতম বাণী। তিনি বললেন, সব মানুষই সমান, এর মধ্যে কারো কোনো বিশেষ অধিকার নেই। বুদ্ধদেব ছিলেন সাম্যের আচার্য। তাঁর শিক্ষার মূল কথাই ছিল : 'আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জনে প্রতিটি নারী-পুরুষেরই রয়েছে সমানাধিকার'। অন্যত্র বিবেকানন্দ বিস্তৃতভাবে বলেছেন :

> "মানুষ ভগবানকে ভালোবাসছিল, কিন্তু নিজের ভাইয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিল। ঈশ্বরের জন্য সে নিজের জীবন বলি দিতে এতটুকুও দ্বিধা করত না। আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে নরহত্যা করতেও প্রস্তুত ছিল। এটাই ছিল তৎকালীন জাতের অবস্থা। ভগবানের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে তার নিজের পুত্রদের বিসর্জন দিত, দেশ লুণ্ঠন করত,— হাজার হাজার জীবহত্যা করে পৃথিবীকে রক্তধারায় প্লাবিত করত ভগবানেরই জয়গান গাইতে গাইতে। এই প্রথম তারা মুখ ফেরাল ভগবানের আর এক মূর্তি মানুষের দিকে। ঠিক করল এখন থেকে মানুষকেই ভালোবাসতে হবে। এখান থেকেই শুরু হল সব শ্রেণির মানুষের জন্য প্রথম গভীর প্রেম-প্রবাহ— বিশুদ্ধ জ্ঞানের সত্যিকারের প্রথম তরঙ্গ যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে প্লাবনের আকারে ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ নানা দেশে।"[১২০]

সম্প্রীতির এই চেতনা এই সময়ের বিশিষ্ট বহু ব্যক্তিত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে; বাঙালি জাতীয়তাবোধ জাগরণে সম্প্রীতির মর্মবাণীটি বারবার উচ্চারিত হয়েছে। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার দত্তর পৌত্র সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮২-১৯২২) তাঁর বহু কবিতায় এই চেতনার বাণীরূপ দিয়েছেন। 'ফুল-শিরনি' কবিতায় তিনি লিখেছেন : "সুফি বৈষ্ণবে করে কোলাকুলি/আমাদের এই দেশে।/সত্যদেবের ইঙ্গিতে মেশে/বাউল ও দরবেশে।/বাহারে মিলায় বসন্তরাগ/সিকর সাথে কাফি—/এক মার কোলে বসি' কুতূহলে/মোরা দোঁহে দিন যাপি।"

তাছাড়া ধর্মের নামে জাতিভেদ প্রথা, সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা মানুষকে যেভাবে কঠিন নিগড়ে বেঁধে রেখেছে তার বিরুদ্ধেও সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে : "যাহাদের ছায়া ছুঁইলেও পাপ, পবন অর্বাচীন/তাদেরি চরণধুলি তুলি দেয় মস্তকে নিশিদিন/নিশ্বাস নিতে মনে হয়, সে যে অজাতির উচ্ছিষ্ট।/ধর্ম হতেছে পণ্ড নিয়ত ধর্ম হতেছে ক্লিষ্ট।/ম্লেচ্ছের শ্রমে চারি আশ্রম ভাঙিয়া পড়িছে নিতি/পীড়ায় আতুর সংহিতা সব পুড়িয়া যেতেছে

স্মৃতি।/বর্ণোত্তমে বর্ণে তাহারা করিয়াছে পরাজয়,/নিষ্ঠার বলে প্রতিষ্ঠা তাঁর আজিকে ভুবনময়।'

এরকম সব কাব্যভাবনায় সত্যেন্দ্রনাথ যেন নজরুল ইসলামের পূর্বসূরি! একইরকম উচ্চারণ,— 'ছত্রিশ জাতে ছত্রিশ ভাগে/হয়ে আছে জরা সন্ধদেশ।/পরায়ে বজ্র-কঙ্কণ তারে/ঐক্যে বাঁধিয়া ঘুচাবে ক্লেশ।/চিরযুবা প্রাণ করে আহ্বান।/ভগবানে আজি সহায় তোর,/ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে খোয়াসনে আর/বাহুতে মিলাবে বাহুর জোর।" ('নবজীবনের গান')

অন্যদিকে বিস্মৃতির অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেছেন বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত (১৮৮০-১৯৩২)। বাংলাদেশের প্রখ্যাত কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক এক প্রবন্ধে বেগম রোকেয়া সম্বন্ধে জানান : "১৯০৪ সালে নবনূর-এ তাঁর যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাতে তিনি লেখেন :

> "আমাদিগকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে অন্ধকারে রাখিবার জন্য পুরুষগণ ওই ধর্মগ্রন্থগুলিকে ঈশ্বরের আদেশপত্র বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।... পুরাকালে যে ব্যক্তি প্রতিভাবলে দশজনের মধ্যে পরিচিত হইয়াছেন, তিনিই আপনাকে দেবতা কিংবা ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।... ক্রমে যেমন পৃথিবীর অধিবাসীদের বুদ্ধি-বিবেচনা হইয়াছে, সেইরূপ পয়গম্বরদিগকেও (অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রেরিত মহোদয়দিগকে) এবং দেবতাদিগকেও বুদ্ধিমান হইতে বুদ্ধিমত্তর হইতে দেখা যায়!!... তবেই দেখিতেছেন, ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষরচিত বিধি ব্যবস্থা ভিন্ন আর কিছুই নহে।... যাহা হউক, ধর্মগ্রন্থগুলি ঈশ্বরপ্রেরিত কিনা তাহা কেহই নিশ্চয় বলিতে পারে না।""[২১]

শতাধিক বছর আগে যে প্রতিস্পর্ধা বেগম রোকেয়া দেখিয়েছিলেন— যে মুক্তবুদ্ধি ভাবনার উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন তার আততি আজকের বাস্তবতায়ও বিস্ময়কর।

ইতিপূর্বে আমরা নবজাগরণের সূত্রে উনিশ শতকের বাস্তবতা, বিশেষত বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক বাস্তবতা— তার অন্তঃস্থ দ্বন্দ্ব এবং বহিরস্থ সংকট বিষয়ে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি সেখানে স্পষ্ট করে বলা দরকার যে, ১৮৩৫ সালে কলকাতা শহরে যখন আট হাজার মুসলমান জড়ো হয়ে মেকলে-র ইংরাজি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল কিংবা ১৮৫০ সালে যখন মাদ্রাসার ইংরেজ অধ্যক্ষকে লক্ষ করে বিক্ষুব্ধ মুসলিম ছাত্ররা ইট-পাটকেল ও পচা ডিম ছুঁড়ে মেরেছিল তখন হিন্দু সমাজ কোথায় দাঁড়িয়ে। মেকলে-র ওই শিক্ষানীতি অনুসরণে তখন কিন্তু হিন্দু সমাজে ক্রমবর্ধমান একটি শিক্ষিত ও চাকুরিজীবী মধ্যশ্রেণির বিকাশ ঘটেছে,— পাশ্চাত্য ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন একটি বিদ্বৎসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মুসলমান সমাজে নতুন মধ্যশ্রেণির বিকাশ তো ঘটেইনি পুরাতন অভিজাত সমাজও আত্মঘাতী অহংকার ও বিরুদ্ধ শক্তির

চাপে লোপ পেয়েছে বা নিষ্ক্রিয় থেকেছে; এবং অসম্ভব পরিমাণে বেড়ে গেছে দরিদ্র নিঃস্ব মানুষের সংখ্যা। নতুন কোনও বিদ্বৎসমাজের বিকাশও ঘটেনি। বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি সামসুর রহমান তাঁর আত্মচরিতে— আমার জীবন আমার কবিতায় নিঃসংকোচে জানান: 'আমাদের ইস্কুলের মোট আটশো ছাত্রের মধ্যে মুসলমান ছাত্র দশজনের বেশি ছিল না।'

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতা— মধ্যশ্রেণির বিকাশের ক্ষেত্রে তার বিলম্ব,— বিশেষত পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে যুক্তিবাদি মুক্তবুদ্ধি মানস গঠনের ক্ষেত্রে তার ব্যর্থতার পরিমণ্ডলে বেগম রোকেয়ার মতন এক ব্যতিক্রমী সমাজ-সংস্কারকের আবির্ভাব বাস্তবিকই এক বিশেষ ঘটনা। নারী-শিক্ষা বিস্তারে তাঁর উদ্যোগ, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে সংস্কারমুক্ত ও যুক্তিবাদি চিন্তার প্রসার ঘটানো,— মুসলমান সমাজের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীল মনোভাবের বিরুদ্ধে ধারাবাহিক প্রচার চালানো বিশ শতকের প্রথমপাদেও যে খুব সহজ কাজ ছিল না তা বুঝতে অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। 'অবরোধবাসিনী' গ্রন্থে মুসলিম নারীসমাজের প্রতি যে আহ্বান রেখেছেন রোকেয়া তা একশো বছর বাদেও আজ খুবই প্রাসঙ্গিক। তবে মুসলমান সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় বেগম রোকেয়া কখনও হিন্দুবিদ্বেষী প্রচারকে প্রশ্রয় দেননি,— ধর্মোর্ধ্ব বাঙালি জাতীয়তাবোধেরই পরিচয় রেখেছেন। এক্ষেত্রেও তিনি এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব।

বিশ শতকের প্রথম পাদ থেকে যে বাঙালি লেখকের সম্মোহনী কলমে পাঠকচিত্ত আলোড়িত হয়ে চলেছে সেই শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৭৬-১৯৩৮)-এর রচনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির নিখুঁত সব মানবিক চিত্র আঁকা রয়েছে। তাঁর আত্মচরিতমূলক শ্রীকান্ত উপন্যাসে যেমন অন্নদাদি ও তার স্বামী শাহজির অভিনব দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে দুই ধর্মের ভেদাভেদ মুছে গেছে তেমনি কবি ও প্রেমিক গহর চরিত্রের উপস্থাপনায় লেখকের উদার মানসিকতার পরিচয় মেলে।

> "...একটি মুসলমান যুবক আমার প্রতি মুহূর্ত-কয়েক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, শ্রীকান্ত না?
>
> হ্যাঁ।
>
> আমায় চিনতে পারলে না? আমি গহর। এই বলিয়া সে সবেগে আমার হাত মলিয়া দিল। সশব্দে পিঠে চাপড় মারিল এবং সজোরে গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, চল আমাদের বাড়ি। কোথায় যাওয়া হচ্ছিল, কলকাতায়? আর যেতে হবে না,— চল।
>
> সে আমার পাঠশালার বন্ধু। বয়সে বছর চারেকের বড়, চিরকাল আধপাগলা গোছের ছেলে— মনে হইল বয়সের সঙ্গে সেটা বাড়িয়াছে বৈ কমে নাই।

তাহার জবরদস্তি পূর্বেও এড়াইবার জো ছিল না. সুতরাং আজ রাত্রের মতো সে যে আমাকে কিছুতেই ছাড়িবে না, এই কথা মনে করিয়া আমার দুশ্চিন্তার অবধি রহিল না।...

তাহার বাবার একটা সেকেলে গাদাবন্দুক ছিল, সেই লইয়া নদীর ধারে, আমবাগানে. ঝোপেঝাড়ে দু'জনে পাখি মারিয়া বেড়াইতাম. ছেলেবেলা কতদিন তাহাদের বাড়িতে রাত কাটাইয়াছি,— তাহার মা মুড়ি গুড় দুধ কলা দিয়া আমার খাবারের জোগাড় করিয়া দিত। তাহাদের জমিজমা চাষ-আবাদ অনেক ছিল।. .

গহরের আর-একটা পরিচয় আছে— সে কবি। তখনকার দিনে সে মুখে মুখে অনর্গল ছড়া কাটিতে পারিত. যে-কোনো সময়ে, যে-কোনো বিষয়ে অনেকটা পাঁচালির ধরনে।.. জিজ্ঞাসা করিলাম, গহর, তোমার যে একদিন কৃত্তিবাসের চেয়ে ভালো রামায়ণ রচনার শখ ছিল, সে সঙ্কল্প আছে, না গেছে?

গেছে! গহর মুহূর্ত গম্ভীর হইয়া উঠিল, বলিল, সে কি যাবার রে! ঐ নিয়েই তো বেঁচে আছি। যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন ঐ নিয়েই থাকব। কত শিখেচি, চল না আজ তোকে সমস্ত. রাত্রি শোনাব তবু ফুরোবে না।...

বলিলাম, সকাল থেকেই শরীরটা এমন বিশ্রী ঠেকচে যে মনে হচ্ছে ঘুমোতে পেলে-—

গহর কানও দিল না, বলিল, পুস্পক-রথে সীতা সেখানে কাঁদতে কাঁদতে গয়না ফেলে দিচ্ছেন, সে জায়গাটা যারা যারা শুনেচে চোখের জল রাখতে পারেনি, শ্রীকান্ত।...

একদিন গহর বলিল, তোর কাজ কি শ্রীকান্ত বর্মায় গিয়ে। আমাদের দু'জনেরই আপনার বলতে কেউ নেই, আয় না দু'ভায়ে এখানেই এক সঙ্গে জীবনটা কাটিয়ে দিই।" (চতুর্থ পর্ব; দ্বিতীয় অধ্যায়)

পঞ্চম অধ্যায়ে আবার 'গহরের খোঁজে আসিয়া' শ্রীকান্ত কমললতা বৈষ্ণবীর আখড়ায় যায়।

"ডাকিলাম, গহর!

গহর ধ্যান ভাঙিয়া হতবুদ্ধির মতো আমার দিকে চাহিয়া রহিল।

বাবাজী তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া বলিল, গোঁসাই, তোমার শ্রীকান্ত, না?

গহর দ্রুতবেগে উঠিয়া আমাকে সজোরে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল। তাহার আবেগ থামিতে চাহে না—।"

গহর গোঁসাইয়ের এই পরিণতি সম্বন্ধে নবীনের পরিবেশিত তথ্যটি

স্মৃতিধার্য: 'ঐসব আউলে-বাউলেগুলোর ধম্মাধম্ম জ্ঞান আছে নাকি? ওরা জাতজন্ম কিছুই মানে না, যে-কেউ ওদের সঙ্গে মিশলেই ওরা দলে টেনে নেয়, বাছবিচার করে না।...' এবং লেখক-স্বরে বিবৃত হয় :

"...দ্বারিক বাউল গান বাঁধিতে, ছড়া রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত। গহর এই প্রলোভনে মজিয়াছে। তাহাকে কবিতা শুনায়, তাহাকে দিয়া ভুল সংশোধন করিয়া লয়। আর কমললতা একজন যুবতী বৈষ্ণবী— এই আখড়াতেই বাস করে। সে দেখিতে ভালো, গান গাহে ভালো, তাহার কথা শুনিলে লোকে মুগ্ধ হইয়া যায়! বৈষ্ণব সেবায় গহর মাঝে মাঝে টাকাকড়ি দেয়, আখড়ার সাবেক প্রাচীর জীর্ণ হইয়া ভাঙিয়া গিয়াছিল, গহর নিজ ব্যয়ে তাহা মেরামত করিয়া দিয়াছে। কাজটা তাহাদের সম্প্রদায়ের লোকের অগোচরে সে গোপনে রাখিয়াছে।"

গহর চরিত্র নির্মাণে শরৎচন্দ্রের গভীর মনোযোগ আমাদের বিস্মিত করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে লেখক জানিয়ে দিয়েছিলেন : "গহররা মুসলমান ফকির-সম্প্রদায়ের লোক। শুনিয়াছি তাহার পিতামহ বাউল, রামপ্রসাদী ও অন্যান্য গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। তাহার একটা পোষা শালিক পাখির অলৌকিক সঙ্গীত-পারদর্শিতার কাহিনী তখনকার দিনে এদিকে প্রসিদ্ধ ছিল। গহরের পিতা কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ত্যাগ করিয়া তেজারতি ও পাটের ব্যবসায়ে অর্থোপার্জন করিয়া ছেলের জন্য সম্পত্তি খরিদ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে, অথচ ছেলে পাইল না বাপের বিষয়বুদ্ধি, পাইয়াছে ঠাকুরদার কাব্য ও সঙ্গীতের অনুরাগ।" তাই সে গহরগোঁসাই হয়, গান বাঁধে।

অধিকন্তু, কমললতার প্রতি তার অনুরাগের পূর্বাভাসও রয়েছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে : '...হঠাৎ বই মুড়িয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিয়া বসিল, আচ্ছা শ্রীকান্ত, তুই কখনো কাউকে ভালোবেসেছিলি?'

এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সূত্রে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলনের অবদান বিষয়ে শরৎচন্দ্র জানান : 'বিশেষজ্ঞদের মুখে শুনিয়াছি, বাঙ্গলাদেশের আধ্যাত্মিকে সাধনার নিগূঢ় রহস্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়েই সুগুপ্ত আছে এবং সেইটাই নাকি বাঙ্গলার নিজস্ব খাঁটি জিনিস।'

তবে শরৎচন্দ্রের হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিষয়ক ভাবনা সুস্পষ্টরূপে ধরা রয়েছে তাঁর কয়েকটি নিবন্ধে ও অভিভাষণে। 'সাহিত্যের আর একটা দিক' শিরোনামে (বর্ষবাণী; ৩য় বর্ষ, ১৩৪২) প্রকাশিত নিবন্ধে জানান :

"কিছুকাল পূর্বে আমার একটি নবীন মুসলমান বন্ধু... নিজে তিনি সাহিত্যসেবী, ...সাম্প্রদায়িক মালিন্য তাঁর হৃদয়কে মলিন, দৃষ্টিকে আজও আবিল করেনি। বললেন, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই বৃহৎ জাতি, একই দেশে, একই আবহাওয়ার

মধ্যে পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো বাস করে, একই ভাষা জন্মকাল থেকে বলে, তবুও এমনি বিচ্ছিন্ন, এমনি পর হয়ে আছে যে, ভাবলেও বিস্ময় লাগে।... কেন এমন হয়েছে, এ গবেষণা প্রয়োজন নেই, কিন্তু আজ এই বিচ্ছেদের অবসান, এই দুঃখময় ব্যবধান ঘুচোতেই হবে। না হলে কারও মঙ্গল নেই।...

তিনি বললেন, উপায় হচ্ছে একমাত্র সাহিত্য। ...নিছক হিন্দুর জন্যেই হিন্দু-সাহিত্য রচনা করবেন না। মুসলমান পাঠকের কথাও একটুখানি মনে রাখবেন। দেখবেন, বাইরের বিভেদ যতই বড়ো দেখাক, তবু একই আনন্দ একই বেদনা উভয়ের শিরার রক্তেই বয়।

বললাম, এ কথা আমি জানি। কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালো-কথার সঙ্গে মন্দ-কথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ তো তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়তো এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে, যা ভাবলেও শরীর শিউরে ওঠে।...

বললাম... সাহিত্যের সেবক যাঁরা তাঁদের জাতি, সম্প্রদায় আলাদা নয়, মূলে— অন্তরে তাঁরা এক। সেই সত্যকে উপলব্ধি করে এই অবাঞ্ছিত সাময়িক ব্যবধান আজ তোমাদেরই ঘুচোতে হবে।"...[১২২]

আর 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ'-এর সভাপতির অভিভাষণে[১২৩] শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শুরুতেই বলেন—

"মুসলিম সাহিত্য-সমাজের দশম বার্ষিক অধিবেশন আমাকে আপনারা সভাপতি নির্বাচন করেছেন। যদিও এর নাম দিয়েছেন মুসলিম সাহিত্য-সমাজ, তথাপি এই নির্বাচনের মধ্যে একটি পরম ঔদার্য আছে। আমি হিন্দু অথবা মুসলমান সমাজের অন্তর্গত, আমি বহু দেবতাবাদী অথবা একেশ্বরবাদী এ প্রশ্ন আপনারা করেননি। শুধু ভেবেছেন— আমি বাঙালী, বঙ্গ-সাহিত্যের সেবায় প্রাচীন হয়েছি।...

ওয়াজেদ আলি সাহেব একটি চমৎকার ভরসার কথা বলেছেন, সেটি হিন্দু-মুসলমান সকলেরই মনে রাখা উচিত বলেছেন, 'মুসলিম সাহিত্য-সেবক আরবি ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার অঙ্গে ছুঁড়তে চাইছেন, এতে আপত্তি অনাপত্তি অতি তুচ্ছ কথা, কেননা শুধু কলম চালিয়ে ওটি হতে পারে না; তার জন্যে চাই প্রচুর সাহিত্যিক শক্তি, চাই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। ও দুটি যেখানে নেই, সেখানে ভাষা ভূষণ পরতে গিয়ে অতি সহজেই সং সাজতে পারে।'

পারেই তো। কিন্তু এ জ্ঞান আছে কার? যিনি যথার্থ সাহিত্য-রসিক তাঁর।"...

তারপর 'মহেশ' গল্পটির দৃষ্টান্ত সহকারে শরৎচন্দ্র বলেন সাহিত্যের মুরুব্বিদের কথা—

"একদিন শুনতে পেলাম গল্পটি Matric-এর পাঠ্যপুস্তকে স্থান পেয়েছে। আবার একদিন কানে এল সেটি নাকি স্থানভ্রষ্ট হয়েছে। ...আমার গল্পটিতে নাকি গোহত্যা আছে। (দ্রষ্টব্য মীর মশারফ হোসেন-এর 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা') আচ্ছা! হিন্দু বালকের বুকে যে শূল বিদ্ধ হবে!...

শরৎচন্দ্র অতঃপর স্বভাবজ সরস ভঙ্গিতে 'মহেশ' গল্পটির সারবস্তু শোনান:

"একটি হিন্দুপ্রধান হিন্দু জমিদার-পালিত ক্ষুদ্র গ্রামে গরিব চাষা গফুরের বাড়ি। বেচারার থাকার মধ্যে বহুজীর্ণ, বহুছিদ্রযুক্ত একখানি খড়ের ঘর, বছর দশেকের মেয়ে আমিনা, আর একটি ষাঁড়। গফুর ভালোবসে তার নাম দিয়েছিল মহেশ। বাকি খাজনার দায়ে ছোটো গাঁয়ের ততোধিক ছোটো জমিদার যখন তার ক্ষেত্রে ধান-খড় আটক করলে তখন সে কেঁদে বললে, হুজুর! আমার ধান তুমি নাও, বাপ বেটিতে ভিক্ষে করে খাব, কিন্তু খড়ক'টি দাও,— নইলে এ-দুর্দিনে মহেশকে আমার বাঁচাব কী করে? কিন্তু রোদন তার অরণ্যে রোদন হল— কেউ দয়া করলে না। তার পরে শুরু হল তার কত রকমের দুঃখ, কত রকমের উৎপীড়ন মেয়ে জলের জন্যে বাইরে গেলে সেই জীর্ণ কুটিরের খড় ছিঁড়ে নিয়ে লুকিয়ে মহেশকে খাওয়াত, মিছে করে বলত মা আমিনা, আজ আমার জ্বর হয়েছে, আমার ভাত কটা তুই মহেশকে দে। সারাদিন নিজে অভুক্ত থাকত।... লোকে বলতো, গোরুটাকে তুই খাওয়াতে পারিস নে গফুর, ওকে বেচে দে। গফুর চোখের জল ফেলে আস্তে আস্তে তার পিছে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, মহেশ, তুই আমার ব্যাটা,— আমায় তুই সাত সন প্রতিপালন করেছিস। খেতে না পেয়ে তুই কত রোগা হয়ে গেছিস,— তোকে কি আজ আমি পরের হাতে দিতে পারি, বাবা। এমনি করে দিন যখন আর কাটতে চায় না তখন একদিন অকস্মাৎ এক বিষম কাণ্ড ঘটল। সে গ্রামে জলও সুলভ নয়। শুকনো পুকুরের নীচে গর্ত কেটে সামান্য একটুখানি পানীয় জল বহু দুঃখে মেলে। আমিনা দরিদ্র মুসলমানের মেয়ে, ছোঁয়া-ছুঁয়ির ভয়ে পুকুরের পাড়ে দূরে দাঁড়িয়ে প্রতিবেশী মেয়েদের কাছে চেয়ে-চিন্তে অনেক দুঃখে বিলম্বে তার কলসিটি পূর্ণ করে বাড়ি ফিরে এল। এখন ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত মহেশ তাকে ফেলে দিয়ে কলসি ভেঙে ফেলে এক নিশ্বাস মাটি থেকে জল শুষে খেতে লাগল। মেয়ে কেঁদে উঠল। জ্বরগ্রস্ত, পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ গফুর ঘর থেকে বেরিয়ে এল— এদৃশ্য তার সইল না! হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যা সুমুখে পেলে একখণ্ড কাঠ দিয়ে সবলে মহেশের মাথায় মেরে বসল। অনশনে মৃতকল্প গোরুটা বার-দুই হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণত্যাগ করলে।

প্রতিবাসীরা এসে বললে, হিন্দুর গাঁয়ে গোহত্যা! জমিদার পাঠিয়েছেন

তর্করত্নের কাছে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা নিতে। এবার তোর ঘরদোর না বেচতে হয়। গফুর দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ রেখে নিঃশব্দে বসে রইল। মহেশের শোকে, অনুশোচনায় তার বুকের ভেতরটা পুড়ে যাচ্ছিল। অনেক রাতে গফুর মেয়েকে তুলে বললে, চল আমরা যাই।...

কোথায় বাবা? গফুর বললে, ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে।

তার পরে গল্পের উপসংহারে এইরূপ আছে— "অন্ধকারে গভীর নিশীথে সে মেয়ের হাত ধরিয়া বাহির হল। এ গ্রামে আত্মীয় কেহ তাহার ছিল না, কাহাকেও বলিবার কিছু নাই। আঙিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলাতলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া হুহু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, 'আল্লাহ! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি, যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি কখনো যেন মাফ করো না।"

এই হল গোহত্যা! এই পড়ে হিন্দুর ছেলের বুকে শেল বিঁধবে। তার চেয়ে পড়ুক 'প্রেমের ঠাকুর'! ...অযোগ্যের হাতে ভার পড়লে অমনি দুর্দশার ঘটে।... শুনেছি নাকি আমার 'রামের সুমতি' গল্পের খানিকটা দিয়েছেন। অত্যন্ত দয়া,— বোধ করি আশা এর থেকে রামেদের সুমতি হবে। কিন্তু মুশকিল এই যে, দেশে রহিমরাও আছে।...

উপরি-উক্ত হিন্দু মুরুব্বির মতো মুসলমান মুরুব্বিও আছেন। শুনেছি তাঁরা নাকি আদেশ করেন ইতিহাস ফরমায়েশ মতো লিখতে। ইসলামধর্মী কোনো ব্যক্তি কোথাও অন্যায়-অবিচার করেছেন এর লেশমাত্র যেন কোনো পড়ার বইয়ে না থাকে।..."

তারপর শরৎচন্দ্র সেই অভিভাষণে তাঁকে ঘিরে সমালোচনার প্রসঙ্গটি তুলে বলেন—

"ওয়াজেদ আলি সাহেব এক স্থানে বলেছেন, 'মুসলিমের এই নবস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ, ইসলামি কৃষ্টির এই বলিষ্ঠ জাগরণ, সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎচন্দ্রের মতো শক্তিমান-প্রতিভার মনোযোগ আকর্ষণ করল, হয়তো দেশের অনাগত কল্যাণের এ এক শুভ ইঙ্গিত। কিন্তু তবু কেন মন সন্দেহ-অবিশ্বাসে দ্বিধা-জিজ্ঞাসায় দুলে ওঠে? 'বুলবুলে' প্রকাশিত তাঁর পত্রখানিতে যেন চোখে পড়ে, মুসলিমের প্রতি তাঁর সহানুভূতির অভাব, ভালোবাসার অভাব এবং মোটামুটি একটা অন্তর্দৃষ্টির অভাব'।

আমার জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছে করে, মুসলিমের এই 'নবস্ফূর্ত আত্মপ্রকাশ' ইসলামি কৃষ্টির 'এই বলিষ্ঠ জাগরণ', যাঁরা নবীন, উদার বাংলা ভাষাকে যাঁরা

অকুণ্ঠিত মনে মাতৃভাষা বলে স্বীকার করেন, তাঁদের— না যাঁরা প্রাচীনপন্থী, যাঁরা পিছনে ছাড়া সমুখে চাইতে জানেন না, তাঁদের জাগরণ, কি মুসলিম কি হিন্দু, সকল সমাজেরই বিঘ্ন স্বরূপ।... এ জাগরণ হয় যদি নবীনের... তাকে আমি দু-হাত তুলে সংবর্ধনা করে নেব। জানবো, এদের হাতে সমস্তই হবে শুভ ও সুন্দর— এদের হাতে হিন্দু-মুসলিম কারও ভয় নেই— এদের হাতে আমরা দুজনেই হব নিরাপদ।...

...এটুকু মোটামুটি জেনে রাখা দরকার যে মানুষ যখন সাহিত্য রচনায় নিবিষ্ট চিত্ত তখন সে ঠিক হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়। তখন সে তার সর্বজনপরিচিত, 'আমি'-টাকে বহু দূরে অতিক্রম করে যায়, নইলে তার সাহিত্য-সাধনা ব্যর্থ হয়।..."

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এই অভিভাষণটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এই কারণে যে, যে মঞ্চ থেকে তিনি হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির মর্মবাণী উচ্চারণ করেছিলেন সেই 'মুসলিম সাহিত্য সমাজ' গঠিত হয়েছিল ঢাকায় ১৯ জানুয়ারি, ১৯২৬-এ; মুসলিম বুদ্ধিজীবী— মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ছাত্রদের নিয়েই গঠিত হয় এই সংগঠন। এর নেতৃত্বে ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। এই সংগঠন থেকে বার্ষিক-পত্র 'শিখা' প্রকাশিত হয় এপ্রিল ১৯২৭ সালে, এবং চলে পাঁচ বছর। তবে এই পত্রিকাটি বাঙালি মুসলমান মানসকে প্রদীপ্ত করার ক্ষেত্রে 'বুদ্ধির মুক্তি' আন্দোলনে শামিল করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। হজরত মোহাম্মদ, পারসিক কবি সাদী, কামাল আতাতুর্ক, রবীন্দ্রনাথ, রোমাঁ রোলাঁ প্রমুখ মনীষীদের বাণী ও রচনা ছিল তাঁদের চিন্তন-বিকাশ ও মুক্ত-মানস গঠনের উৎস।

তবে বাঙালি মুসলমান-মানসে এই ভাবধারা উদ্বোধনের একটি ছোটো ইতিহাস আছে।

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে মুসলমান লেখকদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যবোধ উনিশ শতকের শেষপাদ ও বিশ শতকের শুরু থেকেই দেখা দেয়। এই সময়ে তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল, এক শ্রেণির হিন্দু লেখক মুসলমানদের ধর্ম ইতিহাস ও সমাজের প্রতি কটাক্ষ করে, কলঙ্ক লেপন করে,— শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি মুসলমানদের সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টি করেন। ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে তিক্ততা বৃদ্ধি পায়। তবে কিছু হিন্দু লেখক যে সাম্প্রদায়িক ঐক্য চান তাও তাঁরা বিশ্বাস করতেন। হিন্দু লেখকরা বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দ ব্যবহারে কেমন অসহিষ্ণু হয়ে পড়েছিলেন তা শরৎচন্দ্রের অভিভাষণে প্রকট পেয়েছে।

আবদুস সোবাহান লিখিত 'হিন্দু-মুসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে মুসলমান লেখকদের আত্মমর্যাদাবোধ প্রবল হয়ে ওঠে— তাঁরা প্রতিপদে হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষকে সমালোচনা করতে থাকেন। 'নবনূর' পত্রিকা (১৯০৩) এই ধারাটি অনুসরণ

করলেও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির পক্ষেও বহু রচনা তাতে স্থান পেয়েছে। হিন্দু লেখকদের মুসলিম বিদ্বেষ কী মাত্রায় ছিল তাও 'নবনূর' থেকে জানা যায়। মুসলিম বিদ্বেষের বেশি লেখা ছাপা হত 'ভারতী' পত্রিকায়,— আর 'নবনূর'-এ তার তীব্র সমালচোনা প্রকাশ পেত। সেখানে সক্ষোভে বলা হয়, 'সাহিত্যরথী বঙ্কিমচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে সাধারণ হিন্দু লেখকেরা পর্যন্ত অযথা মুসলিম সমাজের নিন্দাবাদ করেন। আর হিন্দু ঐতিহাসিকেরা মুসলিম জাতির অপযশ প্রচার করে তাঁদের গ্রন্থে পাতা পূর্ণ করেন। এইসব বিষয়ের প্রতি 'হিন্দু ভ্রাতাদের' দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'নবনূর সম্পাদক মন্তব্য করেন : 'ইহাই কি হিন্দু-মুসলমানের শুভ সম্মিলন সাধনের শ্রেষ্ঠ উপায়?''[১২৪]

কিছু হিন্দু লেখকও এই সকল অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেছেন,— তাদের একাংশের মধ্যে 'হিন্দু-মুসলিম ঐক্য' বন্ধনের প্রয়াসও দেখা গেছে। 'নবনূর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 'সতী' নাটিকা এবং ক্ষীরোদপ্রসাদের 'রঘুবীর' নাটকের মুসলিম প্রীতির পরিচয় উল্লেখ করা হয়।[১২৫] আবার ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করার চেষ্টাও করেছেন হিন্দু ইতিহাসে লেখক হরিসাধন মুখোপাধ্যায়, রামপ্রাণ গুপ্ত প্রমুখ। ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমানের দেশ, তাই পরস্পরের জাতীয় গৌরব সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মালে সম্মিলনের পথ প্রশস্ত হবে, এরকম একটা মহান প্রত্যাশা থেকেই উক্ত লেখকদ্বয় মোগল রাজত্বের ইতিহাস আলোচনা করেছেন।[১২৬]

এতদ্‌সত্ত্বেও মুসলমান মানসে বঞ্চনাবোধ ও হীনম্মন্যতা— হিন্দু লেখকদের সদিচ্ছা ও ঐকান্তিকতা বিষয়ে সন্দেহ ছিলই। শিক্ষিত মুসলমানরা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে গণশিক্ষিত হিন্দুদেরই। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে সেটা প্রকাশ্য হয়,— শিক্ষিত মুসলমানদের বড়ো অংশই এই অঙ্গচ্ছেদকে তাঁদের পশ্চাৎপদ অবস্থা থেকে উন্নতির সহায়ক মনে করেন।

প্রসঙ্গত, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমদ প্রথম জীবনে সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়; তাঁর সঙ্গে ছিলেন মুহম্মদ মোজাম্মেল ও মৌলানা আবদুল করিম; পরে এই সংগঠনে যোগ দেন মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। বাংলা ভাষাচর্চায় উৎসর্গীকৃত প্রাণ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করতেন, বাংলা বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা— এই ভাষায় আছে তার জন্মগত অধিকার। আচার্য সুকুমার সেন-এর পরিবেশিত তথ্যে জানা যায়, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ মনে করতেন, বাংলাভাষা গড়ে উঠেছে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে— দেবভাষার আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। (দ্রষ্টব্য 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস')। মুজাফফর আহমদ-এর স্মৃতিচারণও এক্ষেত্রে স্মর্তব্য : ''আমরা কয়েকজন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সভ্য ছিলাম। যেখানে হিন্দু-মুসলমানে কোনো ভেদ না থাকলেও আমরা বড়োলোকের ঘরে গরিব আত্মীয়ের মতন মনমরা হয়ে তার সভায় যোগদান করতাম। আমাদের মনে হল, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের

সঙ্গে সম্পর্ক বিলোপ না করেও আমাদের একটি নিজস্ব সাহিত্য সমিতি থাকা উচিত। এই উদ্দেশ্যে ১নং অ্যান্টনি বাগান লেনে মৌলবি আবদুর রহমান খানের বাড়িতে ১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এক সভা আহূত হয়... আমি সর্বসম্মতিক্রমে সম্পাদক হই।" (দ্রষ্টব্য, কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্যচর্চা নতুন এক পর্যায়ে উন্নত হয়। খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক জীবনে যে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি হয় তার প্রভাব পড়ে সাংস্কৃতিক জীবনেও। ১৯১৮ সালে এপ্রিল-মে মাস থেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'টি কলকাতা থেকে প্রকাশ পেতে থাকে। বস্তুত এই পত্রিকা ছিল 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমিতি'র মুখপত্র। ১৯১৯ সালে কাজী নজরুল ইসলামের প্রথম কবিতা এই পত্রিকাতেই ছাপা হয়। কিছুদিন বাদে কলকাতা থেকে প্রকাশ পেল 'সওগাত' সচিত্র মাসিক পত্রিকা (অগ্রহায়ণ ১৩২৫); তার কিছুদিন বাদে মাসিক 'মোসলেম ভারত' (এপ্রিল ১৯২০)। 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার সঙ্গে অনেক হিন্দু লেখকও যুক্ত ছিলেন; পত্রিকাটির প্রথম পাতায় মুদ্রিত হয় রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে উদ্ধৃতি : 'মানব-সংসারে জ্ঞানালোকের দিয়ালি-উৎসব চলিতেছে। প্রত্যেক জাতি আপনার আলোটিকে বড়ো করিয়া জ্বালাইলে তবে সকলে মিলিয়া এই উৎসব সমাধা হইবে।' বাস্তবত, পত্রিকাটির সম্পাদক হক এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই চলেছেন। ১৩২৮ সনে এই পত্রিকার পাতায় কাজী নজরুল ইসলামের অনেক কবিতা ছাপা হয়। কাজী নজরুলের কবি খ্যাতি এই সময়েই ছড়িয়ে পড়ে। এতকিছু ইতিমূলক দিক থাকা সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা অদৃশ্য বিভাজন রেখা ছিলই। হিন্দু পাঠক কি মুসলমানদের পত্রিকা কিনবেন, এরকম প্রশ্ন মুসলমান সাহিত্যিকদের মনে কাঁটার মতন বিঁধে ছিল। কিন্তু বাস্তবে, 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'ও সাম্প্রদায়িক কাগজ ছিল না, 'মোসলেম ভারত'-ও নয়।

আর 'সওগাত' পত্রিকার গুরুত্ব অন্য এক কারণে অপরিসীম; বাঙালি মুসলিম মহিলাদের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও সৃজন প্রতিভা স্ফুরণের উদ্দেশ্যে 'সওগাত' বিশেষ 'মহিলা সংখ্যায়' মুসলিম লেখিকাদের লেখা এবং প্রত্যেক লেখিকার ছবি ছাপাত। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের অবরোধবাসিনী মহিলাদের পক্ষে এরকম ভূমিকা আর কোনো পত্রিকা পালন করেনি।

সুস্থ জাতীয় চেতনা বিকাশের লক্ষ্যে ১৯২০ সালে ফজলুল হক সাহেবের পরিচালনায় এবং কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফফর আহমদ-এর সম্পাদনায় কলকাতা থেকে প্রকাশ পায় 'নবযুগ' সান্ধ্য দৈনিক। কিন্তু এক বছর বাদেই পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়; পরে আবার প্রকাশ পেলেও 'নবযুগ' তার পুরনো জনপ্রিয়তা আর পুনরুদ্ধার করতে পারেনি। মুহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশ পায় দৈনিক 'সেবক' (১৯২১); পত্রিকাটি ছিল স্পষ্টতই

অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থক; ফলে অসহযোগ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলে পত্রিকাটির গুরুত্বও হ্রাস পেয়ে যায়। ১৯২২-এর অগাস্ট মাসে কাজী নজরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশ পায় সাপ্তাহিক 'ধূমকেতু'। বাংলার সাময়িক পত্রের ইতিহাস 'ধূমকেতু' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, প্রকাশের পরই অক্টোবর মাসে কাজী নজরুল 'ধূমকেতু'র পাতায় ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন। ফলে পত্রিকাটি সরকারি রোষানলে পড়ে এবং বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অনমনীয় নজরুল ১৯২৫ সালে 'লাঙল' নামে এক সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। 'লাঙল'এ-কাজী নজরুল ইসলামের বহু বিখ্যাত কবিতা প্রকাশ পেয়েছে।[১২৭]

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য সমাজ'। ১৯২৭-এ সমিতির উদ্যোগে প্রকাশ পায় 'শিখা' পত্রিকা। সেই শিক্ষা-গোষ্ঠীর কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 'শিক্ষা' গোষ্ঠীর মতো উদার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন বাঙালি মুসলমানদের প্রয়াস কেন ব্যর্থ হয়েছিল তার কারণ অনুসন্ধানে অমলেন্দু দে জানান :

> "কিন্তু এই ভাবধারাকে রক্ষণশীল মুসলমানেরা স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাঁরা সাহিত্যের আঙিনায় 'বুদ্ধির মুক্তি'র মন্ত্রকে মুসলমান ধর্মবিরোধী প্রচেষ্টা বলে উল্লেখ করেন। মুসলমান সমাজে এই রক্ষণশীলতার প্রভাব এতটা ছিল যে এর বিরুদ্ধে যুক্তিনিষ্ঠ মননের অধিকারী লেখকের বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। তাই কবি নজরুল ইসলামও এক বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হন। রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ লাভে ধন্য নজরুল সহজেই জনপ্রিয়তা লাভ করলেও শিক্ষিত মুসলমানদের একটি অংশ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করতে কুণ্ঠিত ছিলেন।'[১২৮]

প্রসঙ্গত, কবি নজরুল ইসলামকে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের প্রথম উদ্যোগ নেয় স্বরাজ্য পার্টির পক্ষে শিশিরকুমার ভাদুড়ী ('৯২৪); পরবর্তীকালে তাঁকে জাতীয় কবিরূপে সংবর্ধনা জ্ঞাপনের উদ্যোগ হয় ১৩৩৬ সালে; কিন্তু তা ঘিরে মুসলমান লেখকরা পরস্পরবিরোধী দুটি অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েন। মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকার সম্পাদক খ্যাতিমান লেখক মোহাম্মদ আকরাম খাঁ নজরুলকে জাতীয় কবিরূপে বরণ করতে তাঁরা আপত্তি জানান। অন্যদিকে 'সওগাত' পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন ছিলেন সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা। 'সওগাত'-এর সঙ্গে কাজী নজরুলের সম্পর্ক গোড়া থেকেই ভালো ছিল,— ১৩৩৩ থেকেই লিখতেন পরে ওই পত্রিকায় চাকরিও করেছেন।

আর মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সম্পাদনায় মাসিক 'মোহাম্মদী' পত্রিকা জন্মলগ্ন থেকেই স্বতন্ত্র বাঙালি মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির স্বপক্ষে তত্ত্বগত প্রচার চালিয়ে এসেছে। অসহযোগ আন্দোলন পর্বের শেষে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের ক্ষেত্রে অবনতি ঘটেছিল আর সেখানে এইরূপ তত্ত্বগত অনৈক্যের প্রচারে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

এই স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তার আন্দোলনের প্রধান তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন মোহাম্মদ আকরাম খাঁ। বাঙালি মুসলমান সমানস পরিচয় সন্ধানে তাঁকে উপেক্ষা করা যায় না; বাস্তবিকই বাঙালি মুসলিম মানস বিশ্লেষণ করে বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখেছেন তিনি। সেগুলির গুরুত্বও অপরিসীম।[১২২]

মোহাম্মদ আকরম খাঁর প্রচারিত স্বতন্ত্র বাঙালি মুসলিম সাহিত্য ও সংস্কৃতির তত্ত্বটি যে সদর্থে মুসলিম জাতীয়তাবাদেরই পরিপোষক এবং হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির পক্ষে খুবই বিপদজনক তা জানতেন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এবং নজরুল ইসলাম, মুজফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ উদারপন্থী ব্যক্তিবর্গ। উনিশ শো বিশের দশকের শেষের দিকে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়েব মধ্যে বিদ্বেষ ও অপভাব ক্রমশ দানা বেঁধে ওঠে; সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিপর্যস্ত হয় কলকাতা মহানগরী (১৯২৭),— সাম্প্রদায়িক সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গ যখন বিভেদের প্রচার চালাচ্ছিল তখন 'লাঙল' পত্রিকা এবং কবি কাজী নজরুল ইসলাম সম্প্রীতির পক্ষে সরব ছিলেন। প্রজা স্বরাজ পার্টির মুখপত্র হিসেবে সাপ্তাহিক 'লাঙল' প্রকাশ পেয়েছিল ১৯২৬-এর ২ জানুয়ারি। পরিচালক হিসেবে নাম ছিল কাজী নজরুল ইসলামের এবং সম্পাদক হিসেবে মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের। পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আবদুল হালিম ও তাঁর দাদা সামসুদ্দিন হোসায়ন। কানপুর কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র থেকে ছাড়া পেয়ে মুজফ্‌ফর আহমদ কলকাতায় এলে তাঁর ওপর পত্রিকার দায়িত্ব বর্তায়। এখানে উল্লেখ্য, 'লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যায় ছিল নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী',— 'হায়রে ভজনালয়,/তোমার মিনারে চড়িয়া ভণ্ড গাহে স্বার্থের জয়/মানুষেরি ঘৃণা করি'...। আবার তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত 'সব্যসাচী' কবিতায় লিখলেন : "মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি/টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি/বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি এবার সব্যসাচী/যা হোক একটা দাও কিছু হাতে একবার মরে বাঁচি।" সুস্থ সাংস্কৃতিক বাতাবরণ বা অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের যত গর্বই বাঙালি হিসেবে আমরা করি না কেন, দুটি বিবদমান সাম্প্রদায়িক সংগঠন, মুসলিম লিগ ও হিন্দু মহাসভার অভ্যুত্থান ঘটেছে বাংলার মাটিতে। ১৯২৭-এর কলকাতার দাঙ্গায় বিক্ষুব্ধ কবি নজরুল ইসলাম লিখলেন,— 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার...।'

তবে যে কোনো কারণেই হোক, 'লাঙল' পত্রিকার আয়ু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি; তবে একই ভাবাদর্শ সম্মুখে রেখে— অসাম্প্রদায়িক জনমুখী চিন্তা চেতনার আধারে অতঃপর প্রকাশ পায় 'গণবাণী' পত্রিকা। লাঙল-এর সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায় বলে গেলেন, 'গণবাণী'র সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন মুজাফফর আহমদ। আর কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন মুজফ্‌ফর আহমদের ছায়াসঙ্গী; এবং এই পর্বেই নজরুলের কাব্য-প্রতিভার চরম স্ফুরণ ঘটে। গান রচনায়, কাব্য সাধনায় নিমগ্ন থেকেও কাজী নজরুল ইসলাম কখনও তাঁব জীবনাদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি— তাঁর, সমগ্র সৃষ্টিকর্ম জুড়ে ছড়িয়ে আছে হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির

মণিকর্ণিকার আলোকচ্ছটা। তাঁর কবিতার সমালোচকগণ যাই বলুক— রবির উজ্জ্বল আলোকে একমাত্র কাজী নজরুলই স্বাতন্ত্র্যে অমলিন থেকেছেন— বাঙালির প্রিয় কবি হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি রক্ষায় ও বিস্তারে কবি নজরুলকে নানারকম প্রতিকূল পরিস্থিতি ও ব্যক্তিগত আক্রমণের মুখে পড়তে হয়েছে। সেই বেদনা ও অসম্মানের মাত্রা একমাত্র অনুভবী পাঠকই বোঝেন। মুসলিম মৌলবাদী শক্তি জোটবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি করেছে, কুৎসা রটিয়েছে,— মিলাদ-মাহফিলে তাঁকে 'কাফের পাষণ্ড বলে অভিহিত করা হয়েছে; তাঁকে বিদ্রূপ করে গান বাঁধা হয়েছে। এমনকী ফুরফুরার বড়ো হুজুরও তাঁর বিরোধিতা করেছেন। এত কিছু সত্ত্বেও নজরুল তাঁর অবস্থান থেকে একটুও সরেননি; বরং আরও বেশি প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। তাই তো অন্নদাশঙ্কর রায় সশ্রদ্ধ ভঙ্গিতে লেখেন : 'ভুল হয়ে গেছে/বিলকুল/আর সব কিছু/ভাগ হয়ে গেছে।/ ভাগ হয়নিকো নজরুল।"

'কৈফিয়ত' কবিতায় ধর্মব্যবসায়ী ও রাজনীতির ফেরিওয়ালাদের উদ্দেশ্য করে তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে নজরুল লেখেন :

> "মৌ-লোভী যত মৌলবী আর মোললারা কন হাত নেড়ে—'
> 'দেব-দেবী নাম মুখে আনে, সবে দাও পাজিটার জা'ত মেরে
> ফতোয়া দিলাম— কাফের কাজী-ও
> যদিও শহীদ হইতে রাজী ও!
> আমপারা-পড়া হামবড়া মোরা এখনো বেড়াই ভাত মেরে
> হিন্দুরা ভাবে, পার্শী শব্দে কবিতা লেখে, ও পা'ত নেড়ে!"

'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' কবিতায় নজরুল ইসলাম লেখেন—

> "মরিছে হিন্দু মরে মুসলিম এ উহার ঘায়ে আজ।
> বেঁচে আছে যারা মরিতেছে তারা, এ মরণে নাহি লাজ।
> জেগেছে শক্তি তাই হানাহানি
> অস্ত্রে অস্ত্রে তাই জানাজানি।
> আজি পরীক্ষা কাহার দণ্ড হয়েছে কত দরাজ।
> কে মরিবে কাল সম্মুখ রণে মরিতে কারা নারাজ।"

নজরুলের আসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ বাণীরূপ পেয়েছে তাঁর 'কুহেলিকা' উপন্যাসেও। বিপ্লবী বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে মুসলমান তরুণরা কেন যোগ দেয়নি, সেই প্রশ্ন উঠেছে এই উপন্যাসে (ইতিপূর্বে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন প্রসঙ্গে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে।)। উপন্যাসে একটি বিপ্লবী দলে জাহাঙ্গীরকে নেওয়া নিয়ে মতবিরোধ। স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র ধারাটি ছিল হিন্দুত্ববাদী। 'যুগান্তর' দলের পূর্বতন সদস্য বিবেকানন্দের ছোটো ভাই ঐতিহাসিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত জানান যে, সে সময়ে বিপ্লবীদের হিন্দু ধর্মীয় রীতি-প্রথা মানতে হত।—

গীতা হাতে নিয়ে বিপ্লবের শপথ মন্ত্রোচ্চারণ কালী মায়ের কাছে নিজেকে বলি-প্রদত্ত বলে ঘোষণা ইত্যাদি পৌত্তলিক শর্ত থাকায় বাঙালি মুসলমানরা বিপ্লবী কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থেকেছে। নজরুলের 'কুহেলিকা' উপন্যাসে বিপ্লবী চরিত্র প্রথম বিষয়টি উত্থাপন করে বলছে : "আমার মনে হয় কী জানিস? ইচ্ছে করলে আমরা অনায়াসে এ দেশের মুসলমানদের মন জয় করতে পারি। তবে তা তরবারি দিয়ে নয়, হৃদয় দিয়ে।" আর বিষয়টি বিশ্লেষণে দলনেতা বজ্রমানির নির্দেশের কথা তুলে বলে, "অবশ্য তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও জাহাঙ্গীরকে আমি দলে নিতে পারতাম না। তা সে যত ভালো ছেলেই হোক। তোমরা বলবে, অধিকাংশ মুসলমান ছাত্রই হয় চাকুরি লোভী, না হয় ভীরু। কিন্তু ওদের সব ছেলেই যে ওই রকমের তা বিশ্বাস করবার তো কোনো হেতু দেখি নে। তাছাড়া আমরা ওদের চেয়ে কম চাকুরি লোভী, কম ভীরু এ বিশ্বাস করতে আমার লজ্জা হয়। দেশপ্রেম ওদের মধ্যে জাগেনি ওদের কেউ নেতা নেই বলে। আব, ওদের ধর্ম আলাদা হলেও এই বাংলারই জলবায়ু দিয়েই তো ওদেরও রক্ত অস্থি মজ্জার সৃষ্টি।

জাহাঙ্গীরের প্রিয় বন্ধু অনিমেষ তাঁর সম্পর্কে বলে—

> '...জাহাঙ্গীরকে আমাদের দলে নেওয়ায় অন্তত আমার কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। সে হিন্দু কি মুসলমান, তা ভেবে দেখিনি।'

অবশেযে বাঙালির বিপ্লবী দলে যোগ দেয় এবং গ্রেপ্তার হয়। বিচারে তার দ্বীপান্তর হল। এই পরিবারের একমাত্র পুত্র জাহাঙ্গীর তার সম্পত্তির বড়ো অংশটা গরিবদের মধ্যে বিলি করে দেয়।

জাহাঙ্গীর চরিত্র চিত্রণে সময়ের অভিঘাত যেমন স্পষ্ট তেমনি কাজী নজরুলের সংগুপ্ত দেশপ্রেমের অভিপ্রকাশও তেমনি স্বচ্ছ।

১৯৩২ সালের ৫ ও ৬ নভেম্বরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলিম তরুণ সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে কাজী নজরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে গোঁড়ামি, যে কুসংস্কার আছে তাহা পৃথিবীব আব কোনো দেশের মুসলমানদের মধ্যে নাই বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।'

'যুগবাণী' পত্রিকায় 'ছুৎমার্গ' শীর্ষক একটি লেখায় কাজী নজরুল তুলে ধরেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ বাঙলার সম্প্রীতির সেই ঐতিহ্য,--

> "হিন্দু হিন্দু থাক, মুসলমান মুসলমান থাক। শুধু একবার এই মহাগগনতলে সীমাহারা মুক্তির মাঝে দাঁড়াইয়া...। তোমার কণ্ঠে সেই সৃষ্টির আদিম বাণী ফুটাও দেখি, বল দেখি— 'আমার মানুষধর্ম'। দেখিবে দশদিকে সার্বভৌমিক সাড়ার আকুল স্পন্দন কাঁপিয়া উঠিতেছে। এই উপেক্ষিত জনসঙ্ঘকে বুক দাও দেখি, দেখিব এই স্নেহের ঈষৎ পরশ পাওয়ার গৌরবে তাহাদের মাঝে ত্যাগের একটা বিপুল আকাঙ্ক্ষা জাগে। এই অভিমানীদিগকে বুক দিয়া ভাই বলিয়া পাশে

দাঁড় করাইতে পারিলে ভারতে মহাজাতির সৃষ্টি হইবে নতুবা নয়। মানবতার এই মহাযুগে একবার গণ্ডী কাটিয়া বাহির হইয়া আসিয়া বল যে, তুমি ব্রাহ্মণ নও, শূদ্র নও, হিন্দু নও, মুসলমান নও, তুমি মানুষ— তুমি সত্য।'[১৩০]

নির্ভীক মুক্তকণ্ঠ কবি কাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে যখন হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক শক্তি জোটবদ্ধ আক্রমণ চালাচ্ছিল তখন পল্লিবাংলার কবি জসিমউদ্দিন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ান। বাঙালি সম্প্রীতির আদর্শকে গ্রামবাংলার মানুষের বুকের গভীরে এঁকে দিয়েছিলেন কবি জসিমউদ্দিন। লোকসংস্কৃতির ধারক এই নিরলস কবি-ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি মেলে রবীন্দ্রনাথের কথায়,— সমাজের বুকে যেভাবে মিলে থাকে হিন্দু-মুসলমান, তাঁর কাব্যেও তারা সেভাবে এসেছে। এসেছে বেদেদের কথা, যাদের কথা সাধারণভাবে সাহিত্যে আসে না। তাঁর নকশী কাঁথার মাঠের রূপাই ও সাজুদের জাত কি ভিন্ন করে বলা যায়। এখানে প্রাধান্য পেয়েছে জমিদারের বিরুদ্ধে কৃষকের জমির দখল রাখার সংগ্রাম। আবার সোজন বাদিয়ার ঘাট কাব্যে এসেছে বেদেদের জীবন-কথা। তখন পূর্ববঙ্গে বেদেরা নৌকায় ভেসে বেড়াত। দেশ থেকে দেশান্তরে; এই কাব্যে উঠে এসেছে নমঃশূদ্রদের কথাও,—

'নমুর পাড়ায় বিবাহের গানে আকাশ বাতাস
উঠিয়াছে আজ ভরি'
থাকিয়া থাকিয়া হইতেছে উলু, ঢোল ও সানাই
বাজিতেছে গলা ধরি।...' (সোজন বাদিয়ার ঘাট)

লোক-কবি জসিমউদ্দিন ছিলেন মুক্তমনা মানবতাবাদী এক কবি। জাতধর্মবর্ণ নির্বিশেষে উদারমনা এই কবি ধর্মের নামে খুনোখুনি, দেশভাগ মনের দিক থেকে কখনও মেনে নিতে পারেননি। এক অবিনাশী দুঃখ তাঁকে, তার অনুভবী সত্তাকে কুরে কুরে খেয়েছে। সেই বেদনাবোধ থেকেই সম্ভবত তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পর্বে নতুন স্বপ্নে উদ্দীপিত ও সক্রিয় হয়ে থাকবেন। এই সময়ে তিনি লেখেন—

'হিন্দু-মুসলমানের এদেশ, এদেশের গাঁব কবি,
কত কাহিনীর সোনার সূত্রে গেঁথেছে সে রাঙা ছবি।
এদেশ কাহারও হবে না একার যতখানি ভালবাসা
যতখানি ত্যাগ যে দেবে সেথায় পাবে ততখানি বাসা,
বেহুলার শোকে কাঁদিয়াছি মোরা, সংকিনী নদী সোঁতে
কত কাহিনীর ভেলায় ভাসিয়া গেছিলে দেশ হতে।

... ...

অতীতে হয়ত কিছু ব্যথা দেছি পেয়ে বা কিছুটা ব্যথা
আজকের দিনে ভুলে যাও ভাই, সে সব অতীত কথা।

এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি, নতুন দৃষ্টি দিয়ে

নতুন রাষ্ট্র গড়িব আমরা তোমাদের সাথে নিয়ে।" (শ্রেষ্ঠ কবিতা)

লোককবি জসিমউদ্দিন-এর একটি অসামান্য উপন্যাস রয়েছে, 'রাঙা প্রভাত',— হিন্দু-মুসলমান মিলনের এক মহাকাব্যিক আখ্যান। রবীন্দ্রনাথের 'মুসলমানী গল্প'-র পর এরকম অনবদ্য সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী আখ্যান আর একটি নেই। হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের দুটি পরিবার রয়েছে গল্পের কেন্দ্রে,— এবং কাহিনি বিন্যাস পেয়েছে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের টানাপোড়েনে। দেশভাগের ঘটনায় লেখক-স্বরে ক্ষোভ-বেদনা উচ্চারিত হয়। ধর্মপ্রাণ হোসেন সাহেবের ছেলে খালিদ বলপূর্বক অপরের বাগ্‌দত্তা একটি মেয়েকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করছে, এই ঘটনার আধারেই বিস্তার পেয়েছে আখ্যানটি। খবর পেয়ে হোসেন সাহেব গেলে ছেলে খালিদ পালিয়ে যায় বার্মায়। বৃদ্ধ হোসেন সাহেব পরম মমতায় খালিদের শিশু-পুত্রকে সস্নেহে লালন করে। সেই শিশু-কামাল বাল্য বয়সেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে,— সে মাদ্রাসায় ভর্তি হবে না, আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হবে। কামাল মনকে করে তোলে যুক্তিবাদী,— সে রবীন্দ্রনাথের 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ', নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতা আবৃত্তি করে। বৃদ্ধ অসুস্থ হোসেন সাহেবকে দেখতে আসেন পাশের শহরের উকিল চারুবাবু ও তাঁর কন্যা মায়া। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যানুবাদে মায়া শোনায় গালিবের কবিতা—

'যদি জোটে একটি পয়সা/খাদ্য কিনিয়ো ক্ষুধার লাগি।/

যদি জোটে দুটি পয়সা/তবে অর্ধেকে ফুল কিনে নিয়ো হে অনুরাগী।

ক্রমে মায়া ও তার দাদা মুকুলের সঙ্গে কামালের বন্ধুত্ব ঘনিষ্ঠ হয়। আর স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ আদর্শপরায়ণ চারুবাবুর ভক্ত হয়ে ওঠে কামাল। হোসেন সাহেব মারা গেলেন; ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিভেদের আগুন জ্বলে ওঠে। ইসলামি ধর্মমতকে উপেক্ষা করে কামাল চারুবাবুর বাড়ির দুর্গাপূজায় অংশ নেয়। দেশভাগ হলে শহরের বাসা ছেড়ে ওকালতি পেশা ছেড়ে দেশ গড়ার কাজে অংশ নিতে কামালদের নিয়ে গ্রামে এসে স্কুল স্থাপন করেন। মুকুল ডাক্তারি পড়ছে; সাম্যবাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রেণিহীন শোষণমুক্ত সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখে। মায়া ও কামালের মধ্যে ভালোবাসা গড়ে উঠলে তারা দাদা মুকুলের সমর্থন পায়। এ সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বৃদ্ধ চারুবাবু খুন হলে মুকুল তাঁর পিতার সময় বিষয়-সম্পত্তি স্কুলের নামে লিখে দিয়ে মা ও বোনকে নিয়ে কলকাতায় চলে আসে। কিন্তু দেশত্যাগের পরেও মুকুল ও মায়া কামালের কথা ভুলতে পারে না। অন্যদিকে কামালও এদের বিশেষত মুকুল ও মায়ার স্মৃতি আঁকড়ে চারুবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুলের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য প্রাণপাত করে চলে।

কাহিনির পরিসমাপ্তি ঘটেছে মিলনের মধ্য দিয়ে। সংবাদপত্রের একটি খবরে প্রকাশ পায়,— দুষ্কৃতীরা চারুবাবুর প্রতিষ্ঠিত স্কুলে আগুন ধরিয়ে দিলে সেই আগুন নেভাতে গিয়ে কামাল গুরুতর আহত।... সংবাদ পেয়েই মুকুল ও মায়া ছুটে যায় পূর্ব-পাকিস্তানে,

তাদেরই ফেলে-আসা গ্রামে। ডাক্তার-বন্ধু মুকুলের এবং প্রেমিকা মায়ার চিকিৎসা ও সেবায় কামাল সুস্থ হয়ে ওঠে; এবং মুকুলের সম্মতিতে কামাল ও মায়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

বিভাজিত বাংলার এরকম মিলনের, দুই ধর্মের মানুষের মধ্যে এরকম সম্প্রীতিরই স্বপ্ন দেখেছেন লোককবি জসিমউদ্দিন।

বাংলার সম্প্রীতি : রবীন্দ্র উত্তর আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সম্প্রীতি

রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র-নজরুল ইসলাম-জসিমউদ্দিনের রচনায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির যে আভাসিক পরিচয় আমরা পেয়েছি, সেটাই বাঙালি সভ্যতা ও সংস্কৃতির মর্মবস্তু। শুধু উনিশ শতকের নবজাগরণ নয়, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্রেই হিন্দু মুসলমান ধর্ম-পরিচয়ের উর্ধ্বে বাঙালিজাতীয় চেতনার পুষ্টি ঘটেছে। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদমুক্ত উদার মানবিক সাহিত্যচিন্তনের যে ধারাটির প্রবর্তন ঘটেছে রবীন্দ্র-শরৎ নজরুলের যুগে, সেই উত্তরাধিকার আজও বহন করে চলেছেন বাঙালি সাহিত্যিকরা। অধিকন্তু, রেনেসাঁসের মতন সাম্যবাদী চিন্তারও লালনভূমি হয়ে উঠেছে এই বাংলা। বাংলার বুকেই বস্তুবাদী দর্শনের, বিশ্ববীক্ষার মতাদর্শগত প্রচার ও অনুশীলন ধারাবাহিকভাবে চলে আসায় বাঙালির মানসলোক উদার হয়েছে, মুক্ত ও সহনশীল হয়েছে।

মানবিক বোধ ও দেশ-কাল চেতনার এই ঐতিহ্যের স্বাক্ষর, বাংলা সাহিত্যে যেভাবে পড়েছে তার অতিক্ষুদ্র পরিচয় আমরা খুঁজব হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির প্রশ্নকে সামনে রেখে।

মগ্ন চৈতন্যের শব্দশিল্পী কবি জীবনানন্দ দাশও সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও বিদ্বেষে বিচলিত হয় '১৯৪৬-৪৭' কবিতায় লেখেন :

> "ঘুমাতেছে।
> যদি ডাকি রক্তের নদীর খেকে কল্লোলিত হ'য়ে
> ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
> হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
> আর তুমি? আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
> চোখ তুলে শুধাবে সে— রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
> ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার;
> মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালির—'
> কোথাকার কেবা জানে; জীবনের ইতর শ্রেণীর
> মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে
> বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে;
> সৃষ্টির অপরিক্রান্ত চারণার বেগে

এইসব প্রাণকণা জেগেছিল বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিল কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এইসব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোতে।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে; কাকে বলে? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা ব'লে গিয়েছিল; তবু—
অনন্ত তো খণ্ড নয়; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা
অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে;
কেউ নেই, কিছু নেই— সূর্য নিভে গেছে''[১৩২]

উদ্ধৃত কাব্যাংশের সংবেদী চিত্রকল্প এবং সংগুপ্ত ভাবকল্পটি স্পষ্টতই কবি জীবনানন্দের মুক্তচৈতন্য এবং উদার মানবিক বোধের পরিচায়ক,— গরিব খেটে-খাওয়া মানুষ হানিফ মহম্মদ মকবুল আর গগন বিপিন শশীর মধ্যে কোনও ভেদই নেই। জীবনানন্দে এই মানবিকতার প্রকাশ বিরল বা কষ্টার্জিত নয় বাঙালি সংস্কৃতির ও ঐতিহ্যের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ।

আবার বৈখরী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্ব অন্নদাশংকর রায়ের তীব্র শ্লেষাত্মক ছড়া,— 'তেলের শিশি ভাঙলে পরে/খুকুর 'পরে রাগ করো/তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা/ভারত ভেঙে ভাগ করো/তার বেলা!' উচ্চপদস্থ সরকারি আমলা অন্নদাশংকর রায় তাঁর দীর্ঘজীবনে ঘটনামুখর বিশ শতকের প্রায় সব ঘটনারই মুখোমুখি হয়েছেন,— হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি আশ্চর্য সব দৃষ্টান্ত যেমন দেখেছেন তেমনি ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গাও দেখেছেন, দেখেছেন মানবতার দুঃখজনক অবচয়ও।

আজীবন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অতন্দ্র প্রহরী অন্নদাশংকর রায় তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে ধর্মোর্ধ্ব জাতীয় চেতনার স্বপক্ষে প্রচার চালিয়ে গেছেন। দুটি গল্প এক্ষেত্রে খুবই প্রাসঙ্গিক,— 'দূরের মানুষ' ও 'আঙিনা বিদেশ'।

'দূরের মানুষ' গল্পে লেখক দেখেন, দুই ইংরেজ প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কথা বলছেন, কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছে না। লেখকের ধারণা হয়, এঁরা কেউই সুস্থ নেই। ট্রেন ছাড়লে সাহেবের কাছে জানা গেল, এই চেঁচামেচি ভালোবাসার অভিব্যক্তি— দুই

ভাইয়ের বিশ বছর বাদে দেখা! ইংরেজ ভদ্রলোকের কথায়, 'জগতে ভ্রাতৃ স্নেহের উপরে কিছু আছে কি?'

অন্নদাশংকর রায় তাঁর গল্পে তখন লেখক-স্বরে জানান : 'আমিও নিশ্চুপ হয়ে তাঁর প্রশ্নের উত্তর ভাবছিলাম। ভ্রাতৃস্নেহের মতো আর কী আছে! তাই যদি হবে তবে আমরা হিন্দু-মুসলমান করে আলাদা হয়ে গেলুম কেন? শুধু কি আলাদা হওয়া লক্ষ লক্ষ ভাইয়ের হাতে বোনেরা ধর্ষিতা হয়েছে। হা বিধাতা! ইংরেজ আমাদের ভাই নয় পর। সেও কি কোনোদিন এমন করে শত্রুতা করেছে! 'বললুম ভাইয়ের মতো বন্ধু আর নেই। ভাইয়ের মতো শত্রুও আর নেই।' আর সেই সঙ্গে 'দূরের মানুষ' গল্পে উঠে এসেছে দাঙ্গার বীভৎসতা।

দ্বিতীয় গল্প 'আঙিনা বিদেশ'; এই গল্পে লেখক সীমান্ত ঘেঁষা এক জেলার অধিকর্তা। ফলে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে আঁকেন চোরাচালানের প্রক্রিয়া। এই পেশায় হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষই আছে। লেখক বুঝেছেন, সীমান্ত সংলগ্ন অঞ্চলে দুষ্কৃতীদের হাতে সবচেয়ে বেশি নিগৃহীত হয় কৃষকরা,— আর বেশির ভাগ কৃষকই মুসলমান। সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাঙালি কৃষকদের ওপর সরকারি-বেসরকারি নিগ্রহ ও সন্দেহ রয়েছেই, আর সেখানে লেখকের স্মৃতিধার্য উচ্চারণ : 'মানুষের ধর্মমতের দরুন অবিশ্বাস করতে নেই।'[১৩২]

বিপ্লবের স্বপ্নে, প্রতিবাদ-প্রতিরোধে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই লিখতে পারেন—

> "আমি আসছি—
> দু-হাতে অন্ধকার ঠেলে আমি আসছি
> সঙ্গিন উদ্যত করেছে কে সরাও
> বাধার দেওয়াল তুলেছে কে? ভাঙো
> সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আমি আসছি
> দুরন্ত দুর্নিবার শান্তি।"

বিপ্লবী সেই কবিই জীবন-সায়াহ্নে মানবতার বিপর্যয়ে— বাবরি মসজিদ ধ্বংসে প্রতিবাদে সোচ্চার হন; তীব্র ব্যঙ্গ আর নিষ্করুণ ঘৃণায় লেখেন 'রাম নাম সত্ হ্যায়' কবিতা,—

> "মা লিখ সত্যং বদ
> এঁটে নিয়ে মতলব
> ভক্তিতে গদগদ
> গদিতে বিরাট লোভ।
> আওড়িয়ে 'ত্যাক্তেন ভুঞ্জীথা'
> মসজিদ ভেঙে চায় মন্দির

চেক কাটা ভেক কেন বৃথা
ব্যাটা আছে শতপথ ফন্দির।
পরহিতে তাকে কেউ দেখেনি তো জন্মেও
পুরোহিত সেজে আজ চটকায় পিণ্ডি—
রথ চড়ে, চোঙা ফোকে মতি নেই ধর্মেও
দেশটা ডুবিয়ে খায় বর্সির শিন্নি।..."[১৩৩]

'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' উপন্যাসখ্যাত সতীনাথ ভাদুড়ীর 'গণনায়ক' (১৩৫৪) গল্পে ধর্মব্যবসায়ীরা হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষের ধর্মীয় আবেগকে কীভাবে ব্যবহার করে তার নিখুঁত উপস্থাপনায় উঠে এসেছে দেশভাগ পর্বের বাস্তবতা।

সাম্প্রদায়িক গণবিকারের সেই বাস্তবতায়,— 'পূর্ণিয়া জেলার গোপালপুর থানা আর দিনাজপুর জেলার শ্রীপুর থানার মধ্যের সীমারেখা 'নাগর নদী'— তার ওপর আছে 'কাঠের নড়বড়ে পুলটি'। রূপক এই উপস্থাপনায় খালটি দুই অঞ্চল ও দুই সম্প্রদায়ের বন্ধনের প্রতীক হয়ে ওঠে। আর মোটা কলমের আঁচড়ে দেশভাগের রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কটা পুনর্বিন্যস্ত হয়— ধর্মীয় ভাবাবেগে দুটি সম্প্রদায়ের মানুষ আলোড়িত হয়, এবং সেই পুনর্বিন্যাস ও আলোড়নের সুযোগ কায়েমি স্বার্থ।

'...চোরাকারবারের কেন্দ্র আরুয়াখোয়া বাজার থেকে পুল পার হয়ে যায় গরু, মোষ, চিনি, ঘি; আর বাংলা দেশ থেকে আসে চাল আর ধান।' সেরকমই এক চোরাকারবারী মুনিমজি আয়ুয়াখোয়ার হাটে এসে খবর দেয় : 'আর কী, দিনাজপুর জেলা তো পাকিস্তান হয়ে গেল।' খবর শুনে সকলে নীরব; 'শ্রীপুরের রাজবংশী দর্পণ সিং-এর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। আর সাওজীর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায় ভয়ে— সাহসে বুক বেঁধে জিজ্ঞাসা করে— আর আমাদের আরুয়াখোওয়া?'

'আরুয়াখোয়া তো পূর্ণিয়া জেলা, হিন্দুস্থানে। এ তো আর বাংলামুলুক নয়, এ হচ্ছে বিহার। এখানে আর কারও টু ফ্যাঁ চলবে না।' এই সময় হাটুবে অছিমদ্দী জিজ্ঞাসা করে, 'মীরপুর কোথায় পড়ল হুজুর?'... 'মালদা জেলা পড়েছে পাকিস্তানে।' লেখক-স্বরে সতীনাথ লেখেন : 'আল্লার এই অসীম করুণায় অছিমদ্দী এত অভিভূত হয়ে পড়ে যে আর কোনো কথা বলবার ভাষা খুঁজে পায় না।'

অন্যদিকে হাটের ইজারাদার হাজি সাহেবের কাছে পাকা খবর জানতে যায় কায়েম,—

"...হাজার হোক মুসলমান তো ইজারাদার সাহেব! আগে হলে কায়েমের এ সাহস হত না, কিন্তু গত বছর বিহারের কাণ্ডের পর মুসলমান আর মুসলমানের কাছে যেতে ভয় পায় না। কায়েম দেখে যে সেখানে আরও অনেকে বসে রয়েছে। সকলেই ইজারাদারকে শাসাচ্ছে। ইজারাদার সাহেব সকলকে শান্ত

> করেন। দূরের লোকদের তখনই বাড়ি ফিরতে বলেন। চারিদিকে হিন্দু বস্তি। সকলে খুব সাবধানে থাকবে। রাতে পালা করে জাগবে। কিষাণগঞ্জ সাবডিভিশন হিন্দুস্থানে গেলেই হল। এর আমি বিহিত করছি। খবর এখনও সঠিক পাওয়া যায়নি। ঐ মুনীমটার কথায় বিশ্বাস কী?"

আবার ইজারাদার আর মুনিমজি এক ঘরে বসে নিভৃতে সলা করে, চাল পাচারের ব্যবস্থা পাকা হয়।

ইতিমধ্যে হাটের লোকেরা খেপে যায়,— 'তারা দল বেঁধে কাছারি বাড়ির মাঠে ঢুকছে। তারা মুনিমজিকে ফেরত চায়—।' এই সময়ে দুজনে একসঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। মুনিমজি ক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করে বলে—

> "...ওর সাধ্যি কি আমাকে কিছু করার। তোমরা এখনও বাড়ি ফেরনি? আজকালকার দিনে বাড়ি ঘর ছেড়ে যত কম থাকা যায় ততই ভাল। তোমরা তো সব বোঝই। আমি আর কি সলা দেব! নিজের নিজের গাঁয়ের মোড়লের সঙ্গে পরামর্শ করে, যা ভাল হয় করো।... মেয়ে-ছেলেদের নিয়েই বিপদ। একটু হুঁশিয়ার থাকবে।..."

অভাবে ইজারাদার সাহেব আর মুনিমজি দুটি চরিত্রের কৃৎকৌশলে ও বাচনে সাম্প্রদায়িক বিভেদের পরিস্থিতি তৈরি হয়। 'পরের দিন থেকেই আরুয়াখোয়ার রূপ বদলে যায়। আগে সপ্তাহে একদিন হাট বসত— এখন অহোরাত্র ভয়ার্ত নরনারীর নিরানন্দ মেলা।' সম্ভাব্য বিভাজনের, স্বাধীনতার খোয়াবের দৃশ্যরূপ আঁকেন সতীনাথ,—

> "পুলের ওপারে রেলিঙেব ওপর লাগানো হয়েছে সবুজের উপর চাঁদতারা দেওয়া লীগের ঝাণ্ডা; পুলের এদিকে দেওয়া হয়েছে কংগ্রেসী তিনরঙা পতাকা। ওদিকে একদল চিৎকার করে, 'লে লিয়া হ্যায় পাকিস্তান', 'বাঁটগেয়া হ্যায় হিন্দুস্থান'; এদিকের দল চ্যাঁচায়, 'বন্দে মাতরম্', 'জয় হিন্দ'।

আর যখন বিবদমান দু-দলের যুবকদের স্লোগান বাতাস মুখর জনচিত্ত আলোড়িত তখনই—

> "কে যায় গাড়িতে?
> শ্রীপুরের দর্পণ সিং-এর জামাই আর মেয়ে।
> সার্চ কর গাড়ি, পাকিস্তান থেকে আবার কিছু নিয়ে যাচ্ছে না তো?
> সঙ্গে সঙ্গে এরফান এসে পড়ে।— কে দিদিমণি? জামাইবাবু?— যেতে দাও গাড়ি। পালিয়ে যাচ্ছ কেন? আমরা থাকতে তোমাদের ভয় কী দিদিমণি? খোকাবাবু কত বড়টা হয়েছে দেখি। ভয় পাচ্ছে আমাকে দেখে। কিছু ভয় নেই দিদিমণি। মা-বাবার সঙ্গে দেখা করে আবার এসো। তোমাকে তো, জামাইবাবু, ভেবেছিলাম মরদ। তুমি আবার পালাও কেন?"

গল্পের শেষে রায় বেরোয় কমিশনের,— শ্রীপুর ও মালদার একটা অংশ পড়েছে হিন্দুস্থানে— জলপাইগুড়ি জেলার তিতলিয়া থানা গেছে পাকিস্তানে,— আর সে-কথাও জানায় মুনিমজি। ধূর্ত চোরাচালানকারী মুনিমজির চরিত্র নির্মাণে শেষে এক অভিনব করুণা প্রদর্শনের দৃশ্যরূপ আঁকেন।

> "ছেলেরা পাটের ক্ষেত থেকে একটি পরিবারকে ধরে নিয়ে আসে,— কী মতলবে লুকিয়েছিল— আগুন লাগাবে বলে মনে হয়—
>
> আরে অছিমদ্দী যে!
>
> অছিমদ্দী কেঁদে পড়ে।— গাঁ থেকে পালিয়ে যাচ্ছিলাম হরিপুরের দিকে। মীরপুর হিন্দুস্থান হয়ে গিয়েছে পরশু থেকে। শুনছি পূর্বদিকে মুখ ঘুরিয়ে নামাজ পড়াবে। মুরগি জবাই করতে দেবে না। তাই এক কাপড়ে বেরিয়ে পড়েছি। ভাবলাম দিনমানটা পাটের ক্ষেতে থেকে, সাঁজ হতে চলতে শুরু করব— সে কাঁদতে কাঁদতে মুনিম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে।
>
> ছেড়ে দাও একে। এরা আমার চেনা লোক।
>
> দয়ার শরীর হুজুরের।
>
> 'মুনীম সাহেব কী জয়! মহাত্মা গান্ধি কী জয়।— জয়-ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কেঁপে ওঠে।"

আর বাংলা কথাসাহিত্যের অন্যতম জ্যোতিষ্ক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'ছেলেমানুষী' গল্পে সাম্প্রদায়িকতার ব্যাপ্তার্থকে ছেলেমানুষি উপহাসের স্তরে নামিয়ে এনেছেন।

মিশ্র বসতির এক মহল্লায় হিন্দু-মুসলমানরা শান্তিতে পাশাপাশি বাস করছে, কোনো ভেদাভেদ বিরোধ নেই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে। এখানে এমন দুটি পরিবার আছে যাদের মধ্যে আছে মৈত্রীর দৃঢ় বন্ধন, ভালোবাসা। হালিমা ও ইন্দিরা, এ দুই বউয়ের মধ্যে নিবিড় সখ্যতা, একে অপরের বাড়ি গেলে না খাইয়ে ছাড়ে না— দুজনের ছেলেমেয়ে হাবিব ও গীতাও একসঙ্গে বড়ো হয়। দুই পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠরা এতটা মেলামেশা ভালো চোখে দেখেন না।

কলকাতার সেই দাঙ্গার পরিবেশে এই বস্তি অঞ্চলেও ঘৃণা-বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি সন্দেহ ছড়িয়ে পড়ে। অঞ্চলের শান্তি রক্ষার্থে গড়ে ওঠে শান্তি কমিটি, আসে পুলিশের আরক্ষা উপকরণ। নিস্তেজ মহল্লাটা বাঁশির হুইসেল আর ভারী বুটের শব্দে জেগে ওঠে। আর তা দেখে হাবিব ও গীতা, দুই শিশুর দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলা করার প্রবল ইচ্ছা জাগে। বড়োদের কাছ থেকে শুনে শুনে শিশুমনে ছোরা, খুর, লাঠি ইত্যাদি অস্ত্রপাতির প্রয়োগ নিয়ে রহস্য জমে।

একদিন দুটি শিশু ভাঙা ছুরি ও অব্যবহৃত খুর সংগ্রহ করে ঘরের দরজা বন্ধ করে

দাঙ্গা-দাঙ্গা খেলা শুরু করে,— এ ওকে আঘাতও করে, অন্যজন প্রতিশোধ গ্রহণে উদ্যত হয়, দুজনার চিৎকার শোনা যায়। আর তখনই দুই পরিবারের মধ্যেকার এতদিনের বিশ্বাস ভালোবাসার ভিতটা নড়ে যায়। হালিমা ও অন্যরা এক জানালা দিয়ে, ইন্দিরা ও অন্যরা আর এক জানালা দিয়ে বাচ্চাদের দরজা খুলতে বলে, কিন্তু খেলায় উন্মত শিশু দুটি দরজা খোলে না। ছুরি ও ক্ষুর ফেলে এবার তারা হাতাহাতি শুরু করেছে। বড়রা ছুটে আসে। হাবিবের বাবার ওপর দায়িত্ব পড়ে দরজা ভাঙার। সে ছিটকানি ভেঙে শিশু দুটিকে বার ক'রে আনে,— দুই মা ঝাঁপিয়ে পড়ে কোলে টেনে নেয় নিজের সন্তানকে, সন্তানের রক্তে রঞ্জিত হয় তাদের বস্ত্র।

গণ্ডগোল শুনে ছুটে আসে শান্তি কমিটির লোকজন, পুলিশের ভারী বুটের শব্দে প্রকম্পিত হয় চারিদিক। তবে ছেলেমানুষি ব্যাপার বলে তখনকার মতো মিটেও যায়। কিন্তু আবার কদিন বাদেই হাবিব-গীতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না,— কোথায় গেল ওরা। খোঁজাখুজি চলে এখানে-সেখানে, কিন্তু পাওয়া যায় না। একটা অবিশ্বাস সন্দেহ আশঙ্কার কালো ছায়া ছড়িয়ে পড়ে,— কী হল ওদের। খুঁজতে খুঁজতে দেখা যায়, চিলেকোঠার ঘরে বসে দুজনে একমনে খেলছে। দুটি শিশুর অনাবিল খেলার ছেলেমানুষির রূপকে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেকার সম্পর্কের টানাপোড়েন— সর্বব্যাপ্ত অবচয় নিখুঁত উঠে এসেছে।

এরকমই আর একটি গল্প আছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, বড়োদের বন্ধুতা নিয়ে, 'স্বাক্ষর'।

দীননাথ ও জম্বুর আলি, দুই অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু। দীননাথ যশোহর কুষ্ঠিয়া বাজারে মালাই বিক্রি করে আর জম্বুর আলি ঝাঁকাভর্তি তরিতরকারি এনে বেচে। একই ঝুপড়িতে দুই বন্ধু দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়ে বেঁচে আছে। এই সময়ে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধে,— হিন্দু-মুসলমান ধর্ম-পরিচয়ে দুই বন্ধু হয়ে যায় পরস্পরের দুশমন,— কেউ আর বিশ্বাস করে না অপরকে। দাঙ্গার প্রবল উত্তেজনায়— গণবিকারে দীননাথ জম্বুরকে লক্ষ করে ইট ছোঁড়ে, জম্বুর পাল্টা ছোঁড়ে সোডার বোতল। দাঙ্গার তীব্রতা বাড়লে এলাকায় পুলিশ আসে। পুলিশের ভয়ে, দুজনেই ওরা পালায়। পালিয়ে গিয়ে লুকোয় একটা অন্ধকার সিঁড়ির নীচে। ততক্ষণে দুই বন্ধুর বুকে পরস্পরের জন্য কী রকম ব্যথা বোধ জাগে। এক সময় সিঁড়ির অন্ধকারে দীননাথ বিড়ি ধরায়, দুটি টান দিয়ে অভ্যাসমতো বিড়িটা এগিয়ে দেয়, জম্বুর আলির দিকে, সে-ও খোশমেজাজে সেই বিড়িতে টান দেয়।

বাংলা কথাসাহিত্যের রত্নপেটিকায় এরকম দাঙ্গাবিরোধী, সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী এবং হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির অজস্র গল্প-মাণিক্য রয়েছে। তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নবেন্দু ঘোষের 'উলুখড়', ঋত্বিক ঘটকের 'স্ফটিক পাত্র', সলিল চৌধুরীর 'ড্রেসিং টেবিল', কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের 'বুলবুলি', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'উস্তাদ মেহের খাঁ ও ইজ্জত', সমরেশ বসুর 'আদাব', মহাশ্বেতা দেবীর 'রাম রহিমের কথা'। ইতিপূর্বে আমরা

যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পরম্পরাগত ঐতিহ্যের কথা বলেছি তারই বহুমুখীন বাণীরূপ ধৃত রয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখাতেই। এই সচেতনতার অহংকার দাবি করতে পারেন বাংলাদেশের সৃষ্টিশীল লেখকরাও।

আরও বলার কথা এই যে, বাঙালি সম্প্রীতির ভাবধারাটি সবিশেষ পরিপুষ্টি লাভ একই সঙ্গে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে। উনিশ শতকের নবজাগরণের যে ধারাটি বাঙালি জাতীয় বিকাশের স্বপক্ষে ছিল, বহু বাধাবিঘ্ন, অস্মিতা ও অহংকারের ভাবাবেগ ডিঙিয়ে তা বিশ শতকে কী স্বরূপে ধরা দিয়েছে তা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। তবে মুক্তবুদ্ধি ধর্মোর্ধ্ব চেতনা বিকাশে— বাঙালি জাতীয় সম্প্রীতির বাতাবরণ নির্মাণে কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের চিন্তা-চেতনার অবদানও এক্ষেত্রে স্মর্তব্য।

প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন (১৮৮০-১৯৬০)-এর কথা। তাঁর অবদান সম্বন্ধে অভিধানকার লেখেন :

> "ভারতীয় মধ্যযুগের ধর্মসাধনার বিষয়ে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। সন্তদের বাণী, বাউল সঙ্গীত এবং সাধন তত্ত্ব সংগ্রহে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব বিশেষভাবে স্মরণীয়। প্রায় পঞ্চাশ বছরের সাধনার ফলে সংগৃহীত বিষয়সমূহ কয়েকটি গ্রন্থে তিনি অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'One Hundred Poems of Kabir' গ্রন্থটিও তাঁর সংগ্রহ অবলম্বনে রচিত (১৯১৪)। ...তাঁর রচিত 'Hinduism' নামক গ্রন্থটি ফরাসি, জার্মানি ও ডাচ ভাষায় এবং অপর কয়েকটি গ্রন্থ হিন্দি, গুজরাটি ও অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হয়েছে... 'কবীর' (৪ খণ্ড), 'ভারতীয় মধ্যযুগের সাধনার ধারা', 'দাদূ', 'ভারতের সংস্কৃতি', 'বাংলার সাধনা', 'জাতিভেদ', 'হিন্দু মুসলমানের যুক্ত সাধনা', 'প্রাচীন ভারতে নারী', 'যুগগুরু রামমোহন', 'বাংলার বাউল', 'চিন্ময় বঙ্গ' 'Medieval Mysticism of India' প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।[১৩৪]

এক্ষেত্রে আমাদের আধেয় গ্রন্থটি হল ভারতে হিন্দু 'মুসলমানের যুক্ত সাধনা' (১৩৯৭)। তাঁর বহুল সমাদৃত এই গ্রন্থটিতে ক্ষিতিমোহন সেন লেখেন : "বাংলা দেশেও হিন্দু-মুসলমান সাধনার কম যোগ হয় নাই। বহু মুসলমান বৈষ্ণব কবি তো আছেনই, তাহা ছাড়াও মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির বাংলা অনুবাদে মুসলমান উৎসাহদাতার অভাব হয় নাই। তাহার উপর আউল-বাউল-দরবেশদিগের অপূর্ব সঙ্গীত-সাহিত্য, আগমনী প্রভৃতি গানেও গোলাম মৌলা প্রভৃতির সব অপূর্ব গান আছে। বাউলদের মধ্যে তো হিন্দু-মুসলমান কোনো ভেদই নাই। লালন, হাসন, মদন প্রভৃতি অনেকে জাতিতে মুসলমান।" তিনি আমাদের আরো জানান : "...চট্টগ্রামের পরাগল গ্রামবাসী সৈয়দ সুলতান বৈষ্ণব কবিতা লিখতেন। ইহার 'জ্ঞানপ্রদীপ' তান্ত্রিক যোগগ্রন্থ। ইনি যে নবী বংশের বারোজন নবীর নাম করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে ব্রহ্মা

বিষ্ণু শিব শ্রীকৃষ্ণ আছেন। বৈষ্ণব পদকর্তাদের মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকে মুসলমান। যথা আলাওন, আমান, কবীর, ফয়জুল্লা, এবাদুল্লা, আলিমুদ্দীন, মহম্মদ হামীর প্রভৃতি।"

"...আলাওলের পূর্বে দৌলত কাজী আশরফ খাঁর আদেশে সতী ময়নামতী বা লোর চন্দ্রানী কাব্য লেখেন। ইঁহারই অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন কবি আলাওলা।"

"আবদুল করিম চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু মুসলমান বৈষ্ণব পদকর্তার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন, কবি আলী রাজার একটি গ্রন্থ 'ধ্যানমালা'।

রবীন্দ্রনাথের ঐক্য ও মিলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত ঋষিপ্রতিম ব্যক্তিত্ব ক্ষিতিমোহন কোনওভাবেই মেনে নিতে পারেন না বিভেদের যুক্তি। আপসহীন এই সমন্বয়বাদীর রচিত 'দাদূ' গ্রন্থের আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন,— "ভারতীয় এই সাধনধারা বর্তমানকালে প্রকাশিত হয়েছে ক্ষিতিমোহন সেনের জীবনে। এই যুগে তিনিই উপনিষদের ঐকতত্ত্বের আলোকে হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানকে সত্য দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন, তিনি কাউকেই বর্জন করেননি।... আজকের দিনের যে রামমোহন রায় আমাদের দেশে জন্মেছেন তাতে বুঝতে পারি যে, কবীর, নানক, দাদূ ভারতের যে সত্য সাধনাকে বহন করেছিলেন আজও সেই সাধনার প্রবাহ আমাদের প্রাণের ক্ষেত্র পরিত্যাগ করেননি।" [দ্রষ্টব্য, ক্ষিতিমোহন সেন-এর 'দাদূ' গ্রন্থের ভূমিকা; বিশ্বভারতী]

ক্ষিতিমোহন সেন ছিলেন এক মুক্তবুদ্ধি গবেষক, তিনি নির্দ্বিধায় লেখেন,— "ভারতে যত অত্যাচার মুসলমানের নামে, তাহা তুর্ক জাতির কৃত। ভারতীয়রা হিন্দু বলিয়াই যে তুর্কেরা ভারতে অত্যাচার করিয়াছেন তাহা নহে। পারস্য প্রভৃতির মুসলমান রাজাও তাহাদের হাতে কম নিগৃহীত হয় নাই।"

ক্ষিতিমোহন তাঁর এই মূল্যবান গ্রন্থে মুসলমানদের উগ্র ধর্ম-প্রসার ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আরবে-পারস্যে যে সমস্ত প্রগতিশীলরা সংগঠিত হয়েছেন তাঁদের কথাও বলেছেন। তিনি আবু আল মু-অরবীর কথাও উল্লেখ করেছেন। ৯৭০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জন্ম; স্বাধীন ও মুক্তচিন্তার স্বপক্ষে এই পৌত্তলিকতাবিরোধীর বক্তব্য : 'পৌত্তলিকতা ছাড়িয়াছ বলিয়া তো গর্ব কর, ভাবিয়া দেখিয়াছ কি তুমি নিজে কত বড় পৌত্তলিক?' বিশেষ শাস্ত্র বিশেষ গ্রন্থ বিশেষ ভাষা বিশেষ দেশ বিশেষ দিন ও বিশেষ দিককেই যদি একমাত্র পবিত্র মান তবেই বা কম পৌত্তলিকতা। দেব-পূজা ছাড়িয়া দেবালয় অর্থাৎ মসজিদকেই পূজা কর তবেই বা কম পৌত্তলিকতা কি?' [দ্রষ্টব্য, ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতে হিন্দু মুসলমান যুক্ত সাধনা]

স্বামী বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮০-১৯৬১) গ্রন্থ 'ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি' বাঙালি সম্প্রীতির আলোচনায় এক অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। আর ওই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে এই মার্কসীয় চিন্তক ভারতীয় মুসলমান সমাজের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, ভারতের বর্তমান জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের সঙ্গে বেদ-পুরাণের কোনও সম্বন্ধ নেই। বরং প্রাচীন ভারতের সঙ্গে আরব দেশের যোগাযোগ ছিল। জানা যায়, ভূমধ্যসাগরীয়

অঞ্চলের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে আরবের বাণিজ্য চলত। কোরানেও ভারত কোনও অজ্ঞাত দেশ নয় বলেই মনে হয়। ইহুদি জনশ্রুতি সূত্রে জানা যায়, নোওয়ার এক পুত্র হাসের সন্তান 'হাসুদ' ভারতে বসবাস করতে এসেছিল। উলেমাগণের মতে, কোরান-হাদিসেও উক্ত জনশ্রুতির উল্লেখ আছে। ঐতিহাসিক আবুল ফজলের 'অকবরনামা'য়ও এই ইসলামীয় প্রবাদটি রয়েছে। বলা হয়েছে যে পিতা আদম স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে মর্তে সারন দ্বীপে (সুবর্ণ দ্বীপে) অবতরণ করে বাসস্থান নির্মাণ করেন (আমীর খসরুর ফারসি কবিতা দ্রষ্টব্য)। এ জন্যই সিংহলের (বর্তমান শ্রীলঙ্কা) 'আদমপিক' আজও মুসলমানদের কাছে এক তীর্থস্থান।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও বলেছেন যে আরব দুনিয়া, পারস্য, বিশেষত বাগদাদের সাথে ভারতের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। আরবি ভাষায় বহু সংস্কৃত গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। শোনা যায়, বাগদাদের রাজসভায় বেশ কয়েকজন ভারতীয় সভাসদও হন। সেকালের এক বিখ্যাত কবি, কুসসিম মাহমুদ-বিন-আল-হোসেন বিন সাহাক ছিলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এরকম গবেষণার মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারীরা মনে করেন, সুফিধর্মে ভারতীয় ধর্ম-চেতনার অনেকখানি প্রভাব পড়েছে।

কালের অগ্রগমনে এবং রাজনৈতিক-সামাজিক ঘটনাক্রমে হিন্দুসমাজে অনেক আন্দোলনমুখর পর্ব অতিক্রম করে আসে। আর তার ফলে হিন্দু ও মুসলমানরা পরস্পরের আরও কাছে চলে আসে। ধারণা করা হয়, সুফি মতের দ্বারা প্রাণিত হয়েই হিন্দুধর্মে সংস্কার আন্দোলন গতি পেয়েছে। কোনও কোনও মুসলমান লেখক বলেছেন, ইসলাম সুফি-আর্য ভাবধারার মধ্য দিয়ে প্রচারিত হওয়ার ফলেই ভারত তা এত সহজেই গ্রহণ করতে সমর্থ হয়।[১৩৫]

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লক্ষ করেছেন যে, হিন্দুদের দ্বারা স্থাপিত অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যে যেমন মুসলমান সদস্য রয়েছেন তেমনি বিপরীতক্রমে মুসলমানদের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়েও হিন্দু সদস্য রয়েছে। বাংলার নদিয়া জেলায় সাহেবধনী সম্প্রদায় তার এক দৃষ্টান্ত। মুসলমান ফকিরের হিন্দু শিষ্য এবং হিন্দু সাধুর মুসলমান মুরিদ (শিষ্য) আছে। আবার বহু মুসলমান ফকির গেরুয়া আলখাল্লা পরেন এবং কেউ কেউ গায়ে ছাইও মাখেন। বাংলার সত্যপির বা সত্যনারায়ণের ব্রতকথায়ও রয়েছে রাম রহিমের ঐক্য সাধনা। তবে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন যে, হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের এরূপ ভাব-বিনিময় সমাজের নীচের স্তরে—গ্রামের অশিক্ষিত কৃষকদের মধ্যে হলেও শিক্ষিত শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমানদের কাছে এগুলি খুবই হেয় ও নিন্দনীয় কাজ বলে গণ্য হত। লেখক বিহারের সাঁওতাল পরগনায় দেখেছেন যে বহু বৌদ্ধ স্তূপে বৌদ্ধ-হিন্দু-সাঁওতালদের দ্বারা একইভাবে পূজিত হয়; একই অশ্বত্থ বৃক্ষতলে মুসলমানদের পিরস্থান, সাঁওতালদের থান, হিন্দুদের বেদি— মুসলমান, হিন্দু, সাঁওতাল প্রত্যেকে এসে সেখানে পূজা দেয়।[১৩৬]

তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দু-মুসলমানের ব্যবহারিক জীবনের মিল-অমিলগুলিও দেখেছেন। যেমন, ইজার ও চাপকান হিন্দুদেরও পোশাক,— "ভারতীয় পোশাক বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে। এই প্রকারে দেখা যাইবে যে, মাদুরে বা বিছানায় খাওয়া ইসলামীয় লক্ষণ নয়। প্রাচীনকালে গরিব পারসিকরা খাদ্যদ্রব্য মাদুরে এবং ধনী পারসিকরা টেবিলে খাইতেন; আর প্রাচীন হিন্দুরা জলচৌকিতে খাদ্য রাখিয়া খাইতেন। রাজপুতান পাঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে, আসাম ও মণিপুরে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা নেই। বোধহয় বৈষ্ণবধর্ম দ্বারা ছুঁতমার্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরাণে (৩-১১-৮০) কাষ্ঠনির্মিত ত্রিপয়াদির উপরিস্থিত পাত্রে ভোজন করিবে বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের 'স্মৃতি হরি ভক্তি বিলাস' গ্রন্থে তিন পায়া জলচৌকির উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে। (উক্ত পুস্তক গৌরাঙ্গদেবের অনুজ্ঞায় তদীয় শিষ্যবৃন্দ কর্তৃক লিখিত হয়।)"[১৩৭]

লেখক শেষে নিজের অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করতে গিয়ে জানান যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে একইবকম অনুষ্ঠান নিয়ে কটাক্ষপাতও করা হয়। কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে ধরা পড়ে যে, আঞ্চলিকতাব শর্তে একটা মিল থাকেই। মুসলমান বন্ধুদের বাড়িতে আহার করতে গিয়ে লেখক দেখেছেন, অঞ্চলগত একটা মিল বহু ব্যাপারে রয়েছে। বাংলার মুসলমানরা আহারের শুরুতে মিষ্টান্ন ও পরে ঝাল খায় না,— তারা বাংলার হিন্দুদের খাদ্যরীতিই অনুসরণ করে। আবার পাঞ্জাব-দিল্লি অঞ্চলের হিন্দুরাও মুসলমানদের মতোই খাদ্যরীতি অনুসরণ করে। পরিশেষে লেখকের স্মৃতিধার্য উক্তি,—

> "এখানে এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দুর সহিত ভারতীয় মুসলমানদের রীতিনীতির যেটুকু প্রভেদ বা পার্থক্য বিদ্যমান আছে তাহা আরব দেশজ নহে, বরঞ্চ তা জরথ্রুশতীয়— পারসিক সভ্যতাপ্রসূত। ইহার কারণ এই যে ইসলামের অর্ধেক হইতেছে পারস্য দেশ সঞ্জাত।"[১৩৮]

নগেন্দ্রনাথ বসু তাঁর 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' গ্রন্থের ব্রাহ্মণকাণ্ডে উল্লেখ করেছেন যে, 'ওকিফাভ-ই-মুস্তকী' নামক তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস সূত্রে জানা যায়, শের খান মুসলমানদিগের প্রধান প্রধান শেখ এবং হিন্দুদিগের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ও গুণিজনের সহিত আহার-বিহার করতে ভালোবাসতেন। খুব সঠিকভাবেই পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে মুসলমান শাসনের প্রথম দিকে উভয় সমাজের মধ্যে তত ব্যবধানও ছিল না, ছিল না ছুঁতমার্গ— ছিল সম্প্রীতির খোলামেলা বাতাবরণ।[১৩৯]

এ কারণে ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত মনে করেন : "দুইটি পৃথক জাতি এক স্থানে যখন বসবাস করে তখন তাহাদের মধ্যে domestication of ideas and habits হয়। ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহাই হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে সহনশীলতা উদ্ভূত হইয়াছিল।"[১৪০]

এবার আমরা উল্লেখ করব মানবেন্দ্রনাথ রায় (১৮৮৭-১৯৫৪))-এর লেখা 'ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান' গ্রন্থের বিষয়ভাবনার কথা।

খ্রিস্টধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশের ইতিহাস লিখতে গিয়ে ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস এক স্থানে মন্তব্য করেছেন, মরু অঞ্চলের মানুষ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সম্ভবত সাম্যের ধারণার কারণে। বিষয়টি বহুকাল অনালোচিতই থেকে গেছে। কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক-এর প্রেসিডিয়ামের সম্মানিত সদস্য এম.এন. রায় বা মানবেন্দ্র নাথ রায় এই বিষয়ে আলোকপাত করেন।

তিনি লেখেন, সত্যিকারের ধর্মীয় আন্দোলন বা আধ্যাত্মিক কারণে নয়, রাজনৈতিক শর্তেই ইসলামের উত্থান ঘটেছে। ইসলামের সূচনাপর্বের ইতিহাসে শুনতে পাই আরব মরুভূমির বেদুইন উপজাতি মানুষের ঐক্যবদ্ধ হবার মর্মস্পর্শী আহ্বান। সে আহ্বানে সাড়াও মিলেছে খুব।[১৪১]

ইসলামের অগ্রগতি ও দ্রুত বিস্তারের শর্ত খুঁজতে গিয়ে পূর্ববর্তী ধর্মগুলির ব্যর্থতা ও পশ্চাৎপদতার কারণগুলিও লেখক বিশ্লেষণ করেছেন।

> "এর পূর্ববর্তী ধর্মবিপ্লব আদর্শভ্রষ্ট হল। খ্রিস্টধর্ম একদিকে মঠ ও মঠাধ্যক্ষদের আওতায় পড়ে নির্বাণোন্মুখ সমাজনীতির রূপ পরিগ্রহ করায় এবং অন্যদিকে বিলীয়মান সাম্রাজ্যের অবলম্বন মাত্র হয়ে পড়ায় তার আদি বিপ্লবাত্মক রূপ হারিয়ে ফেলেছিল।"[১৪২]

ইসলামের দ্রুত প্রসারের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক শর্তটি যে খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে তা স্পষ্ট নির্ণয় করেছেন মানবেন্দ্রনাথ রায়। ইসলামের প্রসার ঘটেছিল মধ্যযুগের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান পথগুলির উপর। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, পারস্য এবং ভক্সসের তীরবর্তী অন্যান্য ভূখণ্ডগুলি জয় করবার ফলে চিনের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্যিক যোগসূত্র গড়ে ওঠার কোনও অসুবিধা থাকল না। ফলে চিন ও ভারতের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা দখলদারি বজায় রাখতে তারা সমর্থ হল। শুধু তাই নয়, এই বাণিজ্য পথ স্পেন ও মরক্কো পর্যন্ত প্রসারিত হয়। হজরত মহম্মদের জন্মের দুশো বছর আগে আরবের ছিল দুটি লাভজনক পেশা,— দস্যুবৃত্তি ও লুণ্ঠন। এই পথে বণিক ও অভিযাত্রীদের বারবার লুণ্ঠিত হতে হয়েছে। এম.এন.রায় তৎকালীন এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করেন, যেহেতু ব্যবসায়ীদের কাছে মুনাফাই প্রধান কথা তাই তারা ব্যবসার স্বার্থেই লুঠেরাদের হাত থেকে বাঁচতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয় এবং ইসলামের প্রতিশ্রুত সমাজবদ্ধ গোষ্ঠীজীবন তাদের নিরাপত্তা দেয়। এভাবেই বণিক-ব্যবসায়ীদের মধ্য দিয়ে ইসলামের প্রসার ঘটেছে।

হজরত মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীদের সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা,— এমনকী যুদ্ধক্ষেত্রে পর্যন্ত সাধারণ সৈনিক বা বয়োকনিষ্ঠ ব্যক্তির সঙ্গে একাসনে একই বাসন-থেকে

আহার্য-গ্রহণ সব ধর্মের মানুষকেই আকৃষ্ট করেছে। এম.এন রায় বলেছেন, মহম্মদের অনুগামীরা সাম্যের যে নীতি প্রচার করলেন তার মূল ছিল আরব উপজাতিগুলির আবহমান কালের স্বাধীন যাযাবর জীবনের মধ্যে।[১৪৩]

মানবেন্দ্রনাথ রায় অন্যত্র বলেছেন,— ইসলাম তার অভিনব অভ্যুত্থান ও প্রসারের শক্তি অর্জন করেছে তার মুক্তি ও সাম্যের বাণীর মধ্যেই; তার অনুগামীদের সামরিক বীরত্ব প্রকাশের মধ্যে নয়। এই প্রসঙ্গে অন্য এক ঐতিহাসিক বলেছেন, 'যেখানেই আরবের খ্রিস্টান কোনো জাতিকে তারা পরাজিত করেছে, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই ইতিহাস, দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রমাণ করেছে যে বিজিত জাতির জনগণ ইসলামের দ্রুত প্রসারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়েছিল। অধিকাংশ খ্রিস্টান দেশের লজ্জার কথা এই যে, বিজয়ী আরবদের শাসন-প্রণালীর তুলনায় তাদের শাসন-প্রণালী ছিল খুবই পীড়াদায়ক। সিরিয়ার অধিবাসীরা মহম্মদের অনুগামীদের অভ্যর্থনা জানায়। মিশরীয় খ্রিস্টধর্ম অবলম্বীরা তাদের দেশে আরবীয় শাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করে। আর খ্রিস্টান বেরবেররা মুসলমানদের আফ্রিকা বিজয়ে তাদের সহযোগিতা করে। কনস্টানটিনোপোল সরকারের বিরুদ্ধে এই জাতিগুলির তীব্র ঘৃণার কারণেই তারা মুসলিম শাসনকে বরণ করে নেয়। আর অভিজাতদের বিশ্বাসঘাতকতা এবং সাধারণের উদাসীনতা স্পেন ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে অতি সহজেই আরবদের পদানত করে দিল।[১৪৪]

মুসলিম দুনিয়ার বিশেষত আফ্রিকার ধর্মীয় অভ্যুত্থানগুলির চরিত্র ছিল বিচিত্র; ইসলাম যেন প্রাচ্যবাসীদেরই মানানসই ধর্ম, বিশেষত আরবদের পক্ষে। একদিকে বাণিজ্য ও শিল্পে ব্যাপৃত আরবদেশের শহরবাসী, অন্যদিকে যাযাবর বেদুইন,— এদের পক্ষেই মানানসই ইসলামধর্ম। তবে সেখানেও রয়েছে সংঘাত-সংঘর্ষের উপকরণ। শহরবাসীরা ধনী ও বিলাসী হওয়ায় ইসলামীয় রীতি-নীতি পালনে তাদের মধ্যে ঢিলেমি আসে; বেদুইনরা গরিব, তাই তারা আবার নৈতিক শিথিলতা বরদাস্ত করতে পারে না। এবং তাদের মধ্যে প্রচ্ছন্নত জাগে বিষয়সুখ ও ভোগের জন্যে আকাঙ্ক্ষা: আকাঙ্ক্ষা থেকে জাগে ঈর্ষা ও লোভ।

আর সেই ঈর্ষা ও বঞ্চনাবোধ থেকেই তাদের মধ্যে জাগে ক্ষোভ ও প্রতিহিংসা; তখন শহরবাসী ধনী বিলাসিদের, তথাকথিত কাফেরদের শাস্তিবিধানের মধ্য দিয়ে ইসলামের সুকঠিন রীতি-নীতি, অবশ্য পালনীয় বিধি-বিধান পুনঃস্থাপনের উদ্যোগী হয়; কোনও এক পয়গম্বর বা মাহিদির অধীনে মিলিত হয়ে কাফেরদের ধনদৌলত বাজেয়াপ্ত করে। এই প্রক্রিয়ায় স্বভাবতই প্রতিশোধস্পৃহাটা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে,— একশো বছরের মধ্যে তারাও কাফেরদের পর্যায়ে চলে আসে। তখন ধর্মমতেরই নতুন বিশ্লেষণ আবশ্যক হয়ে পড়ে; দেখা দেয় নতুন কোনও মাহিদি, শুদ্ধি প্রক্রিয়াটা শুরু হয় আবার শুরু থেকে। স্পেনে আফ্রিকার আলেমোরাবিদ আর আলমোহাদদের দেশজয় অভিযান থেকে শুরু করে

ইংরেজদের সাফল্যের সঙ্গে শায়েস্তাকারী খার্তুম-এর মাহিদি অবধি ঘটেছিল তা-ই। পারস্য ও অন্যান্য মুসলিম দেশের অভ্যুত্থানগুলির বেলায়ও ঘটেছিল একই ব্যাপার।

ধর্মীয় উপরি আচ্ছাদন থাকলেও এই আন্দোলনগুলির উৎসে ছিল অর্থনৈতিক কারণ। আন্দোলনগুলি সফল হওয়ার পরেও দেখা গেছে তার পুরনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা থেকে যায় অক্ষত। এভাবে পুরনো পরিস্থিতি বা ব্যবস্থাপনা থেকে যায় অপরিবর্তিত আর সংঘর্ষ ঘটতে থাকে মাঝে।

গোড়ার খ্রিস্টধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গ এসে পরে : মধ্যযুগের সমস্ত গণ-আন্দোলনের মতো এইসব অভ্যুত্থানের ধর্মীয় মুখোশ পরাটা ছিল অপরিহার্য, আর সেটাকে মনে হয়েছিল বিস্তৃততর হতে থাকা অধঃপতন থেকে গোড়ার দিককার খ্রিস্টধর্মের পুনঃস্থাপনা বলে; কিন্তু ধর্মের মহিমান্বয়নের পিছনে প্রতিবারই ছিল স্পষ্ট বৈষয়িক স্বার্থ।[১৪৫]

বাংলার সম্প্রীতি : ভাষা আন্দোলন ও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সংগ্রাম

ছেলে হারা শত মায়ের অশ্রু গড়া
এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি। (আবদুল গাফফর চৌধুরী)

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন সদর্থে মুসলিম সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে এক ঐতিহাসিক আঘাত, জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ। মাতৃভাষা ও স্বদেশচেতনার এমনই এক প্রকাশ ঘটেছিল ১৯৫২-এর ঘটনাবলিতে যে, তার ফলে শুধু সেদিন মুসলিম লিগের স্বৈরতন্ত্রের ভিতই কেঁপে ওঠেনি, বাঙালি মুসলমান জনগোষ্ঠীকে নতুনতর জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে,— দু'দশক বাদের মুক্তিযুদ্ধের অঙ্কুরও নিহিত ছিল সেই চেতনার উদ্বোধনে। বাঙালি মুসলমানের আত্মপরিচয় নিয়ে যে সংশয় ও বিভ্রম অষ্টাদশ শতক থেকেই চলে আসছিল, যে বিভ্রম থেকে সে বারবার আত্মঘাতী সংঘাতে লিপ্ত হয়েছে, বিচ্ছিন্নতাবোধে ভুগেছে তা যেন ভাষা আন্দোলনের রক্তধারায় শুদ্ধ হয়েছিল। মুসলমানের সেই আত্মপরিচয়ের সংকট সম্বন্ধে আহমদ শরীফ স্পষ্ট বলেছেন : 'আত্মপরিচিতিতে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি বাঙালি মুসলিমদের ১৯৩০ সন অবধি সুস্থ হতে দেয়নি।'[১৪৬] তিনি আরও বিশদ ক'রে জানান : "তারা নিজেরা গ্রামীণ উপভাষাকে বা বুলিকে তাদের প্রজন্মক্রমিক ঘরোয়া ভাষা বলে জেনেও তারাই সভায় ও মুদ্রিত লেখায় বাঙলাকে হিন্দুর ভাষা বলে শুনে, দেখে ও জেনে তাদের ১৯৩০ সন অবধি নিজেদের ভাষা উর্দু কি বাঙলা নিরূপণ করতে না পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছে।"[১৪৭] সৈয়দ মুজতবা আলি আবার উদ্ধার করেছেন জামালউদ্দিন আফগানির উক্তি; তিনি নাকি বলেছিলেন,— যাহারা গ্রহণপূর্বক মুসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন,... মাতৃভূমি জন্মভূমিঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই,... তাঁহাদের স্বদেশ ও নিজ ভাষা বলিয়া কিছু হয় না।

কায়েমি স্বার্থের প্রতিনিধি ও বিশ্বাসঘাতক রাজনৈতিক নেতৃত্বের কূটচক্রের তৎপরতায় ১৫ অগাস্ট ১৯৪৭-এ দেশভাগ হয়,— আবার চল্লিশ বছর বাদে বিভাজিত বাংলা। এই প্রসঙ্গে, অন্নদাশংকর রায়ের স্মৃতিচারণায় উঠে এসেছে অতীতের কথা; বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণায় কেমন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই মানুষ। সেইদিনের একাত্মতায় প্রকাশ পায় বাঙালির বিজয়।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের ছিল বিচিত্র অবস্থান,— দুই প্রদেশের মধ্যে এগারোশো মাইলের ব্যবধান, মাঝখানে ভারত; উপরন্তু, ভৌগোলিক এই ব্যবধানকে ছাপিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের জনগোষ্ঠীর সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ভাষিক ভিন্নতা; আর সেই ভিন্নতা এতই ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক যে, ইসলামীয় ঐক্যসূত্রে তা বেঁধে রাখা ও তার সার্বভৌমত্বকে অটুট রাখা ছিল কষ্টকর। তাই, বাংলাভাগের আগেই, সম্ভাব্য পূর্বপাকিস্তানে রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেই প্রশ্ন বাঙালি কিছু মুসলমানকে বিচলিত করেছিল ১৯৪৭-এর জুলাই মাসেই সর্বজনশ্রদ্ধেয় ড. মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ বাংলাকে নতুন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব রাখেন। আর ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় আইন সভার সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সঙ্গে বাংলাকেও আইন সভার ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দানের দাবি তোলেন। কিন্তু ড. শহীদুল্লার প্রস্তাব বা ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের দাবি তৎকালীন পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ কানেই তুললেন না,— শুধুমাত্র উর্দু হল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা; মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র সদম্ভ উচ্চারণ : 'Urdu— only urdu will be the State Language of Pakistan—!'

রাষ্ট্রভাষার আন্দোলনটি কীভাবে মাত্র চার বছরের মধ্যে প্রলয়ঙ্করী বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে রূপ পেয়েছে, সেই রাজনৈতিক ঘটনাক্রম স্বতন্ত্র আলোচনার বিষয়। তবে এখানে শুধু উল্লেখ্য, অগণিত ছাত্র-যুব-জনতার প্রবল সক্রিয় অংশগ্রহণে বাহান্নর ভাষা আন্দোলন গড়ে উঠছে; নেতৃত্ব ছিলেন সেদিনের তরুণ ছাত্রনেতারা— মুজিবর রহমান, শামসুল হক, রণেশ দাশগুপ্ত, মুনীর চৌধুরী, প্রমুখ। তবে রনেশ দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হলেই ছাত্র-যুব সমাজ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কারণ, পাকিস্তানে তৎকালে বেআইনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হলেও রনেশ দাশগুপ্ত ছিলেন সবারই প্রিয় আদর্শবাদী এক নেতা; সে কারণেই জেল গেটে তাঁর মুক্তির দাবিতে লাগাতার অবস্থান চলছিল। ধীরে ধীরে আন্দোলনটা এক ধরনের অসাম্প্রদায়িক চরিত্র পায়। মাতৃভাষার স্বীকৃতির দাবি বাঙালি জাতীয়তাবোধের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি আততায়ীর হাতে নিহত হলে খাজা নাজিমউদ্দীন প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় এসে পল্টনের জনসভায় তিনি জিন্নাহ্‌র মতো ঘোষণা করেন : পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, শুধু উর্দু ভাষাই। আর এই ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৩০ জানুয়ারি প্রতিবাদ জানায়

ও ধর্মঘট পালন করে। ওইদিন বিকেলে এক সভায় সমস্ত ছাত্ররা বাংলা ভাষার দাবিতে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেয়; এবং চল্লিশজন সদস্যের একটি সর্বদলীয় কমিটিও গড়ে। সেখানে স্থির হয় ৪ ফেব্রুয়ারি সারা দেশ জুড়ে ছাত্র ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল বার করা হবে। আবার ৪ ফেব্রুয়ারির সভা স্থির করে যে ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষার স্বীকৃতির দাবিতে সারা দেশে হরতাল পালিত হবে।

এদিকে আন্দোলনের তীব্রতা অনুভব করে প্রশাসনও প্রস্তুতি নেয়,— ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার সংবেদনশীল অঞ্চলসমূহে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। সর্বদলীয় কমিটি জরুরি বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নেয যে, কোনো প্ররোচনাতেই তাঁরা পা দেবেন না, ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে না।

কিন্তু ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল বেলাতেই দলে দলে ছাত্র সর্বদলীয় সিদ্ধান্তকে অমান্য করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমবেত হতে থাকেন, এবং মিছিল বার করেন। সেই মিছিলের গতিরোধ করতে পুলিশ প্রথমে শূন্যে গুলি ছোড়ে : কিন্তু বাংলাভাষার প্রতি দরদ, এবং স্বৈরশাহীর বিরুদ্ধে জনগণের সঞ্চিত ক্ষোভ তখন ছাত্র-যুবকদের চিত্তকে এমনভাবে আলোড়িত করে ফেলেছে যে তাঁরা তখন ভয়শূন্য, আগুয়ান যাত্রী।

বাঙালি জাতীয়তাবোধের যে উদ্বোধন ইতিপূর্বে মধ্যবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাংশের মধ্যে উনিশ শতকে ঘটেছে, তারই তীব্র রূপ দেখা গেল নবোদিত মুসলিম মধ্যবিত্ত অংশের এই মাতৃভাষার স্বপক্ষে সংগ্রামে। অকুতোভয় ছাত্রদল সমস্ত পুলিশি প্রতিরোধ ভেঙে এগিয়ে যায়,— 'কাপুরুষ সিংহ তো মারতেই জানে শুধু, আমরা যে মরতেও চাই!' মরতেই হয় ওদের! পুলিশের গুলিতে একে একে ঢলে পড়ে মাটির বুকে; মায়ের বুকে। ঢলে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমেদ এবং গফরগাঁয়ের যুবক চাষি আবদুল জব্বার। আরও দুজন শহিদ এঁদের সঙ্গে; কিন্তু তাঁদের পরিচয় জানা যায়নি আজও। তারপর—

দলে দলে মানুষ নেমে এল পথে— তারা জড়ো হল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে এবং সব আইনি বিধি ও চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ছাত্রদের সঙ্গে যোগ দিল হাজার হাজার মানুষ। মেডিকেল কলেজ চত্বরে আয়োজিত 'গায়েবি জানাজা' (মৃতদেহ ছাড়াই শেষকৃত্যের প্রার্থনা)-য় তারা অংশও নিল। দেশ জুড়ে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ, ছাত্রদের মিছিল,— বন্ধ হয়ে যায় স্কুল-কলেজ। জেলে বসে মুনীর চৌধুরী 'গায়েবি জানাজা'র ভাবকল্পে লিখলেন 'কবর' নাটক; জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় জানান : 'রাজ্যময় মানুষের মনে সে-নাটক যে ঝড় তুলেছিল পৃথিবীর আর কোনও নাটক তা পারেনি।'[১৪৭]

বাহান্নর ভাষা আন্দোলন,— শহিদের রক্তে বাঙালিজাতীয় চেতনার উজ্জীবন,— এ সব বিষয় নিয়ে বহু আলোচনা হয়ে গেছে; বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনে একুশে একটি বিশিষ্ট দিন : জাতীয় উৎসব। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক নিবন্ধে

আক্ষেপ করেছেন : ওরা 'মা বলে ডাকার অধিকার আমাদের মুখ থেকে কেড়ে নিতে চেয়েছিল।' আবার নিরাবেগ যুক্তিনিষ্ঠ বিচারও যে ভাষা আন্দোলনের হয়নি তেমন নয়। বদরুদ্দিন উমর-এর বিশ্লেষণ : '...১৯৪৭-৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে পূর্ব বাংলার কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত জনগণের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগ্রামের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে।'[১৪৮] আবার অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করেছেন অন্নদাশংকর রায়:

> "আরও তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে ঐতিহাসিক ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল একটি বিভাজন রেখা। একদিকে উর্দুভাষী মুসলমান ও অন্যদিকে বাংলাভাষী মুসলমান। অবশেষে বাংলাভাষীর পক্ষে যোগ দিলেন বাংলাভাষী হিন্দুরাও। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দুরও যোগ ছিল সেই মুক্তিযুদ্ধে। এটা সম্ভব হল কেন? হল, কারণ বাঙালিরা তলে তলে একটাই জাতি।..."[১৪৯]

এবং, বাঙালি 'একটাই জাতি'— অভিন্ন বাঙালি জাতীয় সত্তার দৃষ্টান্তে, উক্ত নিবন্ধে, অন্নদাশঙ্কর রায় কাজী আবদুল ওদুদ-এর 'শাশ্বত বঙ্গ'-র আধেয় বিষয় উল্লেখপূর্বক জানান : 'তাঁর চিত্তপটে সেই আবহমান বাংলার মানসছবিটাই আঁকা ছিল।' (প্রাগুক্ত) কিন্তু তার পরই তিনি সাম্রাজ্যবাদী কুহকী প্রচারণায় বিভ্রান্ত হন, এবং প্রস্তাব রাখেন ইউরোপীয় কমিউনিটিব মডেলে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমন্বয়।

জাতীয়তাবাদী ভাবাবেগ সঞ্জাত এরকম বহু প্রস্তাবই একুশের ভাষা আন্দোলন বা মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে উঠেছে; জাতীয় ঐক্যচেতনার সুষুপ্ত আবেগ স্বপ্নদেখা তার প্রাণস্পন্দনকেই ইঙ্গিত করে।

আর সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ভাষা আন্দোলনকে দেখেছেন ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে,— উনিশ শতকের নবজাগরণের উপাদান হিসাবেই দেখেন আবহমানকালের বাংলা এবং বাঙালির ঐতিহ্য। আর তার প্রেক্ষিতেই লেখেন :

> "বৃহত্তর বাংলার রাজনৈতিক বিভাজন যে বাংলার আত্মার বিভাজন নয়, অস্বীকার করা যায় না। রাজনীতি তথা রাষ্ট্রীয়-বলয়ের বাইরে আবহমানকালের বাংলা ও বাঙালিচেতনা স্বতন্ত্র অবস্থানে দাঁড়িয়ে আত্মবিকাশের পথ খুঁজে নিয়েছে। লক্ষ করবার বিষয়, বাংলার তিনজন শ্রেষ্ঠ কবি, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং জীবনানন্দ ক্রমশ বিভাজিত দুই বাংলার মধ্যে গভীর সংযোগ স্থাপন করেছেন। একুশে ফেব্রুয়ারি এই গভীর আত্মিক সংযোগকে উন্মোচিত করেছিল মাত্র।"[১৫০]

বাঙালি জাতীয়তাবোধকে একুশে ফেব্রুয়ারি কতটা প্রবর্ধিত করেছে তা স্পষ্ট হয়, দুই বাংলার কবি ও লেখকদের লেখায়,— ভাষাজননীর প্রতি নিবেদিত রচনায়। এবং পূর্বসূরিগণের সৃষ্টিশীলতায়। কবি অরুণ মিত্র 'একুশে ফেব্রুয়ারি' কবিতায় লেখেন :

> "একুশে ফেব্রুয়ারির আওয়াজ
> যদি কোনো মসনদে না পৌঁছয়

বুঝতে হবে সেখানে গদীয়ান এক মতলববাজ
এক পেশাদার খুনী যার সূর্যোদয় রক্তরাঙা
জননী ও সন্তানদের রক্তাক্ত করে।"

আবার ওপার বাংলার কবি শামসুর রহমান-এর 'বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে' সনেটটি আবহমানকালের ভাবচ্ছবি আঁকে :

"বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈবিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে, নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।

বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি : মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া কোন সে সুদূরে; সত্তা তাঁর
আশাবরী। নানী বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে
রমজানী সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরী, অলৌকিক ভোর।

বাংলার সম্প্রীতি : সাম্প্রতিক সাহিত্য ও লোকসংস্কৃতিতে সম্প্রীতি

বাংলার আবহমানকালের লোকসংস্কৃতির ধারার পরম্পরায় আজও গ্রামবাংলার লোকশিল্পীরা গান বাঁধে, নাটক করে আর মানবগোষ্ঠীর যে কোনও বিপর্যয়ে সংকটে নৈতিক সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ে বা ধর্মীয় বিভেদে মুক্তমনস্ক সাহিত্যিকরা এবং লোকসংস্কৃতির শিল্পীরা মানবতার আদর্শ, সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে নিরলস প্রচার চালিয়ে যায়।

"দেখ মাটি কত মেহেরবান
আনন্দে আজ গাইছি গান;
আমরা আছি পাশাপাশি
হিন্দু মুসলমান।"

এই ঐকচেতনা বাঙালি চিত্তে পুষ্টিলাভ করে আসছে আবহমানকাল ধরে। তবু বিভেদ আছে, হানাহানি আছে, রাজনীতিক ও কায়েমি স্বার্থের ষড়যন্ত্রে দাঙ্গা হয়,— যেমন হয়েছিল

নোয়াখালি-বিহার-কলকাতায়, এবং বারবার দেশের নানা প্রান্তে। ছেচল্লিশের দাঙ্গা বাঙালির চিত্তাকাশে কালো মেঘ সঞ্চার করলে শান্তিপুরের হাজারীদাস সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী জনশিক্ষা প্রসারে তরজার আসরে গেয়ে বেড়ান :

"অকারণে আমরা কেন মরব
একথা কেউ বোঝে না
বুঝাই কারে কার পায়ে মাথা খুঁড়বো
হিন্দু-মুসলমান মিলে আস্থা বিবাদ বাধিয়ে দিলে
কেউ শোনেনি কোনোকালে
কার কাছে বা বলব।"

আর নদিয়ার চাপড়া থানার অন্তর্গত ডোমপুকুর গ্রামের শিল্পী চায়েনুদ্দিন মল্লিক জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান-সকলের অংশগ্রহণে এক সমন্বয়ের পরিবেশ গড়ে তুলতে চেয়েছেন। জল-ওয়াটার-পানি, আল্লাহ্-গড-ভগবানের অভেদত্ব প্রচারে লোকশিল্পী চায়েনুদ্দিন সব ধর্মের পৌরাণিক চরিত্র সমন্বয়ে কাহিনি-নির্ভর 'বোলান' এবং 'জারি' গান পরিবেশন করেছেন। "ওই গানে মাদার, ফতেমা, গঙ্গা, ভগীরথ যেন এক পরিবারের চারটি চরিত্র হয়ে উঠেছে। আবার ১৯৭৯ সালে এলাকায় দাঙ্গা বন্ধ করতে ওই শিল্পীরাই বড়ো ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁরা গান বেঁধেছিলেন :

'আমরা হিন্দু-মুসলমান: জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টান
আমরা একই স্রষ্টার সৃষ্টি
তবে কেন কোলাহল ভাই ভাই সকল
কেন ঘটাও এত অনাসৃষ্টি।"[১৫]

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে, আলকাপ বাংলার নিজস্ব এক ধরনে লোকনাটক; ছড়া ও গানের মধ্য দিয়ে জীবনের নানা দিক এই নাটকে তুলে ধরা হয়। আলকাপ-শিল্পী নৈমুদ্দিন শেখ-এর একটি 'ছড়াগান' :

'সোনার বাংলায় আমরা মানুষ কেন হলাম না?
শস্যে ভরা, [মোদের শস্য ভরা] জন্মভূমি অভাব কিছু রবে না।
আমবা নয় গো হিন্দু, নয় মুসলমান
জাতিতে সবাই যে সমান
শুধু ধর্মেতে হিন্দু-মুসলমান
দেখুন খোদা-হরি একজনা।
দূর করুন ভাই মনের হিংসা,
অকাল মৃত্যুর এই যে নেশা,

সবে আপন আপন বেঁধে বাসা,

কর্মে-ধর্মে এগিয়ে চলুন না।

বিশ শতকের ত্রিশ ও চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের অস্থিরতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস, স্বরাজ্য পার্টি, কৃষক-প্রজা পার্টি, মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যকলাপ ও তাদের জনমত গঠনের প্রক্রিয়ায়— রাজনৈতিক নানা প্রতিশ্রুতি, ব্রিটিশবিরোধী নানা স্লোগান, ধর্ম ও জাতীয়তা বিষয় নানা অশ্রুতপূর্ব শব্দ উচ্চারণে বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল যখন কুয়াশাচ্ছন্ন তখন 'আলকাপ' শিল্পী ঝাঁকসুর রচিত একটি 'ছড়াগান'-এ পাই :

"আমরা চাষা নই গো ভাষা বাংলা মায়ের সন্তান,
তোরা দলবল নিয়ে আয় ভাই ছুটে দেশের যত হিন্দু-মুসলমান।
আমি বন্দি ভারতমাতা বন্দি আমার পিতামাতা
তারপরেতে বন্দি আমার যত শ্রোতা মাতা পিতা বোন
আছেন যত মতিমান শুনতে এলেন মোদের গান
স্বরাজের ব্যাপার জানাই সবার নিকটে।
চিন্তা করে দেখ মনে হিন্দু-মুসলমান
এক মাতার সন্তান মোরা এক পথেতে আন
মূল যদি এক জা'গাতে বৃক্ষেরে জন্মায়
সেই বৃক্ষের শাখা আর প্রশাখা বেরোয়।
হিন্দু বলে এই ভাল মোদের বাবা হইল
এক থেকে দুই ভাগ দেখ বিচার করি
যারে বলে খোদাতাল্লা তারে বলে হরি,
তবে কেন ভাই-এ ভাই-এ করবো মারামারি।"

এরকম পদবিন্যাসে লোককবির কণ্ঠে বেজে ওঠে 'হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি চেতনা'; এবং সেই চেতনার শিকড় বাঙালির চিত্তভূমির কত গভীরে প্রোথিত তা ইতিহাসের সাক্ষ্যেই ধরা পড়ে; বিবাদ-বিসংবাদ, খেয়োখেয়ি-মারামারি সত্ত্বেও দুই সম্প্রদায়ের অন্তস্থলেই রয়েছে এক ঐকবোধের ঐতিহ্য। আর আবহমানকালের সেই ঐতিহ্য ধরা রয়েছে লোকসংস্কৃতির মর্মবাণীতে।

বাংলার লোকনাটক গ্রামবাংলার মানুষের প্রাণের সম্পদ। কালের অমোঘ নিয়মে, উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে লোকনাটকের প্রচার ও প্রভাব অনেকটাই আজ হ্রাস পেয়ে গেছে,— দূর-দূরান্তরের গ্রামেও পরকীয় ভিডিও-টিভি সংস্কৃতি বিস্তৃতি পেয়ে গেছে; "গ্রামীণ মানুষের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনার প্রকাশ এইসব গ্রামীণ লোকনাটকের মধ্যে দিয়ে ঘটে থাকে। এইগুলি যেমন তাদের

চিত্তবিনোদন ঘটায়, তেমনি তাদের গ্রাম্য সম্পর্কজাত সৌভ্রাতৃত্বকে সংবদ্ধ থাকতে প্রণোদিত করেছে। ওইসব প্রমোদ মাধ্যম একই সঙ্গে ঔষধ ও আহারের কাজ করে। এই কারণেই গ্রামীণ লোকনাটকে গ্রামজীবনের সহজ সরল ছবি ফুটে ওঠে, যা নগরজীবনের সংস্কৃতি থেকে একেবারেই আলাদা।"[১৫২]

আবার একই সঙ্গে লোকনাটকে জনগণের রাজনৈতিক-সামাজিক চেতনারই প্রতিভাসও পড়ে। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংসের মতো কলঙ্কজনক ঘটনার পর নদিয়ার শিল্পীরা 'ব্রহ্মার বিয়ে' লোকনাটকে গান বাঁধেন :

"রামের নামে কেউ ভাঙে মসজিদ
বিস্ফোরণ ঘটায় কেউ আল্লার নাম করে
আর দাঙ্গার আগুন কেমন জ্বলছে দেখুন
নেতারা কেমন নাচে মাজা ধরে।"

এভাবে, লক্ষ করলে দেখা যাবে, গ্রামবাংলার গরিব নিরক্ষর বা প্রায়-নিরক্ষর লোকশিল্পীরা মানবপ্রীতির বোধকে তাঁদের চেতনার গভীরে সঞ্চারিত করেছেন,— বাংলার সাধারণ মানুষও তাদের আত্মিক চাহিদা পূরণের উপকরণ খুঁজে পায় লোকসংস্কৃতির মধ্যে। "আসলে লোকসংস্কৃতির মূল সুর সমন্বয়ের,— তার চিন্তা ও বিশ্বাস ঐক্যে। এই ভাবনা থেকেই তাঁদের হৃদয়ে ধ্বনিত হয়েছে :

নানা বরণ গাই রে ভাই একই বরণ দুধ,
জগৎ ভরমিয়া দেখিলাম একই মায়ের পুত।"[১৫৩]

বাংলার সম্প্রীতি : উত্তর আধুনিক যুগ

আর বাংলা সাহিত্যে বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তজ্জনিত দাঙ্গার আধারে ইতস্তত নানা রচনা প্রকাশ পেয়েছে; এবং বাঙালির ঐতিহ্যগত ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর— তার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি চেতনার ওপর বিদ্বেষ-বিভেদের কালো মেঘের পুঞ্জীভবনের বিরুদ্ধে শিল্পী-সাহিত্যিকরা সম্মিলিতভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। আর বাংলাদেশের কবি-ঔপন্যাসিক তসলিমা নাসরিন দেশ জুড়ে এক প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেন তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাস রচনার মধ্য দিয়ে। তসলিমা নাসরিন প্রায় এককভাবেই প্রথমে পিতৃতান্ত্রিক সমাজশাসনে নারীর ভোগ্যবস্তু হয়ে ওঠার বিরুদ্ধে লেখেন 'নির্বাচিত কলাম' এবং তারপর ইসলাম এবং পুরো ধর্মতান্ত্রিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে— মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সরাসরি আক্রমণ হানলেন তিনি, কেন আমি সেকেলে— ইতিহাস ও বিজ্ঞান-পরিত্যক্ত অনুশাসনের অধীনতা স্বীকার করব।

তসলিমা নাসরিনের এই প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর বাংলাদেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে; এবং এই সময়ে— বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক

দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখলেন 'লজ্জা' উপন্যাস। সংখ্যালঘু হিন্দুদের অসহায়তা, তার অস্তিত্বের বিপন্নতা উন্মোচনে চার-সদস্যের একটি ঢাকার হিন্দু পরিবারকে কেন্দ্রে রেখে বিস্তার পেয়েছে উপন্যাসটি।

বাবা সুধাময় দত্ত, মা কিরণময়ী, ছেলে সুরঞ্জন ও মেয়ে নীলাঞ্জনা (ডাকনাম মায়া) ডাক্তার সুধাময় খুবই ভালো চিকিৎসক, কিন্তু হাসপাতালে সে অধ্যক্ষ হতে পারেন না; কারণ তিনি হিন্দু। তবুও পৈতৃক ভিটেমাটি ছেড়ে যান না ডা. সুধাময়। আর তারই ফলে একাত্তরের শাসক বাহিনী তাঁকে ধরে নিয়ে গিয়ে তাঁর লিঙ্গচ্ছেদ করে। এ লজ্জা ও অপমানে তিনি কাতর হন, ধুতি ছেড়ে বাড়িতে পাজামা পরেন, কিন্তু তবু দেশেত্যাগে সম্মত হন না। ছেলে সুরঞ্জন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল,— তার বন্ধুরাও সেরকম। দাঙ্গা বাধলে,— তসলিমা মনে করেন, এক্ষেত্রে 'দাঙ্গা' শব্দটি খাটে না,— এক সম্প্রদায় দ্বারা অপর এক সম্প্রদায়ের ওপর একপক্ষীয় নির্যাতন!

ডা. সুধাময়ের বাড়িতে হামলা চালায় উন্মত্ত জনতা,— তারা তুলে নিয়ে যায় মায়াকে। সুরঞ্জন ছুটে যায় তার বন্ধুদের কাছে, কামাল-আলতাফদের কাছে, তারা তাদের অসহায়তার কথা জানায়। সুধাময় ও সুরঞ্জন ছাত্রজীবন থেকেই নাস্তিক,— কিন্তু সর্বব্যাপ্ত ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও হিংসার বাতাবরণে থাকতে থাকতে সুরঞ্জন এক সময় টের পায় তার রক্তেও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা খেলা করছে! হায়দার-কামাল তার অভিন্ন হৃদয়ের বন্ধু, কিন্তু সে কেন যায় পুলকদের বাড়িতে? এভাবে লেখক দেখান, সুরঞ্জনের চেতনা কোষে ক্রমশ প্রবর্ধিত হয় ধর্মীয় অপভাব; এবং এক সময় তার মধ্যে জেগে ওঠে এক বিকৃত প্রতিশোধস্পৃহা। মায়াকে খুঁজে না পেয়ে হতাশ সুরঞ্জন যখন বার কাউন্সিলের সামনে দাঁড়িয়ে তখন তার চোখে পড়ে একটি অল্পবয়সি বারবণিতা তার কাছে এগিয়ে আসছে।

সুরঞ্জন ভাবে, নিশ্চয়ই মেয়েটি মুসলমান, তবে—। তাকে নিয়ে গিয়ে সুরঞ্জন তার ওপর বলাৎকার করে— বলাৎকার করে এমনভাবে যেন সে তার বোন মায়ার ওপর সম্ভাব্য ধর্ষণের প্রতিশোধ নিচ্ছে।

'লজ্জা' উপন্যাস ঘিরে যে প্রবল বিতর্ক দেখা দিয়েছিল তার দুটি দিক সবার চোখেই পড়েছে। একটি হল উপন্যাস হিসেবে 'লজ্জা'-র সাহিত্যগুণ; আর দ্বিতীয় দিকটি হল, সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার উন্মেষ ঘটানোর ক্ষেত্রে 'লজ্জা' উপন্যাসকর্মের ভূমিকা। তাৎক্ষণিক ভাবাবেগে বিরচিত এই উপন্যাসটির সাহিত্যগুণ এক্ষেত্রে আমাদের আলোচনার বিষয় নয়; লেখক হিসেবে যে ভূমিকাটি তসলিমা নাসরিন সেদিন পালন করেছেন,— যে দুঃসাহসে ভর করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু মানুষের অস্তিত্বের বিপন্নতা, তাদের ওপর সংঘটিত ধারাবাহিক পীড়ন,— দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্যতা উন্মোচন করেছেন সেই বিরল সাহসটিকে ধন্যবাদ আমাদের জানাতেই হয়। 'লজ্জা' পদটির ব্যঞ্জনার্থও নানা বিন্যাসে আমাদের লঘু মস্তিষ্কে ঘুরপাক খেতে থাকে।...

প্রবীণ কবি মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

"রামজন্মভূমি আর বাবরি মসজিদের মাঝ বরাবর
কটা শতাব্দীর ডিগবাজির ভেলকিতে মধ্যযুগ অন্ধকার
দাঙ্গাবাজ রসের দড়বড় চিঁহি চিঁহি ঘরে দোরে আগুন
মশালের মধ্যরাত
ইটপাটকেল ত্রিশূল ডাণ্ডা বোমা বন্দুক অন্ধকার..."

আবার 'শ্রীরামচন্দ্র উবাচ' কবিতায় তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে গেরুয়াধারীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানেন :

পতিত পাবন রাজা রামচন্দ্র আমাকে স্বপ্নে বললেন—
বেটা
সারা দেশের লোক হাজার হাজার বছর ভালোবেসে
আমাকে কত কি দিয়েছে
তুই সন্ন্যাসী মানুষ
না হয় একটা পাথরই দে।
শক্তি চাটুজ্যে একটা পদ্যে লিখেছিল—
পাথর পাথর পাথর
আমি সেই শোকেতেই কাতর
আমার বুকের মধ্যে তুলে
তুমি কোন সাহসে হলে
তা তোদের ওই শক্তিকেই ফলো করে বলি—
রামনাম লেখা পাথরই যখন হয়েছিস
আমার মা যেখানটিতে আমাকে বিইয়েছিলেন
ঠিক সেখানেই
ওই পাথরটা একটু কষ্ট করে রেখে আয় বাপ।

দিব্যেন্দু পালিত তাঁর 'ধর্ম : ১৯৯২'-এ লেখেন :

"মানুষই করে মানুষকে ক্ষমা—
এ কথা বলার আগে বাঘ বানরের মতো
তারা জেনে গেছে
ধর্ম জানে না কোনো ক্ষমা।"

বাবরি মসজিদ ধ্বংস, গৈরিক জঙ্গি শক্তির উত্থান, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা,— সমস্ত দেশ জুড়ে বিভেদের রাজনীতির কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়লে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দেশ ও জাতির এই সঙ্কটে আর নীরব থাকতে পারলেন না। একাংশ সক্রিয়ভাবে জনমত

গঠনে পথে নামলেন আর অন্যরা তাঁদের কলমে তুলিতে বা অভিনয়ে-মুদ্রায় তা প্রকাশ করলেন। আর এক্ষেত্রে বাংলার বুদ্ধিজীবী ও লেখকদের ভূমিকা ছিল ইতিমূলক।

ঠিক এক দশক বাদে, গেরুয়াধারীরা জোট বেঁধে কেন্দ্রে এসে বসতেই সাম্প্রদায়িক চেতনার মেরুকরণ ঘটে; এবং গুজরাতে মুসলিম নিধনের বর্বরতা, দানবিক নারীনির্যাতন সমস্ত ভারতবাসীর তথা বিশ্বের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে প্রবল আলোড়ন তোলা সাধারণ মানুষের পক্ষে কবি কমলেশ সেন আবেদন রাখেন : ''সারা দেশের মানুষের কাছে আমি আর্জি করছি, আপনারা সবাই একটা কফিনের জন্য অর্থ তুলুন, মানুষের কাছে যান। বলুন, বলুন আমরা সবাই একসাথে একটি রাষ্ট্রকে কবর দিতে গোরস্তানে যাই।' আর এই কবি কমলেশ সেনই 'আগুন' কবিতায় লেখেন : 'ঈশ্বর তার যমজভাই আল্লাকে নিয়ে বেশ সুখেই আছেন। আপনাদের দুজনের সুখের ঘরে আমি একদিন আগুন লাগাব ঠিক আমাদের ঘরে যেমন আগুন লাগিয়েছেন আপনি।'

আর কবি জয় গোস্বামী অনবদ্য ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেন যন্ত্রণা :

> 'ধর্ম ক্ষমতা দর্পিত পায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার
> মুখে আলোময় গেরুয়া মুখোশ জ্বলে
> মা শিশু আঁকড়ে মরে পড়ে থাকে অহিংসার
> দগ্ধ হাতটি ভেসে ওঠে শুধু সবরমতীর জলে।'

আর প্রবীণ কবি কৃষ্ণ ধর লেখেন :

> 'আমরা গাইছি একসাথে মৃত্যুহীন গান।
> যেমন গেয়েছি আমরা লোকায়তে— গাজনে পরবে
> চেরাগ জ্বালিয়ে রেখে পীরের মাজারে
> কিম্বা সাবারাত জেগে মনসা ভাসানে।'

রাম বসুর আকুল প্রার্থনা :

> 'আব্বাজান আমাকে বাঁচাও
> যারা গিলে খাচ্ছে আগুন আমাকে
> চাচা খুড়ো দোস্ত ভাই দুশমন শয়তান
> যে যেখানে আছো— বাঁচাও বাঁচাও'

আর অমিতাভ দাশগুপ্ত ইতিহাসের ক্রমে দেখেন গুজরাতকে, বিশ্ব-বাস্তবতাকে,—

> 'কবে কবরের কীট হয়ে গেছেন ফ্যুয়েরার.
> তবু দুনিয়া জোড়া আজও শোনা যায় তাদের প্রেতগীতি—
> দ্য ফ্যুয়েরার ইজ ডেড, লং লিভ দ্য ফ্যুয়েরার।
> আজও ঘরবাড়ি আর মানুষ পোড়ানো নেকড়েদের
> উল্লাসের শীৎকারের সঙ্গে মিশে যায়

কাবুল কান্দাহার প্যালেস্তাইন গুজরাত
কিশোরী সকালের ফেনিচেরা লাল...।

'শ্বাসকষ্ট আমাদের' শীর্ষক কবিতায় প্রণব চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

তখন মিডিয়ার ছবির আর এক শিশু
মরা মায়ের হাত থেকে রুটি টানছিল
রুটির গায়ে রক্ত ছিল;
প্রসূতি সদনের গর্ভগৃহে নমাজ চলছে
বাতাসের অক্সিজেন বিষয় আশয়...
শূন্যে দুলছে আমেন।
কনসেনট্রেশন ক্যাম্প থেকে রবীন্দ্রনাথ
বোমারু বিমানের চলাচলের ভিতর
নিবিড় দাঁড়িয়ে;
ভয়ানক শ্বাসকষ্ট হচ্ছে শ্বাসকষ্ট
অন্যদিকে শোকসভার গূঢ় কূট আয়োজন।

গোলাম কুদ্দুস 'গুজরাট ২০০২'-এ লেখেন :

'মর্মাহত ক্লান্ত আমি, অতিক্লান্ত
ভাবি তবু ভাবি—
ভবিষ্যে কী গুপ্ত আছে অতঃপর
কানে আসে আর্তস্বর—
বাঁচাও বাঁচাও!'

'গুজরাট ২০০২ কিংবা নিছকই প্রলাপ' কবিতায় এন জুলফিকার লেখেন

'...আমরা চিৎকার করে উঠছি—- আল্লাহ্...
আকবর...! আমরা চিৎকার করছি জয় শ্রীরাম...!
আর মুহূর্তের ঝনঝন শব্দে ফালা ফালা
আজন্ম লালন
রঘুজীর চা-দোকানের আড্ডা-আমোদ।'

সংহিতা বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন 'কতোকাল আরো' :

'কারা তারা! কোথায়ই-বা তাদের জন্ম ঘর ভিটে,

সময় যাদের খায় সবচেয়ে আগে, সেই তুচ্ছ প্রাণ মিছিল
রাত্রি জোড়া কংক্রিটের গায়ে, দেখে
'কেমন থেঁতলে গেছে মাথাগুলো—
কিংবা তলোয়ারের ডগায় বেঁধা ভ্রূণ
পেঁয়াজের খোসার মতো পরতে পরতে খুলে যাওয়া গর্ভাশয়
অথবা উপড়ানো দাঁত— পোড়া চামড়া।'

আর আমি লিখেছিলাম, 'মহাত্মাজীর প্রতি'—
আপনার নীতি
আপনার পাথরের মূর্তি
ধূলায় গড়াচ্ছে
আপনি কি দেখছেন?
হে অসমর্থ জাতির জনক,
বিভেদের আগুন
লাঞ্ছিতা নারীর অসম্মান
লজ্জায় আপনার মর্মর মূর্তিও
মাথা নুয়েছে
কোথায় রাখব আমরা এ লজ্জা!'

'একটা লাগসই কিছু' কবিতায় সুধাংশু সেনগুপ্ত আঘাত হানেন রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে:
সবাই?
সব্বাই
আমরা সবাই কি একক মাত্রায়
পুলিশকে এঁকে ফেলেছি?
আসলে তকমার উড়ানিতে
ঘোমটা দিতে গেলে
পাছা বেরিয়ে পড়ে।

কবি সুশীল পাঁজা লেখেন 'ঘৃণা করি সন্ত্রাস ও দাঙ্গা' :
বসন্ত দিনে দাঙ্গা বর্ষায় দাঙ্গা
নেই দাঙ্গার কোনো ঋতু, তফাত নেই রাত্রিদিনে
দেখি ভারতবর্ষে বাংলাদেশে আফগানিস্তান পাকিস্তানে

আর দেশ-বিদেশে রক্তাক্ত শরীরে সূর্যাস্ত হয় আজ এখানে
গির্জায় মসজিদে মন্দিরে
একথা জেনে গেছে মৌলবাদী ধর্মান্ধ মানুষের ঘরদোরে...।'

শুধু কবিতায় গল্পে বা উপন্যাসে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলার বিবেকবান মানুষ প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেননি তাঁরা মিছিলে হেঁটেছেন, দুর্গত মানুষের সাহায্যে চাঁদা তুলেছেন,— গুজরাটের মোদি সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন। সেই কারণেই সমাজসেবী সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী রাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণনকে এক খোলা-চিঠি লেখেন জনগণের ক্ষোভ ও বেদনার প্রকাশ হিসেবে।

মাননীয়
শ্রী কে. আর. নারায়ণন,
ভারতের রাষ্ট্রপতি,
রাষ্ট্রপতি ভবন,
নতুন দিল্লি,

মহাশয়,

আমি আপনাকে সরাসরি লেখার সুযোগ নিচ্ছি, কারণ এখন গোটা দেশ জুড়ে যা ঘটছে তার জন্য আমি অত্যন্ত মানসিক যন্ত্রণা ও উদ্বেগের মধ্যে আছি। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন সকল ভারতীয় নাগরিকের মতো আমারও মানবিকতা ও সুবিচারের জন্য অন্য কারও দিকে তাকানোর নেই এবং সেই জন্য দেশের সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে আপনার কাছে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আবদন জানাচ্ছি, যাতে নিরীহ দেশবাসীদের প্রাণ রক্ষা পায় এবং গণহত্যা আরও ছড়িয়ে না পড়ে। গুজরাট ও দেশের অন্যত্র জাতিদাঙ্গার উন্মাদনায় আমি আতঙ্কগ্রস্ত। গত কয়েক দিনে যে গণহত্যা চলেছে তা উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও সুকৌশলি ষড়যন্ত্রের ফল— সেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে এবং তথাকথিত সঙ্ঘপরিবারের প্ররোচনামূলক কর্মপদ্ধতির জন্যই এটা ঘটেছে।

১৯৯২-এর ডিসেম্বরে অযোধ্যায় যারা রুচিবিগর্হিত জঘন্য বর্বরোচিত কাজ করেছিল এবং জাতিদাঙ্গার আগুন ছড়াতে ইন্ধন জুগিয়েছিল তারাই আবার গত কয়েক মাস ধরে নিজেদের খেলায় মেতেছে। আমরা এই খেলার ধরন জানি। এমনকী আমরা এর প্রতিকারের উপায়ও জানি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এই ধরনের রাজনৈতিক ইচ্ছাই নেই। ইচ্ছা নেই যারা গুজরাট ও অন্যত্র ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে, রক্তধারা বইয়ে দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত শক্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের।

গত তিন দিনের ঘটনায় এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, গুজরাটের রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার উপযুক্ত সময়ে ব্যবস্থা না নিয়ে সরাসরি এই গণহত্যায় মদত জুগিয়েছে। সামান্য যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তাও বড্ড বিলম্বে নেওয়া হয়েছে।

গোটা দেশের পক্ষে চরম লজ্জাজনক এই পরিস্থিতিতে আপনার যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রয়োগ করে অবিলম্বে এইরূপ জীবনহানি বন্ধ করুন; এবং সুস্থ স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধির পরিবেশ ফিরিয়ে আনুন।

আমি আপনার অতি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রত্যাশায় থাকছি। ইতি—

আপনার বিশ্বস্ত
মহাশ্বেতা দেবী

অন্যদিকে খ্যাতনামা লেখক ও চিন্তক দেবেশ রায় তুলে ধরলেন দাঙ্গার অর্থনৈতিক ক্ষয়ক্ষতির ভয়াবহ দিকটি। গুজরাটের ২০০২-এর দাঙ্গায় একমাত্র আমেদাবাদ শহরেই ৬০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। কোনও হোটেল লুট করা হয়েছে, কোনও হোটেল পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে,— বিধ্বস্ত হোটেলগুলির ২০,০০০ কর্মী বেকার হয়ে পড়েছে। আর সেই কর্মীদের এক বড় অংশের খোঁজও পাওয়া যাচ্ছে না। ভাবনগরে দুটি বিলাসবহুল হোটেল, ১২০টি ছোটো-বড়ো রেস্তোরাঁ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৫০০ কোটি টাকা। বিশ হাজার বাইক-স্কুটার, ত্রিশ হাজার গাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ক্ষতির পরিমাণ আন্দাজ করুন!

রাজকোট, ভদোদরা, ভাবনগর— এসব অঞ্চলে হাজার হাজার বাইক, গাড়ি, আর হাইরোডগুলিতে অসংখ্য লড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বরোদা সুরাটে ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের কারখানাগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজকোটে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে ৬টি প্লাস্টিক কারখানা। বস্তুত, গুজরাটের এই দাঙ্গার লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের শিরদাঁড়া ভেঙে দেওয়া,-- তাঁদের অর্থনৈতিক-বৈষয়িক জীবন-জীবিকার কাঠামোটা ভেঙে দেওয়া। আর সে কারণেই বেছে বেছে আক্রমণ হানা হয়েছে মুসলমানদের ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে,— মাঝারি মুসলিম ব্যবসায়ীদের মালিকানাধীন হোটেল ও শো-রুমগুলিতে।

আর সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মতো বিশিষ্ট অভিনেতা ও বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখলেন, গুজরাটের মোদি সরকারকে এবার বরখাস্ত করুন। "আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 'রাজধর্ম' পালনের কথা বলছেন। যাঁকে এই মূল্যবান পরামর্শ দেওয়া সেই নরেন্দ্র মোদি এই উপদেশ বা পরামর্শের কী ব্যাখ্যা করেছেন জানি না; তবে গুজরাটে এখনও আসল ধর্ম মনুষ্যত্বের ধর্মটাই মানা হচ্ছে না। যত রকম জঘন্য বিবেক ও বিবেচনাহীন কাজ কল্পনা করা সম্ভব— সবই সেখানে এখনও অব্যাহত। আগুন, মৃত্যুর সঙ্গে শেষতম সংযোজন সবরমতী আশ্রমে মেধা পটেকরসহ সাংবাদিকদের উপর লাঠিচার্জ।

নরেন্দ্র মোদির দুঃশাসনের এই শেষতম কীর্তিও ওই রাজধর্ম পালনের বহিঃপ্রকাশ।[১২৯]

অন্যদিকে বিশিষ্ট সাংবাদিক অশোক দাশগুপ্ত ফিরে এসেছেন বাংলার প্রেক্ষিতে, সম্প্রীতির যে ঐতিহ্যগত অহংকাব বাংলার আছে তা চূর্ণ করার চেষ্টা অশুভ শক্তি করবেই। আমরা তা হতে দেব না; তিনি লিখলেন, "গুজরাটকে পাল্টাতে পারব কি না জানি না, বাংলাকে পাল্টাতে দেব না। আমরা দেওয়াল, সেই সম্প্রীতির ও বিশ্বাসেরা দেওয়াল চূর্ণ তো হতে দেবই না, ক্ষুদ্র ছিদ্র করার চেষ্টা দেখলেই বাধা দেব। প্রথমত আমরা বাংলাকে বাংলা রাখব, দ্বিতীয়ত আমরা গোটা ভারতবর্ষকে বলব : এইরকম থাকতে হয়।"[১৩০]

অযোধ্যার বাবরি মসজিদ ধ্বংস বা গুজরাটের মুসলিম নিধন,- কোনওটির সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশের কোনও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক না থাকলেও তার নিহিত গূঢ় সম্পর্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতিতেই পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান জনগোষ্ঠী আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এবং বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পর কলকাতায় (৮-৯ ডিসেম্বর ১৯৯২) এবং বাংলাদেশে (১০-১৫ ডিসেম্বর ১৯৯২) যে সকল দাঙ্গার বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে তা নিশ্চয়ই বাঙালি জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী; অধিকন্তু, পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট শাসিত তথাকথিত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বাতাবরণে এমতো ঘটনা শুধু অনভিপ্রেত নয়, কলঙ্কজনকও। আর সেই সূত্রে অনিবার্য প্রশ্ন ওঠে : কেন এমনটা হল?

দুটি সম্ভাব্য কারণ আমাদের এক্ষেত্রে বিবেচনা করতে হবে; প্রথম জাতীয় ঐতিহ্য— হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকার, সম্প্রীতির জীবনচর্চার যে ভাবাদর্শ তা তো স্বাভাবিকভাবেই অন্তস্থলের ব্যাপার। উপরিস্তরে, রাজনৈতিক-সামাজিক প্রাত্যহিক ঘটনাক্রমে,— বিশেষত বড়ো বড়ো ঘটনার ব্যত্যয় গণমানসের উপরিভাগ যখন আলোড়িত হয়— প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ গ্রহণে একবল্গা হয়ে পড়ে তখন তাকে দমিত রাখার মতো শিক্ষা-সংস্কৃতি এখনও পায়নি জনগণ। কিংবা মতাদর্শগত প্রশিক্ষণও ঘটেনি তাদের; বরং প্রতিটি রাজনৈতিক দল জনগণের আবেগকে বিশ্বাসকে আনুগত্যকে নিয়ে খেলা করে বলেই শতাব্দীব শেষলগ্নেও কলকাতায় দাঙ্গার আগুন জ্বলে।

তাছাড়া দ্বিতীয়ত বাংলার প্রগতিশীল অংশ–– গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মী ও সমর্থকরা বড়ো বেশি আত্মতুষ্টিতে ভোগেন। ভারত এক বিশাল দেশ,— তার ভাষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে যেমন রয়েছে বহুত্ব তেমনি তার ধর্ম সংস্কৃতি জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি ক্ষেত্রেও তন্তুবিন্যস্ত জটিলতা : পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীরা সেই বহুত্ব ও জটিলতা বুঝতে পারছেন না বলেই জয় শ্রীরাম স্লোগানকে রামভক্তিকে তার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিতে না রেখেই হাল্কাভাবে নিয়েছেন। বামপন্থীরা যে স্বখাত সলিলে ভেসে যাচ্ছেন সেই বোধটাও যখন বৃহত্তম জনসমাবেশের সাফল্যে(!) হারিয়ে গেছে তখনই দাঙ্গার আগুন জ্বলে ওঠে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে।

আর ৬ ডিসেম্বর ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চলে যে দাঙ্গার আগুন জ্বলে উঠেছিল তা ছিল প্রত্যাঘাত ইসলামীয় চেতনার ওপর আঘাতের প্রতিক্রিয়া। সেই দাঙ্গার যে পল্লবিত কাহিনি এখানে শোনা গেছে,— বিশেষ রাজনৈতিক সংগঠনের নেতারা যা বলেছেন বা তাঁদের সমর্থনকারী সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে তার সবটাই সত্য নয়। হ্যাঁ, দাঙ্গা, লুটপাট, ভাঙচুর হয়েছে; তবে তা ব্যাপক আকার নিতে পারেনি; আর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আক্রমণের লক্ষ ছিল হিন্দুদের কোনও দেবস্থান। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রতিক্রিয়ায় উন্মত্ত মুসলমান জনতা হিন্দুর মন্দিরের ওপর হামলা চালিয়েছে! এবং সেই হামলাকারীদের মদত জুগিয়েছে বাংলাদেশের ইসলামীয় মৌলবাদী সংগঠনগুলি।

তবে বাংলাদেশেও ক্রমশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক শক্তির বিকাশ ঘটছে,— বিরানব্বইয়ের দাঙ্গার বিরুদ্ধে সেই শক্তির অভ্যুদয় আমাদের মনে আশার আলো দেখায়। অশীতিপর বৃদ্ধ কবি শামসুর রহমানকে আমরা যেমন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে দেখেছি ঠিক তেমনি প্রতিবাদী তিনি আজও,— নিরীহ হিন্দু জনগণ ও তাদের ধর্মস্থানের ওপর মুসলিম মৌলবাদী শক্তির হামলাকে তিনি কাপুরুষোচিত ঘৃণ্য কাজ বলে নিন্দা জানিয়েছেন। এবং বুদ্ধিজীবীদের এক বিশাল মিছিল মহানগরী পরিক্রমা করে তাঁদের পবিত্রতম স্থান শহিদমিনারে শেষ হয়েছে। সেই মিছিলে উচ্চারিত হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির ঐতিহ্যের স্লোগান,— বাঙালি সম্প্রীতির ডাক।

আর এই দাঙ্গার আধারেই তসলিমা নাসরিন লেখেন তাঁর 'লজ্জা' উপন্যাস এবং সেখানে তিনি দেখান, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর কী নিদারুণ নির্যাতন চালানো হয়, তারা কতখানি অবিচারের শিকার,— বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে কীভাবে তারা দিন কাটায়। ইতিপূর্বে আমরা উপন্যাসটি প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সংযোজন হিসেবে বলা সমীচীন, 'লজ্জা' উপন্যাস দুটি প্রশ্ন উস্কে দিয়েছে : আমরা 'লজ্জা' উপন্যাসের মতো সাহিত্যকর্মকে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী সাহিত্য বলব কিনা। দ্বিতীয়ত, মৌলবাদীদের দাবি মতো কোনও সাহিত্যকর্মের প্রকাশ-প্রচার নিষিদ্ধ হওয়া কতটা জরুরি।

প্রথম প্রশ্নের উত্তরের আগে ভাবতে হয়, উপন্যাস শিল্পের মৌল শর্ত, কাহিনিবিন্যাসে যতই পরিপাটি বা গতিময়তা থাকুক ইচ্ছাপূরণমূলক বিবৃতি বা বাস্তবতার বিনির্মাণ যখন প্রচারমূলক মাত্র থাকে তখন সেই রচনাকে উপন্যাস হিসেবে আখ্যায়িত করা হবে কিনা সেটা ভাবতে হয়। সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী বা দাঙ্গাবিরোধী— এরকম অভিধায় সাহিত্যকর্মকে চিহ্নায়ন নিয়ে সম্প্রতি প্রবল মতানৈক্য দেখা দিয়েছে। ভাববাদী শিবির 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজম'-এর সংজ্ঞাটাই মানেন না; তাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' তত্ত্বে বিশ্বাসী আত্মমগ্ন শিল্পী; সাধারণভাবে যাঁদের বলা হয় কলাকৈবল্যবাদী।

কিন্তু যাঁরা বিপরীত দৃষ্টিকোণ থেকে ঘটমান বাস্তবকে দেখেন,— একটা পীড়নকারী

রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের অধীনে— শ্রেণিশোষণের বাস্তবতায় একক কোনও মানুষ, বা কোনও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিকোণ থেকে সংঘটিত বাস্তবকে লেখক দেখেন, সেই বাস্তবতাকে, বাস্তবতার দৃশ্য-অদৃশ্য শর্তকে বিশ্লেষণ করেন তখনও কি তাঁর শিল্পসৃষ্টি সমাদৃত হবে না?[১৫৬]

আর শেষোক্ত এই দুরূহ কাজটিই করেছেন বাংলাদেশের লেখক তসলিমা নাসরিন।

আর দ্বিতীয় প্রশ্নটিও খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। বাংলাদেশের তৎকালীন শাসকবর্গ মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলির ও আরব ও পারস্যের দেশগুলির স্বার্থরক্ষার কারণেই 'লজ্জা' উপন্যাসকে নিষিদ্ধ করেছিল। এই নিষিদ্ধকরণের প্রক্রিয়াটি সব দেশের শাসকবর্গই করে থাকেন। তসলিমা নাসরিন মুসলিম রক্ষণশীলতার দুর্গে উপর্যুপরি বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন : পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা এবং নারী নির্যাতন; পারিবারিক নারী পীড়ন; ধর্ম কী এবং তার কোনও আবশ্যকতা এই সময়ে আছে কিনা; মৌলবাদী শক্তির নখর-দন্তকে সকৌতুকে উন্মোচন ও চ্যালেঞ্জ ঘোষণা; 'লজ্জা' উপন্যাসে এবং নানা লেখায় সংখ্যালঘু হিন্দুদের প্রতি তাঁর পক্ষপাত,— ফলত তসলিমা নাসরিনের প্রাণনাশের ফতোয়া জারি হয়; তাঁকে রাতের অন্ধকারে দেশত্যাগ করতে হয়।

তবে একথা সত্য, তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার 'লজ্জা' উপন্যাসকে যতটা না গুরুত্ব দিয়েছেন তার থেকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন লেখিকা তসলিমা নাসরিনের উপর। তার কারণ, এই উপমহাদেশ জুড়েই তখন মৌলবাদী শক্তির প্রেতনৃত্য চলছিল : সেই শক্তির কাছে দায়বদ্ধতার কারণেই নিষিদ্ধ হয়েছিল 'লজ্জা' উপন্যাস; মুক্তমনা গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের কাছে যা লজ্জা-ই।

পিতামহ ক্ষিতিমোহন সেন রবীন্দ্র আদর্শে উৎসর্গীকৃত ব্যক্তি। তাঁর লেখা 'ভারতের সংস্কৃতি' সে সময় অসাম্প্রদায়িক মানুষের কাছে আবার গ্রন্থরূপে বিবেচিত হত। 'তলওয়ার ও রাজ্যজয়ের দ্বাবাই এ দেশে মুসলমান ধর্মের প্রচার হয়েছে একথা মনে করা ভুল। হিন্দু ও মুসলমান দুই ধর্মের আদর্শ নিয়ে দুই দল তপস্বীই সাধনায় প্রবৃত্ত হলেন। এই উপলক্ষে হিন্দুরাও তাঁদের পুরাতন অথচ বিস্মৃত সব বড়ো বড়ো সত্য ও আদর্শকে সবার সামনে স্থাপন করবেন।'[১৫৭] তিনিই প্রথম রবীন্দ্র চিন্তানুসারে বিশ্লেষণ করেন এই মিলনের ধারা কৃষক ও নীচকুলজাত মানুষের কাছ থেকে কিন্তু তবু হিন্দু মুসলমানের মিলনটি পণ্ডিতদের দ্বারা সাধিত হন না। কারণ কি মুসলমান মুল্লা-কাজি কি হিন্দু পণ্ডিত-পুরোহিত সবাই আপন আপন শাস্ত্রের ও ধর্মের সীমানা সামলাতেই ব্যস্ত। নদীর দুই কূল। যদি কেউ আপন কূল ছেড়ে একটুও এগিয়ে আসে তবে সেতু রচিত হবে কেমন করে।... কাজেই সেতু রচনার ভার নিলেন সব সহজ সাধকের দল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই নিরক্ষর দীন দবিদ্র নীচ কুলজাত।'[১১৫৮]

ভারতের বর্তমান ঘনায়মান সাম্প্রদায়িক শক্তির কালমেঘের ঘনঘটা দেখে, বাংলার

অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ অমর্ত্য সেন চুপ করে থাকতে পারেননি। মিলনের গাথা রচনা শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক পুত্রের পরম্পরা। ১৯৯৩ সালের ১১ মার্চ কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ভারতের ভাবাদর্শ শীর্ষক নেহরু স্মারক বক্তৃতা দেন, যা ৮ এপ্রিল 'নিউইয়র্ক রিভিউ' পত্রিকায় 'সংকটের মুখে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা' শিরোনামে প্রথম প্রকাশিত হয়। যা বাংলার সম্প্রীতির ঐতিহ্যের মুকুটে আরও একটি নুতন পালক সংযোজিত করেছে। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও তার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় অসহায় মানুষের জীবনহানি তাঁকে বিচলিত ও সংক্ষুব্ধ করেছে।

হিন্দু ধর্মের বৈচিত্র্য রাম ও রামায়ণের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তিনি সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে আঘাত হানেন। চতুর্দশ শতাব্দীতে মহীশূরের শৃঙ্গেরী মঠের অধ্যক্ষ বিশিষ্ট হিন্দুশাস্ত্রজ্ঞ মাধবাচার্য যখন তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ 'সর্বদর্শন সংগ্রহ' প্রণয়ন করেন, তখন তিনি সেই গ্রন্থের ষোলোটি অধ্যায়ের এক একটি বিন্যাসে হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন মতের (চার্বাকের নাস্তিকতাবাদ দিয়ে শুরু করে) বিশ্লেষণ উপস্থিত করেছিলেন; এবং তিনি সযত্নে দেখিয়েছিলেন হিন্দু ধর্মের ভিতরে থেকেও উক্ত মতামতগুলির পার্থক্য কোথায় নির্দিষ্টভাবে বিরাজমান।

হিন্দুধর্মকে বৈচিত্র্যহীন এক নিটোল ধর্ম হিসেবে পেশ করার প্রবণতা একটি সাম্প্রতিক ঘটনা মাত্র। 'হিন্দু' অভিধাটি উন্মেষকালে ব্যবহৃত হয়েছিল দেশ ও তার ভৌগোলিক অবস্থান বোঝানোর জন্য, ঠিক কোনো একমাত্রিক ধর্মীয় বিশ্বাসকে চিহ্নিত করার জন্য নয়। শব্দটির ব্যুৎপত্তি সিন্ধুনদের নাম থেকে উদ্ভূত... 'এবং ইন্ডিয়া শব্দটির উৎসও ওই নদের নামের সাথে সম্পৃক্ত। প্রাচীন গ্রিক ও পারস্যবাসীদের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয়েছিল 'ইন্ডাস' নদের চারপাশে অবস্থিত এক নির্দিষ্ট ভূখণ্ড হিসেবে, এবং তাঁদের চোখে হিন্দুরা ছিলেন ওই ভূখণ্ডের অধিবাসী। এক সময় ভারতের মুসলমানদের ও 'হিন্দভী' মুসলমান হিসেবে অভিহিত করা হত আরবি ও ফারসি ভাষায়'[১৫৯]

আবার রাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন তুলে ধরার আগে তিনি ব্যক্ত করেন 'রামের নাম... ঈশ্বরের সমার্থক হিসেবে উচ্চারিত হয়েছিল', সেটি সম্পৃক্ত হয়ে আছে ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারিতে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার কলঙ্কের সাথে।... সেই চরমপন্থী হিন্দুটির গুলিতে যখন তিনি ধরাশায়ী এবং মৃত্যুপথযাত্রী তখন তাঁর অন্তিম শব্দোচ্চারণটি ছিল : "হে রাম!"[১৬০] একই সঙ্গে তিনি বলেন রামকে শুধুমাত্র উত্তর ও পশ্চিম ভারতে দেবতা বলে পূজা করার রীতি আছে। 'আমার জন্মভূমি বাংলায় রামকে গণ্য করা হয় শুধুমাত্র রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক হিসেবে, দেবতার রূপে নয়।' 'রবীন্দ্রনাথের মতে ঈশ্বরের রূপে প্রতিভাত হয়েছিল সেই সব আদিবাসী জনজাতিদের চেতনায় যাদের একাংশের আদিম ধর্মীয় প্রতীক ছিল হনুমান এবং অন্য কিছু গোষ্ঠীর উক্ত প্রতীক ছিল ভালুক।'[১৬১]

ভারতবর্ষের বর্তমান সময়ের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার তীব্রতা দেখে একে তিনি সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদ বলে উল্লেখ করে লেখেন 'বোম্বাই অঞ্চলে সক্রিয় উগ্র হিন্দুধর্মী সংগঠনগুলি বিশেষভাবে উপরোক্ত ফ্যাসিবাদী প্রবণতা প্রকাশ করেছে।'[১৬২]

সাম্প্রদায়িকতা বাংলার সংস্কৃতে তো বটেই এমনকী ভারতীয় সংস্কৃতিতে ও সম্পৃক্ত নয়। 'দ্বিজাতি তত্ত্ব' হিন্দু মুসলমানের যে বিভেদের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে তা বস্তুতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুঁজে পাওয়া দুস্কর।' এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর পূর্বসূরীদের মতো কবীরের দোঁহার উল্লেখ করেন 'কবীর আল্লা ও রামের সন্তান। একজন আমার গুরু। আরেকজন আমার পির।'[১৬৩]

এই অধ্যায়ের উপসংহার টানব তাঁর লেখার শেষ অধ্যায় দিয়ে 'সাম্প্রদায়িক হিন্দুবাদী রাজনীতির দুর্বলতার প্রধান কারণ তার টিকে থাকার ভিত্তি বিভিন্ন স্তরে বিরাজমান অজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল। ওই অজ্ঞতার সাহায্যে কুসংস্কারের অন্ধ আকর্ষণকে ব্যবহার করা হয়েছে জঙ্গি রক্ষণশীলতাকে শক্তিশালী করার তাগিদে এবং ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িক ফ্যাসিবাদকে মদত দেওয়ার জন্য। এই অজ্ঞতাই সংকীর্ণ গ্রন্থির দুর্বলতম শৃঙ্খল, যা পরিব্যাপ্ত রয়েছে প্রাকৃত ও পরিশীলিত উভয় স্তরে। ও অজ্ঞতাকে উন্মোচিত, আলোকিত করার জন্যই চূড়ান্ত প্রতিবাদের আশু প্রয়োজনীয়তা।[১৬৪]

বাংলার ঐতিহ্যময় সম্প্রীতিকে তুলে ধরে, সারাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ না গড়তে পারলে ইতিহাস আমাদের কখনও ক্ষমা করবে না। আর তা হবে বাঙালির ঐতিহ্যের অবমাননা।

বাংলার সম্প্রীতি ঃ রাজনৈতিক সাহিত্যে

ইংরাজ এদেশে অত্যন্ত সফলতার সাথে হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদের অলঙ্ঘ্য প্রাচীর তুলে ধরে। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, বাংলার নবজাগরণের রূপকাররা আত্মোন্নতির বাইরে কিছু ভাবেননি, ফলে নিম্নবর্ণের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিস্তর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল। ভারতের নিরিখে স্যার সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে গো-সংরক্ষণ আন্দোলন এবং সর্বোপরি ব্রিটিশ রাজশক্তির সমর্থন সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে নূতন মাত্রা এনে দেয়।[১৬৫] এই সংকটময় অবস্থায় কংগ্রেস নেতৃত্বের দোদুল্যমানতা দেখে মুসলমান সমাজ মুখ ফিরিয়ে নেয়।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের রাজনীতির প্রত্যক্ষে প্রবেশ, বিপিনচন্দ্র পালের বলিষ্ঠ ভূমিকা এবং বরিশালের জননেতা দক্ষিণারঞ্জন দত্তর উদ্যোগে মুসলমান সমাজের অংশগ্রহণ সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমান সমাজ সাড়া দেননি। এই অনুভবের থেকে রবীন্দ্রনাথের ঐতিহাসিক উক্তি 'বঙ্গ-বিচ্ছেদ-ব্যাপারটা আমাদের অন্ন বস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা অপরিচ্ছন্ন ছিল বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।'[১৬৬]

বিপিনচন্দ্র পাল 'বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রিটিশের বিভেদ নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন— এই সকল অনুচরের সাহায্যে আপনার কুটিল ভেদনীতি প্রতিষ্ঠা করিয়া ইংরেজ বঙ্গ বিভাগ হইয়া গেলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবিধ রাজনৈতিক ঈর্ষাদ্বেষ উৎপাদন ও পরিপোষণ করাইয়া বাঙালির রাজনৈতিক শক্তিকে অক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে।'[১৬৭]

মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের পর দেশ জুড়ে হতাশা নেমে আসে। এই হতাশার ফল স্বরূপ হিন্দু-মুসলমান বিভেদ আরও প্রকট হয়।[১৬৮] এই সময় হিন্দু-মুসলমানের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতা রুখতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস প্রয়াসী হন। ১৯২৩ সালের ১৬-১৭ ডিসেম্বর বাংলার রাজনীতির ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য দিন। ওইদিন হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর জন্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট' গৃহীত হয়। এই প্রথম পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট কিছু অর্থনৈতিক কার্যক্রম গৃহীত হয়। এই কারণেই নেতাজি

সুভাষচন্দ্র বসু বলেছিলেন 'ভারতের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দেশ বন্ধুর মতো ইসলামের এত বড়ো বন্ধু আর কেহ ছিলেন বলিয়া আমার মনে হয় না।'[১৬৯] কিন্তু ওই বছরের ২৩ ডিসেম্বর কংগ্রেসের অধিবেশন এই প্যাক্টকে স্বীকৃতি না দিলেও এই প্রথম মুসলমান সমাজ এর প্রত্যক্ষ ও প্রকাশ্য সমর্থনে শামিল হন। ১৯২৫ সালের ২৫ জুন দেশবন্ধুর অকাল প্রয়াণে বাংলার সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রাজনীতিতে অন্ধকার নেমে আসে। নিজেদের অন্তঃকলহ বন্ধ করে বাংলার কংগ্রেস নেতৃত্ব দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করলে দেশভাগের মতো কলঙ্কজনক অধ্যায়ে তাদের শামিল হতে হত না।

দেশবন্ধুর ভাবশিষ্য সুভাষচন্দ্র বসু রাজনীতিতে ও তাঁর বাহিনীর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষতার নজির সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। তিনি তাঁর পূর্বসূরি বাংলার চরমপন্থীদের মতো নিজের ধর্মীয় বিশ্বাসকে রাজনীতিতে টেনে এনে সমাজের একটা বৃহৎ অংশকে দূরে ঠেলে দেননি। তাঁর ব্যক্তিজীবনের আধ্যাত্মিক বিশ্বাসকে তিনি কখনও জন-জীবনে টেনে আনেননি। ব্যক্তি জীবনে তাঁর আধ্যাত্মিক গুরু ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ঋষি অরবিন্দ। এতদ্‌সত্ত্বেও 'তিলক, অরবিন্দ ছাত্রদের উপরই অত্যধিক নির্ভর করেছিলেন, আর নির্ভর করেছিলেন হিন্দু ধর্মের ইন্দ্রজালের উপর।... আর বলা বাহুল্য ''হিন্দুত্বের'' বড়াই এদেশের সব থেকে প্রভাবশালী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চরমপন্থীদের প্রতি বিরূপ করে তুলেছিল। স্বাধীনতা লাভের জন্য এতদিন লড়াইটা করছিল দুটি দলে। এখন সমরাঙ্গণে হাজির হল তৃতীয় পক্ষ— মুসলমান আর নবাগতকে স্বপক্ষে রাখার জন্য কূট কৌশলি ইংরেজ চেষ্টার কোনও ত্রুটি করেনি।'[১৭০]

চরমপন্থীদের সম্পর্কে একই মূল্যায়ন করেছিলেন সেই সময়ের প্রখ্যাত বিপ্লবী। পরবর্তীকালে মার্কসবাদী চিন্তায় উদ্ভাসিত ঐতিহাসিক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 'কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হইল।'[১৭১] পূর্বসূরিদের ভুলগুলি সংশোধন করেই সুভাষ বসুর পথ চলা। তাই তিনি বলতেন 'দেশ ছাড়া অন্য কোনও উপাস্য দেবতা আমাদের জীবনে নেই। তাই আমাদের একমাত্র মন্ত্র জয় হিন্দ'।[১৭২] জাতি, বর্ণ বা ধর্মমূলক বৈষম্যকে তিনি স্বীকার করলেন না। তাঁর পরিচালিত সেনাবাহিনীতে Legion একজাতি এক প্রাণ।

কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব বিশাল ইমারতের ভিতর সৃষ্ট বটবৃক্ষের শেকড়ের মতো বারে-বারে দলের অভ্যন্তরে ফাটল ধরিয়েছে। ধর্মের বিভেদ দলীয় কর্মীদের সহমর্মিতাকে করেছে নিঃশ্ব রিক্ত। গোটা দল ভুগেছে চরম বিশ্বাসহীনতায়। ব্রিটিশ সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান ভোটের বিভাজন, কংগ্রেস নেতৃত্বের ক্ষমতার মদমত্ততা ব্যক্তিগত ধর্মাচরণকে জনজীবনে নামিয়ে আনার ফল ভুগতে হয়েছে উপমহাদেশের জনসাধারণকে। যুক্তবঙ্গে ও আঞ্চলিকতা বাদের দ্বন্দ্বে দীর্ণ হতে হয়েছে কংগ্রেসকে। যা জে.এম. সেনগুপ্ত ও বিধান রায়ের বাঙাল ঘটি লড়াই বলে সুবিদিত। 'দেশমাতা জগদীশ্বরীর থেকে ভিন্ন নন, আর জন্মভূমি তো দেবী দুর্গারই প্রতীক— অরবিন্দর এই উপলব্ধি চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য

করেছিল।'[১৭৩] এর ফলে দূরে সরে গিয়েছিল মুসলমান জনতা। অপরপক্ষে সুভাষ বসুর কার্যক্রমে ছিল তৃতীয় ধারার মত ও পথের প্রতিষ্ঠা। ঠিক সে কারণেই তাঁর দীর্ঘ যাত্রাপথের সমস্ত মোড় ও বাঁকের সামনে বিশ্বস্ত সৈনিক ছিলেন কোনও না কোনও মুসলমান।

আজাদহিন্দ্ ফৌজের অন্যতম সেনানায়ক শাহ্ নওয়াজ খানের কথায় 'ধর্ম সম্বন্ধীয় বা প্রাদেশিক ভেদাভেদ তাঁর কাছে কিছুমাত্র ছিল না। এসব তিনি আমলই দিতেন না। হিন্দু, মুসলমান, শিখ সবাইকে তিনি সমচোখে দেখতেন।... নেতাজির অনুপ্রেরণায় আমরা সবাই এক হয়ে গিয়েছিলাম এবং আমরা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করেছিলাম ভারতের ধর্মগত বা সাম্প্রদায়িক শুধু বিদেশিদেব সৃষ্টি। এই বিদ্বেষের ভাব যে আমাদের মন থেকে সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়েছিল তার স্পষ্ট প্রমাণ— নেতাজি শ্রেষ্ঠ অনুরাগী ভক্তদের কয়েকজন হচ্ছেন মুসলমান।

'জার্মানি থেকে টোকিও আসবার বিপদসঙ্কুল পথে তিনি যখন সাবমেরিনে যাত্রা করেন, তখন তাঁর সঙ্গী নির্বাচন যাকে তিনি একজন মুসলিম তরুণ। নাম তাঁর আবিদ হোসেন।'

'আবার তাঁর সৈন্যদল যখন যুদ্ধে শত্রুর সম্মুখীন— তখন তাঁর দু'জন ডিভিশনাল কমান্ডারই ছিলেন মুসলমান— মেজর জেনারেল এম.জেড. কিয়ানি এবং আমি। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে তিনি যখন শেষবার টোকিও যাত্রা করেন তখনও তাঁর সঙ্গী নির্বাচন করলেন একজন মুসলমানকে। তাঁর নাম কর্নেল হবিবুর রহমান। এইরূপ মনোভাব শুধু সৈন্যদলেই নিবদ্ধ ছিল না, অসামরিক লোক সমাজেও এ ভাব প্রসারিত হয়ে পড়েছিল। সেখানে নেতাজির শ্রেষ্ঠ অনুরাগীদের কয়েকজন হচ্ছেন মুসলিম। মি. হাবিব নামে রেঙ্গুনের এক ধনী বণিক নেতাজির গলার মালার মূল্য স্বরূপ তার সমস্ত সম্পত্তি দান করেছিলেন— এ-সম্পত্তির মূল্য প্রায় এককোটি টাকা। এই জন্য আমবা আজাদহিন্দ ফৌজের লোকেরা এ কথায় বিশ্বাস করি না যে ভারতীয়রা সব ঐক্যবদ্ধ হয়ে আপন ভাইবোনের মতো মিলেমিশে এক স্বাধীন মহান অখণ্ড ভারতবর্ষ গড়ে তুলবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না।'[১৭৪]

ব্যক্তিজীবনে নেতাজির অন্তরঙ্গতা ছিল দুজন মানুষের সাথে। প্রথমজন দিলীপ কুমার রায় দেশ সেবার ব্রত না নিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনে প্রবেশ করলে সুভাষ বসু অত্যন্ত ব্যথিত হন। অপরজন অবশ্যই কাজী নজরুল ইসলাম। নজরুলের বিপ্লবী চেতনা, দেশাত্মবোধ এবং একজন প্রকৃত ধর্ম নিরপেক্ষ কবি হিসাবে অনতিবিলম্বে তাঁর ও তাঁর গানের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ১৯২৩ সালের দাঙ্গার পর নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানখানি শুনে সুভাষ বসু মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' গানটির মতো জাতীয় সঙ্গীত আমি শুনিনি। আমরা যখন জেলে যাব তখন নজরুলেব গান গাইব, আমরা যখন সংগ্রাম করব তখনও নজরুলের গান গাইব।[১৭৫]

মহত্মা গান্ধী বিশ্বাস করতেন সুভাষ একদিন মুক্ত ভারতে এসে সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ রুখবেন। মৌলনা আবুল কালাম আজাদ এ কথাই ব্যক্ত করেছেন তাঁর ভারত স্বাধীন হল গ্রন্থে। একই বিশ্বাস ছিল সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খানেরও, তাই তিনি লেখেন— 'On the basis of Communal feelings once in moment absence of Subhash, India was divided giving bluff solution of it to the nation,... being so much afraid of Netaji Subhash that he might come out one day in this subcontinent, Mr. Neharu and Mr Jinnah set together on the throne and lastly they proved themselves inefficient. ...only Subhash could wipe out the feeling plague in India and Pakistan?[১৭৬]

বাংলার সম্প্রীতি : বাংলার প্রগতিশীল শক্তির ভূমিকা

সাম্প্রদায়িকতা মানুষের ঐক্যকে বিনষ্ট করে। মেহনতি মানুষকে তার শ্রেণিচেতনা থেকে বিচ্যুত করে। প্রগতির লক্ষ্য দূরগামী হয়, নীচে নামিয়ে দেয় চেতনার স্তরকে, বিলুপ্ত হয় মানবিকতা বোধ। অপরদিকে লাভবান হয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ও শাসকশ্রেণি। ধর্মের অহিফেনে বুদ হয়ে থাকা মানুষ শ্রেণি সংগ্রামকে উপেক্ষা করে তার বিরুদ্ধে সদাজাগ্রত থাকতে হয় সমাজের প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে।

মুজফ্‌ফর আহমদ শুধু মাত্র ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এই পরিচয় দিলে একমাত্রিক হয়ে যায়। আহমেদ শরিফের বর্ণনামত আত্মপরিচিতিতে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি বাঙালি মুসলিমদের ১৯৩০ সন অবধি সুস্থ হতে দেয়নি।[১৭৭] এই বিকৃতি ও বিভ্রান্তি থেকে বাঙালি মুসলমান সমাজকে বের করে আনার উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে পথিকৃৎদের অন্যতম মুজফ্‌ফর আহমেদ। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালি মুসলমানদের সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হতে হবে। তা না হলে বিভেদের প্রাচীর ভাঙা যাবে না। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের দুই কৃতী মুসলমান ব্যক্তিত্বকে তিনি সাহিত্যকর্মে ব্রতী হন। প্রথমজন কাজী নজরুল ইসলাম দ্বিতীয় জন মহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তাঁর কথায় 'তিন-চার জনকে সাথে নিয়ে নজরুল আব আমি একখানা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা বার করেছিলাম। কাগজের নাম ছিল "নবযুগ"।... ১৯২০ সালের ১২ জুলাই তারিখে কাগজখানা প্রথমবার হয়েছিল[১৭৮] এর কিছুদিন পরে তাদের উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'লাঙল' তারপর 'গণবাণী'। তাঁর গদ্য লেখা অত্যন্ত সাবলীল ছিল বলে বহু সাহিত্যিক মত ব্যক্ত করেছেন।

বাঙালি ঐতিহ্য এবং চেতনা বোধ থেকে তিনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন। গণবাণী পত্রিকায় এক নিবন্ধে লেখেন 'ধর্ম সমূহের মধ্যে সারবস্তু কী আছে না আছে তা জানিনে কিন্তু এদেশে প্রতিনিয়ত চোখে দেখতে পাচ্ছি যে বেশি ধার্মিক হওয়ার মানেই বেশি সংকীর্ণ হওয়া। আমি যত বেশি ধার্মিক হব তত বেশি অন্য ধর্মাবলম্বীকে ঘৃণা করব। এই হচ্ছে আমার ধার্মিকত্বের পরিচয়। হিন্দু শুধু হিন্দু বলেই মুসলমান তাকে

ঘৃণা করে, মুসলমানকে ঘৃণা করে থাকে কেবল মুসলমান বলে। হোকনা কেন উভয়েই মানুষ, তাতে কি এসে যায়— হিন্দু কিংবা মুসলমান তো নয়।'[১৭৯]

একই লেখায় তিনি লালা লাজপত রায় ও সৈয়ফুদ্দিন কিচলুর সমালোচনা করেন। 'মানুষ যে কত বহুরূপী সাজতে পারে তা বর্তমানে দুজন প্রসিদ্ধ সাম্প্রদায়িক নেতা লালা লাজপত রায় ও ডাক্তার সয়ফুদ্দিন কিচলুর কার্যকলাপের প্রতি-দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যায়। লালা লাজপত রায় প্রথমে ছিলেন আর্য সমাজী। আর সফল আর্য সমাজীরা যেমন গরল উদ্গীরণ করে থাকেন তিনিও তা করতেন। আমেরিকা হতে ফিরে এসে তিনি ঘোষণা করেছিলেন ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেই আজ আবার তিনিই হিন্দু মহাসভা ও হিন্দু সংগঠনের পাণ্ডা। ডাক্তার সৈয়ফুদ্দিন কিচলুর দেশাত্ববোধের কথা দেশময় ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিল। আজ তিনি হয়েছেন আজিম বা মুসলিম সংগঠনের পাণ্ডা। বাংলাদেশে ভ্রমণের সময় অনেক বড়ো বড়ো কথা বলে গিয়েছেন, কিন্তু সে সকল ভুয়ো কথার কোনও মূল্যই নেই। যদি তাঁর মনে কোনও প্রকার সাম্প্রদায়িকতা না থাকে তাহলে তিনি পৃথকভাবে মুসলিম সংগঠন করতে গেলেন কিসের জন্য?'[১৮০]

তিনি একজন শ্রেণি সচেতন মানুষ, বাঙালির ঐতিহ্য সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। একজন প্রকৃত জননেতার কাজ মেহনতি মানুষ বাঙালির ঐতিহ্য সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল। একজন প্রকৃত জননেতার কাজ মেহনতি মানুষকে এ সম্পর্কে সচেতন করা। তাই তিনি লিখলেন— 'বর্তমান সময়ে দেশময় সাম্প্রদায়িক ঘৃণা-বিদ্বেষের কথাটাই আর সফল কথার চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে। সত্য বলতে গেলে শ্রেণি বিশেষের স্বার্থের খাতিরে এ কথাটাকে বড় করে তোলা হয়েছে। সকলের যে সকল কথার কোনও মানে নেই সে সকল কথা নিয়ে ঝগড়া-কলহ, এমনকী মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত করা যেন ভারতবর্ষের হিন্দু আর মুসলমানের একমাত্র ধর্ম হয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের লোকের মধ্যে ধর্মের ভাবটা খুব বেশি এ কথাটা আরো খোলসা করে বলতে গেলে এই বলতে হবে যে ধর্মের নাম করে ভারতের লোকদিগকে যত বেশি ঠকানো যায় এমনটা জগতের আর কোনো দেশেই পাওয়া যায় না।[১৮১]

১৯২৭ সালের অগাস্ট মাসে ঢাকা শহরে এক বিশেষ যুব সম্মেলন হয়েছিল এই সম্মেলনের একটি বিভাগের সভাপতি ছিলেন মুজফ্ফর আহমদ। তিনি ওই সভায় সাম্প্রদায়িকতার সাথে সন্ত্রাসমূলক বিপ্লবী পন্থারও সমালোচনা করে যুবশক্তিকে আহ্বান করেন 'হীন সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতাকে ঘৃণা ভরে পরিহার করিয়া মনুষ্যত্বকে বরণ করিয়া লইতে না পারিলে আমরা ভারতের যুবকগণ কোনও কাজেই আসিব না।'

'...যে মুক্তি সংগ্রামে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি শ্রেণি সংগ্রাম তাহার একটা রূপ।'[১৮২]

তাঁর এই লেখাটি প্রকাশিত হয় গণবাণীর ২৫ অগাস্ট ১৯২৭ (৮ ভাদ্র ১৩৩৪)। এই লেখায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন ধর্মের নামে বিপ্লব প্রচেষ্টার যুগ বহুকাল উত্তীর্ণ হয়ে

গেছে। বর্তমানে ধর্মের নামে বিপ্লব প্রচেষ্টা সংকীর্ণতারই নামান্তর। আর এই প্রচেষ্টা কখনও সফল হতে পারে না। পুঁজিবাদের যুগে, সাম্রাজ্যবাদের যুগে সব সম্প্রদায়ের মানুষই অর্থনীতির অচ্ছেদ্য বন্ধন থাকার কারণে কোনও একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় একা জীবনযাত্রা নির্বাহ সম্ভব নয়।' (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ নির্বাচিত রচনা সংকলন, পৃ. ৬৬)।

১৯৪৬ সালের ১৬ অগাস্ট কংগ্রেস প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দেয়, এর বিপক্ষে মুসলিম লিগ ছুটি ঘোষণা করলে সারা দেশের সাথে কলাকাতায়ও দাঙ্গা শুরু হয়, যা কলকাতার ইতিহাসে একটি কলঙ্কময় দিন। যে বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছিল ফল্গুধারার মতো বহমান। দাঙ্গার কলঙ্কে যেন সেই ঐতিহ্য পুড়ে খাক হয়ে গেল। 'কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ওইদিন হিন্দু মুসলমান ঐক্যের ধ্বনিতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিলের চেষ্টা চালায় কিন্তু আর কোনও রাজনৈতিক দলই এতে রাজি হয় না।'[১৮৩] মহাত্মা গান্ধী এই সময় কলকাতা ও নোয়াখালিতে অভিযান চালান। জনযুদ্ধ পত্রিকায় মহাত্মাগান্ধীর অভিযানের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'স্ব-স্ব এলাকায় হিন্দু মুসলমান মৃতদেহের ভিড় দেখা যায়। ওয়েলিংটন স্কোয়ারে হিন্দু-মুসলমান যুবকদের সম্মুখ সমরে লিপ্ত হতে দেখা যায়। মুসলমান জনতা বিধান রায়ের বাড়ি আক্রমণ করে। হামলা হয় আনন্দবাজার ও ভারত পত্রিকা অফিসে। ওইদিন ২-টার সময় লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতে সুরাবর্দির প্ররোচনামূলক ভাষণে অবস্থা আরও আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। বাংলায় শান্তি সেনা গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনকে অকুণ্ঠ আশীর্বাদ জানান মহাত্মাগান্ধী। তাঁর আশীর্বাণী প্রকাশিত হয় জনযুদ্ধ পত্রিকায় 'শান্তি সেনা বাহিনীতে সমস্ত দলের সদস্যরা দায়িত্ব নিয়া কাজ করিবেন। কংগ্রেস, লিগ, হিন্দু মহাসভা, কমিউনিস্ট পার্টি, সোসালিস্ট পার্টি, ফরওয়ার্ড ব্লক বা আই. এন.এ. প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের রাজনৈতিক মতের পার্থক্য আছে কিন্তু শান্তি রক্ষার কাজে তাহাদের একসাথে হইতে হইবে।'[১৮৪]

জনযুদ্ধ পত্রিকায় শান্তিসেনায় যোগদান করার জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়, তাতে বলা হয় শান্তিসেনার আদর্শ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, ঐক্য ও শান্তি। শান্তিসেনা সংগ্রাম করে—

> দাঙ্গাবাজদের বিরুদ্ধে
> দুর্নীতির বিরুদ্ধে
> চোরা বাজারের বিরুদ্ধে
> মুনাফাখোরের বিরুদ্ধে।[১৮৫]

এই সময় বঙ্গীয় আইন সভায় জ্যোতি বসু একটি ঐতিহাসিক ভাষণ দেন, 'অতীতে যখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে তখনই আমরা, সঠিকভাবে সাম্রাজ্যবাদকে তার প্রধান উস্কানিদাতা হিসাবে ভর্ৎসনা করেছি এবং আমরা দেখেছি সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে দেশবাসী কীরকম অসহায় দুর্বল দাবার বোড়েতে পরিণত হয়। এবারেও দাঙ্গা সম্পর্কে আলাদা করে ভাবনার কোনো কারণ নেই। সমস্ত দেশপ্রেমিক শক্তির সঙ্গে আমিও অভিযুক্ত করছি এই দাঙ্গার প্রধান অপরাধীদের।'

কিন্তু মি. সুরাবর্দি জানেন তাঁর গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন দিয়ে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন ১৬ অগাস্ট দুপুর বেলা যে জনসমাগম কেমন করে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল! তাঁরই অধীন পুলিশ কমিশনার দায়িত্ব পালন করছে কিনা তা দেখার দায়িত্ব মি. সুরাবর্দির। ...মুসলিম লিগ সরকার মুসলিম লিগ দল থেকে পৃথক নয় এবং শেষোক্তটিকে অবশ্যই ত্রুটি বিচ্যুতির দায়িত্ব নিতে হবে।

'আমি আর দু-মিনিট সময় চাই! এতে কি আশ্চর্যের আছে স্যার যে মুসলিমদের একাংশ তাঁদের নেতাদের গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের হাতে কলমে প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিলেন এবং এরই পরিণতিতে ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গা। এর দ্বারা ব্রিটিশ আমাদের উপর নতুন করে শৃঙ্খল চাপিয়ে দিয়েছে। এর ফলে একমাত্র ব্রিটিশ সম্পত্তি সুরক্ষিত হয় হিন্দু ও মুসলিম পরস্পরকে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস নিয়ে দেখবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন সংগঠিত করার বদলে কংগ্রেস ব্রিটিশ পরিকল্পনাকেই গ্রহণ করেছে। এবং এটা জেনে বুঝেই যে, ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী ভারত ত্যাগ করছে না, রাজন্যবর্গের নিয়ন্ত্রণকারী আধিপত্য থাকছে এবং চূড়ান্ত ক্ষমতা ব্রিটিশের হাতেই রয়ে যাচ্ছে। এই কারণেই ব্রিটিশ পরিকল্পনায় কংগ্রেস মুসলিম লিগের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে এবং কংগ্রেসকে এখন রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে এর মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হতে হবে। এই কারণেই মুসলিম লিগের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ কংগ্রেসের কাছে ভীতিকর হয়ে উঠেছিল এবং একটি সফল হরতাল তাদের কাছে ছিল অনাকাঙ্ক্ষিত। সুতরাং ১৫ অগাস্ট দেশপ্রিয় পার্কের জনসভায় ১৬ অগাস্টের বিরুদ্ধে আবেগ সঞ্চারিত করা হয়েছিল।'[১৮৬]

এই সময় কলকাতার ট্রাম শ্রমিকরা বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তারা নিজেদের দায়িত্বে জঙ্গি-বিরোধী মিছিল পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। রাজাবাজারের মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকরা তৎকালীন ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন আক্রমণ করলে (বর্তমান নাম ব্রাহ্মগার্লস) রাজাবাজারের ট্রাম কোয়ার্টার্সের শ্রমিকরা মুসলমান শ্রমিকদের নেতৃত্বে প্রতিরোধ গড়ে তোলে! শুধু তাই নয় তাঁরা দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত ছাত্রী ও শিক্ষিকাদের বাড়ি পৌঁছে দেন।

জননাট্য সংঘের উদ্যোগে দাঙ্গা বিরোধী সাংস্কৃতিক কর্মসূচি গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। দাঙ্গা বিরোধী সাহিত্য গড়ে ওঠে। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যর কবিতায় শ্রেণিচেতনায় উদ্ভাসিত এক কবিকে আমরা খুঁজে পাই—

'একদা দুর্ভিক্ষ এল
ক্ষুধার ক্ষমাহীন তাড়নায়
পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই দাঁড়াল একই লাইনে
ইতর ভদ্র। হিন্দু আর মুসলমান,
একই বাতাসে নিল নিঃশ্বাস।

এই সময় ঢাকায় সোমেন চন্দ লেখেন সাড়া জাগানো ছোটো গল্প।

দাঙ্গা পালিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে গিয়ে বিভিন্ন জায়গায় মানুষরা ছোড়ার আঘাতে প্রাণ দেয়। আহত মানুষে ভর্তি হাসপাতালগুলি, মিলিটারির কনভয়ে অবরুদ্ধ নগরী। কিন্তু শৃঙ্খলের ভিতরেও সংগ্রাম হয়। শুরু হল এক বিরাট সংগ্রাম। চৌদ্দ বছরের বালক থেকে আরম্ভ করে সত্তর বছরের বুড়ো পর্যন্ত। এমন দৃশ্য শহরের জীবনে অভিনব। লাইনের ধারে যাদের বাস তাদের পালাবার অবকাশ নেই। শুরু হয় পুলিশের খানা তল্লাসি। তাদের হাত থেকে রেহাই নেই মেয়েদের স্কুলের শিক্ষয়িত্রী সুপ্রভার বাড়িও।

'অশোক ও অজয় দুই ভাই অশোক কমিউনিস্ট অজয় হিন্দু সোস্যালিস্ট।

অশোককে তাদের মা বলেন 'আশু এখান থেকে চলে যা। কিন্তু অশোক রাজি হয় না। মা-ছেলে রাজনীতির কথাও হয়, মা জানতে চান— 'রাশিয়ার কি হল শুনি? পারবে জার্মানির সঙ্গে পারবে? পারবে?' অশোক বাইরের দিকে তাকিয়ে বলে 'কেন পারবে না মা? বিপ্লবের কখনও মরণ হয়!'

অজয় পাগলের মতো চলাফেরা করে হিটলারের জয়গান করে। ওদের বাবা কারখানা থেকে সন্ধ্যায় ফেরে না। অশোক খুঁজে পায় না তার বাবার সন্ধান। ছোটো ভাই নিলুর এক কঠিন প্রশ্নের সামনে দাঁড়াতে হয় অশোককে। সে নিজের মনে বলে ওঠে— আগামী নতুন সভ্যতার যারা বীজ, তাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে যোগ দিয়েছি তাদের সুখ-দুঃখ আমারও। আমি যেমন বর্তমানের সৈনিক ও আগামী দিনের সৈনিকও বটে। সেজন্য আমার গর্বের সীমা নেই। আমি জানি অজয়ের চক্রান্ত সেদিন ব্যর্থ হবে প্রক্রিয়ার ধোঁয়া শূন্যে মেলাবে।'

পাশের ঘরে অজয় তখন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ইস্তাহারে আগুন ধরিয়ে দেয়। অশোক বাধা দিলে অজয় বলে 'মরা পোড়াচ্ছি।'

—অজু তুই ভুল বুঝেছিস। চোখ যখন অন্ধ হয়ে যায়নি তখন একটু পড়াশোনা কর তারপর পলিটিক্স করিস।

—দাদা তোমার কমুনিজম রাখ, আমরা এসব জানি।

—কি জানিস বল? অশোকের উত্তাপ বাড়ল

—সব জানি আর এও জানি তোমরা দেশের শত্রু। অশোক উত্তপ্ত স্বরে বললে, 'ফাসিস্ট এজেন্ট' বড়লোকের দালাল। আজ বাদে কাল যখন হিন্দু মুসলমান ভাই বোনেরা বলে ডাক ছাড়বি তখন তোর গাধার ডাক শুনবে কে? পেট মোটা হবে কার? স্টুপিড জানিস দাঙ্গা কেন হয়? জানিস প্যালেস্টাইনের কথা? জানিস আয়ারল্যান্ডের কথা মূর্খ?— কিন্তু একটা আর্তনাদ শুনে অশোক হঠাৎ থেমে গেল, পাশের ঘরে গিয়ে দেখে মা আরো অস্থির

হয়ে পড়েছে।— অশোকের বাবা ফেরে না। কয়েকদিন পরে অশোক বাইকে চড়ে একটা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মিটিং-এ যোগ দিতে যাচ্ছিল। একজায়গায় নির্জন পথের মাঝখানে খানিকটা রক্ত দেখে সে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। সারাদিন আকাশ মেঘাবৃত ছিল বলে রক্তটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়নি। খানিকটা এখনও লেগে রয়েছে। কার দেহ থেকে এই রক্তপাত হয়েছে কে জানে অশোকের চোখে জল এল, সব কিছু মনে পড়ে গেল সে চারিদিক ঝাপসা দেখতে লাগল, ভাবল এই চক্রান্ত ব্যর্থ হবে কবে?'[১৮৭]

দাঙ্গা বিরোধী যত ছোটো গল্প আছে এই গল্পটা তার মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ছোটো গল্প। মাত্র উনিশ-কুড়ি বছরের একটি যুবক এত বলিষ্ঠতার সাথে লিখতে পারে এই গল্প না পড়লে ভাবা যায় না। গল্পকারের লেখার দৃঢ়তা, মূল চরিত্রের আদর্শে অবিচল থাকা, অত্যন্ত সদর্থক দৃষ্টিতে লেখা এই গল্পটি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রবীন্দ্রনাথের ছোটো গল্প 'মুসলমানীর মেয়ে'র কথা মনে পড়ায়।

দ্বিজাতি তত্ত্বের কুৎসিত অবভাসে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ কলুষিত হল। ক্ষমতার কারবারীরা কালানেমির লঙ্কাভাগে নেমে পড়লেন। শত শত বছরের বাঙলার সম্প্রীতির ঐতিহ্য ধূলায় লুণ্ঠিত হল। তবুও বাঙালি চিন্তায় এগিয়ে। সেই সময় শরৎ বসু ও আবুল হাসেম স্বাধীনতা সার্বভোম বাংলা গড়ার প্রস্তাব দিলে মহাত্মা গান্ধী তাঁকে সমর্থন করেন। কমিউনিস্ট পার্টিও এই প্রস্তাব সমর্থন করে অসাম্প্রদায়িক বাংলা গঠনের দাবি জানান। এ উপলক্ষে জনযুদ্ধর শেষ সংখ্যাটিতে একটি যুগান্তকারী সম্পাদকীয় প্রকাশ করে। এর পূর্বে অবশ্য পার্টির সাধারণ সম্পাদক পূরণচাঁদ যোশী ও বাংলা কমিটির সম্পাদক ভবানী সেন এক যৌথ বিবৃতিতে জানান 'শরৎবাবুর সহিত মি. শহীদ সুরাবর্দি ও আবুল হাসেমের সহিত যে কথাবার্তা চলিতেছে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তকে পরাস্ত করার নতুন পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। ...কংগ্রেস ও লিগের চুক্তির ভিত্তিতে ঐকবদ্ধ বাংলা ব্রিটিশ পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিবে।'[১৮৮] জনযুদ্ধ পত্রিকায় লেখা শেষ এবং ঐতিহাসিক সম্পাদকীয়র উদ্ধৃতি দিয়েই উপসংহার টানব।

'বঙ্গভঙ্গ হইতে দিব না'

'একচল্লিশ বছর আগে দাম্ভিক লাট লর্ড কার্জন সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনে বাংলাকে দুভাগ করিবার হুকুম জারি করেন। সেদিন সমস্ত বাঙালি এক সাথে প্রতিজ্ঞা নিয়াছিল বঙ্গভঙ্গ রদ করাইব। সে প্রতিজ্ঞা বাঙালি রক্ষা করিয়াছে, সাম্রাজ্যবাদ ভাবিয়াছিল রাজনীতির ক্ষেত্রে অগ্রণী, চরমপন্থীদের শক্ত ঘাটি বাংলাদেশকে দুভাগ করিলেই তার কার্য সিদ্ধ হইবে। তাহা হয় নাই। সরকারি শাসন ব্যবস্থায় বাংলা দুভাগ হইয়াছিল, কিন্তু শত শত বছরের এক জাতিত্বের দৃঢ় বনিয়াদ একটুকুও ভাঙে নাই। বঙ্গভঙ্গের খবরে বাংলার ঘরে ঘরে আবাল-

বৃদ্ধ-বনিতা সকলে কাঁদিয়া উঠিয়াছিল। তারপর চোখের জল শুকাইয়া সকলের চোখে আগুনের হলকা দেখা দিল। ঘরে-বাহিরে, বাজারে গঞ্জে রাশি রাশি অখণ্ড ভ্রাতৃত্বের রাখী বাঁধিয়াছিল। ঘরে-বাহিরে, বাজারে-গঞ্জে রাশি রাশি বিলাসি পণ্য জ্বালাইয়া দিল। কোনও বাঙালি বঙ্গ বিভাগ চায় না কিন্তু এই না চাওয়ার মধ্যে একচল্লিশ বছর আগের মিলিত শক্তি নাই। কংগ্রেস ভক্তরা বাংলা চান তাহাকেই অখণ্ড ভারতের শক্তি রূপেই চান, লিগ ভক্তরা বাংলা চান তাহাকে পাকিস্তানের যুক্তরাষ্ট্রীয় অংশ রূপেই চান।

সাধারণ হিন্দু-মুসলমান চাষি-মজুর, জমিদার-ধনী সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে মুক্ত সুখী ও স্বাধীন বাংলা চান এবং স্বাধীনভাবে ভারতীয় ইউনিয়ন বা পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের সম্বন্ধ স্থির করিতে চান।

সর্বভারতীয় কংগ্রেস ও লিগ নেতারা বাংলা সম্পর্কে গোপনে কী প্লান করিতেছেন তাহা জানি না। তাহারা যদি সাম্রাজ্যবাদের মন্ত্রীদূতদের সঙ্গে মিলিয়া বঙ্গভঙ্গের চক্রান্তে রাজি হন, তবে তাহাদের কথা কোনো বাঙালি মানিবে না। অষ্টম শতাব্দী হইতে যে জাতিসত্তা সুখে-দুঃখে কৃষি-শিল্প ও সংস্কৃতির মধ্য দিয়া পূর্ণাঙ্গ রূপ পাইয়াছে, সে জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি বাংলার সমগ্রতার উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল।— আমরা কিছুতেই তাহাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত হইতে দিব না।'

'বাংলার কংগ্রেস ও লিগ কেহই এই বঙ্গবিভাগ চায় না। একচল্লিশ বছর আগে একবার দুরাত্মা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙালি বিপ্লবের দাবানল জ্বালাইয়াছিল। আজ আমাদের সমগ্র অতীতকে স্মরণ করিয়া এবং আমাদের ভবিষ্যতের সুখী, স্বাধীন সমগ্র বাংলার দিকে লক্ষ রাখিয়া আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি,—'

'বঙ্গভঙ্গ হইতে দিব না।'[১৮৯]

দুর্বল কমিউনিস্টদের আবেদন, মিথ্যা দ্বিজাতি তত্ত্বের মায়ায় আচ্ছন্ন, ক্ষমতালোলুপদের কর্ণপটহে প্রবেশ করেনি। কালগ্রাসে পতিত হল বাংলার ইতিহাস। তাদের অবিমৃশ্যকারিতার মাসুল হিসাবে দুবার লক্ষ-লক্ষ মানুষের প্রাণহারা সম্পত্তি হারা ও মা-বোন-কন্যা-জায়ার ইজ্জতহরা। নিঃস্ব-রিক্ত হয়ে পড়া সংস্কৃতির ঐতিহ্য আবার ফিরে আসে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ১৯৭১-র স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। তবুও বলতে হবে সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ায় হাজার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও প্রগতিপন্থী বাঙালির মনন, তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এখনও অখণ্ডিত।

সূত্রনির্দেশ : প্রথম পরিচ্ছেদ

১. অতুল সুর : বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়; জিজ্ঞাসা; ১৯৮৬; পৃ. ৩৭

২. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : বাঙ্গালীর সংস্কৃতি; পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯১; পৃ. ১৫

৩. পঞ্চানন সাহা : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক : নতুন ভাবনা; বিশ্ববীক্ষা, ১৯৯৭; পৃ. ৩

৪. এনামুল হক : বঙ্গে সুফী প্রভাব : বাঙলা; পৃ. ৮২

৫. আনিসুজ্জামান : মনন ও সৃজন : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিত; পরিচয়; ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫

৬. আনিসুজ্জামান, আবু সাইয়িদ, রফিক আজাদ ও সেলিনা হোসেন সম্পাদিত : বাঙালী বাংলাদেশ; ঢাকা, ১৪০০; পৃ. ১৫৬

৭. অতুল সুর : প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৩

৮. সুকুমার সেন : মধ্যযুগের বাঙালী; পৃ. ৬ [দ্রষ্টব্য, পঞ্চানন সাহা (১৯৯৭)]

৯. আনিসুজ্জামান : প্রাগুক্ত, পরিচয়

১০. এম.এম. আকাশ : ভাষা আন্দোলন : শ্রেণীভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতাসমূহ; ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ১৯৯০; পৃ. ৫

১১. যদুনাথ সরকার : ভারতে মুসলমান; প্রবাসী; আশ্বিন ১৩৩৭ [দ্রষ্টব্য, পঞ্চানন সাহা (১৯৯৭)]

১২. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : ইতিহাসের উত্তরাধিকার; আনন্দ, ২০০০; পৃ. ১০১-১৩০

১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : বাউল গান; প্রবাসী, ১৩৩৪

১৪. উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য : বাংলার বাউল ও বাউল গান; কলিকাতা, ১৩৮৮-; পৃ. ৫৪৪

১৫. তদেব: পৃ. ৭১১

১৬. বরুণকুমার চক্রবর্তী : সাম্প্রদায়িকতা ও লোকসংস্কৃতি সমন্বয়েব সূত্র; লোকসংস্কৃতি গবেষণা; ১৩ বর্ষ, ৪ সংখ্যা, ১৪০৭

১৭. সুরেন মুখোপাধ্যায় : সাম্প্রদায়িকতা ও গ্রামীণ লোক নাটক; লোকসংস্কৃতি ও গবেষণা; প্রাগুক্ত

১৮. বরুণকুমার চক্রবর্তী : প্রাগুক্ত

১৯. অপালা ভট্টাচার্য : সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহ্য : গীতিকা; লোকসংস্কৃতি ও গবেষণা; প্রাগুক্ত

২০. অতুল সুর : বাংলার সামাজিক ইতিহাস; কলিকাতা, ১৯৮২; পৃ. ৬৮

২১. আশুতোষ ভট্টাচার্য : বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; কলিকাতা, ১৯৬৪; পৃ. ৩১

২২. তদেব; পৃ. ৩০-৩১

২৩. পঞ্চানন সাহা; প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

২৪. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪

২৫. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : র. র.; খণ্ড ১৪, শতবার্ষিকী সংস্করণ; পৃ. ৮৯৭

২৬. তদেব; খণ্ড ১২; পৃ. ৬৬৫

২৭. বিমলচন্দ্র সিংহ : সামাজিক গোষ্ঠী ও পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি; বিশ্বভারতী পত্রিকা, জানু-মার্চ, ১৯৫৯

২৮. হিতেশরঞ্জন সান্যাল : আনন্দবাজার পত্রিকা; ২৬ মার্চ, ১৯৮৬

২৯. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগণ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৭

৩০. পঞ্চানন সাহা : প্রাগুক্ত; পৃ. ৫২

৩১. গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী : প্রাগুক্ত

৩২. অতুল সুর : বাংলার সামাজিক ইতিহাস; প্রাগুক্ত

৩৩. ক্ষিতিমোহন সেন : ভারতে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত সাধনা; বিশ্বভারতী; ১৩৯৭; পৃ. ৫৫-৫৬

৩৪. আজিজুর রহমান : ব্রিটিশনীতি ও বাংলার মুসলমান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২; পৃ. ৫

৩৫. ক্ষিতিমোহন সেন : প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮

৩৬. আজিজুর রহমান : প্রাগুক্ত; পৃ. ৬

৩৭. পঞ্চানন সাহা : প্রাগুক্ত; পৃ. ৭১

৩৮. গিরীন্দ্রনাথ দাস : বাংলা পীর সাহিত্যের কথা; সুবর্ণরেখা, ১৯৯৮; পৃ. ২৮৩-৮৪

৩৯. শেখ মকবুল ইসলাম : সাম্প্রদায়িকতা লোকসংস্কৃতি তত্ত্ব ও তথ্য; লোকসংস্কৃতি ও গবেষণা; প্রাগুক্ত

৪০. আশীষ বসু : ভারতকোষ; খণ্ড ৪; পৃ. ২৮৬

৪১. শেখ মকবুল ইসলাম : প্রাগুক্ত

৪২. যদুনাথ সরকার : History of Bengal; Vol. II; p. 499 [দ্রষ্টব্য পঞ্চানন সাহা (১৯৯২)]

৪৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য; বিশ্বভারতী, ১৯৭২; পৃ. ১২

৪৪. তদেব; পৃ. ১৩৯

৪৫. তদেব; পৃ. ৮৯-৯১

৪৬. তদেব; পৃ. ৯২

৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতপথিক রামমোহন রায়; বিশ্বভারতী, পৃ. ১২৯-৩০

৪৮. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত; পৃ. ২২৩-২৬

৪৯. শিবনাথ শাস্ত্রী : রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ; নিউ এজ; পৃ. ৮৪

৫০. তদেব; পৃ. ৮৫-৮৭

৫১. গোপাল হালদার : বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা; ২য় খণ্ড; অরুণা প্রকাশনী, ১৪০৪; পৃ. ৫১

৫২. অমলেন্দু দে: বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১; পৃ. ৩০

৫৩. তদেব; পৃ. ৩৩

৫৪. যোগেশচন্দ্র বাগল : ভারতকোষ; খণ্ড ১; পৃ. ৫৪০

৫৫. পৃথ্বীশ সাহা : ঈষৎ বঙ্কিম : বৈরিতার উৎস সন্ধান; লোক, নভেম্বর ২০০২

৫৬. ক্ষেত্র গুপ্ত (সম্পাদিত) : মধুসূদন রচনাবলী; সাহিত্য সংসদ; পৃ. ২৫০-৫১

৫৭. গোপাল হালদার : প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৮, ৪৯

৫৮. দেবীপদ ভট্টাচার্য : ভারতকোষ; খণ্ড ৪; পৃ. ৬৩

৫৯. গোপাল হালদার : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬৮

৬০. যোগেশচন্দ্র বাগল : সাহিত্য-প্রসঙ্গ; ভূমিকা, বঙ্কিম রচনাবলী, খণ্ড ২; সাহিত্য সংসদ, ১৩৮৭; পৃ. পঁচিশ, রমেশচন্দ্র দত্তের উক্তি (দ্রষ্টব্য, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১ম ভাগ, ১ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩০১)

৬১. তদেব; বিপিনচন্দ্র পালের উক্তি, পৃ. সাতাশ (দ্রষ্টব্য, নারায়ণ; জ্যৈষ্ঠ ১৩২২)

৬২. তদেব; পৃ. তেরো

৬৩. তদেব; পৃ. একুশ-বাইশ

৬৪. পার্থ চট্টোপাধ্যায় : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩২

৬৫. পৃথ্বীশ সাহা; প্রাগুক্ত

৬৬. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায় : কমলকুমার, কলকাতা— পিছুটানের ইতিহাস; ইতিহাস গ্রন্থমালা ৯; আনন্দ, ২০০৫, পৃ. ১৭৭-৭৮

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মভাবনার অপর একটি দিক আলোচনায় এসেছে এই গ্রন্থে :

"রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনায় মানবজীবনের একটা গোড়ার কথা তুলেছেন— সামঞ্জস্য স্থাপন। পশ্চিমি সভ্যতার, সংস্কৃতির দাপটের মুখে পড়ে বাঙালির কাছে এই গোড়ার কথাটির গুরুত্ব বেড়ে গিয়েছিল। সামঞ্জস্য বিধান সূত্রেই রামেন্দ্রসুন্দর 'ধর্মবুদ্ধি', 'ধর্মরক্ষা'র কথা তোলেন, যা নৈতিক জীবনের সার। জীববৃত্তি আর বুদ্ধিবৃত্তির দ্বন্দ্ব (মনুষ্যধর্ম আব জীবধর্মের দ্বন্দ্ব বলাই সমীচীন), যুদ্ধ এক মহাসমর— তা-ই আদিকবির কল্পনায় কুরুক্ষেত্র। সেখানে পথপ্রদর্শক, চোখের আলো নৈতিকতা। ভাবনায়,

চিন্তায়, সাধনায় বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন এই আলোর পথের প্রথম সার্থক যাত্রী। রামমোহন-বিদ্যাসাগর আরব্ধ কাজ কীভাবে বঙ্কিমের হাতেই সফলতা অর্জন করল, রামেন্দ্রসুন্দর খুব অল্প কথায় তা আমাদের বুঝিয়েছেন—

"বঙ্কিমচন্দ্র যাহার মূলে নাই, সে জিনিস বাঙ্গলা দেশে চলে না। রামমোহন রায় বাঙ্গালা ভাষার সাহায্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার চেষ্টা চলে নাই; তাঁহার পরবর্তী শিক্ষিত বাঙ্গালী সেই গতির রোধ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সংস্কৃত ভাষায় ও সংস্কৃত সাহিত্যের পুণ্যতোয়ে বাঙ্গালা ভাষাকে স্নান করাইয়া, তাহার দীপ্ত কলেবর শিক্ষিত সমাজের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষিত সমাজ তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ কর্তব্যবোধ করেন নাই। রামমোহন রায়ের এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দেবদেহের জ্যোতির্ম্মণ্ডিত শিরোভূষণ হইতে একখানি মাণিক্য অপসারণ না করিয়াও আমরা স্বীকার করিতে পারি যে, তাঁহারা যে কার্য্যে অসমর্থ হইয়াছিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা অবলীলাক্রমে সেই কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হইয়াছে।" (দ্রষ্টব্য, আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, 'চরিতকথা'; দাসগুপ্ত অ্যান্ড কোম্পানি; ৭ম সংস্করণ, ১৩৭৯; পৃ. ৩৫)

৬৭. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত; পৃ. ১

৬৮. তদেব : পৃ. ২

৬৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তিটি উদ্ধার করে অমলেন্দু দে (প্রাগুক্ত) জানান : "মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন (সংগৃহীত ও সম্পাদিত) 'হারামণি লোকসঙ্গীত সংগ্রহ', কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪২; গ্রন্থের 'আশীর্ব্বাদ' পত্রে রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি লিপিবদ্ধ রয়েছে

৭০. ড. ওয়াকিল আহমদ : উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমানের চিন্তা-চেতনার ধারা; দ্বিতীয় খণ্ড; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৮৩; পৃ. ১৭-১৮

৭১. তদেব; পৃ. ১৯

৭২. তদেব; পৃ. ৫

৭৩. তদেব; পৃ. ৫

৭৪. তদেব; পৃ. ২০

৭৫. তদেব; পৃ. ২০

৭৬. তদেব; পৃ. ২২

৭৭. তদেব; পৃ. ২৩

৭৮. তদেব; পৃ. ২৪ (দ্রষ্টব্য, নবনূর; জ্যৈষ্ঠ ১৩১০)

৭৯. নবনূর; অগ্রহায়ণ, ১৩১২

৮০. ড. ওয়াকিল আহমদ : প্রাগক্ত; পৃ. ২৪

৮১. তদেব; পৃ. ২৬

'ইসলাম, খ্রিস্ট ও ইহুদি ধর্মের একেশ্বরবাদ, হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম, জরথুশ্‌ত ধর্মের অগ্নি উপাসনা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও সুফিবাদের মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ইত্যাদি দীন-ই-এলাহির প্রধান উপাদান। বিবিধ ধর্মের সংশ্লেষ ও সমন্বয় ছিল আকবরের উদ্দেশ্যে।" (দ্রষ্টব্য, ভারতকোষ; খণ্ড ১; পৃ. ২০৩)

৮২. তদেব; পৃ. ৩২

৮৩. সৈয়দ নওয়ার আলী চৌধুরী : Vernacular Education in Bengal; কলিকাতা, ১৯০০; পৃ. ৪০-৪৭

৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : উক্ত গ্রন্থের ওপর 'ভারতী' (কার্তিক ১৩০৭) পত্রিকায় আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন—

"স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধু দৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি, মুসলমান শাস্ত্র ও সাধু দৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্য ধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত।... বাঙালী হিন্দু ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারিবে না।"

৮৫. ড. ওয়াকিল আহমদ : প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৭

"অতীতর তিক্ত স্মৃতির প্রতিক্রিয়া থেকে হিন্দু লেখকগণ গল্প-উপন্যাস-নাটকে মুসলমানকে আক্রমণ করেন বলে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা 'বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, 'গত সময় হিন্দু ললনাগণ মুসলমানের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন বলিয়া বর্তমান সময়ে শিক্ষানবিশ হিন্দু লেখকগণ আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিতেন এবং তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে এইরূপ নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি।" (দ্রষ্টব্য, নবনূর; কার্তিক ১৩১১)

৮৬. তদেব; পৃ. ৪২

৮৭. মশারফ রচনা-সম্ভার; খণ্ড ১; সম্পাদনা : ড. কাজী আবদুল মান্নান; বাংলা একাডেমী, ঢাকা; ১৯৭৬; পৃ. ৩১৯

৮৮. তদেব; পৃ. ৩৪৯-৫০

৮৯. তদেব; পৃ. ৩২৮

৯০. তদেব; পৃ ৩৫৬

৯১. অঞ্জলি বসু সম্পাদিত : বাঙালী চরিতাভিধান; সাহিত্য সংসদ; ১৯৭৬

৯২. অক্ষয়কুমার সরকার : মশারফ হোসেন-এর 'গোরাই ব্রিজ' কাব্যের আলোচনা (দ্রষ্টব্য, বঙ্গ দর্শন; পৌষ ১২৮০)

৯৩. ড. মুহম্মদ এনামুল হক : মুসলিম বাংলা সাহিত্য; পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা; ১৯৬৫; দ্বিতীয় সংস্করণ; পৃ. ৩০৩

৯৪. ড. ওয়াকিল আহমদ : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৩-৩৪

৯৫. তদেব; পৃ. ১৩৫-৩৬

"যত দূর জানা যায়, রংপুর-পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবার, টাঙ্গাইল-করটীয়ার 'পন্নী' ও দেলদুয়ারের 'গজনবী' পরিবার, ময়মনসিং-ধনবাড়ির 'চৌধুরী' পরিবার, মেদিনীপুরের 'সোহরাওয়ার্দী' পরিবার প্রভৃতি উর্দু-ফারসির চর্চা করতেন। নব্যশিক্ষিত আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুর রহিম, আবদুল জব্বর খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা প্রমুখ উর্দু-ফারসি ও ইংরেজী ভাষার সেবা করেছেন। মাদ্রাসায় শিক্ষিত মৌলবি-মৌলানারাও উর্দু-ফারসির সমর্থক ছিলেন। ...তাঁরা বাংলা ভাষাকে বাঙালী হিন্দুর ভাষা বলে মনে করতেন।"

৯৬. তদেব; পৃ. ১৩৯

"Briefly summerised, my opinion as regards Begal is that primary instruction for the lower classes of the people, who for the most part are ethnically allied to the Hindoos, should be in the Bengali language purified, however, from the superstructure of sanskritism of learned Hindoos and supplemented by the memorous words of Arabic and Persian origin which are current in everyday speech : for this the Bengali of the low-courts furnishes a good example.

For the middle and upper clases of Mahomedoans, the Urdoo should be recognised as the vernaculars. . The middle and upper classes of Mahomedans are descended from the original conquerors of Bengal, or the pious, the learned and the brave men, who were attracted from Arabia, Persia and central Asia to the service of the Mahomedan Rulers of Bengal; or from the Principal officers of Government, who were appointed and sent from the imperial court, many of whom permanently settled in these parts, All these, for the most part, naturally retain the Urdoo as their Vernacular." (See, Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings Related Documents; p. 225)

৯৭. বদরুদ্দীন উমর : পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট; নবজাতক, কলিকাতা, ১৯৭১; পৃ. ১১

৯৮. ড. ওয়াকিল আহমদ : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪০-৪১ (দ্রষ্টব্য, মিহির ও সুধাকর; ১৩ আষাঢ় ১৩০৯)

৯৯. তদেব; পৃ. ১৪১

১০০. তদেব

১০১. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ : হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা (১৯২৭); ভূমিকা; সোলেমানি প্রেস, কলিকাতা; ৪র্থ সংস্করণ, ১৩৫৫

১০২. ড. ওয়াকিল আহমদ : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮১

১০৩. তদেব; পৃ. ১৮৩-৮৪

১০৪. তদেব; পৃ. ১৮৫

১০৫. রশীদ আল ফারুকী : বাংলা উপন্যাসে মুসলমান লেখকদের অবদান (১৮৮৫-১৯৩০); রত্না প্রকাশন; কলিকাতা; ১৯৮৪; পৃ. ৩৩-৩৪

১০৬. তদেব; পৃ. ৩৪; উল্লিখিত তিন নম্বরটির সপক্ষে,--

'Besides, these advantages the whole of the tea industry (with exception of the Darjeeling gardens) and the greater portion of the jute growing area would be brought under single administration (p. 236). [see, Sufia Ahmed : 'Muslim Community in Bengal (Dacca, 1974).

১০৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস; খণ্ড ৪; কলিকাতা, ১৯৭৫; পৃ. ৩৩

১০৮. তদেব; পৃ. ৪০

১০৯. রশীদ আল ফারুকী : প্রাগুক্ত; পৃ. ৩৬

১১০. তদেব; পৃ. ৩৭

১১১. তদেব; পৃ. ৩৯

১১২. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮৩

১১৩. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : ভারতে জাতীয় আন্দোলন; কলিকাতা; পৃ. ১১৬

১১৪. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্র জীবনী; খণ্ড ২; কলিকাতা ১৩৬৮; পৃ. ১৪৫

১১৫. রশীদ আল ফারুকী; প্রাগুক্ত; পৃ. ৪১; [তৎসহ দ্রষ্টব্য, রমেশচন্দ্র মজুমদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

১১৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : র. র. খণ্ড ৩; বি-ভা (সুলভ); পৃ. ৬৬৪

১১৭. অঞ্জলি বসু (সম্পাদিত) : বাঙালী চরিতাভিধান; সাহিত্য সংসদ; পৃ. ৩৪৮

১১৮. হোসেনুর রহমান : ধর্ম দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ; মিত্র ও ঘোষ; ১৪০৫; পৃ. ৭৯

১১৯. স্বামী লোকেশ্বরানন্দ : চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ; ১৩৯৭; পৃ. ৭৫৮; এতদসহ দ্রষ্টব্য, পঞ্চানন সাহা : প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৪, পাদটীকা

১২০. স্বামী বিবেকানন্দ : রচনা সমগ্র; খণ্ড ২

১২১. হাসান আজিজুল হক : ইতিহাসের ইঙ্গিত— বেগম রোকেয়ার ভাবনা; মুক্তাক্ষর, জানু, ১৯৯৩

১২২. শরৎ সাহিত্যসমগ্র; আনন্দ; পৃ. ২১৬৭

১২৩. তদেব; পৃ. ২১৭০-৭২

১২৪. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত; পৃ. ২২০; এবং দ্রষ্টব্য, কাজী আবদুল মান্নান : আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা; পৃ. ৩৪৫-৪৯

১২৫. তদেব; পৃ. ২২১

১২৬. তদেব; পৃ. ২২১; এতদসহ তথ্য এই.--

রামপ্রাণ গুপ্ত, 'মোগল বংশ'; দ্বিতীয় সংস্করণ, ঢাকা, ১৩২২; পৃষ্ঠাসংখ্যা ৫১৬।

'সাহিত্য' পত্রিকাব সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশ অধ্যায়ের ভাষা বিশুদ্ধ ও পরিমার্জিত করার কাজে লেখককে সহায়তা করেছেন।

১২৭. মুজাফফর আহমদ : কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা; কলিকাতা, ১৯৬৫; পৃ. ৬১

১২৮. অমলেন্দু দে : প্রাগুক্ত; পৃ ২২৩-২৪; [তৎসহ দ্রষ্টব্য, Forward, 8th & 11th April 1924]

"১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের ৯ এপ্রিল শিশির কুমার ভাদুড়ী কলকাতার ৯১ নং হ্যারিসন রোডের (বর্তমান, এম.জি. রোড) আলফ্রেড থিয়েটার হলে কবি নজরুলের সম্মানার্থে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সভাগৃহ ভ্রাতৃমণ্ডলী কর্তৃক পরিপূর্ণ ছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি স্থানীয় কেউই এই সভায় উপস্থিত ছিলেন না। কবিরূপে তাঁর সাফল্যের ও দেশের জন্য তাঁর আত্মত্যাগের কথা উল্লেখ করে নজরুলকে সংবর্ধনা জানানো হয়। এই সভায় চিত্তরঞ্জন দাশ ভাষণও দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কবি নজরুল দেশের জন্য নিজের জীবন দান করবেন। এই সংবর্ধনার উত্তরে কবি নজরুল এক মনোজ্ঞ ভাষণ দেন এবং কয়েকটি স্বরচিত গান পরিবেশন করেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী' আবৃত্তিও করেন।"

১২৯. তদেব; পৃ. ২২৫; লেখক মোহাম্মদ আকরম খাঁর নির্বাচিত প্রবন্ধের একটি তালিকাও তৈরি করেছেন :

(১) গণিত ও গণতন্ত্র; মোহাম্মদী, ৪র্থ বর্ষ, ৫ম-৭ম সংখ্যা, ১৩৩৭

(২) মিশ্র ও স্বতন্ত্র নির্ব্বাচন; ঐ, ৪র্থ বর্ষ, ১০ম ১১শ সংখ্যা, ১৩৩৮

(৩) হিন্দু বিবৃতি ও সংখ্যা বিজ্ঞান মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

(৪) মকতব-মাদ্রাছার পাঠ্য; মোহাম্মদী, ৫ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৯

(৫) লোথিয়ান কমিটীয় রিপোর্ট; ওই; ৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৯

(৬) আত্ম-বিচার; ওই; ৫ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৯

(৭) পতন-যুগের প্রকৃত ইতিহাস; ওই; কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

(৮) স্কুল-পাঠশালার পাঠ্য পুস্তক; ওই; কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

(৯) বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুছলমান; ওই; ৯ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ফাল্গুন ১৩৪২

(১০) মুছলমানের জাতিত্ব ও সংস্কৃতি; ঐ; ১২শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৫

১৩০. নজরুল রচনাবলী; বাংলা একাডেমী; ঢাকা প্রথম খণ্ড, পৃ. ৮২৩

১৩১. আবু হাসান শাহরিয়ার (সম্পাদিত) জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থিত-অগ্রন্থিত কবিতা-সমগ্র সাহিত্য বিকাশ; পৃ. ২৯৬-৯৭

১৩২. মানবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ভেদ-বিভেদ-সংকলন; প্রথম খণ্ড

১৩৩. সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা সংগ্রহ; পৃ. ২০১

১৩৪. অঞ্জলি গুহ (সম্পাদিত) : প্রাগুক্ত

১৩৫. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি— মুসলমান সমাজ বিজ্ঞান, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ১২২

১৩৬. তদেব; পৃ. ১২৩

১৩৭. তদেব; প্রাগুক্ত

১৩৮. তদেব; প্রাগুক্ত

১৩৯. পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য, বঙ্গবাণী;

১৪০. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত : প্রাগুক্ত

১৪১. মানবেন্দ্রনাথ রায় : ইসলামের ঐতিহাসিক অবদান; পৃ. ৯

১৪২. তদেব; পৃ. ৯

১৪৩. তদেব; প্রাগুক্ত

১৪৪. তদেব; পৃ. ৪০

১৪৫. গোড়ার খৃষ্টধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে : এঙ্গেলস (ধর্ম প্রসঙ্গে, মার্কস এঙ্গেলস) পৃ. ৩০৪

১৪৬. আহমদ শরীফ : বিশ শতকের বাঙালি; নবজাতক প্রকাশন; ১৯৯৯; পৃ. ১২

১৪৭. তহমিনা খাতুন, প্রবীর দে ·সম্পাদিত : মায়ের ভাষা ২১শে ফেব্রুয়ারী সুবর্ণ জয়ন্তী সংকলন, এন.ই. পাবলিশার্স; ২০০৩; কলিকাতা; পৃ. ৩৩

১৪৮. তদেব; পৃ. ১৭৪

১৪৯. তদেব; পৃ. ১৮

১৫০. তদেব; পৃ. ১৯

১৫১. সুরেন মুখোপাধ্যায় : সাম্প্রদায়িকতা : গ্রামীণ লোকনাটক; লোকসংস্কৃতি গবেষণা; প্রাগুক্ত

১৫২. তদেব

১৫৩. তদেব

১৫৪. অশোক দাশগুপ্ত (সম্পাদিত) : গুজরাট দিচ্ছে ডাক

১৫৫. তদেব

১৫৬. প্রসঙ্গত আমরা ভারতের বামপন্থী আন্দোলনের অন্যতম দিশারী ই.এম.এস. নাম্বুদ্রিপাদ-এর বিশ্লেষণের দিকে তাকাতে পারি। তিনি একজন সাহিত্যিকের কর্তব্য হিসেবে মনে করেছেন,— তাঁর প্রধান কর্তব্য সমাজের বঞ্চিত পীড়িত মানুষের কথা তুলে ধরা। তিনি তুলে ধরবেন সমাজের কোথায় জমে আছে অবিচার, শোষণ ও বঞ্চনার ক্লেদ।

সেই ক্লেদ দূর করা--- পরিষ্কৃত সমাজ গঠনের লক্ষ্যে সেটাই সাহিত্যিকের প্রধান কর্তব্য।

১৫৭. ভারতের সংস্কৃতি : ক্ষিতিমোহন সেন; বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ : পৃ. ৩৩৩-৩৪

'এই গ্রন্থে তিনি ভারতবর্ষে প্রবেশকারী সব ধর্মের মধ্য থেকে উত্থিত মিলনের সুরকে তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লেখেন সব মানুষই এক ভগবানের সন্তান, অথচ সব দেশেই মানুষের মধ্যে নানাভাবে নানা রকমের ভেদ-বিভেদ রয়েছে। কিন্তু মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সাংঘাতিক রকমের ভেদ ভারতবর্ষে। আবার সবচেয়ে সকল মানবের মধ্যে সাম্য ও অভেদ হয়েছেও এই ভারতেই।' (পৃ. ৫)

১৫৮. তদেব : পৃ. ৫৯

উপনিষদ ব্যাখ্যা করে এই গ্রন্থে তিনি লেখেন ঘুমিয়ে থাকাটাই হল কলিকাল, জাগলেই হল দ্বাপর উঠে দাঁড়ানোই হল ত্রেতা, এগিয়ে চলাই হল সত্যযুগ। অতএব এগিয়ে চলো। পৃ. ১৪

চরণ বৈ মধু বিন্দতি চরণ, স্বাদুমধুস্বয়ম। সূর্যস্য পশ্য প্রেমানং যোন তন্দয়তে চরণ, চরৈবতি চরৈবতি।

১৫৯. সংকটের মুখে ভারতের ধর্ম নিরপক্ষেতা : অমর্ত্য সেন, পৃ. ১৯

১৬০ তদেব : পৃ. ১২

১৬১. প্রাগুক্ত

১৬২. তদেব; পৃ. ১৩

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'এ ভিশন অব ইন্ডিয়াজ হিস্ট্রি' (কলকাতা, বিশ্বভারতী ১৩৫১ পুনর্মুদ্রণ ১৯৬২) পৃ. ২৩

১৬৩ তদেব : পৃ. ২৩

১৬৪. প্রাগুক্ত

দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনূদিত 'ওয়ান হান্ড্রেড পোয়েমস অব কবীর (লন্ডন, ম্যাকমিলান ১৯১৫) আরও দ্রষ্টব্য ক্ষিতিমোহন সেন রচিত হিন্দুইজম অষ্টাদশ ও উনবিংশ অধ্যায়)

১৬৫. Subaltern Studies · Rannjit Guha p. 60

'১৮৮২ সাল নাগাদ পাঞ্জাবে আর্য সমাজের উদ্যোগে গো-সংরক্ষণ আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং ঐ দশকের শেষ দিকে মধ্য প্রদেশে এই আন্দোলনের সর্ব ভারতীয় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের ভোজপুরী ভাষাভাষী অঞ্চলে (আজমগড়, বালিয়া, গাজীপুর, সারণ, শাহাবাদ) এবং ভোজপুরী ভাষাভাষী অঞ্চলের বাইরে গয়া ও পাটনা জিলায় এ আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। হিন্দু-মুসলমান বিরোধ সৃষ্টিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্ত বেশ কিছুটা সাফল্যমণ্ডিত হয়। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু অঞ্চলে হিন্দু-মুসলমানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সৃষ্টি হয়।

১৬৬. লোকহিত, কালান্তর : রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৫৯৯; প:ব: সরকার সং

এ প্রবন্ধে তিনি আরও বলেন— 'সংস্কৃত ভাষায় একটা কথা আছে, ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। বঙ্গবিচ্ছেদের দিনে হঠাৎ যখন মুসলমানকে আমাদের দলে টানিবার প্রয়োজন হইল তখন আমরা সেই কূপ খননের চেষ্টা করি নাই— আমরা মনে করিয়াছিলাম মাটির উপর ঘটি ঠুকিলেই জল আপনি উঠিবে।

১৬৭. উদ্ধৃতি : স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য : সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ৬৭

১৬৮. ভারতবর্ষের ইতিহাস : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫৩৪ (দ্বিতীয় খণ্ড)

তাঁর লেখায় : সারাদেশে আশাভঙ্গের ছায়া নেমে এল...। ...সরকার যখন পরজয়োন্মুখ তখনই সংগ্রামকে শুদ্ধ করে দিয়ে ব্যর্থতা স্বীকার যে রাজনীতির ব্যাপারে অবাস্তব ও অসঙ্গত একথাও বলা অন্যায় হবে না। (প্রাগুক্ত)

১৬৯. The Indian Struggle 1920-42 : Subhash Ch. Bose, Asia Publishing House; p. 117

সুভাষচন্দ্র বসু লিখেছেন— 'had served to convience all Muslims that he (Das) was their real friend'. পরে লেখেন-- 'with the death of Deshbandhu (Das) the Muslim Community no Longer retained their farmar confidence in the swaraj Party.'

১৭০. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব : অমলেশ ত্রিপাঠি পৃ.

১৭১. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম : ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৬-১৭

এই উক্তির আগে তিনি যা বলেছেন তা হল 'বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যেই অনেকেই আবার হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানকারীর দলে ছিলেন,...।'

১৭২. উদ্ধৃতি নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক দর্শন : সন্তোষকুমার অধিকারী, পৃ. ৭১

১৭৩. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব : অমলেশ ত্রিপাঠি, পৃ. ৭৬

১৭৪. আমাদের নেতাজী— শাহনাওয়াজ খান, সুভাষ স্মৃতিমাল্য : সম্পাদনা সুজিতকুমার নাগ, পৃ. ১৬-২০

১৭৫. একটি কালজয়ী গানের জন্ম : স্ফুলিঙ্গ : নজরুল জন্ম-শতবর্ষ উদযাপন কমিটি : নজরুল ভারতবর্ষে এই শিরোনামে একটি লেখায় আমি লিখেছি, মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হলে দেশ জুড়ে হতাশা নেমে আসে তার পরিণতিতে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ক্ষুব্ধ নজরুল তখন কৃষ্ণনগরে হেমন্ত সরকারকে নিয়ে প্রজাস্বরাজ পার্টি গঠনের জন্য প্রয়াসী। সেই সময় নেতাজী সুভাষ, মুজফ্ফর আহমদরা এমন একটি গান চাইছিলেন যা সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী লড়াইয়ের হাতিয়ার হতে পারে।

১৭৬. Times of India . 6th April 1970

(গান্ধী শতবর্ষের প্রাক্কালে) এ সম্পর্কে আরও বিশদ শৈলেশ দের আমি সুভাষ বলছি · তৃতীয় খণ্ডতে উল্লেখিত আছে।

১৭৭. বিশ শতকে বাঙালি : আহমেদ শরীফ, পৃ. ১২

১৭৮. আমির জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি . মুজফফর আহমেদ. পৃ. ৬১

১৭৯. গণবাণী : ৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯২৬ (১৩ই আশ্বিন ১৩৩৩) : মুজফ্‌ফর আহমেদ, নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ, (এন. বি.এ) পৃ. ১৬

১৮০. তদেব; পৃ. ১৮

১৮১. গণবাণী : ২১শে এপ্রিল ১৯২৭ (৮ই বৈশাখ ১৩১৪); প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৯

১৮২. মুজফ্‌ফর আহমেদ নির্বাচিত রচনা সংকলন · ন্যাশনাল বুক এজেন্সি; পৃ. ৬৯-৭০

এই লেখার শিরোনাম ছিল : কৃষক শ্রমিক এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়। ভূমিকায় তিনি লেখেন : প্রায় একচল্লিশ বছর আগে ১৯২৭ সালের অগাস্ট মাসে ঢাকা শহরে একটি বিশেষ যুব সম্মেলন হয়েছিল। কয়েকটি শাখায় বিভক্ত এই সম্মেলনে শ্রমিক ও কৃষক শাখার সভাপতি রূপে আমি এই লেখাটি পড়েছিলাম। অন্যান্য শাখার সভাপতিরা ছিলেন ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও পুলিনবিহারী দাস। ...এটা মিলনক্ষেত্র হয়েছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী যুব দল সমূহের তাঁদের পথ ও উদ্দেশ্য এক হলেও তাঁদের ভিতরে আপস ঝগড়ার অন্ত ছিল না।

আমার আমি ঐসব যুব দলের বহুবিষয়ে সমালোচনা করেছি। সবচেয়ে বড় কথা তাঁদের সন্ত্রাসমূলক বিপ্লবী পন্থার সমালোচনাও আমি করেছিলেম... আমার লেখাটি হাতের লেখা ছিল, পড়া হওয়ার পরে শ্রী শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তা আমার নিকট হতে নিয়ে গিয়েছিলেন।

১৮৩. ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা : সরোজ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড; পৃ. ৪০২

১৮৪. উদ্ধৃতি তদেব; পৃ. ৪০৩

১৮৫ তদেব, এই গ্রন্থে ওই লেখাটির ফটো কপি মুদ্রিত আছে; পৃ. ৪১৩

১৮৬. রচনা সংগ্রহ : জ্যোতি বসু; পৃ. ৩৭-৩৯

এই বক্তৃতাটি তিনি রাখেন ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৪৬। পরে এটি লিখিত আকারে তাঁর রচনা সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৮৭. সোমেন চন্দ : এই লেখকের নাম বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই হয়তো জানেন না। ঢাকায় একটি ফ্যাসিবাদ বিরোধী মিছিল পরিচালনার সময় তিনি খুন হন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। এ প্রসঙ্গে মুজফ্‌ফর আহমদের একটা প্রতিবেদন পাঠকদের উদ্দেশ্যে তুলে দিলাম 'সোমোন চন্দ বিশের কোঠায় পা দিতে না দিতে ঘাতকের ছোড়ার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছেন। আমি তখন বে-আইনি পার্টির সভ্য হিসাবে গা-ঢাকা দিয়েছিলাম। সোমেন চন্দর নাম আমার জানা ছিল। কিন্তু তাঁকে কখনও দেখিনি, তার লেখা পড়িওনি। পার্টি

যখন আইনসঙ্গত হল বাইরে এসে সোমেন চন্দর ইঁদুর গল্পটি প্রথম পড়লাম। আমার মন তখন হাহাকার করে উঠল এমন ছেলেকে রাজনীতিক মন কষাকষির জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীরা মেরে ফেলল। সোমেন বেঁচে থাকলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের একটি বিরাট স্তম্ভ গড়ে তুলতে পারতেন। ...ইঁদুর জগতের একটি শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প'। নির্বাচিত রচনা সংকলন (এন.বি.এ) পৃ. ১৪৮

১৮৮. উদ্ধৃতি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা : সরোজ মুখোপাধ্যায়; পৃ. ৪২৭-৪২৮

১৮৯. জনযুদ্ধ পত্রিকা সন্ধিক্ষণের মুখপত্র : সম্পাদনা অঞ্জন বেরা; পৃ. ২৪৯-৫০

[৪/৫২, ২৩ এপ্রিল ১৯৪৬ পৃ. ২
জনযুদ্ধের সর্বশেষ সম্পাদকীয়]

বাঙালির সাম্প্রদায়িক ভাবনা

বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভাষাগোষ্ঠীর মতো বাঙালির আর্থ সামাজিক ইতিহাসের সমীক্ষণকে সামনে আনলে দেখা যাবে তার পরিবর্তনশীলতা ও বিপরীতমুখিনতা। বস্তুবাদী বীক্ষণ ও সমাজের দ্বন্দ্বসমূহকে অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছবোধের মধ্যে এনে দৃষ্টি প্রসারিত করলে আলো-আঁধারের গলি-ঘুঁজিগুলি দৃষ্টির গোচরে এসে পড়বে। সাধারণের সামনে প্রতিমার মোহিনী মূর্তি চোখে পড়ে। দ্বন্দ্বসমূহকে ব্যবহার করা একজন সমাজতত্ত্ববিদকে দেখতে হয় তার পিছনের কাঠামোগত দুর্বলতাগুলি। অনুভব করতে হয় মৃন্ময়ী মূর্তির ভিতরের খড়ের বুঁজোকে। একাজে শুধুমাত্র সমাজের নিম্নবর্গীয়দের শ্রেণি বিন্যাস, জীবন সংগ্রাম ও জীবন চর্চা বিশ্লেষণ করলে তা হবে একদেশদর্শী। দেখতে হবে উচ্চবর্গীয়দের জটিল শ্রেণি বিন্যাস, উৎপাদন ব্যবস্থায় তাদের ভূমিকা। শ্রেণিস্বার্থে কীভাবে তারা গরিব মানুষদের ধর্মবোধ ও সংস্কৃতির উপর প্রভুত্ব চালায়, গরিব মানুষের ঐক্য ভাঙতে বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেয়। লক্ষ রাখতে হবে সমাজের নিম্নবর্গীয়দের ঐক্যের কোথাও ফাঁক থাকলে তার দুর্বলতা কোথায় নিহিত ছিল। মার্কসীয় বীক্ষণে বিশ্বাসী ছাত্র হিসাবে যখনই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সম্প্রীতির পক্ষে লিখতে গিয়েছি তখনই মনে হয়েছে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণে কোথাও ফাঁক থেকে গিয়েছে। নানা রং, নানা বর্ণের কথা বলা হলেও এর অনেক প্রলেপ রয়ে গিয়েছে কাঁচা আর সমাজতত্ত্ববিদরা তাকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। মার্কস প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রবন্ধাবলিতে লেখেন 'মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের পারস্পরিক বিদ্বেষকে পরিহার করে মিলিত হয়েছে সাধারণ মনিবদের বিরুদ্ধে। হিন্দুদের মধ্য থেকে হাঙ্গামা শুরু হয়ে তা শেষ হয়েছে দিল্লির সিংহাসনে এক মুসলমান সম্রাটকে বসিয়ে'।[১] এ কথার মধ্য দিয়ে মার্কস আন্দোলনের উপর সম্প্রীতির একটা আবরণ দিতে চেয়েছেন। সে সময় মার্কসের পক্ষে সমস্ত খবর পাওয়া অত্যন্ত দুষ্কর ছিল। ওই সময় সবচেয়ে অগ্রসরমান হিন্দু বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা এই বিদ্রোহের তীব্র বিরোধী ছিলেন। শুধু তাই নয়, তারা ব্রিটিশ শক্তিকে সক্রিয় সহযোগিতার দ্বারা তাদের হৃত মনোবল উদ্ধারে সহযোগিতা করেছেন। এরা সকলেই ছিল প্রধানত ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ সম্প্রদায়ের। যারা মুৎসুদ্দি বৃত্তির দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। এমনকী মার্কস ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণির উদ্ভবের কথা তিনি যেভাবে ভেবেছিলেন তা তো হয়ইনি, হয়েছিল উপনিবেশিক শাসনের ফলস্বরূপ এক পরজীবী মুৎসুদ্দি শ্রেণির। ঐতিহাসিক কারণেই

তাদের হাতে শিল্পের বিকাশ সম্ভব হয়নি, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে বর্তমান সময়ে ইতিহাসের মার্কসীয় মূল্যায়ন অনেক বলিষ্ঠ হয়েছে।

সম্প্রীতি নিয়ে লিখতে গিয়ে সব সময় মনে হয়েছে এর বিপরীত ক্রিয়াও তো বাঙালি সমাজে বিদ্যমান। একে অস্বীকার করে অস্মিতা প্রকাশ করা শুধু ভুলই নয় একধরনের আহাম্মকি। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে ছাত্র জীবনে ইতিহাসের না পাওয়া একটি প্রশ্ন যার বিশ্লেষণ এখনও অসম্পূর্ণ মনে হয়। কোনো প্রশ্ন আমাদের ততক্ষণ ভাবায় যতক্ষণ সঠিক বিশ্লেষণ না পাওয়া যায়। সমগ্র ভারতের মধ্যে স্বাধীনতার জন্য লড়াই সবচেয়ে তীব্র হয়েছে যুক্ত বাংলায়। নবজাগরণের আলোয় প্রজ্জ্বল হয়ে নতুন চিন্তায় উদ্ভাসিত হয়েছিল প্রথমে এই বাংলার চিন্তা নায়করা। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের সবচেয়ে স্রোতস্বিনী চরমপন্থী ধারার বিদ্রোহীরা মার্কসবাদে দীক্ষা গ্রহণ করে বিপ্লবী রাজনীতির অঙ্গনে প্রবেশ করেন। এত সংগ্রামী শক্তির উপস্থিতি শহর-গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও এখানে ১৯৪৬-এর মতো আত্মঘাতী দাঙ্গা কলকাতায় বা নোয়াখালিতে সংগঠিত হল কীভাবে? সংগ্রামী শক্তিগুলির ভূমিকাই বা সেসময় কী ছিল। কীভাবেই বা বাংলার রাজনীতির এতগুলি সক্রিয় ধারা অতিক্রম করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ন্তার আসনে বসে? অবশ্যই মানতে হবে স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যেই সুপ্ত ছিল বিভেদের বীজগুলি। শুধু তাই নয় মেহনতি মানুষ ও স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে বিস্তর ফাঁক ছিল। তাকে বোজানোর কোনও চেষ্টা তো হয়ইনি বরং সাম্রাজ্যবাদীদের প্ররোচনায় তাঁকে দুর্লঙ্ঘ্য করে তোলা হয়েছে। এগুলোকে স্বীকার না করলে প্রশ্নের উত্তর ঝাপসা থেকে যাবে। আবার সাম্প্রতিক একটা ঘটনা টানলে দেখব গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির দুর্বলতা। ঘটনাটা ছিল ১৯৯২-র ছয়ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভাঙাকে কেন্দ্র করে আট ডিসেম্বর কলকাতার দাঙ্গা। এই ঘটনার মাত্র কয়েকদিন আগে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ দুটি রাজনৈতিক দলেরই সভা হয়েছিল। প্রথম সভাটি হয় ২১ নভেম্বর কংগ্রেস দলের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে জনসভা কংগ্রেস সে সময় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। মাত্র কয়েকদিন বাদে ২৭ নভেম্বর বামফ্রন্টের ডাকে ব্রিগেডে জনসভা হয়েছিল। দুটি সভা দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, সেদিন সব পথই ব্রিগেডে মিশেছিল। মনে প্রশ্ন জেগেছিল কোন রাজনৈতিক সমাপতনে আট ডিসেম্বর রাতে গণআন্দোলনের অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞতালব্ধ কলকাতার গণতান্ত্রিক শক্তি কীভাবে উবে (vanish) গিয়ে দুঃস্বপ্নের নগরীতে পরিণত করেছিল। গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির চেতনার অধোগামী প্রবণতা নেতৃত্ব বুঝতে সক্ষম হননি কেন? যার পরিণতিতে তৃণমূল স্তরের এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে বোমা বাঁধতে শুরু করে। পূর্ব কলকাতার ট্যাংরা অঞ্চলের রাজনৈতিক দলের এক কর্মী (সম্ভবত তার নাম ভাল্লুক) গ্রেপ্তারও হন। আমাদের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে গলদটা কোথায় ছিল, যার মধ্য দিয়ে গলে গেল সম্প্রীতির আদর্শ। এর পিছনের ঐতিহাসিক,

আর্থ-সামাজিক কারণগুলি খুঁজে বের না করতে পারলে গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে বাঘের পিঠের সওয়ার হতে হবে। দুর্বল হবে গণতন্ত্রের ভিত্তি। ভারতবর্ষের বর্তমান সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধর্মীয় ফ্যাসিবাদী আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে গণতান্ত্রিক শক্তগুলিকেও সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী মানুষদের অত্যন্ত বস্তুনিষ্ঠভাবে আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখতে হবে সমাজের মধ্যে সৃষ্ট স্ব-বিরোধিতাগুলিকে। আর একাজ করতে হবে সমাজের গভীর-গভীরতর অসুখকে দূরীভূত করার জন্য।

প্রথমেই এ আলোচনায় আসতে হবে বাঙালি বলতে আমরা কী বুঝি। অনেক শিক্ষিত হিন্দু লোককেও বলতে শুনেছি 'আমরা বাঙালি ওরা মুসলমান।' তাহলে দৌলত কাজী, আলাওল, হাসান রাজা, নজরুল, জসিমউদ্দিন, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, বাংলা ভাষা আন্দোলনের শহিদ জব্বার-বরকত-সালাম ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা মুজফফর আহমদ ও তাঁর সহযোগী আব্দুল হালিম এবং বাংলার মুক্তিসূর্য মুজিবর রহমানরা কি বাঙালি নয়। এদের থেকে বড়ো বাঙালির উদাহরণ আর আছে কি? বাঙালি তাদের বলব যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তারা হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান যে সম্প্রদায়েরই হোক না কেন; তারা বাংলায় থাকুন আর নাই থাকুন তারাই বাঙালি। বাঙালি বলতে আমরা বুঝি একটা ভাষাগোষ্ঠী যাদের সাধারণ সাংস্কৃতিক অভিন্নতা আছে, একই জীবনচর্চায় অভ্যস্ত।

এবার দেখে নেওয়া যাক সাম্প্রদাযিকতা বলতে আমরা কী বুঝি। সম্প্রদায় থেকে [সম্প্রদায় + ইক] সাম্প্রদায়িক শব্দের উৎপত্তি। যার ভিত্তিগত ধারণা হল ইংরেজিতে 'commune' [communa, French/Latin]। কমিউন বলতে বোঝায়— group of people not all of one family, living together and sharing property and responsibilities.[২] সম্প্রদায় বলতে গোষ্ঠী, সমাজ বা শ্রেণি বুঝি। যেমন ভাষা সম্প্রদায়, বৌদ্ধ সম্প্রদায়, যুব সম্প্রদায় বা বাউল সম্প্রদায় বুঝি। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বলার সাথে সাথে শব্দটি একটি নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখন ধর্মীয় উন্মার্গগামিতা, ধর্মান্ধতা বা পরধর্ম-বিদ্বেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শুধুমাত্র এক ধর্মের সাথে অপর ধর্মের দ্বন্দ্বের [যেমন হিন্দু-মুসলমান] মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে একমাত্রিক বিশ্লেষণ হয়ে যায়। আমাদের অবশ্যই একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের এক গোষ্ঠীর সাথে অপর গোষ্ঠীর (যেমন সিয়া-সুন্নি, শৈবদের সাথে শাক্তদের বা শাক্তদের সাথে বৈষ্ণবদের বিরোধ, ঘৃণা, সংঘর্ষ) দ্বন্দ্বকে এর মধ্যে আনতে হবে। সর্বোপরি নিম্নবর্ণের অন্ত্যজদের প্রতি উচ্চবর্ণের ঘৃণা বিদ্বেষকে আনলে তবেই বৃত্তটি সম্পূর্ণ হবে। সম্প্রতি মৌলবাদী শব্দটিও নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়। নিজধর্মের প্রতি কট্টর ও পরধর্ম বিদ্বেষীকে মৌলবাদী বলা হচ্ছে। কিন্তু প্রকৃতার্থে নিজের ধর্মের মৌলিক চিন্তানুসারে পরমত সহিষ্ণুতা দেখিয়ে ধর্ম মানে তাকে মৌলবাদী এই অভিযোগে অভিযুক্ত করা কতটা যুক্তিযুক্ত ভাবা দরকার। আর যারা এই শব্দটি বেশি ব্যবহার করেন তারা কি বলতে পারবেন মার্কস-লেনিন আইনস্টাইন-নিউটনের মৌলিক

চিন্তা গ্রহণকারী তাদের মৌলিক চিন্তা নিয়ে এগিয়ে চলেছে তাকেও নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা সম্ভব।

সাম্প্রদায়িকতার শিকড় আমাদের সমাজজীবনের গভীরে প্রোথিত আছে। তাই সঠিক বিশ্লেষণের জন্য চাই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি, সম্যক ধারণা এবং কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করব সে সম্পর্কে একটি যুক্তিনিষ্ঠ বিচার পদ্ধতি স্থির করলে তবেই আলোচনাটি পূর্ণতা পাবে। আমরা বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণকে ছয়টি ভাগে ভাগ করছি। আলোচনার সময় এই বিভাগগুলি থেকে উপবিভাগ তৈরি হবে।

(১) ঐতিহাসিক
(২) ভাষাতাত্ত্বিক
(৩) দার্শনিক
(৪) অর্থনৈতিক
(৫) রাজনৈতিক
(৬) সামাজিক

১. ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ

বিভিন্ন ধর্মের জাতির আগমন ঘটেছে এই ভারতে তথা বাংলায়। এই মিলনকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে আমাদের দেখিয়েছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভারততীর্থ কবিতায়—

হেথায় আর্য, হেথা অনার্য,
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক-হুন-দল পাঠান মোগল
এক দেহে হল লীন।'

যোদ্ধাদের রাজ্য জয়ের মধ্য দিয়ে রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে। জয়ী শক্তি বলপূর্বক তার ধর্ম সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেয় বিজিত জাতি-গোষ্ঠীগুলির উপর। সাধারণভাবে বিজয়ী ও বিজিত শক্তির পরস্পরের প্রতি থাকে ঘৃণা অবিশ্বাস ও বিদ্বেষ। অপরপক্ষে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনেক পরে প্রবেশ করেছে। হিন্দু ধর্মের বর্ণভেদ প্রথা, অস্পৃশ্য, অন্ত্যজদের প্রতি ঘৃণা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর অত্যাচারে পর্যবসিত হয়েছে। নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাবার জন্য গরিব অন্ত্যজরা বিজয়ী শক্তির ধর্ম গ্রহণ করেছে। 'তখন শ্রান্ত পুরাতন ভারতবর্ষে বৈদিক ধর্ম বৌদ্ধদের দ্বারা পরাস্ত। বৌদ্ধধর্ম বিচিত্র বিকৃত রূপান্তরে ক্রমশ পুরাণ-উপপুরাণের শতধা বিভক্ত ক্ষুদ্র সংকীর্ণ বক্র প্রণালীর মধ্যে স্রোতহীন মন্দগতিতে প্রবাহিত হইয়া একটি সহস্রলাঙুল শীতরক্ত সরীসৃপের ন্যায় ভারতবর্ষকে শতপাকে জড়িত করিতেছিল। তখন ধর্মে সমাজে শাস্ত্রে কোনো বিষয়ে নবীনতা ছিল না, গতি ছিল না, বৃদ্ধি ছিল না, সকল বিষয়েই যেন পরীক্ষা শেষ হইয়া গেছে. নতুন আশা করিবার বিষয়

নাই। সে সময়ে নূতন সৃষ্ট মুসলমান জাতির বিশ্ব বিজয়োদ্দীপ্ত নবীন বল সংবরণ করিবার উপযোগী কোনো উদ্দীপনা ভারতবর্ষের মধ্যে ছিল না।'[৩]

২. ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় 'নব সৃষ্টি বাঙ্গালী জাতি নবীন এক গৌরবময় জীবনে প্রবেশ লাভ করিল। প্রথমটায় বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সমগ্র ভারতবর্ষের সাহিত্যের ভাষা সংস্কৃতেরই চর্চায় তৎপর হইলেন। তাহাব পরে তাঁহারা দেশ-ভাষার দিকে দৃষ্টি দিলেন। পাল-রাজগণের রাজ্যের প্রতিষ্ঠার দুই শতকের মধ্যেই মাগধী প্রাকৃত এবং বঙ্গদেশে প্রচলিত মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ হইতে একটু বিশিষ্ট মূর্তি ধারণ করিয়া, বাঙ্গালা ভাষা, একটি স্বতন্ত্র ভাষা হইয়া দাঁড়াইল; এবং খৃষ্টীয় দশম শতকের মধ্য-ভাগ হইতে বৌদ্ধ গুরুদের হাতে এই স্বতন্ত্র ভাষায়, অর্থাৎ প্রাচীন বাঙ্গালায়, সাহিত্য সৃষ্টি, গান রচনা হইতে লাগিল।'[৪] এই মতকে শহীদুল্লাহ এবং সৈয়দ মুজতবা আলি সমর্থন করেছেন। শহীদুল্লাহর মতে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বুদ্ধদেব লোকভাষা পালিকে ধর্মের ভাষায় নামিয়ে আনলেন। পালিভাষা ভেঙে মৈথিলি এবং মৈথিলি ভেঙে ব্রাহ্মলিপির বর্ণমালায় বাংলা ভাষার যাত্রা শুরু।[৫] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভাষ্য অনুসারে 'তুর্কি বিজয়ের পরে অনেক তুর্কি বাংলা দেশে এসে বৈবাহিক সম্বন্ধে বাধা পড়েন। বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট বিদেশী মুসলমানদের বাঙ্গালী স্ত্রী গ্রহণ করিতে হইত; তাহাদের সন্তানেরা ভাষায় বাঙ্গালী-ই হইত।' (বাঙ্গালীর সংস্কৃতি পৃ. ৯)। ক্রমে বিদেশি শক্তির আগমনের সাথে সাথে কিছু বিদেশি শব্দও বাংলা ভাষার সাথে আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে যায়। সুফিদের এদেশে আগমনের সাথে সাথে এই বন্ধন আরও ব্যাপক হয়।

৩. দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

বিভিন্ন ধর্মীয় বিশ্বাসকে একত্রিত করে হিন্দুধর্মের উৎপত্তি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার 'স' ধ্বনি পরবর্তীতে প্রাচীন পারসিক ভাষায় 'হ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে হিন্দু শব্দের উৎপত্তি। 'হিন্দু' অভিধাটি উন্মেষকালে ব্যবহৃত হয়েছিল দেশ ও ভৌগোলিক অবস্থা বোঝানোর জন্য (অমর্ত্য সেন— সংকটের মুখে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষতা, পৃ. ১১) সিন্ধু নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই জনপদকে এই নামে অভিহিত করেছিল বিদেশিরা। এমনকী জেন্দাবস্থায় 'হপ্তহিন্দু' কথাটির উল্লেখ আছে। ইসলাম ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম বলতে একটা সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসকে বোঝায়, সেই অর্থে হিন্দু ধর্ম কোনও সুনির্দিষ্ট বিশ্বাসকে বোঝায় না। হিন্দু ধর্মের দার্শনিক ভিত্তি কোনও একটি পুস্তকে নেই। এই দার্শনিকতা বেদে, উপনিষদে, পুরাণে ও শ্রীমদ্ভগবত গীতায় বিবৃত আছে। বেদ চার প্রকার— ঋক, সাম, যযু, অথর্ব আবার পুরাণ গ্রন্থগুলি বিশ্বাস অনুযায়ী ভিন্ন, যেমন বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ ইত্যাদি। সাকার-নিরাকার দুই সাধনা এই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই বিভিন্নতার কারণে একে সনাতন ধর্ম বলে

একই গণ্ডিতে বাঁধবার চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলে। বাংলায় আর্যদের চতুরাশ্রম বর্ণভেদ নেই। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণগুলি অনুপস্থিত। এখানকার সমাজে মাহিষ্য, বাগদি, পোদ, নমঃশূদ্রদের আধিক্য দেখা যায়। অস্পৃশ্যতার কারণে ব্রাহ্মণরা এদের পূজা-পাঠ করত না। অন্ত্যজদের লোকায়ত বিশ্বাসগুলি (যা নিয়ে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যগুলি) একসময় ব্রাহ্মণদের প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসকে ছাপিয়ে যায়। আবার বৈষ্ণব যুগে চৈতন্যর ন্যায়দর্শনের কাছে শাক্তরা কোণঠাসা হয়ে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যে শান্তিপুর ডুবুডুবু নদে ভেসে যায়। পরস্পরের দার্শনিক মতদ্বৈধতাকে সামনে না আনলে মূল্যায়ন ভুল হয়ে যাবে। ইসলাম ধর্মপরিচালনায় শরিয়তই একমাত্র ধারা নয়। এছাড়া আরও তিনটি বিধান ধারা আছে, এগুলি হল মারফতি, হানাফি, আহলে হাদিস, মহম্মদী। বর্তমান বিশ্বে শরিয়ত বিধানের প্রবক্তাদের নিরঙ্কুশ আধিপত্য থাকলেও অতীতে তা ছিল না। রাজকার্য পরিচালনার জন্য পারস্য থেকে প্রায়শই বিদ্বজ্জনের আগমন ঘটত, ফলে ফারসি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব সারা ভারতেই বহমান ছিল। পারস্যে মূলত সিয়া ও মারফতি সম্প্রদায়ের আধিক্যের কারণে মারফতি ধারা প্রসার লাভ করেছিল। উদার মনোভাবের মারফতি ধারা থেকেই সৃষ্ট সুফি সম্প্রদায়। যারা তলোয়ারের জোরে নয় ভালোবাসা দিয়ে জয় করেছিল বাংলার নিম্নবর্ণের কৃষক ও হস্তশিল্পীদের হৃদয়। যার স্থায়ী স্বাক্ষর এখনও এই বাংলায় আছে, মুসলমান শাসকগোষ্ঠী অবশ্য কঠোর শরিয়তি আইন রাজ্য পরিচালনার কাজে ব্যবহার করতেন। এর পূর্বেই অবশ্য ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিস্তারলাভ করেছিল। বাংলার প্রাচীন অধিবাসী যাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হত তারা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর বুদ্ধধর্ম তার সাবলীলতা হারিয়ে ফেলে। সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়ে তন্ত্র সাধনা গুহ্য সাধানায় নিমজ্জিত বৌদ্ধধর্ম হীনযান, মহাযান দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। গ্রামের ভূস্বামী যারা স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবর্ণের তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষার কোনও প্রয়াসই বৌদ্ধধর্ম নেয়নি। মুসলমান বিজয়ের সময় থেকে এই অবহেলিত মানুষরা নিরাপত্তার জন্য ইসলামের আশ্রয় গ্রহণ করে।

৪. অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ

সাম্প্রদায়িকতার উৎস খুঁজতে গিয়ে অধিকাংশ লেখক এই বিষয়টাকে উপেক্ষা করেন, ফলে তাদের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। মধ্যযুগে বর্ণভেদ সূচিত অর্থনৈতিক অবস্থার ভিত্তিতে। এটা শুধু আমাদের দেশেই নয় সমগ্র বিশ্বের ক্ষেত্রে সত্য। অর্থনীতির প্রত্যন্ত অঞ্চলের কৃষক, হস্তশিল্পী, ক্ষুদ্র কারিগররা অন্ত্যজ বলে বিবেচিত হত। আর্যদের চতুরাশ্রম বর্ণের সর্বনিম্ন শূদ্ররা শ্রমজীবী। তার উপরে ব্যবসায়ী বৈশ্যরা। শূদ্ররা ধর্মীয় থেকে অধিকার বঞ্চিত ছিল। প্রকৃতার্থে সম্পদের অধিকারী ছিল ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়রা। ক্ষত্রিয়রা ও বৈশ্যরা ব্রাহ্মণদের ধন দান কবতে বাধ্য থাকত। প্রতিলোম বিবাহ প্রথার মধ্য দিয়ে কিছু

জটিল বর্ণ বিন্যাস (যেমন ব্রাহ্মণীর গর্ভে শূদ্রের সন্তান = চণ্ডাল) সৃষ্টি করলেও সেগুলি গৌণ ছিল। উঁচু-নিচু বর্ণভেদের মূখ্য সূচক ছিল অর্থনীতি! ব্রাহ্মণ ও রাজাদের অবাধ যৌনাচারণ কোনও বিবাহ প্রথার অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। আর শুধু অস্পৃশ্যতার ঘৃণা থেকে মুক্তিলাভেই ধর্মান্তকরণের একমাত্র কারণ মনে করলে ভুল হবে। অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ হল, উচ্চবর্ণের ভয়ংকর শোষণ থেকে মুক্তি ও বিজয়ী শক্তির কাছ থেকে অর্থনৈতিক সুবিধা লাভ। মুসলমান শাসনকালে এই প্রবণতা দরিদ্র মানুষের মধ্যে থাকলেও কিছু উচ্চবিত্ত মানুষও আর্থিক সুবিধালাভের আশায় ধর্মান্তরিত হয়েছিল। বাঙালি ভদ্রলোকদের এই প্রবণতা বৃদ্ধি পায় ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ইঙ্গবঙ্গ সোসাইটির প্রায় সমস্ত সদস্যই হয় ব্রাহ্মণ নয় কায়স্থ। ধর্মান্তরিত না হয়ে সাহেব সেজে ও ইংরেজ শাসকদের দাসানুদাস হয়ে আর্থিক আনুকূল্য লাভের উদাহরণও বড় কম নয়। আর্থিক দিক থেকে স্ফীতকায় বর্ণ হিন্দুরা শুধু ব্রিটিশ শাসনকে স্বাগতই জানাননি, অত্যাচারিত কৃষক প্রজাদের বিদ্রোহ দমনের জন্য ইংরেজ শক্তিকে সক্রিয় সহযোগিতার ফল পেয়েছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের জমিদারি। এই কৃষক প্রজাদের প্রায় সবাই হয় মুসলমান নয় নমঃশূদ্র, দুলে-বাগদি, শবর বা অন্ত্যজ মাহিষ্য সম্প্রদায়ের।

৫. রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ

মধ্যযুগে রাজার ধর্ম প্রজার ধর্ম রূপে বিবেচিত হত। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তারাই যুগে যুগে অধিষ্ঠিত থাকেন যাদের হাতে রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা বিদ্যমান। শাসক পরিবর্তনের সাথে সাথে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের রাজানুগ্রহ পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। 'পালযুগের বৌদ্ধরা সেন আমলে ব্রাহ্মণ্যধর্মের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছিল। ফলে বৌদ্ধধর্ম হয় স্তিমিত। সমাজে তন্ত্র মন্ত্রের প্রসার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও হইল। বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মাত্রই রাজানুগ্রহ লাভ হইতে বঞ্চিত হইল। পালযুগে সমাজের কোনও শ্রেণিই— বণিক, শিল্পী, কৃষক, চণ্ডাল, কেহই অবজ্ঞাত হয় নাই, কিন্তু এখন কৃষককুল ও তথাকথিত নিম্নস্তরীয় জনসাধারণ অবহেলিত হইল। স্বাভাবিক কারণেই এই বৌদ্ধধর্মাবলম্বীরা মুসলমান বিজেতাদের মুক্তির দূত হিসেবে গ্রহণ করিয়াছিল।'[৬] অপর পক্ষে রাজনৈতিক ক্ষমতা যাদের হাতে তারা রক্ষণশীল ভূমিকা পালন করত। সামাজিক বিধি বিধান যা ব্রাহ্মণদের সৃষ্ট তাকে রক্ষা করার দায়িত্বও তাদের অধিকারে ছিল। অবাধ্যদের প্রয়োজনে সমাজচ্যুত করার, দণ্ডমুণ্ডের কর্তা এরাই ছিল। বাংলাদেশে মুসলমান আধিক্যের কারণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমানের মতে 'উচ্চশ্রেণির অত্যাচারে নিম্নশ্রেণির লোকের ইসলাম গ্রহণ, বৈষয়িক সুযোগ সুবিধা লাভের আশায় ইসলাম গ্রহণ, সুফি দরবেশবাদের প্রভাবে পড়ে ইসলাম গ্রহণ, আদিম গোত্রের দলপতির ইসলাম গ্রহণে গোত্রের সমগ্র লোকগোষ্ঠী ইসলাম গ্রহণ এবং আরো

বহুবিধ কারণে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়।'[৭] এ আলোচনায় আমাদের অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে বাংলায় সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান। অরবিন্দর নেতৃত্বে চরমপন্থী ধারার আন্দোলন যা হিন্দু পুনরুত্থানবাদের প্রতীকে পরিণত হয়েছিল, যাকে হিন্দু মহাসভা গঠনের ভ্রূণাবস্থা বললে অত্যুক্তি হয় না। আবার ১৯০৬ সালে বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ মদতে এই বাংলায় (ঢাকায়) মুসলিম লিগ গঠিত হয়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের আধুনিক ইতিহাসে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জনকের দাবিদার বাংলা। ১৭৫৭ পলাশির যুদ্ধের অনেক পরে বাঙালি জাতীয়তাবাদী নাট্যকারদের কল্যাণে সিরাজদৌল্লা দেশপ্রেমিকের আসনে বসেন, আর মীরজাফরের স্থান হয় বিশ্বাসঘাত-পাতক হিসাবে। অনেকে মুসলমান সমাজকেই মীরজাফরের জাত বলে অভিযুক্ত করেন। অনেক মুসলমান এর জন্য আত্ম-বিলাপ করেন। কিন্তু কখনও কোনো হিন্দুকে জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ, রায়বল্লভের নামে বিশ্বাসঘাতকের তকমা লাগাতে দেখিনি বা খেদোক্তিও শুনিনি। কখনও কি ভেবে দেখেছি মীরজাফরের পরিবার মাত্র একপুরুষ আগে ভারতে এসেছিলেন, তার কাছ থেকে কতটা জাতীয়তাবোধ আশা করা যায়। আর জগৎশেঠ উমিচাঁদরা বংশ পরম্পরায় এই দেশের জল হাওয়ায় পরিপুষ্ট হয়েছেন বহুদিন ধরে সুবা বাংলার আর্থিক লেনদেনের দায়িত্ব, ব্যাঙ্কিং কাজকর্মের দায়িত্ব পালন করেছেন, তাদের কাছ থেকে আরও বেশি জাতীয়তাবোধ আশা করা অন্যায় নয়। ঘন ঘন শাসক বদল, শাসক ও রাজকর্মচারীদের বিশ্বাসঘাতকতা, অমিতাচার, সাধারণ মানুষের উপর দুর্বিষহ নিপীড়ন সে সময়ের রাজনীতিতে জাতীয় ভাবনা সৃষ্টি করতে দেয়নি। দ্বিতীয়ত, সিরাজদৌল্লাকে দেশপ্রেমিক সাজানোর মধ্য দিয়ে এক প্রকার চিন্তার দৈন্য প্রকাশ পায়। স্বাধীনতা সংগ্রামী ও কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষ তার কষ্ট কল্পিত গ্রন্থে প্রশ্ন তুলেছেন যে সিরাজদৌল্লা গর্ভবতী মেয়েদের পেট চিরে ভ্রূণের অবস্থান লক্ষ করতেন, এইরকম একজন অত্যাচারী শাসক কী করে দেশপ্রেমিকের শিরোপা পায়? (কষ্টকল্পিত প্রথম খণ্ড : অতুল্য ঘোষ)

১৮৫৭-র মহাবিদ্রোহ বাঙলার মাটিতে বারাকপুরে শুরু হলেও সে সময়ের নবজাগরিত হিন্দু সম্প্রদায় প্রাকৃতার্থে এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে ছিল। এমনকী নবজাগরণের ফল লাভ করেছিল বাঙালি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যরা। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনায় আমরা দেখব যে বাংলার নব-জাগরণের রূপকাররা আত্মোন্নতির বাইরে কিছুই করেননি বরং সাম্প্রদায়িক বিভেদকে প্রকট করেছিল। জমিদার ও ধনিক-শ্রেণির দল বলে কংগ্রেস বাংলার হিন্দু-মুসলমান কৃষিজীবীদের আস্থা কোনওদিনই অর্জন করতে পারেননি। অপরদিকে চরমপন্থীদের বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থান বঙ্গের কৃষিজীবীদের বৃহৎ অংশ যারা মুসলমান সম্প্রদায়ের তারা এর থেকে দূরে থেকেছে! শুধু তাই নয় জমিদার প্রথার বিরুদ্ধে নিপীড়িত কৃষকদেব পক্ষে কোনও দলেরই সুস্পষ্ট নীতি না থাকার কারণে বাংলার

জনসংখ্যার গরিষ্ঠ অংশ কৃষকদের কোনও সংগঠিত আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠেনি। তে-ভাগা আন্দোলনের সময় এ রাজ্যে কৃষক আন্দোলন সংগঠিত রূপধারণ করে।

এর পরিণতিতে যা অবশ্যম্ভাবী তাই হল ১৯৪৩ ও ১৯৪৬-এর দাঙ্গার কলঙ্কজনক অধ্যায়, সম্প্রীতির ঐতিহ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা ধুয়ে মুছে গেল, কংগ্রেস-লিগ ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে মশগুল হয়ে রইল। বাংলা ভাগ না করার জন্য শেষপর্যন্ত শরৎ বসু ও আবুল হাসিম একটা মরিয়া প্রচেষ্টা চালান। শরৎ বসু মহাত্মা গান্ধীকে যুক্ত বাংলাকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিলে মহাত্মা গান্ধী শরৎ বসুর চিঠির প্রত্যুত্তরে একে শর্ত সাপেক্ষ সমর্থনের কথা বলেন।[৮] অবশ্য শরৎ বসুর কংগ্রেসের মধ্যে এবং আবুল হাসিমের মুসলিম লিগের মধ্যে এমন কিছুর প্রভাব ছিল না তাঁরা নিজ-নিজ দলের মধ্যে এই সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করাতে পারেন। জনমানসে এদের নেতা হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা সেই পর্যায়ে ছিল না, বরং দু-তিন জন মিলে গোপন চুক্তির মাধ্যমে একাজ করলে দেশ-ভাগের মতো আরও একটা যুগান্তকারী ভুল হত।

'আজো পশ্চিমবঙ্গে... নিম কম্যুনিস্ট শাসন চলছে লাগাতার।'[৯] ওপারে বাংলাদেশে '৫২-র ভাষা আন্দোলন ও ৭১ স্বাধীনতা যুদ্ধর পর স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন বিশ্বের দরবারে বাঙালি জাতিকে এক অনন্য মর্যাদার আসনে বসায়। মুসলিম রাষ্ট্রর পরিবর্তে বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত হয়, রাষ্ট্রপ্রধান হন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি মুজিবর রহমান। সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ক্যু-দেতার মধ্য দিয়ে মুজিবর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হলে আবার ওপার বাংলায় অন্ধকার নেমে আসে। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে উপেক্ষা করে আবার মুসলমান রাষ্ট্র হয় বাংলাদেশ। ১৯৯২-এর ৬ ডিসেম্বর বাবরি মসদিজ ভাঙার সূত্র ধরে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বহু সংখ্যালঘুর জীবন ও সম্পত্তিহানি হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় মদতে মৌলবাদীদের সন্ত্রাসের দ্বারা গণতন্ত্র সংকুচিত হয়েছে, অবরুদ্ধ হয়েছেন প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা।

৬. সামাজিক দৃষ্টিকোণ

বেদবিদ্যার প্রভাব বাংলার মাটিতে শিকড় খুব বেশিদূর প্রসারিত করতে পারেনি, কারণ বাংলাদেশ মূলত অনার্য ও যবনদের দেশ। আর্যদের তাই বাংলায় এলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের মতো এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিরঙ্কুশ আধিপত্য কখনওই প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'বাংলাদেশে এমন হবার কারণ আছে। প্রথমত, এত দূরদেশে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ আসতে দেরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের লোকদের প্রতি এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব কাটাতে সময় লেগেছে এবং বরাবরই তা একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রাণপণে ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়ত, বাংলার কৌম সমাজ ও আর্য-ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্য প্রাণপণে জুঝেছে এবং যখন

পারেনি তখন সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে একটা বোঝাপড়ায় আসবার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলাদেশ আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে মাথা নোয়ালেও ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দু-একটি সম্প্রদায়ের বাইরে এই ধর্ম ও সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা রক্তের মেশামিশির কারণে জাত বর্ণের বাছ-বিচার দক্ষিণ ভারতের মতো এতটা কঠোর হয়ে উঠতে পারেনি।[১০] এ সত্ত্বেও ধর্ম ও বর্ণের ভিত্তিতে সামাজিক গঠনও ভিন্ন রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। গ্রামভিত্তিক সমাজ ও কৌমগুলির ভাঙাগড়া হয়েছে। কোথাওবা বর্ণের ভিত্তিতে পেশাভিত্তিক গ্রাম গড়ে উঠেছিল। শিশুপাঠ্যতে আছে 'গাঁয়ের বামুন পাড়া তারি ছায়া তলে।' (সহজপাঠ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) সে রকম চাষিপাড়া, তাঁতিপাড়া, কুমোরপাড়া, মুসলমানপাড়া। সাধারণভাবে বাংলার ব্রাহ্মণ সমাজ দুইভাগে বিভক্ত, রাঢ় বাংলার ব্রাহ্মণরা রাঢ়ি এবং বারেন্দ্রভূমের ব্রাহ্মণরা বারেন্দ্রনামে বর্ণিত হয়। রাঢ়ি ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের মধ্যে বৈবাহিক আদান-প্রদানের চল ছিল না। এছাড়া ব্রাহ্মণদের মধ্যেও অন্ত্যজ বলে একটি শ্রেণির সৃষ্টি হয়েছিল। অগ্রদানী ব্রাহ্মণদের শুধুমাত্র শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের নিবেদিত অন্নগ্রহণ ও এই উপলক্ষে দেয় দান সামগ্রী গ্রহণই শুধু তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে। পূজা-পাঠ, উপনয়ন বা পারলৌকিক ক্রিয়ায় মন্ত্রোচ্চারণ তাদের অধিকারের মধ্যে পড়ে না। মৃতদেহ সৎকারে মন্ত্রোচ্চারণ করা ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রেও একই বিধি বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। ধরেই নেওয়া যায় ব্রাহ্মণরা বহুধা বিভক্ত ছিল সুতরাং নীচের বর্ণগুলি শতধা বিভক্ত হওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

পশ্চিম বাংলায় একক গরিষ্ঠ বর্ণ-সম্প্রদায় মাহিষ্য বা কৈবর্ত সম্প্রদায়। মহাভারতে সত্যবতী ধীবর কৈবর্তরাজকন্যা ছিলেন। এই বিবাহের ফলে রাজা শান্তনুকে অনেক প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়। কৈবর্তরা প্রধানত মৎস্যজীবী, অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে এদের একটা অংশ কিছু জোতজমির মালিকানা লাভ করলে তাদের সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করে। আর এর ফলে কৈবর্ত সমাজ জেলে কৈবর্ত ও হেলে কৈবর্ত এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। জেলে কৈবর্তরা পুরানো পেশায় বহাল থাকে আর হেলে কৈবর্তরা হাল চাষ ও কৃষিকর্মে ব্যাপৃত হলেন। ফলে এরা দুটো আলাদা কৌম-এ বিভক্ত। শুধু তাই নয় জোতজমির মালিকরা নিজেদের উচ্চবর্গের দাবি করতে লাগলেন। বঙ্কিম ভাষ্যে 'অমরকোষ অভিধানে কৈবর্তদিগের নাম কৈবর্ত, দাস, ধীবর। পূর্বেই দেখানো গিয়াছে যে ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্য জাতি পাওয়া যায়। দাস, ধীবর কৈবর্ত তিনই এক। যদি দাস ও ধীবর অনার্য হইল, তবে কৈবর্তও অনার্য জাতি। এক্ষণে বাঙ্গালায় কৈবর্তের মধ্যে কতকগুলি চাষা কৈবর্ত; কতকগুলি জেলে কৈবর্ত, পূর্বে সকলেই মৎস্য ব্যবসায়ী ধীবর ছিল সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইলে কতকগুলি কৃষিব্যবসায় অবলম্বন করিল, তাহারাই চাষা কৈবর্ত। ধোপারা ওইরূপে কেহ কেহ চাষ করিয়া চাষা ধোপা বলিয়া পৃষক জাতি হইয়াছে।' (বাঙ্গালীর উৎপত্তি, পঞ্চম পরিচ্ছেদ, বঙ্গদর্শন, প্রথম খণ্ড,

পৃ. ২০৫) তিনি আবার বলেছেন, 'পুঁড়ো, পুণ্ডরী এবং পোদ, তিনটি আদৌ এক জাতি এবং তিনটি আদি প্রাচীন পুণ্ড্র জাতির সন্তান।' (তদেব, পৃ. ২০৭) 'পরিশেষে ইহাও প্রমাণ করা গিয়াছে যে বাঙ্গালি শূদ্রের কিয়দংশ অনার্য সম্ভূত হইলেও অপরাংশ আর্যবংশীয়। কেহ বিশুদ্ধ আর্য যেমন অম্বষ্ঠ, কায়স্থ, কেহ আর্য অনার্য উভয়কুল জাত, যেমন চণ্ডাল (সপ্তম পরিচ্ছেদ স্থূলকথা, তদেব পৃ. ২১১)।

এ প্রসঙ্গে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের একটা প্রচার ছিল বীরেন শাসমল কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হতে চাইলে বিধান রায় নাকি বলেছিলেন মেদিনীপুরের এক কেওট হবে কলকাতার মেয়র। বিপিনচন্দ্র পালের 'আমার জীবন ও সমকাল' গ্রন্থে ব্রাহ্মণাধিপত্যের প্রমাণ মেলে। পূর্ববঙ্গের সাহারা খুবই উচ্চবর্ণাধিকারী ও আর্থিক দিক থেকে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন। আর্থিক সংগতির জোরে তারা ব্রাহ্মণদের সমানাধিকার দাবি করলে ব্রাহ্মণরা তাদের কয়েক ধাপ নীচে নামিয়ে দেন।[১১] পূর্ববঙ্গের সাহারা প্রধানত কুসিদজীবী ছিলেন। তারা দরিদ্র মুসলমান ও নমঃশূদ্র ঋণজালে জড়িয়ে চরম শোষণের নিগড়ে আবদ্ধ করত। অনেক সময় ঘটি-বাটি বন্ধক রাখতে বাধ্য হত। প্রমথ চৌধুরীদের পূর্ববঙ্গে জমিদারি ছিল। তাঁর কথায় 'আমাদের একটা বড় কর্তব্য ছিল সাহাদের হাত থেকে সেখদের বাঁচানো।'[১২] ফজলুল হক আইন প্রণয়ন করে মহাজনি সুদ কমিয়ে দিলেও বিকল্প ঋণের ব্যবস্থা করতে সক্ষম হননি।

অতুল সুর 'বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় গ্রন্থের পরিশিষ্টতে প্রধান জাতিসমূহের তিরিশটি নামের তালিকা দিয়েছেন— (১) ব্রাহ্মণ (২) বৈদ্য (৩) কায়স্থ (৪) সদ্‌গোপ (৫) তিলি (৬) মালাকার (৭) তাঁতি (৮) নাপিত (৯) বারুই (১০) কামার (১১) কুম্ভকার (১২) গন্ধবণিক (১৩) ময়রা (মোদক) (১৪) সুবর্ণ বণিক (১৫) আগুরি (১৬) অঘোরি (১৭) চাষাধোবা (১৮) গোয়ালা (১৯) কৈবর্ত (২০) মাহিষ্য (২১) অগ্রদানী ব্রাহ্মণ (২২) বাগল (২৩) যুগি (২৪) কাঁসারি (২৫) তাম্বুলি (২৬) স্বর্ণকার (২৭) সূত্রধর (২৮) সাহাবণিক (২৯) শাঁখারি (৩০) বৈষ্ণব।

বাংলার প্রধান জনজাতি সমূহের মধ্যে চৌদ্দটি বিভাগ দেখা যায়— (১) সাঁওতাল (২) ওঁরাও (৩) মুণ্ডা (৪) ভূমিজ (৫) কোরা (৬) লোধা বা খরিয়া (৭) কোরা (৮) হো (৯) ভুটিয়া (১০) লেপচা (১১) মহালি (১২) মেচ (১৩) নগেকিয়া (১৪) রভা। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত তফশিলি জাতির যে তালিকা আছে তাতে বাংলার তফশিল ভুক্ত জাতিসমূহের তেষট্টিটি নামের তালিকা পাওয়া যায়— (১) বাউরি (২) চামার (৩) ধোবা, রজক (৪) ডোম (৫) দোসাধ (৬) খাসি (৭) লাল বেগি (৮) মুসাহার (৯) পান (১০) পাশি (১১) রাজওয়ার (১২) তুরি (১৩) বাগদি, দুলে (১৪) বাহেরিয়া (১৫) বাইতি (১৬) বেদিয়া (১৭) বেলদার (১৮) ভুঁইমালী (১৯) ভুইয়া (২০) বিন্দ (২১) দামাই (২২) দেযাই (২৩) গোঁড়ি (২৪) হাড়ি (২৫) জেলে কৈবর্ত (২৬) ঝালোমালো (২৭) কাদার (২৮) কামি (২৯) কান্‌দ্রা (৩০) কেওরা (৩১) করেংগা

(৩২) কাউর (৩৩) কেওট (৩৪) খটিক (৩৫) কোচ (৩৬) কোনাই (৩৭) কোঁয়ার (৩৮) কৌষল (৩৯) লোহার (৪০) মাহার (৪১) মাল, মল্ল (৪২) মাল্লা (৪৩) মেথর (৪৪) নমঃশূদ্র (৪৫) নুনিয়া (৪৬) পলিয়া (৪৭) পাটনি (৪৮) পোদ, পৌণ্ড (৪৯) রাজবংশী (৫০) সরকি (৫১) শুঁড়ি (৫২) তিয়র (৫৩) বানটার (৫৪) চৌপল (৫৫) ভোগতা (৫৬) দাবগর (৫৭) হালালখোর (৫৮) কানজর (৫৯) কুরারিয়ার (৬০) নট (৬১) ভূমিজ (৬২) ভঙ্গি (৬৩) খয়রা (সূত্র : বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অতুল সুর পরিশিষ্ট ক খ গ দ্রষ্টব্য)।

১৮৭২ আদম সুমারির প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় কৈবর্তদের ৭২ শতাংশ বাস করত মেদিনীপুর, হুগলি ও হাওড়া জেলায়, বাগদিদের ৭১ শতাংশ বাস করত বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও ২৪ পরগনায় আবার ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে বেশি বাস করত বর্ধমানে তারপর যথাক্রমে চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর ও হুগলি-হাওড়া জেলায়। যজন-যাজনের জন্য তাদের ভিন্ন স্থানে গমন করতে হয় বলে তাদের আদি বাসস্থান নির্ণয় করা কঠিন। সদগোপদের ৮৭ শতাংশ বাস করত বর্ধমান, বীরভূম, মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলায়। গোয়ালাদের ৬২ শতাংশ বর্ধমান, চব্বিশ পরগনা ও নদিয়া এই তিন জেলায় বাস করত। কায়স্থদের ৭০ শতাংশ মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগনা ও বর্ধমান জেলায় বাস করত। তিলিদের শতকরা ৬৯ শতাংশ যার মধ্যে বর্ধমান ও মেদিনীপুর সর্বাধিক তারপরে বীরভূমে বাস করত। পোদেরা মুখ্যত চব্বিশ পরগনার লোক কারণ এদের ৯২ শতাংশই এই জেলায় বাস করত, তাঁতিদের ৭৫ শতাংশ লোক মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, বর্ধমান জেলায বাস করত, বাউরিদের ৭৮ শতাংশ বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলায়, চামাররা ৮৩ শতাংশ বাস করত চব্বিশ পরগনা, নদিয়া ও বর্ধমান জেলায়, ডোমদের ৬৫ শতাংশ বাস করত বর্ধমান বীরভূম জেলায়, কেওড়াদের ৫৫ শতাংশ চব্বিশ পরগনা, হুগলি ও হাওড়া জেলায়, যুগিরা পোদদের মতো চব্বিশ পরগনার লোক কেননা এদের ৬৮ শতাংশ এই জেলায় বসবাস করে। কুম্ভকারদের ৭৭ শতাংশ হুগলি, হওড়া, বর্ধমান, বীরভূম ও বাকিরা অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে; গন্ধবণিকদের ৬৬ শতাংশ বর্ধমান, বীরভূম ও মেদিনীপুর, আগুরিরা মূলত বর্ধমান জেলার (৮৭ শতাংশ) ময়রাদের ৫৯ শতাংশ বর্ধমান, বীরভূম, নদিয়া, তাম্বুলিদের ৮০ শতাংশ বর্ধমান বাঁকুড়া, হুগলি-হাওড়া, মেদিনীপুর; বারুইদের ৭৫ শতাংশ বর্ধমান, হুগলি-হাওড়া ও চব্বিশ পরগনা, বৈদ্যরা সব জেলাতেই বিস্তৃত ছিল, তবে বর্ধমান ও চব্বিশ পরগনায়, ভুঁইয়া মেদিনীপুর; কাঁসারিরা চব্বিশ পরগনা, হুগলি-হাওড়া, মেদিনীপুর, বর্ধমান, নদিয়া; মেথর চব্বিশ পরগনা, মেদিনীপুর; শাঁখারি মেদিনীপুর, বর্ধমান, চব্বিশ পরগনা; চণ্ডালরা চব্বিশ পরগনা, বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় বাস করে। বর্তমানে এরা নমঃশূদ্র নামে পরিচিত।[১৩] কোথাও কোথাও এরাই আবার চাঁড়াল নামে পরিচিত।

এবার আমরা মুসলমান সমাজের দিকে দৃষ্টি ফেরাব। অতুল সুর বাংলার মুসলমানদের তিন শ্রেণিতে ভাগ করেছেন— (১) আগন্তুক মুসলমান, (২) ধর্মান্তরিত মুসলমান (৩) উভয়ের মধ্যে সংমিশ্রিত মুসলমান। 'জোর-জুলুম করেই যে মুসলমান করা হত তা নয়। অনেক হিন্দু স্বেচ্ছায়ও মুসলমান হত। এরা অধিকাংশই হিন্দু সমাজের অবহেলিত নিম্ন সম্প্রদায়ের লোক। নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ এদের হেয় চক্ষে দেখতেন। এসকল সম্প্রদায় ইসলামের সাম্যনীতির দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল।'...

'উচ্চশ্রেণির বর্ণহিন্দুরা খুব কমই ধর্মান্তরিত হত। তবে যাদের যবন দোষ ঘটত (নিষ্ঠাবান সমাজের পাতি অনুযায়ী মুসলমানের খাদ্য আঘ্রান করলে যবন দোষ ঘটত), নিষ্ঠাবান হিন্দু সমাজ তাদের একঘরে করত। তাদের মধ্যে অনেকেই মর্যাদা পাবার জন্য মুসলমান হয়ে যেত। এছাড়া, মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোনও জমিদার বা ভূস্বামী যদি রাজস্ব দিতে অক্ষম হতেন তাহলে তাঁকে সপরিবারে মুসলমান ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হত।'[১৪]

এ পর্যায়ে আলোচনার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে সাধারণভাবে ভারতীয়রা ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ঠাবান। বিশ্বের অধিকাংশ দেশে যেখানে মুসলমান ও খ্রিস্টান বিজয় লাভ হয়েছে সেখানেই অধিকাংশ মানুষই ধর্মান্তরিত হয়েছেন। কিন্তু ভারতে বহুবার মুসলমান আগ্রাসন প্রায় তিনশো বছর মুসলমান শাসন থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় উপমহাদেশের অধিকাংশ প্রদেশগুলিতে হিন্দুরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশ। প্রায় দুশো বছরের ইংরেজ শাসন ও মিশনারিদের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় সমাজের খুব ক্ষুদ্র অংশই খ্রিস্টানধর্ম গ্রহণ করেছে। কিন্তু বাংলা সেই ব্যতিক্রমী রাজ্য যেখানে বলপূর্বক ধর্মান্তরিত না করিয়ে অধিকাংশ মানুষ মুসলমান হয়েছেন। নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ও একথা প্রমাণিত বাংলার অধিকাংশ মুসলমানরা স্থানীয় জাতিগুলির থেকেই বৌদ্ধ ও মুসলমান হয়েছিলেন। মোটকথা, বাঙালি মুসলমান মূলত বাংলাদেশেরই সন্তান। আজ যে স্বাধীনতা লাভের পর পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা নিজেদের বাঙালি বলে পরিচয় দেয়, তার পিছনে যথেষ্ট ঐতিহাসিক সত্য আছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিমাপের দিক দিয়েও ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণিত হয়। রিজলি যে পরিমাপ সূচক গ্রহণ করেছিলেন তা থেকে দেখা যায় পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা শিরাকার সূচক সংখ্যা ঠিক ওই অঞ্চলের নমঃশূদ্রের শিরাকার-সূচক সংখ্যার সহিত একেবারে অভিন্ন। এই সকল মুসলমানদের নাসিকাকার-সূচক সংখ্যার নমঃশূদ্রের চেয়ে বেশি। কিন্তু পোদদের চেয়ে বেশি তফাত নয়।'[১৫] এখানে প্রশ্ন আসবে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের মিল থাকা সত্ত্বেও পরস্পর এত বিদ্বেষ পূর্বাপর বাহিত হয়ে আসছে কীভাবে? অস্পৃশ্যতার কারণে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা নিচুজাতিদের ঘৃণা করত। ধর্মান্তকরণের পর সেই ঘৃণা আরও বেড়ে পরস্পরের বিদ্বেষে পরিণত হয়েছে এবং তা পূর্বাপর বাহিত হয়ে এসেছে। বাংলার মুসলমানরা হিন্দুদের অনেক সংস্কৃতি খুব স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছে, আবার জাতিভেদ প্রথাও হিন্দু সমাজের মতো এত প্রকট না হলেও তাদের বিদ্ধ করেছে। সাধারণভাবে

বিশ্বের অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও সিয়া ও সুন্নির একটা বিভাগ আছেই। আমাদের মনে রাখতে হবে বাংলার মুসলমান শাসকরা ধর্মের ব্যাপারে অত্যন্ত কট্টরপন্থী ছিলেন। দু-একজন বাদ দিলে সুফিদের উদারনৈতিক ভাবধারাকে ভালোচোখে দেখতেন না। এম.এম. আকাশ লিখেছেন 'বাঙ্গালী মুসলমান সমাজে পৃথক মর্যাদাসম্পন্ন দুটি স্তরের উদ্ভব হল আশরাফ-আতরাফ, অভিজাত-অনভিজাত ইত্যাদি। প্রথমোক্তরা তাদের আদি উৎস হিসাবে বহিরাগত বিজয়ী মুসলমানদের চিহ্নিত করতেন এবা তা দিয়ে গর্ববোধ করতেন।'[১৬] কেমব্রিজ ইতিহাস অনুসারে পূর্ববঙ্গে অর্ধেক মধ্য বাংলায় এক চতুর্থাংশ আর পশ্চিমবাংলায় সামান্য সংখ্যক মুসলমান ছিল। প্রধানত ভূমিহীন চাষি. প্রান্তিক চাষি, কারিগর মজুর ইত্যাদি শ্রেণি থেকে। ১৯১১-র লোক গণনায় বাংলাদেশের মুসলমান সমাজে ৮০টি প্রধান জাতির উল্লেখ আছে। যদিও মনে রাখতে হবে হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা এত কঠোর নয়।

> প্রধান জাতি— (১) আবদাল (২) আফলাফ (৩) আকুঞ্জি (৪) বেদিয়া (৫) বেহারা (৬) বেলদার (৭) ভাট (৮) ভাটিয়া (৯) চাটুয়া (১০) চুরিহর (১১) দফাদার (১২) দাই (১৩) দরজি (১৪) দেওয়ান (১৫) ধাওয়া (১৬) ধুবি (১৭) মুনিয়া (১৮) ফকির (১৯) গাইন (২০) হাজাম (২১) জোলা (২২) কাগজি (২৩) কালাল (২৪) কান (২৫) কাসবি (২৬) কসাই (২৭) কাজী (২৮) খাঁ (২৯) খোন্দকার (৩০) কলু (৩১) কুমার (৩২) কঁজরা (৩৩) লাল বেণী (৩৪) মহিফেরাস (৩৫) মাহিমল (৩৬) মাল্লাহ (৩৭) মল্লিক (৩৮) মশাল্চি (৩৯) মেহতর (৪০) মীর (৪১) মীর্জা (৪২) মুচি (৪৩) মোগল (৪৪) নগর্চি (৪৫) লালুয়া (৪৬) নাস্যা (৪৭) নাট (৪৮) নিকিরি (৪৯) পাঠান (৫০) পাওয়ারিয়া (৫১) পির (৫২) রাসুয়া (৫৩) সৈয়দ (৫৪) সেখ (৫৫) সোনার।

অপ্রধান জাতিগুলি—

> (১) আফগান (২) আশরাফ (৩) বাকলি (৪) বাখো (৫) বাড়ি (৬) ভুঁইয়া (৭) চৌধুরী (৮) চুনারি (৯) দফালি (১০) গাড্ডি (১১) গোলাম (১২) হালাল (১৩) হিজরা (১৪) হোসেনি গোয়ালা (১৫) খরাদি (১৬) কোরেশি (১৭) লাহেরি (১৮) মাংটা (১৯) মেহানা (২০) মীরদা (২১) মিরিয়াসিন (২২) মিএগ্রা (২৩) নও-মোসলেম (২৪) পটুয়া (২৫) সুন্নি।[১৭]

এখানে লক্ষ করার বিষয় যে, হিন্দু সমাজের মতোই বাঙালি মুসলমান সমাজেও পেশা ভিত্তিক জাতি বিন্যাস লক্ষ করা যাচ্ছে। এখানে আরও একটি প্রধান জাতি বিভাগের কথা উল্লেখ করা দরকার— নিম্নবর্ণের অন্ত্যজ হিন্দুরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলে তাদের 'আজলাফ' বলে গণ্য হত। বল্লাল সেনের আমলে বাংলায় হিন্দু ব্রাহ্মণ

ও কায়স্থদের মধ্যে কৌনীন্য প্রথা চালু করেন। মুসলমান সমাজ যারা বিদেশ থেকে আগত আশরাফরাও নিজেদের কৌলিন্য দাবি করতেন। সৈয়দ-সেখ-মোগল-পাঠানরা কৌলিন্যের প্রধান দাবিদার ছিল। এছাড়া উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত হিন্দুরা মুসলমান ধর্মগ্রহণ করলে আশরাফ বর্ণভুক্ত বলে গণ্য হত। সাধারণভাবে আশরাফরা আতরাফদের সাথে, আতরাফদের আজলফদের সাথে বিবাহ বন্ধন নিষিদ্ধ ছিল। বাঙালি হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার জটিলতা যুক্ত ব্যবহার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বাঙালি মুসলমান সমাজ তাকে গ্রহণ করেছিল। তবে মুসলমান সমাজে হিন্দু সমাজের মতো বংশানুক্রমিক ভিত্তি এত সুদৃঢ় ছিল না, ছিল না গোত্রের মধ্য দিয়ে কৌমগুলির বিভাজনের প্রক্রিয়া। বরং আতরাফ বা আজলাফরা ধন-উপার্জনের মধ্য দিয়ে প্রতিপত্তশালী হলে উঁচু বর্ণে বিবাহের মধ্য দিয়ে উচ্চ-বর্ণভুক্ত হত। অমলেন্দু দে এ প্রসঙ্গে মুসলমান সমাজে প্রচলিত প্রবাদের উল্লেখ করেছেন—

'আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দিন
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।'[১৮]

মইনুল হাসান তার পুস্তিকাতে আরজাল বলে একটি শ্রেণির উল্লেখ করেছেন। যার উল্লেখ অন্য কোথাও নেই। 'অন্য পর্ব হচ্ছে আরজাল অর্থাৎ অবনমিত শ্রেণির মুসলমান। এই পর্ব বিভাগ-এর বেড়া খুব শক্তিশালী ছিল তা নয়।' (মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা— মইনুল হক, পৃ. ২২)।

ধর্ম নিরপেক্ষতা তত্ত্ব ও তথ্য
ভেদাভেদের সমীক্ষা

ইংরেজিতে 'সেকুলার' (Secular) শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতা। সাধারণভাবে সাম্প্রদায়িক শব্দটির বিপরীত শব্দ অসাম্প্রদায়িক আবার সাম্প্রদায়িকতার বিপরীতে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ব্যবহার করি। আমরা এখন একটি নূতন শব্দ ব্যবহার করছি ধর্ম-নিরপেক্ষতা। এই শব্দটি ব্যবহারের সাথে সাথে এর ব্যুৎপত্তিগত তাৎপর্য ও তত্ত্বর উপস্থাপনা জরুরি। সাম্প্রতিক অতীতে এই শব্দটি ব্যবহার নিয়ে বিতর্কের ঢেউ উঠেছে। ভারতীয় জনতাপার্টি যারা একটি উগ্র হিন্দুত্ববাদী দল। এই দলের তৎকালীন সভাপতি লালকৃষ্ণ আদবানি পাকিস্তানে গিয়ে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অন্যতম একজন স্থপতি, দ্বিজাতিতত্ত্বের এবং ধর্মের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রবক্তা মহম্মদ আলি জিন্নাকে ধর্মনিরপেক্ষ বললে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই প্রতিবাদকে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলি, বিশেষত অভিভাবক সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বিদ্রোহের পর্যায়ে নিয়ে যায়। যুক্তিবাদীরাও ধর্মনিরপেক্ষ হন কীভাবে। আর গুজরাত কাণ্ডের পর ধর্মনিরপেক্ষ কথাটি তার বাক্যে প্রস্ফুটিত হয় কীভাবে সে প্রশ্নও থেকে যায়। অবশ্য একটি ধর্মীয় ফ্যাসিস্ত দলের নেতার মুখ দিয়ে আর একটি ধর্মীয় ফ্যাসিস্ত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতার নামে ধর্মনিরপেক্ষতাব বাংলাপত্রে আমরা আশ্চর্য হই না। এটাই বোধ হয় প্রকৃত গোয়েবেলসীয় প্রচার।

সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষতা কী অর্থ বহন করে। অ-সাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষতার মধ্যে সত্যিই কি কোনও ভেদ রেখা আছে তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত জরুরি।

যিনি পরধর্মদ্বেষী নন, নিজের ধর্মের বৃদ্ধি বা প্রসারতার জন্য অপরের ধর্মীয় অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না বা নিজের ধর্মের প্রসারতার জন্য অপর ধর্মের মানুষের প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ পোষণ করে না, অপর সম্প্রদায়ের উপর আঘাত সমর্থন করে না, মোটের উপর 'পরমত সহিষ্ণুতা' আছে তিনি অসাম্প্রদায়িক। যিনি সকল ধর্মের প্রতি সমান আচরণ করেন সাধারণভাবে তাঁকে ধর্মনিরপেক্ষ বলা যায়। শুধুমাত্র এইটুকু বলে শেষ করলে ধর্ম নিরপেক্ষতা তত্ত্বের একটি অতি-সরলীকৃত রূপ বোঝা যায় মাত্র। এখানে তত্ত্বের পার্থক্য আছে, বামপন্থী চিন্তন এর সাথে অ-বামপন্থী চিন্তার ফারাক আছে। অ-বাম ধর্ম নিরপেক্ষরা মনে করেন সকল ধর্মকেই সমান বৃদ্ধির সুযোগ দেওয়াই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্র ও ধর্মের বিষয়ে নিরাসক্ত থাকবে না।

মধ্যযুগ থেকে আজ পর্যন্ত ধর্মের ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে সমস্ত ধর্মশাস্ত্রের মূল কথা অপরের ধর্মকে ঘৃণা করা ও অন্য ধর্মাবলম্বীদের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করা। সমকালীন ধর্মনায়ক পর্যন্ত প্রত্যেকের একই কথা। অবশ্যই এই কথাগুলি তারা বলেছেন তাদের দেশজ অবস্থার উপর নির্ভর করে। হজরত মির্জা তাহির আহ্‌মেদ তাঁর Murder in the name of Allah গ্রন্থে লিখেছেন—

> 'Religion was usual as an excuse of Mass Murder.'.
>
> 'The history of religion in any part of the world at any time is the history of torture, repression, execution and crucification.''[১৯]

আবার ভবানী প্রসাদ সাহু বলেছেন "ধর্ম নিরপেক্ষতা" বা "সর্বধর্ম সমন্বয়"— 'এসব কথার মধ্যে ধর্মকে স্বীকার করে নেওয়ার কথাই বলা হয়েছে। নানা ধর্ম আছে থাক, বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাস করছে করুক, কিন্তু সব ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের ঐক্য হোক— এটাই যেন কাম্য। কিংবা ধর্মকে টিকিয়ে রেখেই সব ধর্মের প্রতি সম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করাটাই যেন কাম্য। কিন্তু শত শুভ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এসব কামনা যেন 'সোনার পাথরবাটি' কামনা করার মতো।[২০]

ধর্মের ইতিহাস থেকে একথা নিশ্চিত করে বলা যায় ধর্মের সৃষ্টি হয়েছে প্রাকৃতিক বা জাগতিক ঘটনা ও নিয়মগুলির যুক্তিগ্রাহ্য বৈজ্ঞানিক সমাধান করতে পেরে অলীক কল্পনা থেকে, যার ভিত্তি হল মিথ্যাচার; যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস, দ্বিধাহীন আনুগত্য হল এর মূল কথা। এর সাথে মিশে থাকে স্থানীয় দেশাচার-লোকাচার এবং অবশ্যই নিজের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অপরিসীম বিশ্বাস, যার মধ্য থেকে জন্ম নেয় অপর ধর্মই নিকৃষ্ট ধরনের মনোভাব। একারণেই ধর্ম-বিশ্বাসীর সকল ধর্মের প্রতি সম-মনোভাবাপন্ন এমন আশা কাঙ্ক্ষিত হলেও প্রায় অ-ধরা হয়ে থাকে। এখানে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী মানুষদের ও বাম-মার্গীয়দের সুস্পষ্ট অভিমত হল কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্র কোনও রকম ধর্মীয় বিশ্বাসকে বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেবে না এবং একই সাথে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের ধর্ম বিশ্বাসকে জনজীবনে প্রতিফলিত হতে দেবেন না। সব ধর্মকে বিকশিত হতে দিলে সংঘর্ষ অনিবার্য। আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্মেও থাকে আবার জিরাফেও থাকে। তারা দশেরা-দেওয়ালি-হোলিতেও থাকেন আবার ইফতার পার্টি ডেকে গণভোজের ব্যবস্থা করেন। ভোটের জন্য দেবতার থানে, গুরুদেবদের কাছে যান আবার পিরের দরগায়ও শিরনি মানত করেন। আজকের সময়ে ধর্মনিরপেক্ষ থাকার জন্য ভবানী প্রসাদ সাহুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য 'নাস্তিকতা ও ধর্মহীনতাই মানুষকে একটি কাল্পনিক বিভেদ থেকে মুক্ত করে, সর্বজনীন ঐক্যের পথ দেখায় এবং মানুষ তখন অনৈক্যের যে কারণ অর্থনৈতিক ও শ্রেণিগত বৈষম্য সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। নাস্তিক্যবাদী দর্শন মানুষকে তার বাস্তব সমস্যা চিনতে ও তার সমাধানের প্রকৃত পথ খুঁজে পেতে সাহায্য করে। ঈশ্বর ও ধর্মে

বিশ্বাস টিকিয়ে রেখে এই পথ খোঁজার চেষ্টা একসময় কানাগলির সম্মুখীন হতে বাধ্য।'[১১] এখন বামপন্থীরা সততই 'কানাগলির' মধ্যে ঢুকে কানামাছি খেলছে।

শ্রী সাহুর উক্ত বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে কিছু বলার আছে, বাকুনিন রাষ্ট্রে ধর্মের অধিকারকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানালে মার্কস তার বিরোধিতা করে বলেন 'তাছাড়া স্বাধীনতা ন্যায় ইত্যাদি চিরন্তন সত্য আছে, সমাজের সকল অবস্থাতেই তা বিদ্যমান, কিন্তু কমিউনিজম সত্যকেই উড়িয়ে দেয়, ধর্ম আর নৈতিকতাকে নতুন ভিত্তিতে পূর্ণগঠিত না করে তা সব ধর্ম আর নৈতিকতারই উচ্ছেদ করে, তাই তা ইতিহাসের সকল অভিজ্ঞতার পরিপন্থী'। (কমিউনিস্ট মেনিফেস্টার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, ধর্ম প্রসঙ্গে মার্কস এঙ্গেলস, পৃ. ৮৭)

এবার আমরা তত্ত্ব থেকে তথ্যে ফিরব। কীভাবে সাম্প্রদায়িকতা বাঙালির সমাজজীবনের শিকড়ে প্রবেশ করে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। এবিষয় আলোচনা করার অর্থ সাম্প্রদায়িক শক্তির বিজয়গাথা নির্মাণ নয়। এর উদ্দেশ্য ধর্ম বর্ণের রেশারেশি-বিদ্বেষ বা এর বিপদ সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং সমাজ জীবনের এই রিষ্ঠ পর্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও সমূলে উৎপাটিত করা। আমাদের পরীক্ষা করে দেখা দরকার প্রাচীন লোক সাহিত্যে মিলনের গাথা যেমন রচিত হয়েছিল ঠিক তেমনভাবে, বিদ্বেষ, পরস্পরের প্রতি ঘৃণা, দুর্বলের অসহায় আকুতি প্রাচীন সাহিত্যে লোকসংস্কৃতিতে প্রবিষ্ট হয়েছে। নিচুবর্ণের সাথে উচ্চবর্ণের বিরোধ বিভেদের নিদর্শন পাই বাংলার সবচেয়ে প্রাচীন সাহিত্য চর্যাপদে—

'নগর বাহিরে ডোম্বি তোহোরি কুডিআ
ছোই ছোই গাহ সো ব্রাহ্মণ নাড়িয়া'

[দশম সংখ্যক চর্যাপদ]

...'পরবর্তীকালে আমার যৌবনে শ্রদ্ধেয় ডক্টর শহীদুল্লাহর কাছে শুনেছিলাম— বৌদ্ধ শ্রমণদের 'নেড়ে' বলত যেহেতু তারা নেড়া থাকতেন। পরে যখন বৌদ্ধরা মুসলমান হলেন এই আখ্যানটা তাদেরও (মুসলমানদের) ভূষণ হল। মুসলমানদের মধ্যেও 'নেড়া' হওয়ার রীতি ছিল। পরে চর্যাপদ থেকে উদ্ধৃতি করে উল্লেখ করে কেউ কেউ নেড়ে বলে ফেলত, বলা বাহুল্য তা মিষ্ট সম্ভাষণে হত না।' (ভেদ-বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা: অতীত ও বর্তমান-সৈয়দ শাহেদুল্লাহ, বঙ্গদর্পণ, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৪৩)

এইকইভাবে ইসলাম ধর্মপ্রতিষ্ঠায় মুসলমান শাসকদের অপর ধর্মস্থান ধ্বংস করার বিবরণ ও সুখ্যাতি পাই আলাওল বিরচিত সিকান্দরনামায়—

'মগানেব আদ্যঘর ভস্ম কবি বহুতর
দ্বীন ইসলাম শিখাইল
অগ্নি আদি চন্দ্র সূর সব পূজা করি দূর
এক প্রভু ভার স্থির কৈল।'

একই গ্রন্থে সিকান্দরের ইসলাম প্রচার অংশে আছে—

'অগ্নিপূজা গৃহসব যথেক আছিল
শাহার আদেশে, সব ছারখার কৈল'।

(মায়ারীর যাদু সংখ্যা, সিকান্দর নামা, আলওল)

মনু সংহিতাতে দেশ-জাতি-কুল ধর্ম শাশ্বত বলে নাস্তিকদের পাষণ্ডধর্ম বলে উল্লেখ আছে—

'দেশধর্মান জাতিধর্মান কুলধর্মাংশ্চ শাশ্বতান।
পাষণ্ডগণ ধর্মাংশ্চ শাস্ত্রে স্মিন্নুক্তবান মনুঃ।।

(মনুসংহিতা ১।১১৮)

বাংলার অন্ত্যজ মানুষরা বেদ-ব্রাহ্মণদের রুদ্ধদ্বারে না গিয়ে নিজেদের মতো লোকায়ত দেবতা সৃষ্টি করেছেনন। যে দেবতাদের অস্তিত্ব ব্রাহ্মণ্যশাস্ত্রে নেই। যে দেবতা আছে মাটির কাছাকাছি, তার কীর্তিগাথায় দেব আরাধনার আবিল আনন্দ খুঁজে পায় অন্ত্যজ বাঙালি সম্প্রদায়। তবুও তারা ব্রাহ্মণদের ঘৃণায় কাতর। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাদের আকুল আর্তি প্রকাশ করে ধর্মঠাকুরের কাছে।

মনেতে পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম
তোমাবিনে কে করে পরিত্রাণ
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ
এই বড় হোইল অবিচার।'
বৈকুণ্ঠে জপিয়া ধর্ম্ম মনেতে পাই মর্ম্ম
মায়াতে হোইল অন্ধকার
ধর্ম্ম হৈল্যা যবন রুপি মাথা এতকাল টুপি
হাতে সোভে ত্রিকচ কামান

(বাংলার মুসলমানের কথা— কাজী আবদুল ওদুদ)

কবিকঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর কাব্যে মুসলমান সমাজের জাতিভেদ ও পেশাভিত্তিক বর্ণভেদের বিষয়টা পরিস্ফুট হয়েছে—

'রোজা নমাজ বারি কেহ হইল গোলা
তাসন করিয়া নাম বসাইল জোলা
বলদ বীপুয়া কেহ বলায় মুকেরি।
পিঠা বেচিয়া নাম কেহ বলায় পিঠারি।।
মৎস্য বেচি নাম কেহ ধরাল কাবারি
নিরন্তর মিথ্যা কহে নাহি রাখি দাড়ি।।

হিন্দু হয়ে মুসলমান হয় গরসাল।
নিশাকালে ভিক্ষা মাগে নাম ধরে কাল।।
সানা বান্ধি নাম বলাইল সানাকার।
জীবন উপায় তার পেয়ে তাঁতি ঘর।।
পট পড়িয়া বুলে কেহ নগরে নগর।
তীরকর হয়ে কেহ নিরমায় শর।।
কাগজ কুটিয়া নাম ধরায় কাগচী
কলন্দর হয়ে কেহ ফিরে দিবারাতি।।
বসন রঙ্গায়ে কেয় ধরে রঙ্গ রেজ।
লোহিত বসন শিরে ধরে মহাতেজ।।
সুন্নত করিয়া নাম বলায় হাজাম।
সহরে সহরে ফিরে না করে বিশ্রাম।।
কাটিয়া কাপড় জোড়ে দরজির ঘটা।
নেয়াল বুঝিয়া নাম বলায় বেলটা।।
নানা বৃত্তি করিয়া বসিল মুসলমান।
সাবধান হয়ে গুণ হিন্দুর বাথান।।
অভয়ার চরণে মজুক নিজ চিত।
শ্রী কবিকঙ্কণ গান মধুর সঙ্গীত।।

আবার বিদ্যাপতির 'কীর্তিলতায়' মুসলমানদের হিন্দু ধর্মস্থানের উপর আক্রমণ, অপবিত্র করে ধর্ম নষ্ট করার কথা বলা হয়েছে।

'নিত্য ধর্মনষ্ট করে দুষ্ট ম্লেচ্ছ গণে।।
দেবতা প্রতিমা ভাঙ্গি কারে খণ্ড খণ্ড।
দেব পূজার দ্রব্য সব করে লণ্ডভণ্ড।।
শ্রীমদ্ভাগবত আদি ধর্ম শাস্ত্র গণে।
বল করি পোড়াইয়া ফেলায় আগুনে।।
ব্রাহ্মণের শঙ্খ ঘণ্টা কাড়ি লঞা যায়
অঙ্গের তিলক মুইছা গালে চাটি খায়।।
শ্রীতুলসী বৃক্ষে মুতে কুকুরের সনে।
দেবগৃহে মলত্যাগ করে দুষ্ট মনে।।
পুজায় বসিলে দেয় কুলকুচা জল।
সাধুকে তাড়না করে বলিয়া পাগল।।

হেন মতে কতশত দুষ্ট ব্যবহারে।
অবহেলে সর্বধর্ম কর্ম নষ্ট করে।।[২৩]

আমরা পূর্বেও লক্ষ করেছি বর্ণভেদের কু-প্রভাবে বাঙালি হিন্দু অন্ত্যজদের মধ্যে প্রবণতা ছিল নিজেদের আর্যকুলদ্ভব প্রমাণের চেষ্টা করা, আগেই বর্ণনা আছে পোদরা পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়। বাগদিরা ব্যগ্রক্ষত্রিয় বলে দাবি করত। মুসলসমান সমাজেও সে ভাবেই নিজেদের বহিরাগত বলে দাবি করে নিজেদের আশরাফ শ্রেণিতে উন্নীত করার চেষ্টা অবিবত চালিয়ে যায়। সে কারণেই ১৮৭০ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ১ কোটি ৭ লক্ষ মুসলমানের মধ্যে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার অর্থাৎ ১.৬ শতাংশ মানুষ বহিরাগত মুসলমান বলে দাবি করে, এরমধ্যে ২ লক্ষ ৩২ হাজার জনই হল সেখ। তিরিশ বছর পরে শুধুমাত্র নোয়াখালি জেলায় ৮ লক্ষ ৫২ হাজার জন মুসলমান নিজেদের বহিরাগতদের বংশধর বলে দাবি করে।[২৪] আনিসুজ্জামান এক প্রবন্ধে লেখেন 'বাংলার ইসলামি শাসনের অন্যতম পরিণতি হিসেবে বৌদ্ধ এবং নিম্নবর্গের হিন্দুদের ইসলামে ব্যাপক ধর্মান্তকরণ ঘটে। এইসব মানুষের কাছে ইসলাম কেবলমাত্র একটি উন্নত পর্যায়ের সমতা ভিত্তিক আদর্শ ছিল না। ধর্মান্তরে পার্থিব সুযোগ সুবিধা লাভের আশাও ছিল খুব জোরালো। কিন্তু অচিরে দেখা গেল যে বর্ণপ্রথার প্রভাব মুসলমান সমাজেও পড়েছে। বহিরাগত মুসলমানরা সামাজিক মর্যাদায় অনেক উপরে অধিষ্ঠিত হয়েছে, আর স্থানীয় ধর্মান্তরিতরা ঠাই পেয়েছে মুসলমান সমাজের নীচের তলায়।'[২৫] বাঙালি হিন্দু সমাজে যেভাবে জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হয়েছে সেভাবেই মুসলমান সমাজও প্রভাবিত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয়। বাঙালি ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে বহিরাগতরা যারা উত্তর ভারত থেকে আগত তারা সব সময় শ্রেষ্ঠতর দাবি করেছে।

হিন্দু-মুসলমান একে অপরের সাথে বৈরিতার সম্পর্ক সৃষ্টি তার কারণ সমূহ নিয়ে বিচার-বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। জরুরি মুসলমান ধর্ম এখানে বিস্তারের সময়কার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ইতিহাস প্রক্ষেপণ। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের মতে 'এই যে শত শত বৎসর ধরিয়া হিন্দু-মুসলমান একই রাজার অধীনে বাস করিয়া আসিতেছে ইহার ফলে দুই ধর্ম ও সমাজের মধ্যে পরস্পরের কী প্রভাব আদান-প্রদান ঘটিয়াছে, প্রথমে ইহারা শত্রু ছিল একের সহিত অপরের অস্তিত্বও যেন অসম্ভব, প্রকৃতির নিয়মের বিরোধী, কিন্তু অষ্টশত বৎসরেও একে অপরটিকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নাই। লোপ করিয়া দেয় নাই। দুইজনেই জীবিত আছে অশেষ পরিবর্তন গ্রহণ করিয়া'।[২৬] আবার রবীন্দ্রনাথ সমস্যা ও তার মাত্রাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন—

> 'তখনকার কালে দুই সনাতন বেড়া দেওয়া সভ্যতা ভারতবর্ষের পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে তাদের মধ্যে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া হয়নি তা নয়, কিন্তু তা সামান্য।'[২৭]

বাংলায় এই বিভেদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অতি সামান্যই 'হিন্দুরা পির ফকিরকে শ্রদ্ধা করত তার অলৌকিক ক্ষমতার জন্য। কিন্তু তাদের স্পর্শ অন্ন বা পানীয় গ্রহণ করত না।'[২৮] আবার তিনি দেখিয়েছেন 'হিন্দুরা মহরমের শোভা যাত্রায় যোগ দিত, মুসলমানরা হোলি খেলত, কারণ আনন্দ উৎসবে যোগ দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি।'[২৯] অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মতকে সরলীকরণ বলে ধরলে ভুল হবে। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় বিপিনচন্দ্র পালের আমার জীবন ও সমকাল (তথ্যসূচি দ্রষ্টব্য) গ্রন্থে।

একথা দ্বিধাহীন চিত্তে স্বীকার করা যায় যে, বাঙালির সমাজ জীবনে সে সময় মিলনের ধারা বহমান ছিল, কিন্তু ইতিহাসের বিচারে তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি ছিল এবং সমাজজীবনে তার শিকড় কতখানি গভীরে প্রবেশ করেছিল তার সমীক্ষণ জরুরি। কোন প্রেক্ষাপটে সম্প্রীতির ঐতিহ্য লীন হয়ে গেল তার সমীক্ষাও অত্যন্ত জরুরি। হিন্দুধর্মের কঠোর বিধি নিষেধ, অস্পৃশ্যতা, নিজের ধর্ম অন্য সম্প্রদায়ের মানুষকে ঘৃণা করতে শিখিয়েছে, অন্য ধর্মের প্রতি সে তুলে রেখেছে এক উচ্চ প্রাচীর, কোনওভাবেই অন্ত্যজরা বা অন্য ধর্মাবলম্বীর মতে উচ্চবর্ণের সাথে মেলামেশা না করতে পারে তার জন্য দেওয়া আছে কঠিন বেড়াজাল। এই সমস্যাকে সবচেয়ে বেশি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি তাঁর বহুখ্যাত কালান্তর প্রবন্ধে লেখেন—

> "হিন্দুর ধর্ম মুখ্যভাবে জন্মগত ও আচার মূলক হওয়াতে তার বেড়া আরও কঠিন। মুসলমান ধর্ম স্বীকার করে মুসলমানের সঙ্গে সমানভাবে মেশা যায়। হিন্দুর সে পথও অতিশয় সংকীর্ণ। আহারে ব্যবহারে মুসলমান অন্য সম্প্রদায়কে নিষেধের দ্বারা প্রত্যাখ্যান করে না, হিন্দু সেখানেও সতর্ক। তাই খিলাফৎ উপলক্ষে মুসলমান নিজের মসজিদে এবং অন্যত্র হিন্দুকে যত কাছে টেনেছে হিন্দু মুসলমানকে তত কাছে টানতে পারেনি। আচার হচ্ছে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের সেতু, সেইখানেই পদে পদে হিন্দু নিজের বেড়া তুলে রেখেছে। আমি যখন প্রথম আমার জমিদারির কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম তখন দেখেছিলুম কাছারিতে মুসলমান প্রজাকে বসতে দিতে হলে জাজিমের এক প্রান্ত তুলে দিয়ে সেইখানে তাকে স্থান দেওয়া হত। অন্য আচার-অবলম্বীদের অশুচি বলে গণ্য করার মতো। মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলনের এমন ভীষণ বাধা আর কিছু নেই। ভারতবর্ষের এমনি কপাল যে, এখানে হিন্দু-মুসলমানের মতো দুই জাত একত্র হয়েছে; ধর্মমতে হিন্দুর বাধা প্রবল নয়, আচারে প্রবল; আচারে মুসলমানের বাধা প্রবল নয়, ধর্মমতে প্রবল। এক পক্ষের যে দিকে দ্বার খোলা, অন্যপক্ষের সে দিকে দ্বার রুদ্ধ। এরা কি করে মিলবে"।[৩০]

রবীন্দ্রনাথের ক্ষোভের সাথে সাজুয্য রেখে মেকি মিলনের প্রচেষ্টাকে অনেক পরে তীব্র

ব্যঙ্গের কশাঘাতে বিদ্ধ করেন কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্যাকট কবিতায়—

'আঁট সাঁট করে গাঁট-ছড়া বাঁধা হল টিকি আর দাড়িতে
বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো? তা হয় হোক তাড়াতাড়িতে
একজন যেতে চাইবে সমুখে অন্যে টানবে পিছনে
ফস্‌কা যে গাঁট হয়ে যাবে আঁট টানাটানি ভীষণে'

('চন্দ্রবিন্দু')

পির-ফকির-বাউল-বৈষ্ণব-সহজিয়াদের মিলনের বসন্ত সমীরণে মুখরিত হয়েছিল বাংলার আকাশ বাতাস। শুরু হয়েছিল সেতু বাধার কাজ। সে ঋতুর অবসান হল কীভাবে। ঐক্যের সেতু ভাঙা হল পরিণত হল আত্মঘাতী দাঙ্গায়। অনেক গবেষক এর জন্য তিতুমীরের ওয়াহাবি বিদ্রোহ ও দুদু-মিঞার ফরাজি আন্দোলনকে দায়ী করেন। ড: পঞ্চানন সাহার মতে 'তিতুমীরের বারাসাতের কৃষক বিদ্রোহ বা ফরিদপুরের হাজি শরিফৎউল্লা ও তার পুত্র দুদু মিঞার নেতৃত্বে ফরাজি আন্দোলনে সামন্ততন্ত্র বিরোধী চরিত্র ছিল তাতে সন্দেহ নেই। জমিদার এবং ইংরেজ শাসকদের মিলিত জোট এই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেয়। তবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জন্য এই আন্দোলন হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিল।' খ্যাতকীর্তি জ্ঞানী আবদুল ওদুদ ১৯৩৫ সালের ২৬-২৮ মার্চ শান্তিনিকেতনে 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধ' নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে তিনি বলেন— 'উন্নতিকামী জাতীয়তাবাদী চেতনা আধুনিক মুসলিম জগতে বর্জিত হচ্ছে।'[৩১] অন্যত্র এক আলোচনা প্রসঙ্গে লেখেন 'মধ্যযুগে মুসলমান বিজয়ের প্রভাবে হিন্দু সমাজে দেখা দিয়েছিল পূর্ণাঙ্গ জীবনবোধের অভাব ও ধর্মাচারের আধিক্য, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরেজ বিজয়ের প্রভাবে মুসলমান সমাজেও দেখা দিল নৈরাজ্য ও মাত্রাতিরিক্ত ধর্মাচার প্রীতি'।[৩২] বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক গফ্‌ফর চৌধুরী মনে করেন ১৮শ শতকের ভারতে বিশেষ করে বাংলাদেশে হিন্দু মুসলমান বাঙালির 'নাতিপুষ্ট' মিলিত জাতীয়তার বিকাশকে রুদ্ধ করে দেয়। (বাঙালি ও বাংলাদেশ পৃ. ১৬৩)। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদীর নেতা ও প্রাক্তন লোকসভা সদস্য মইনুল হাসান একেই 'ধর্মীয় সংস্কার' বলে বাঙালি হিন্দুদের ধর্মীয় সংস্কারের সাথে তুলনা টেনেছেন। তাঁর মতে 'হিন্দু সমাজের ধর্ম বহু সংস্কারের মধ্য দিয়ে চলেছে। হিন্দু সমাজে যে সমস্ত ঘটনা রীতি হিসাবে চালু, তার পক্ষে বা বিপক্ষে আইন প্রচলিত হয়েছে। যা আসলে ধর্মীয় সংস্কার। মুসলমান সমাজের মধ্যেও ধর্মীয় সংস্কার ছিল। একেবারে সাধারণ গ্রাম-বাংলার মানুষের মধ্যেও এই সংস্কার আন্দোলন প্রভাব ফেলতে পেরেছিল।'[৩৩] মইনুল হাসানের মতকে সত্য বলে মানতে হলে কী কী ধর্মীয় সংস্কার হয়েছিল আর কাদের নেতৃত্বেই বা তা হয়েছিল? ওই অংশটি লেখার পরেই লেখক ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলনে-র বর্ণনা দিয়েছেন। আমরা কি ধরে নেব ওই দুই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ধর্মীয়

সংস্কার হয়েছিল? আসলে উক্ত দুটি আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষপূর্ণ ও ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতার দিকে মুখ ফিরিয়ে কট্টর শরিয়তি ব্যবস্থার পুনর্প্রবর্তন। আর মুসলমান সমাজে সংস্কার আন্দোলন হয়নি বলে আক্ষেপ করেছেন মহিয়সী বেগম রোকেয়া, নজরুল থেকে আবুল বাসার পর্যন্ত।

বাঙালি হিন্দু সমাজের মধ্যে বারে বারে যে সংস্কার আন্দোলন হয়েছে সমাজ প্রগতির জন্য তার অভিমুখ সব সময়ই সামনের দিকে। ভারতীয় হিন্দু সমাজের প্রধানতম ব্যাধি অস্পৃশতাকে জীর্ণ বস্ত্রের মতো পরিত্যাগ করে বাঙালি হিন্দু সমাজ নতুন বস্ত্র পরিধান করেছে। সমাজে প্রচলিত কু-প্রথাকে বারে বারে পরিত্যাগ করেছে। সবটাই আইন প্রণয়ন করে হয়েছে এমন নৈরাজ্যবাদী চিন্তার মধ্য দিয়ে যুগব্যাপী রামমোহন বিদ্যাসাগরের কাজের নেতিবাচক মূল্যায়ন করা হয়। মার্কসবাদী বীক্ষণে এই ধরনের নেতিবাচক মূল্যায়ন অসিদ্ধ। শ্রীচৈতন্যের নেতৃত্বে ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়েছিল। মুসলমান শাসকদের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তিনি শুধু অন্ত্যজ হিন্দুদেরই কাছে টানেননি, প্রেম দিয়ে বুকে টেনে নিয়েছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষদের। এবং ধরে নেওয়া যায় এরা আজলফ বর্ণভুক্ত মুসলমান ছিলেন তার উজ্জ্বল উদাহরণ রূপ সনাতন। কঠোর ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বেড়া ভেঙে অস্পৃশ্যতাকে দূর করে তিনি অন্ত্যজ হিন্দুদের ধর্মান্তকরণ থেকে আটকান। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা ও জীবনী বাঙালি সংস্কৃতিতে অনেকগুলি নতুন ধারা সৃষ্টি করিয়াছিল।'[৩৪] 'চণ্ডালোপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তিপরায়ণঃ' তারই ফসল। 'অভিজাত কর্তৃত্বের স্থূল হস্তাবলেপে এইসব মতাদর্শের ছায়াঘন পরিবেশও ক্রমে অন্ত্যজদের হাতছাড়া হয়েছে। বাঁচার তাগিদে মনের টানে গড়ে উঠেছে নানা লোকধর্মের নানা সম্প্রদায়। বাংলার বাউল, সহজিয়া বৈষ্ণব, বলাহাড়ি, সাহেবধনী, কর্তাভজা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তথাকথিত পিছড়ে বর্গ-এর মানুষদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণে এদের বাড়-বাড়ন্ত। সামাজিক-ঐতিহাসিক তাগিদে এরা চরিত্রধর্মে প্রতিবাদী, জাতি-বর্ণের ছুৎমার্গী ব্যতিক-এর প্রবল বিরোধী।'[৩৫] বৈষ্ণব আন্দোলনের পুরোভাগে মুসলমান সন্তান হরিদাস ১৪৫০ সালে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যের জন্মেরও ৩৬ বছর আগে খুলনা জেলায় তাঁর জন্ম। তাঁর শৈশবের নাম জানা যায় না। মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি শান্তিপুরে এসে শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন, তখন তাঁর নাম হয় 'ব্রহ্ম হরিদাস'। এই সময় ব্রাহ্মণরা অদ্বৈতাচার্যকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সেই সময় ব্রাহ্মণের মুসলমান শিষ্য গ্রহণে সিদ্ধান্ত এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত এ বিষয়ে কোনও সংশয় নেই। ব্রাহ্মণদের উষ্মা দেখে হরিদাস ভীত হলেও অদ্বৈতাচার্য অবিচলিত। চৈতন্য মঙ্গলে আছে—

'আচার্য তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয়।।

তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন।।

এ-ঘটনা থেকে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত করা যায় পূর্বাপর ধারাবারিক সংস্কার আন্দোলনের ফসল শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্ম।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর দ্বিবিধ পথে ধর্ম সংস্কার আন্দোলন করলেও আলোর দিশারি ইউরোপের নবজাগরণ। সতীদাহপ্রথা রোধের আইন প্রণয়নের আগে রামমোহন একক প্রচেষ্টায় ধারাবাহিক আন্দোলনের প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। সতীদাহপ্রথা রোধের আন্দোলন নিরাকারের উপাসনার জন্য ব্রাহ্মধর্ম প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি মুক্ত চিন্তার ভাবধারা ইউরোপের নবজাগরিত শিক্ষা সংস্কৃতির আলোকে হলেও, 'রামমোহন রায় যে পশ্চিমের ভাবকে আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ পশ্চিম তাঁহাকে অভিভূত করে নাই তাঁহার আপনার দিকে দুর্বলতা ছিল না।'[৩৬] বিদ্যাসাগর শুধুমাত্র বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের আন্দোলনই নয়, তিনি হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে গেছেন। একই সাথে ইংরেজি শিক্ষার আলোকে মাতৃভাষার সংস্কার সাধন, নারী শিক্ষার প্রবর্তন বাঙালি হিন্দু সমাজকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল। এসমস্তই তিনি করেছিলেন দেশীয় শিক্ষা-সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করার মাধ্যমে। বিদ্যাসাগর ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক বাঙালি জীবনের নষ্ট মূল্যবোধ যা পূর্বাপর বাঙালি সমাজে বর্তমান ছিল তার পুনরুদ্ধারের জন্যও প্রয়াসী হয়। এই কারণেই আহমদ শরিফ-এর মত 'বিদ্যাসাগর হলেন সর্বপ্রকারে বিশ্বাস-সংস্কারমুক্ত যুক্তিবাদী বিবেকানুগত নাস্তিক।'[৩৭] রামমোহন-বিদ্যাসাগর শুধু নয় সেইসময় নবজাগরিত চিন্তা নায়করা বারে বারে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বাধা ভেঙেছেন। এ ব্যাপারে তাদের বিদেশি ডিরোজিও নর্মান বেথুনদের শিক্ষা নিতে সংকোচ বোধ তো ছিলই না, বরং মুক্তজ্ঞানে ঋদ্ধ হয়েছিল বাঙালি হিন্দু সমাজ। অপরদিকে বাঙালি মুসলমান সমাজের ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে অনীহা তো ছিলই এমনকী মাতৃভাষা কী হবে তা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছে।[৩৮] একথা জোর দিয়ে বলা যায় পুরানো ধ্যানধারণাগুলিকে বাঁচিয়ে রাখা। ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার মধ্যে আবদ্ধ রাখব, এবং এখান থেকে মুক্ত করার জন্য কালজয়ী মহামানবের উদ্ভব হয়নি বলে বাঙালি মুসলমান সমাজ হিন্দু সমাজের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছিল।

গভীর সুপ্তিতে নিমগ্ন বাংলার মুসলমান সমাজকে নিয়ে বিলাপের অন্ত ছিল না অতীতের মুসলমান চিন্তানায়কদের, আক্ষেপ ছিল রামমোহন বিদ্যাসাগরের মতো প্রকৃত সমাজ নায়কের অভাব নিয়ে। বিদুষী বেগম রোকেয়া তার 'ধ্বংসের পথে বঙ্গীয় মুসলিম' নামক এক অভিভাষণে লেখেন 'রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি সমাজ হিতৈষী লোকেরা ব্রাহ্ম সমাজের প্রবর্তন করে হিন্দুকে সর্বাংশে খ্রিস্টান হওয়া থেকে রক্ষা করলেন। তখন তাঁদের নিজের স্কুল, কলেজ হল... তাঁরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে রক্ষা পেলেন।...

অপরদিকে মোসলেম সমাজ তখন ঝোঁপরিমে শুয়ে খোয়াব দেখছিলেন।'[৩৯] এর পরে জন্মদ্রোহী, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামী লেখক কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন 'হিন্দু লেখকরা তাদের সমাজের গলদ ত্রুটি নিয়ে কিনা করাঘাত করেছেন সমাজকে... তা সত্ত্বেও তাঁরা সমাজের শ্রদ্ধা হারাননি, কিন্তু এ হতভাগা মুসলমানের দোষ ত্রুটির কথা পর্যন্ত বলবার উপায় নেই, সংস্কার তো দূরের কথা, তার সংশোধন করতে চাইলেও এরা তার বিকৃত অর্থ করে নিয়ে লেখককে হয়তো ছুড়িই মেরে দেবে।'[৪০] আর সাম্প্রতিক লেখক আবুল বাসার লিখেছেন 'কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বিদ্যাসাগর যখন গ্রামে গ্রামে ইংরেজি পাঠশালা তৈরি করছেন তখন মুসলমান উর্দুভাষী নেতৃত্ব নবাব আবদুল লতিফ প্রমুখ বিদ্যাবৎসল প্রভুরা বাংলার মুসলমানের জন্য এক ধরনের কৃত্রিম মুসলমানের পুঁথির আদলে গঠিত মুসলমানি বাংলা চালু করার ছিমাকত করে চলেছেন। তিনি আরও বলেছেন 'যখন একটি জাতি বা ধর্ম সম্প্রদায়গোষ্ঠী ধর্ম থেকে ভাষাকে ভাষা থেকে কৃষ্টিকে, সাহিত্য থেকে ইতিহাসকে বিচ্ছিন্ন করে বিচার করতে পারে না তখন তার চলার গতি প্রাগ্রসরতা রুদ্ধ হতে থাকে।[৪১] হোসেনুর রহমানের বক্তব্য 'মুসলমানেরা ঘরের এক কোণে বসে থাকল নিজেরা নিজেদের নিয়ে।'[৪২] মইনুল হাসানের মতের সমর্থন শতবর্ষব্যাপী মুসলমান চিন্তানায়কদের লেখায় কোথাও পাওয়া গেল না।

অপরপক্ষে জমিদার কৃষ্ণদেব রায়কে লেখা তিতুমীরের পত্রকে কোনও ধর্মীয় সংস্কার বলা যায় না। বরং একে মধ্যযুগীয় ধর্মীয় উন্মাদনার পুনরুত্থান বলে অভিহিত করা যায়। 'আমি দ্বীন ইসলাম জারী করিতেছি, মুসলমানদের ইসলাম ধর্মশিক্ষা দিতেছি। আল্লাহর মনঃপুত ধর্মই ইসলাম,... ইসলামী ধরনের নাম রাখা, দাড়ি রাখা, গোঁফ ছোট করা, ইদুল আজাহার কোরবানি করা আকিকা কোরবানি করা মুসলমানদিগের উপর আল্লাহর হুকুম।' বাংলাদেশের প্রাবন্ধিক আবদুল গফ্ফর চৌধুরী এ প্রসঙ্গে বলেন বাংলাদেশের ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রসার অনেক ঐতিহাসিক ও গবেষক পণ্ডিত বাঙালি মুসলমানের ইংরেজ বিরোধী জাতীয় আন্দোলন রূপে ব্যাখ্যা করেন। এই আন্দোলন অনগ্রসর বাঙালি মুসলমান কৃষক সমাজের পশ্চাদপদ চেতনা। খণ্ডিত সমাজ সংস্কৃতির বহিঃপ্রকাশ। ওয়াহাবিরা বাংলার ভাষা-কৃষ্টি, বাঙালির সামাজিক রীতি-নীতি ও দেশজ সংস্কৃতির মধ্যে ইসলাম বিরোধী পৌত্তলিকতার ছাপ আবিষ্কার করেন এবং এই দেশজ সংস্কৃতির মিলিত ধারা থেকে বাঙালি মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করেন। ওয়াহাবি আন্দোলনের ফলে বাংলার নববর্ষ, নবান্ন, পৌষপার্বণ প্রভৃতি উভয় সম্প্রদায়ের মিলিত উৎসব হিন্দুধর্মীয় উৎসব হিসাবে চিহ্নিত ও বর্জিত হয়। এবং বাঙালির সমাজ-জীবনেব সাথে সম্পর্কহীন শুষ্ক কঠোর পরওয়ানাতে শরিয়ত রক্ষা ও শুদ্ধির ছাপ মেরে বাঙালি মুসলমানের সামাজিক প্রগতি ও সম্প্রীতির দ্বাররুদ্ধ করা হয়।

একই সাথে একথা না বললে অনুচিত হবে যে, মুসলমান শাসকরা বহু চেষ্টা করেও উলেমাদের দিয়ে শরিয়তিব্যবস্থার নিগড়ে রুদ্ধ করতে পারেনি। পির সুফিদের মিলনের ধারা, তাঁদের মারফতি সাধন পদ্ধতি বাংলা সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে নেওয়ার সহজ সাধন পদ্ধতি অন্ত্যজ হিন্দুরা তাদের কাছে টেনে নিয়েছিল এবং গণদেবতার আসনে বসিয়েছিলেন তার অপমৃত্যু ঘটল। রবীন্দ্রনাথের 'সেতু বাঁধার কাজ' স্তব্ধ হল। অস্তমিত হন হিন্দু-মুসলমান মিলনের লোকসাহিত্য-সংস্কৃতির

'শুন বাপ সবারই একই ঈশ্বর
নাম মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে
পরমার্থে এক কহে কোরানে পুরানে।।' অথবা

'মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ।।'

বাংলার মিলনের যুগ-বাহিত ঐতিহ্য পিছনের সারিতে চলে যেতে বাধ্য হল।

মইনুল হাসানের এ কথা অবশ্যই মানতে হবে বিভিন্ন আইন বিচার-ব্যবস্থা সবই গিয়েছে গরিব চাষিদের বিপক্ষে। কৃষ্ণদেব রায় এক ফরমানে তার জমিদারির মধ্যে পাঁচ দফা নির্দেশ জারি করেন— (১) যাহারা তিতুমীরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ওয়াহাবি হবে, দাড়ি রাখবে গোঁফ ছাটবে তাহাদের প্রত্যেককে ফি দাড়ির উপর আড়াই টাকা ফি গোঁফের উপর পাঁচ সিকা খাজনা দিতে হবে। (২) মসজিদ প্রস্তুত করলে প্রতি কাঁচা মসজিদের উপর পাঁচশত টাকা, পাকা মসজিদের জন্য এক সহস্র টাকা নজরা দিতে হবে। (৩) পিতা-পিতামহ যে নাম রাখিবে সেই নাম পালটাইয়া ওয়াহাবি মতে আরবি নাম রাখিলে প্রত্যেক নামের খারিজানা ফি পঞ্চাশ টাকা জমিদার সরকারে জমা দিতে হইবে। গো-হত্যা করিলে হত্যাকারীর ডান হাত কাটিয়া লওয়া হইবে, যাহাতে সে ব্যক্তি আর গো হত্যা করিতে না পারে। (৫) যে ব্যক্তি ওয়াহাবি তিতুমীরকে বাড়িতে স্থান দিবে তাঁকে ভিটে মাটি ছাড়া করা হইবে।[৪৩] মইনুল এও উল্লেখ করেন 'বাংলায় হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত যে মুসলমান সম্প্রদায় তারা ধর্মীয় আচার সমালোচনা করায় তিতুমীরের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা তিতুর বিরোধী ছিলেন।' (প্রাগুক্ত)। শোনা যায় জোলারা দাড়ি রাখলে জমিদার তাদের দাড়ি হিন্দু নাপিতের প্রস্রাব দিয়ে ধুয়ে কামিয়ে দিত। এমনকী জোলা পাড়ার মসজিদের আজান ধ্বনিকে জমিদার পুত্ররা বিকৃত উচ্চারণ করে চিৎকার করত। জমিদারকে অভিযোগ করলে তিনি পুত্রদের শাসন করা দূরে থাক বরং উৎসাহ দিতেন। একদিন একজন জোলা রায়ত প্রচণ্ড ক্ষোভে জমিদার পুত্রকে চড় মারলে জমিদারের নির্দেশে তার অনুচররা নমাজরত অবস্থায় ওই ব্যক্তির মুখে শূকরের মাংস গুজে দেয়।[৪৪] এর পাল্টা হিসাবে তিতুমীর ১৮৩১-এর ৬ নভেম্বর পুরা গ্রাম আক্রমণ

করেন। উত্তপ্ত শিষ্যদের দ্বারা গো-হত্যা করে গো-রক্ত মন্দিরে নিক্ষিপ্ত হয়, হাট প্রভৃতি লুট হয়।'[৪৫] আমাদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় উভয় পক্ষের উগ্রধর্মীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে শ্রেণিদ্বন্দ্ব চাপা পড়ে যায়। শ্রেণি শত্রুরা আড়ালে সুরক্ষিত থাকে।

আরও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে আলোচনায় আনতে হবে, বাংলার দুই জায়গায় মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলনের উত্থান হয়েছিল প্রথমটি ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরে, যা ফরাজি আন্দোলন বলে খ্যাত। অপরটি ২৪ পরগনার বারাসতে যা ওয়াহাবি আন্দোলন বলে খ্যাত। ফরাজি আন্দোলনের প্রথম নেতা ছিলেন মাদারিপুর মহকুমার জামাই হাজি শরিয়ত-উল্লাহ। তাঁর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র দুদু মিঞা নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। নেতৃত্ব হাতে নিয়েই দুদু মিঞা কোরানের ভাষ্য অনুসারে ঘোষণা করেন— ঈশ্বরই সমস্ত জমির মালিক, সুতরাং জমিদার কোনও খাজনা বা কর আদায় করতে পারবে না। জমিদার ও নীলকরদের কাছ থেকে মুসলমান কৃষকদের রক্ষা করার জন্য তিনি অসামান্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি কোরানের ভাষ্য অনুসারে উঁচু-নিচু ভেদাভেদ বিলোপ করে সামাজিক জীবনে সাম্য প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। এই আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান জমিদাররা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। এই সংগ্রামের একটা শ্রেণিদৃষ্টিভঙ্গির কারণে শুধুমাত্র দরিদ্র মুসলমান চাষিরা এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আসল ঘটনা হল এই আন্দোলন চলে গিয়েছিল হিন্দু জমিদারদের বিরুদ্ধে। 'ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলন বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক জীবনের ক্ষতি করেছে প্রভূতভাবে। যে লোকসংস্কৃতির উত্তরাধিকার আমাদের ছিল, সংস্কারের নামে. কোরানের নির্দেশ বলে তা প্রায় ছাঁটাই করে দিল এই আন্দোলন। বাংলার নতুন ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান সকলেই এই উৎসব পালন করত। মুসলমান পুরাতনপন্থীরা প্রচার করলেন এটা পালন করা নাকি হারাম। হিন্দুদের পূজা পার্বণে মুসলমানদের যে সোৎসাহ অংশগ্রহণ দেখা যেত তাতে ভাটা পড়েছিল। তারপর মুসলমান বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে নাচগান, বাজনার ব্যবস্থা ছিল, বিশেষত, মেয়েদের মধ্যে সে সব প্রায় উঠে গেল, ঘট, আমপাতা, ধান দূর্বা, কলাগাছ ইত্যাদির ব্যবহার ছিল। ইসলামি বিশুদ্ধবাদীদের কোপে পড়ে সে সব ছাটাই হয়ে গেল।'[৪৬] কথাগুলো অত্যন্ত বলিষ্ঠতার সাথে বলে মইনুল হাসান অন্য সমস্ত চিন্তানায়কদের সঙ্গে চিন্তার সহমত হয়ে স্বীকার করে নিলেন যে, এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন গ্রামের কৃষিজীবী হিন্দুমুসলমানের মিলিত লোকসংস্কৃতির দ্বার রূদ্ধ করে দিয়েছিল।

ওয়াহাবি ও ফরাজিদের আন্দোলনের ধর্মীয় ও দৃষ্টিভঙ্গিগত অনেক পার্থক্যও পরিলক্ষিত হয়। ধর্মীয় এই আন্দোলন দুটিকে অনেকেই এক বলে ভুল করেছিলেন। তুরস্কের দুর্নীতিপরায়ণ সরকারের বিরুদ্ধে স্থানীয় মুসলমানগণ বিদ্রোহ শুরু করলে এই আন্দোলন এশিয়ার দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তুরস্কের ওয়াহাবিদের আন্দোলন আমাদের দেশেও বিস্তারলাভ করেছিল।

একে অপরের দ্বারা ফরাজি ও ওয়াহাবিরা প্রভাবিত হলেও অনেক পার্থক্য বিদ্যমান ছিল। যেমন ফরাজিরা তকলিদ এর সমর্থক আর ওয়াহাবিরা ইজতেহাদ এর সমর্থক। ফরাজিরা সুফিবাদকে ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত বলে মনে করতেন। হিন্দু ওয়াহাবিরা তাকে ইসলাম বিরোধী বলে বর্জন করেছিলেন। এছাড়াও ফরাজিরা মনে করত ইংরেজের অধীন ভারত 'শত্রুর দেশ' সুতরাং এদেশে ঈদ্ এবং জুম্মার নমাজ পড়া বন্ধ রেখেছিলেন, কিন্তু ওয়াহাবিরা এই দুটি নমাজ বন্ধ রাখা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।[৪৭] সঙ্গত কারণেই আমাদের মনে হয়েছে ওয়াহাবিদের থেকে ফরাজিদের দাবিগুলি অনেক বেশি রাজনৈতিক ছিল। পরিশেষে উল্লেখ্য যে ধর্মীয় উগ্রতার কারণে অন্ত্যজ হিন্দু কৃষককুল, ভূমিহীন খেতমজুররা এই দুটি আন্দোলনের সাথে থাকেননি। শোনা যায় তিতুমীরের দলে একজন মাত্র হিন্দু ছিল, পরে জানা যায় সে লোকটি একজন বিকৃত মস্তিস্ক। এই কারণেই বিশিষ্ট বাঙালি বুদ্ধিজীবী আবদুল ওদুদ ওয়াহাবি আন্দোলনকে বঙ্গের মুসলমান সমাজের পশ্চাদপদতার অন্যতম কারণ বলে মনে করেন।[৪৮]

বাংলার নবজাগরণের প্রভাব ও সাম্প্রদায়িকতা

আগের অধ্যায়ে আমরা আলোচনায় এনেছি বাংলার লোকসংস্কৃতিতে বহমান সম্প্রীতির স্রোতধারা কীভাবে হারিয়ে গেল। তিতুমীরের ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রভাব এর একটি কারণ হলেও একমাত্র কারণ নয়। যারা একে একমাত্র বা প্রধান কারণ বলে মনে করেন তাঁরা প্রকৃতপক্ষে তিতুমীরের আন্দোলনের ব্যাপ্তিকে ঐতিহাসিক সত্যর চেয়ে অনেক বেশি বলে পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নেন।

বাংলার নবজাগরণ এই অভিধাতে যিনি সর্বপ্রথম অভিহিত করেন তিনি ব্রাহ্মসমাজের ধর্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন। সেই সময় শ্রীঅরবিন্দ এবং যদুনাথ সরকারও একে পুনর্জাগরণ বলে উল্লেখ করেন। যদুনাথ সরকার তাঁর History of Bengal এর শেষ পৃষ্ঠায় লেখেন 'Plassey marked the dawn of Renissance more glorious than ever taken place.' ঐতিহাসিক বরুণ দে মনে করেন রাজা রামমোহন রায় এ ধরনের কথা থেকে খুব দূরে ছিলেন না।[৪৯]

১৯১০ সালে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের রেনেসাঁসের কথা বলেন। তিনি বলেছেন, প্রায় দেড়শো বছর ধরে প্রাচীন হিন্দুধর্ম সম্পর্কে চর্চার ফলে হিন্দু সভ্যতার পুনর্জন্ম হয়েছে, যেটাকে পরবর্তী যুগে ঐতিহাসিকরা 'Revivalism— Hindu Revivalism বলে থাকেন। শ্রী অরবিন্দ লিখেছেন এই প্রাচীন চিন্তার পুনর্জন্মের উপর নির্ভর করেই ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে, ভারতের সভ্যতাকে পুরোপুরি হিন্দুত্ব মেনে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে, তা নয় তো ভারতের উন্নতির কোনও পথ নেই।' অধ্যাপক দে আরও দেখান যে, 'শ্রী অরবিন্দ

শংকরের ব্রহ্মসূত্রের কথা বলেছেন। রাজারামমোহন রায়ও শংকরের ব্রহ্ম সূত্রের কথা বলেছেন।'[৫০]

রেনেসাঁস এই অভিধা নিয়ে কলকাতার মুৎসুদ্দি ও বেনিয়ারা উদ্বাহু নৃত্য শুরু করলেন। প্রথম কথা রেনেসাঁসের উষার আলো এত অনুজ্জ্বল ও অপরিসর ছিল যে কলকাতার বাইরে পৌঁছানোর সাধ্য তার ছিল না। আমরা যদি রেনেসাঁসের প্রবক্তাদের নিয়ে একটা বর্ণগত সমীক্ষায় আসি তবে দেখব রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর বা সবাই ব্রাহ্মণ ছিলেন। এর পরবর্তীতে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য বা উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। এমনকী ইয়ং বেঙ্গল সোসাইটির সদস্যরা ও ডিরোজিয়ানরা সকলেই ছিল উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু। এরা রেনেসাঁসের ফলস্বরূপ আত্মোন্নতির বাইরে কিছু ভাবেননি। এদের এই গোষ্ঠীতে মুসলমানদের কথা ভাবা তো দূর অস্ত, এমনকী হারু চাড়াল-রাম কৈবর্তদেরও কোনও স্থান ছিল না। নবজাগরণের নাম করে বাংলার অন্য সমস্ত সংস্কৃতি-কেন্দ্রগুলিকে বন্ধ করে দিয়ে এক মাত্র সংস্কৃতির কেন্দ্র হল কলকাতা। আর সেই সংস্কৃতি হল ব্রিটিশ বণিকদের অবৈধ সম্ভোগে সৃষ্টি এক জারজ সংস্কৃতি। বিনয় ঘোষ তাঁর 'বাংলার নব জাগৃতি একটি অতি কথা'তে লেখেন— 'পণ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলার যে নবজাগরণের কথা বলেন সেটা কী পদার্থ? কোথায় এবং কখন 'জাগরণ' হল? জাগল কারা? কলকাতা শহর যদি 'নবজাগৃতি কেন্দ্র' হয়, যদি রেনেসাঁসের সূর্য-জ্যোতির কনকপদ্মের মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও দেড়শো বছর পরেও কেন অমাবস্যার রাতের অন্ধকার? কেন অতীতের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্য?'[৫১] তিনি আরও লিখেছেন 'এই সমস্ত ব্যক্তিগত বিলাস ও মর্জি চরিতার্থের জন্য অজস্র অর্থব্যয় ছাড়াও কেবল যৌথ সম্পত্তির ভাগ বাটোয়ারার জন্য মামলাতে (অনেক সময় পুরুষানুক্রমে কত লক্ষ লক্ষ টাকা যে খরচ হয়েছে তার কোনো হিসাব নেই, আজ পর্যন্ত কেউ তার আনুমানিক হিসাব করার চেষ্টা করেননি। অন্নপ্রাশন বিবাহ, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি ব্যাপারে রাজসূয় যজ্ঞের মতো খরচের কথা উল্লেখ না করাই ভালো।) এই বিচিত্র অপব্যয়ের একটা অনুমানিক হিসাব করাও যদি সম্ভব হত, তাহলে দেখা যেত যে, সেই অর্থ দিয়ে আমাদের দেশ শিল্পায়নের (Industrialisation) পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারত,...'[৫২] যাইহোক না কেন এর ফলে পরজীবী বাঙালিবাবু কালচারের সাথে শ্রমজীবী মানুষ সে হিন্দুই হোক আর মুসলমানই হোক তাদের সুদূর পার্থক্য সূচিত হল। শুধু তাই নয় শ্রমজীবী মানুষ এদের অনেককেই শ্রদ্ধার আসনে রাখেননি।

বাংলায় নবজাগরণ ইউরোপের ধরনে ঘটেনি। না ঘটার প্রধান কারণ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে বা উপনিবেশিক পুঁজির বিরুদ্ধে প্রথমত বাণিজ্যপুঁজি (Markentile Capital) ও শেষত, শিল্পপুঁজির বিকাশ ঘটানোর চেষ্টা হয়নি, এবং এদের সৃষ্টিও ইউরোপের পুঁজির

মালিকদের মতো হয়নি। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই বিষয়টা পরিষ্কার হবে। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ, পাইকপাড়ার গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, দর্পনারায়ণ ঠাকুর থেকে কালীপ্রসন্ন সিংহের পূর্বপুরুষরা ক্লাইভ, রামবেল্ড বা মিডিলটনদের দেওয়ান ছিলেন সেই সুবাদে তারা কলকাতায় বসে জমিদারি কিনতে সক্ষম হন। আবার শীল, শেঠ, লাহা, মল্লিক, দত্তরা ইংরেজদের ঠিকাদারি করে বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। এদের মুনাফার হার বিশ্বের যে কোনও সময় যে কোনও ব্যবসাব পক্ষেই ঈর্ষণীয়। আমরা এও জানি ইংরেজ বণিক গোষ্ঠীর সহায়তায় দ্বারকানাথ ঠাকুর কী বিপুল পরিমাণ অর্থের মালিক হয়েছিলেন। আগেও উল্লেখ করেছি, মার্কস যেভাবে ভেবেছিলেন সেভাবে ভারতীয় পুঁজির বিকাশ হয়নি বুর্জোয়া শ্রেণির স্বাভাবিক বিকাশের সম্ভাবনার অভাব দেখে মার্কস তাঁর ভারতীয় ইতিহাসের খসড়াতে লেখেন 'Results of settlement' First Product of this Plunder of communal and Private Property of the ryots : whole seris of Local rising of the ryots against the 'Land Lords' (Confaced on them involving in some cases expulsion of the Zamindars and sleeping of the East India co. into their places as owners : other cases, improvishment of the Zamindars and Compulsory on voluntary sale of their estates to pay of the arrears and private debts. Hence greeters party of the province's Landholdings fell rapidly into the heads of a few city capitalist who had spare capital and reality invested in Land.' (Notes on Indian History—Karl Marx) এই বিপুল পুঁজির মালিকরা এছাড়া বিনিয়োগের আর কোনও পথে যাননি। ফলে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ দিয়ে পায়রাব বিয়ে দেওয়া বাইজি নাচানো থেকে যে কোনও অজুহাতে সাহেবদের নিয়ে মদ-মেয়েছেলের মোচ্ছব করার প্রতিযোগিতা একটা সাধারণ নিয়মে দাঁড়িয়েছিল। দ্বারকানাথ ঠাকুরের ইউরোপের জীবনযাত্রা প্রণালী রূপকথার গল্পকেও হার মানায়। এর জন্য তাঁর পুত্র দেবেন্দ্রনাথকে জমিদারির এক বিপুল অংশও বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়।

ভাষা-শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ইতালি তথা ইউরোপে যেভাবে স্বাধীন চিন্তার বিকাশ ঘটেছিল, বাংলার সেরকম দাবি করা চলে না। মেকলে চেয়েছিলেন 'লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের আমরা শাসন করি তাদের এবং আমাদের একশ্রেণির মানুষ সৃষ্টি করার জন্য আমাদের যথাসাধ্য করা উচিত। যে মানুষরা রক্ত ও ত্বকের পরিচয়ে হবে ভারতীয়— কিন্তু রুচি মতাদর্শ, নীতিবোধ এবং প্রজ্ঞায় হবে ইংরেজ।'[৩৫] মেকলের ঘোষণার পাঁচ বছর আগে ১৮৩০ সালেই ডিরোজিও শিষ্যগণ আত্ম পরিচয়ে একই কথা বলেছিলেন।

> 'জন্ম-সূত্রে হিন্দু, কিন্তু শিক্ষা ও আনুষঙ্গিক বিষয়ে ইউরোপীয়, তাদের মনোভঙ্গি প্রচারের জন্য প্রয়োজন একটি মাধ্যমের, একটি ফলকের যাতে তাদের চিন্তাধারা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হবে।'[৩৪]

যে সাহিত্য সৃষ্টি দিয়ে জাগরণ ও স্বদেশ প্রেমের উন্মেষ ঘটেছিল বলে ধরা হয় সেই

আনন্দমঠ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কখনওই সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সাহস দেখাননি। তিনি বিদ্রোহের সাহস দেখিয়েছিলেন পরাভূত মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে। বাংলার সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্যের শুরু এখান থেকেই। চাকুরি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং মেকলের প্রস্তাবানুযায়ী 'আদর্শ ভারতীয় পুরুষ'। আনন্দমঠ কখনওই ইংরেজ বিরোধী উপন্যাস নয়। বরং বঙ্কিম ভাষ্যে দেখা যায় 'সমাজ বিপ্লব অনেক সময় আত্মপীড়নমাত্র।...'[৫৫] পাবনা বিদ্রোহের সময় বঙ্কিমচন্দ্র মীর মোশারফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নাটক বন্ধ করার পরামর্শ দেন 'জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া নাকি অনুচিত!' বদরুদ্দিন উমরের মূল্যায়ন—

> 'যে ব্যক্তি কৃষকদের দুরবস্থার মূল কারণ অপসারণের বিরোধী, তিনি সেই দুরবস্থাকে বর্ণনার ক্ষেত্রে নিজের সাহিত্যিক প্রতিভার এবং বাকচাতুর্যের একটা স্বাক্ষর রাখতে পারেন, কিন্তু তার দ্বারা সামাজিক চিন্তা এক পাও অগ্রসর হয় না।... বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের কৃষকদের শ্রেণিশত্রু ছিলেন।'[৫৬]

আরও বলার কথা বঙ্কিমের রাজভক্তি ও মুসলমান বিদ্বেষকে এখনও আদর্শ করতে পারেন ভারতের বর্তমান হনুমান দল। মুসলমান শাসন অনেক আগে শেষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাহিত্যে বিদেশি মুসলমান শাসনের অবসান চান। হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও দীনবন্ধু মিত্রর মতো কতিপয় জাগরিত মানুষ অত্যাচারিত নীল-চাষিদের পক্ষে দাঁড়ান। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ব্রিটিশের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে নীলদর্পণ অনুবাদ করেন। আদালতে মধুসূদন ও রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর জরিমানার টাকা সাথে সাথে দিয়ে দেন বিদ্যাসাগর। এছাড়া তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই কৃষক সাধারণের সংগ্রাম সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন।

ইউরোপের মতো এখানে ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির স্বাধীন বিকাশ হয়নি, যা হয়েছে সবই ইংরেজি ভাষার অনুসরণে। 'এরা এমনকী মাতৃভাষার বদলে ইংরেজি ভাষাকে আদান-প্রদানের ভাষা বলে ধরে নিয়েছিলেন। ১৮৯৭ নাটোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনে বাংলায় বক্তৃতার দাবিতে একদল যুবকের সাথে রবীন্দ্রনাথও সোচ্চার হলে কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র ব্যানার্জি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন— রবীন্দ্রনাথ তো ওরকম বলবেনই। কারণ তিনি তো ইংরেজি তেমন ভালো জানেন না!'[৫৭] বিদেশি অন্ধ অনুকরণ দেখে রেনেসাঁসের তৃতীয় প্রজন্মের অন্যতম নায়ক বিপিনচন্দ্র পাল চরম আত্ম বিকারে লিখেছেন—

> 'আমাদের ব্যক্তিত্ব বিদেশি টবে গঠিত হয়েছে, না ঠিক টবেও নয়, অর্কিডের মধ্যে আমাদের পৌরুষ ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তিত্ব, আমাদের জাতি ও জীবনের কর্মপ্রবাহ আমাদের পিতৃপুরুষদের সনাতন ঐতিহ্যে এর কোনও শিকড় নেই।... সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক ব্যাপার এই যে তা (ইংরেজী শিক্ষা) আমাদের মন,

আমাদের হৃদয়, আমাদের ব্যক্তিত্ব এবং আমাদের পৌরুষকে আমাদেব জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।'[৫]

দাসত্ববরণের এই আত্মগ্লানি সত্য এবং বাংলার জাগরণের এই নির্মোহ আত্মোপলব্ধিও সত্য। বাংলার রেনেসাঁসের আরও একটি দুর্বল দিক নিয়ে আলোচনার দরকার আছে। রামমোহন বিদ্যাসাগর সমাজ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন একথা সত্য। ইউরোপের রেনেসাঁস সফল হয়েছিল জসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা গ্রহণে। রামমোহন বিদ্যাসাগররা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই সংস্কার যজ্ঞে আশানুরূপ সাড়া পাননি। রামমোহন নব জাগৃত ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামীদের পেলেও তারা সংখ্যায় অত্যল্প ছিলেন বলেই তাকে সতীদাহ আইন প্রণয়নের উপর জোর দিতে হয়। বিদ্যাসাগর দীর্ঘ ধারাবাহিক প্রচারের মধ্য দিয়ে কিছু লোককে তাঁর পাশে পেয়েছিলেন। তাঁর পাশে যারা দাঁড়িয়েছিলেন তারা সবাই সমান আদর্শবাদী ছিলেন না। অনেকেই তার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তাঁকে প্রতারণা করেছেন। অবশ্য একশো না বললে অন্যায় হবে, বিদ্যাসাগর শেষদিন পর্যন্ত নিজের আদর্শে অবিচল ছিলেন।

বাংলার ইতিহাসে রেনেসাঁসকে প্রথম লিপিবদ্ধ করেন ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার। এই সময় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির স্কুলের জন্য তাঁর ভাষায় বামপন্থী রাজনৈতিক কর্মীদের জন্য ঊনবিংশ-শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনের পটভূমিকায় রচনা করেন বিখ্যাত 'নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁস'। অত্যন্ত উদারদৃষ্টিতে তিনি এর ব্যাখ্যা করেন। নব-জাগৃতিরা সিপাহী বিদ্রোহের তীব্র বিরোধী ছিলেন, এই সমালোচনার উত্তরে মার্কসীয় বীক্ষণে দীক্ষিত এই ঐতিহাসিক লেখেন 'দেশের নবজীবন থেকে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা অনেকটা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকেন, একথা বলা চলে। মহাবিদ্রোহের করাল রূপে তাঁদের আতঙ্ক পাবারই কথা, সে জন্য দোষ দেওয়া অন্যায়। কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে আমরা আজও আশ্রয় করে থাকব অমন কোনো বাধ্যবাধকতা নেই' ('সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস' পরিচয়, শ্রাবণ ১৩৬৪)। তাঁর এই মূল্যায়ন অতি সরলীকরণ ও অতিকথন হয়েছে এই অভিযোগ তোলে তার ছাত্ররা। একাডেমিক মহল থেকেও সমালোচনার ঝড় উঠলে তিনি তাঁর 'নোটস অন বেঙ্গল রেনেসাঁস' এর পুনর্মূল্যায়ন করে একটি সংযোজনী টীকা লেখেন। তাঁর এই সংযোজনী টীকা ভাস্বর হয়ে আছে রেনেসাঁসের মূল্যায়নে।

'আমার মতে বাংলা রেনেসাঁসের মূল সীমাবদ্ধতা ছিল তিনটি— (১) আমাদের জাগরণের অধিকাংশ প্রতিনিধিই প্রগতিকে ব্রিটিশ শাসনের সমার্থক হিসাবে গণ্য করেছেন, এবং ব্রিটিশরা যে আমাদেরকে আধা উপনিবেশিক দাসত্ব ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণে আবদ্ধ রেখেছিল সেকথা এড়িয়ে গেছেন; (২) আমাদের রেনেসাঁসের আলোকপ্রাপ্তরা আমাদের জনগণের ব্যাপক অংশের থেকে দুস্তর ব্যবধানে অবস্থান করেছেন, বাস করেছেন নিজস্ব জগতে; (৩) আমাদের আন্দোলনের

জাগরিত ভদ্র-লোকদের মধ্যে সাধারণ বিরাজমান হিন্দুধর্মীয় পক্ষপাতিত্ব মুসলিম চেতনাকে বিচ্ছিন্ন না করে পারেনি। যার পরিণতি হয়েছিল দুর্ভাগ্যজনক এবং আমাদের বিদেশীয় ব্রিটিশ শাসকদের কাছে আনন্দদায়ক।'[৫৮] (নীচের দাগ-তথ্যসূচি দ্রষ্টব্য)

একথা জোর দিয়ে বলা যায় শুধু ওয়াহাবি আন্দোলন নয় নব জাগ্রত হিন্দু বাঙালি সমাজ আরও বেশি সুবিধা পাওয়ার আশায় শুধু মুসলমান সমাজেকেই বিচ্ছিন্ন করেনি বিচ্ছিন্ন করেছিল দরিদ্র অন্ত্যজ হিন্দু সম্প্রদায়কেও। রাজভক্তি প্রদর্শনের মূল্যস্বরূপ যুগব্যাপী গড়ে ওঠা সম্প্রীতির সেতুকে ভেঙে দিতে কসুর করেনি। ধনিক ও মধ্যবিত্তের স্তরে বাঙালি হিন্দুদের সঙ্গে বাঙালি মুসলমানদের বিচ্ছেদ তো হয়েছিলই, 'শিক্ষিত এলিটের স্তরেও হয়েছিল।'...

'যদি ঐতিহাসিক সত্য বিকৃত না করে বাংলাদেশ থেকে আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয়, তাহলে তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিকাশ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। এইভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন থেকে আধুনিক জাতীয়তাবোধের উন্মেষও ক্রমবিকাশের ইতিবৃত্ত রচনা করতে হয়, তাহলে তা মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধের বিকাশ ছাড়া আর কিচু বলা যায় না। এইভাবে বাঙালি মুসলমান সমাজ উনিশ শতকের শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার ফলে পরবর্তীকালে নতুন উদীয়মান বাঙালি ধারার সঙ্গে একাত্মতা স্থাপন করতে পারেননি। তার আগেই উভয় সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক সামাজিক দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল খণ্ডিত বাংলাদেশ।'[৫৭]

হিন্দু মুসলমান বিচ্ছেদের ফল প্রত্যক্ষে আসে ১৯০৫ সনে বঙ্গভঙ্গের কালে। কার্জন পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে তার বক্তৃতায় তুলে ধরেন যে পূর্ববঙ্গে কৃষকদের সর্ববৃহৎ অংশই মুসলমান আর জমিদারদের বৃহৎ অংশই হিন্দু। জমিদারদের প্রত্যক্ষ শোষণের ফল মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছিল শুধু পূর্ববঙ্গই নয় যুক্ত বঙ্গের প্রজারা। জনজাতিগোষ্ঠীগুলির যত ক্ষোভ ছিল ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে তার বহু গুণ ক্ষোভ ছিল দেশীয় জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। বঙ্গভঙ্গের কালে রবীন্দ্রনাথ হিন্দু মুসলমান বিরোধের বিষয়ে মর্মোপলব্ধি করেছিলেন—

বঙ্গ বিচ্ছেদ ব্যাপারটা বাঙালির অন্ন-বস্ত্রে হাত দেয় নাই, আমাদের হৃদয়ে আঘাত করিয়াছিল। সেই হৃদয়টা যতদূর পর্যন্ত অখণ্ড ততদূর পর্যন্ত তাহার বেদনা নিরবচ্ছিন্ন ছিল। বাংলার মুসলমান যে এই বেদনায় আমাদের সঙ্গে এক হয় নাই তাহার কারণ তাহাদের সঙ্গে আমরা কোনওদিন হৃদয়কে এক হইতে দিই নাই।[৬০]

নবজাগরণের প্রভাবে মুসলমান সমাজের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব মুসলমান সমাজে কীভাবে পড়েছিল সে আলোচনাও এখানে সম্পৃক্ত হওয়া জরুরি। আমির আলি, আবদুল লতিফরা হিন্দু পুনরুত্থানের ভুল দিকগুলি অনুসরণ করে ইসলামি পুনরুত্থানের প্রয়াসী হলেন। 'বাংলার পরিবর্তে আরবি ও উর্দু মুসলমানের জীবনের ধর্ম ও সমাজবোধের একমাত্র রক্ষাকবচ এই বোঝালেন।''... মুসলমান তার ধর্ম ও সমাজের মধ্যেই বন্দি হয়ে থাকল। কেবল শেকলটি এবার নতুন করে সোনার তৈরি হল।'[৬১] হোসেনুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলি দরিদ্র নিম্নবর্ণের আজলফ আতরাফ মুসলমানদের কাঁটার শৃঙ্খল আরও সুদৃঢ় হল। আমির আলিরা হিন্দু রিভাইভালিস্টদের পথেই হাঁটলেন। আগে ইংরেজি শিক্ষা পরে চাকরি। তারপর রাজনীতি— পৃথক রাজনীতি মুসলমান চেষ্টা করল কত বেশি সরকারি আমলা বা রাজকর্মচারী পদে মুসলমানকে ঢোকানো যায়, তাতেই তাদের মোক্ষ। চিন্তার মুক্তি কখনওই মুসলমান বুদ্ধিজীবী সমাজ চাননি। 'এহেন আবদুল আলি Muslim Institute Journal-এর সম্পাদক, মুসলমানদের আধুনিকতার পথে পরিচালনা করার সাহস পাননি। সেই আরবি উর্দুতে বাধা পড়েছেন। ভারতীয় মুসলমানের জীবনে এই হল সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি।'[৬২] এমনকী অত্যন্ত দেরিতে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ শুরু করার ফলে তারা বাঙালি হিন্দুদের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েন। অপরদিকে হিন্দু পুনরুত্থানের রূপকারদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও হিন্দু কলেজের ছাত্ররা চিন্তার মুক্তি ঘটিয়ে দেন। একদিকে যখন মুসলমান আশরাফরা ইংরেজি শিক্ষা, চাকরি ও ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার মধ্যে নিজেদের নিবদ্ধ রাখতে চাইলেন তখন হিন্দু সমাজ নিজেদের ধর্মীয় কুসংস্কার ভাঙার গানে মগ্ন। আবদুল লতিফ, আমির আলিরা কেউই প্রতিভা-ত্যাগ তিতিক্ষায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেনদের মতো উচ্চতায় পৌঁছোতে পারেননি। অন্য দরিদ্র কৃষিজীবী মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যযুগীয় অন্ধকারে নিবৃত্ত হতে লাগল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে—

> 'যদিও বাঙ্গালী জাতির অর্ধেকের উপর এখন মুসলমান করিয়াছে, ইহা লক্ষণীয় যে অতি অল্প কয়েক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত মুসলমান সংস্কৃতি (অর্থাৎ আরবি, ফারসি ও উত্তর-ভারতীয় মনোভাব বা বাস্তব সভ্যতা, রীতি-নীতি এবং চিন্তা প্রণালী) বাঙ্গালী জীবনেও তেমন কার্যকর হয় নাই।'[৬৩]

আবার তিনি বলেন—

> 'ফরমাইশ দিয়া ইচ্ছামতো 'জাতীয় সংস্কৃতি' তৈয়ার করা চলে না। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবনে যেটুকু মুসলমান প্রভাব বিদ্যমান, ধীরে ধীরে এই পাঁচ-ছয়-সাত শত বৎসর ধরিয়া ইসলামগত-প্রাণ পূর্ণবিশ্বাসী আলেম মোল্লা মৌলবীদের চেষ্টাতেই হইয়াছে। সম্প্রতি বাঙ্গালী মুসলমানদের কেহ-কেহ যেভাবে বাঙ্গালায় 'ইসলামি সংস্কৃতি' আনিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহার মধ্যে positive অর্থাৎ

> সংগঠনকারী দিক অপেক্ষা negative অর্থাৎ ধ্বংসকারী দিকটাই প্রবল। ইঁহাদের কাছে ইসলামীয় মনোভাব মানে মুখ্যত যাহা ভারতীয়ত্বের বা হিন্দুত্বের বিরোধী, কারণ ভারতীয়ত্ব বা হিন্দু ইঁহাদের চোখে 'কুফর' বা বিধার্মিকত্ব এবং 'শিরক্' বা বহু-দেব-বাদিত্বের নামান্তর।'[৬৪]

এমতাবস্থায় আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে মহিয়সী ও দ্রোহী বেগম রোকেয়া সক্ষোভে মন্তব্য করেন 'বাঙালী না মুসলমান' এই শিরোনামে লেখেন—

> একজন পাঞ্জাবী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি পাঞ্জাবী, একজন হিন্দুস্থানী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে বলবেন তিনি হিন্দুস্থানী; একজন সিন্ধী মুসলমান বলবেন সিন্ধী। কারণ সকলেই নিজ নিজ দেশের পরিচয় দিয়ে থাকেন। অথচ তাদের মুসলমানত্বের ব্যাপারে কেউ সন্দেহ পোষণ করে না। একজন বাঙালী মুসলমানকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলে কিন্তু তিনি বলবেন তিনি মুসলমান।'[৬৫]

এর ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজে জাগরণ বলতে যা বোঝায় তা না হয়ে জাগরিত হয়েছে 'প্যান ইসলামইজম', যা দেখে ক্ষুব্ধ ওয়াজেদ আলি মন্তব্য করেন— 'উচ্চপদস্থ কোনও মুসলমান রাজকর্মচারীর বাড়িতে গিয়ে দেখুন, একটি বাংলা বই কিংবা সাময়িক পত্র দেখতে পাবেন না। অথচ ওই শ্রেণির কোনও হিন্দুর বাড়িতে ও সব জিনিসের ছড়াছড়ি।'[৬৬]
পরিশেষে আমরা আসব—

> 'বাংলার কৃষকের কথা ভাবুন, তার ধর্ম-হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সে বাংলার কৃষক দুঃখে কষ্টে অভাবে দুজনের একটাই ধর্ম ছিল। তাহল কৃষকের ধর্ম। মানুষের ধর্ম। কেবল ঈদের দিনে পুজোর দিনে ওরা মুসলমান, ওরা হিন্দু। জন্ম বিবাহ মৃত্যুতে ওদের ধর্ম পরিচয়। আর ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬০ দিন ওরা শান্তিপ্রিয় মানুষ। খরায়, বন্যায়, দুর্ভিক্ষে শুকিয়ে ক্ষয়ে যায় ওরা। তবু দাঙ্গায় ফ্যাসাদে জড়িয়ে যায় না। কেবলই প্রার্থনায় মগ্ন হতে জানে। এই চাষি মুসলমানের প্রার্থনার প্রতীক 'আল্লা ম্যাঘ দে পানি দে' গোটা বাংলার তৃষ্ণার্ত নর-নারীর জীবনের আকণ্ঠ প্রার্থনা। ...কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রর 'মহেশ' বাংলার চাষির দিগন্ত বিস্মৃত বেদনার চূড়ান্ত ম্যানিফেস্টো। শিল্প যে প্রচারধর্মী না হয়েও অগ্নিশিখা হতে পারে 'মহেশ তার শতকোটি প্রমাণ আমিনা আর আমিনা থাকেনি, বাংলার চাষির বেদনার যন্ত্রণায় জ্যোতির্ময়ী হয়ে উঠেছে।[৬৬]

এই সত্যকে উপেক্ষা করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রভেদের প্রাচীর হয়েছিল আকাশ ছোঁয়া আর ফল হয়েছিল বিষময়।

আর্থিক বৈষম্য

বর্ণগত পার্থক্য নিরুপণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থানকে গৌণ বলে স্থির করার মতো এত বড়ো ভুল আর হয় না। আর্থিক বৈষম্যের প্রধান কারণ শিক্ষার অভাবে মুসলমান যুবকদের চাকরির সুযোগ না পাওয়া। অপর প্রধান কারণটি হল পুরোনো পেশা চলে গেলে নতুন পেশা গ্রহণে অক্ষমতা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান প্রজারা ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। জমির মালিকানা আরও বেশি চলে যায় বর্ণহিন্দুদের হাতে। বহু প্রান্তিক মুসলমান চাষি ভূমিহীন কৃষকে পরিণত হয়ে বেগার শ্রমে বাধ্য হয়। ব্রিটিশের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করে মুৎসুদ্দিবৃত্তির সুযোগ পুরোটাই গ্রহণ করেছিল উচ্চবর্ণের হিন্দুরা, ফলে তারা প্রভূত অর্থ উপার্জন করে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল পুরোপুরি গ্রহণ করেছিল। পুনর্বিনিয়োগের সুযোগ না থাকায় কলকাতার বাবুরা গ্রামের জমিদারি ও রায়তদের জমি অর্থ, প্রতিপত্তির জোরে হস্তগত করতে থাকে। শুধু মুসলমান কৃষকদেরই নয় অন্ত্যজ হিন্দু বাগদি-হাড়ি-চাড়াল যারা এই বঙ্গের প্রাচীন অধিবাসী তারাও ভূমি হারা হয়ে অর্থনীতির প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' এই ভূমিহারাদের উপাখ্যানের প্রতীক হয়ে আছে। শুধু মাত্র পুঁড়া-গ্রামের জমিদার কৃষ্ণদেব রায়ই নয় সমস্ত জমিদারই মুসলমান, বৈষ্ণব ও অন্ত্যজ হিন্দু প্রজাদের উপর মধ্যযুগীয় বর্বরোচিত পন্থায় লুণ্ঠন করত ও অত্যাচার চালাত। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারও আজ সর্বজনবিদিত। হস্ত শিল্পী ও কারিগরদের বৃহৎ অংশই ছিল মুসলমান, বাকিরা অন্ত্যজ। ইংলন্ডের শিল্প বিপ্লব সফল করতে প্রথম দরকার ছিল এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস করা। এর প্রথম ধাপ হিসাবে কোম্পানি শাসকরা ভুবন বিখ্যাত বাংলার বয়ন শিল্পকে ধ্বংস করে ফেলে। ক্রমান্বয়ে চাষের জমি ও হাতের কাজ হারিয়ে বাংলার মুসলমান সমাজ অসীম দূর্দশায় পতিত হন।

এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ হয়নি এমন নয়, কিন্তু কৃষক ও হস্তশিল্পীদের স্বার্থ রক্ষাকারী কোনও রাজনৈতিক শক্তির অস্তিত্ব না থাকার কারণে তা অচিরেই হারিয়ে যায়। কংগ্রেস দল প্রধানত জমিদারের স্বার্থরক্ষাকারী দল, তাদের পৃষ্ঠপোষক ও প্রধানত জমিদার ও মুৎসুদ্দিরা। পরবর্তীতে মুসলিম লিগ দল ও বাংলায় আশরাফদের স্বার্থ রক্ষাকারী দলে পরিণত হয়। বাংলার চরমপন্থী দলগুলি মধ্যবিত্ত ছাত্র-যুবকের পুষ্ট দল, তাদের এ সম্পর্কে কোনও স্পষ্ট নীতি ছিল না। জমিদার, বড় ব্যবসায়ী আর মহাজনদের

বৃহৎ অংশই ছিল উচ্চবর্ণের হিন্দু সম্প্রদায়। এর ফলে রাজ্যের ধন সম্পত্তির এবং বিপুল অংশ কুক্ষিগত ছিল মাত্র কয়েকটি বর্ণভুক্ত শ্রেণির হাতে। গরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গের একটি উদাহরণ থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ১৯৩০-এর যুগেও দেখা যায় সেখানে শহর ও গ্রামের সম্পত্তির শতকরা ৮০ ভাগই হিন্দুদের হাতে। আর তাছাড়া পূর্ববঙ্গের মহাজনি ব্যবসা, আমদানি রপ্তানি প্রভৃতি বেশিরভাগই ছিল হিন্দুদের হাতে। মুসলমান সমাজের মধ্যে জমিদার, ব্যবসায়ী, মহাজন এর সংখ্যা ছিল নগণ্য। মুসলমানরা প্রধানত কৃষক কারিগর ও দিনমজুর। হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই অর্থনৈতিক পার্থক্য ব্যাপক সংখ্যক মুসলমান চাষি ও ঘাতকদের মধ্যে হিন্দু বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করেছিল।[৬৭]

১৮৭১ সালের প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দায়িত্বশীল পদে হিন্দু মুসলমানের তুলনামূলক হার।[৬৮]

সরকারি দপ্তর	হিন্দু	মুসলমান
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টার	১১৩	২০
আয়কর বিভাগ	৪৩	৬
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	২৫	—
নিম্ন আদালতের জজ, মুন্সেফ	২৫	৮
জনকল্যাণ বিভাগ	১৭৮	৩৭
অন্যান্য	৫০	৮

এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় সুমিত সরকারের লেখায়ও—

'The Hindu 'bhadralok castes' were eagrly making the Switch over from Parsian to English education with a confidence but tressed by rising rent receipts from zamindari on tenure holding?

অপরপক্ষে— 'British collectors and district magistrates replaced Muslim anlis and foujdars, the resumption of rent free modad-i-massh Lands ruined hundreds of old families and delta shattering blow to the traditional Islamic educational system Muslim position in the low courts.'[৬৯]

প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় ১৮৭১ সালে ২১১১ জন গেজেটেড অফিসারের মধ্যে ইংরেজ ১৩৩৮ জন, হিন্দু ৬৮১ জন মুসলমানের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯২ জন, আর নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সংখ্যা ছিল নগণ্য।[৭০] ঢাকা নর্মাল স্কুলের শিক্ষক দীননাথ সেন ১৮৭২ সালে লিখেছেন যে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্র ছিল। মুসলমান ও হিন্দুছাত্রদের মধ্যে মানসিকতার পার্থক্য ছিল। হিন্দু ছাত্ররা শিক্ষার শেষে চাকরির জন্য উদ্যোগী হতেন। আর

মুসলমান ছাত্রদের ঝোঁক ছিল ধর্মশিক্ষার উপর তাবা মৌলবি বা আলেম হতে চাইতেন। তাঁর লেখায়—

> '...for while Hindu boys acquire knowledge that services as a passport to Government services or success in literate professions, the absolete learning acquired by Muhammadan lads only makes them Munshis or Maulavis.'[৭২]

আগেও উল্লেখ করেছি মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে ইংরেজি ও আধুনিক শিক্ষার পরিবর্তে আরবি-উর্দু ও ধর্মশিক্ষার ঝোঁকের জন্য, হিন্দু উচ্চবর্ণের ছাত্র, যারা শুধু ইংরেজি শিক্ষাই নয়, আধুনিক শিক্ষার সবটুকু গ্রহণ করার জন্য তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় মুসলমান ছাত্ররা হটে যায়। বাঙালি মুসলমান সমাজের মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব না হওয়ার এটি একটি প্রধানতম কারণ, একমাত্র কৃষিকার্য ব্যতীত অর্থাগমের বা আয়ের সমস্ত উৎসগুলি মুসলমান সমাজের কাছে প্রায় রুদ্ধ হয়ে যায়। এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় ডব্লু.ডব্লু. হান্টারের লেখায় তিনি তথ্য দিয়ে দেখান-উকিল, মোক্তার, ডাক্তার করনিক, ব্যবসায়ী— অর্থাগমের সবকিছু ক্ষেত্রেই হিন্দুদের প্রাধান্য। ভূমিস্বত্বেও তাদের প্রাধান্য হ্রাস পাচ্ছে তাই মুসলমানরা যদি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মসগুল থেকেই ইঁরেজ বিরোধিতা করতে থাকে তাহলে আত্মঘাতই হবে। এই গ্রন্থ সম্পর্কে ঐতিহাসিক যোগেশচন্দ্র বাগল বলেছেন 'হান্টারের এই গ্রন্থখানি কিছু পরেই মুসলমানদের নিকট 'হাদিস'' বলে গণ্য হয়।'[৭২] বেঙ্গল সোশাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে রেভারেন্ড জেমস লঙ বলেন 'বাংলাদেশের কোনো গভর্নমেন্ট অফিসে কোনো মুসলমান উচ্চপদস্থ কর্মচারী তেমন দেখা যায় না। কিন্তু দফতরে মুসলমান পিওন আর দফতরিতে ভরে গেছে।'[৭৩] উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও অধ্যাপকদের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় ২২৮৭ জন হিন্দু আর মুসলমান ৩২০ জন শতকরা ২২ ভাগ।

ইতিমধ্যে ১৮ শতকের শেষদিক থেকে বাংলার কৃষিতে কিছু গুণগত পরিবর্তন সূচিত হয়। এই সময় বিশ্বজুড়ে পাট জাত পণ্যের দাম চাহিদা বৃদ্ধির ফলে পাটের ক্রমবর্ধমান দর বৃদ্ধির লক্ষণ দেখা যায়। উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে দাম বৃদ্ধির ফলে কৃষকের অর্থাগম হতে থাকে। বাংলার কৃষক সমাজ বিশেষত গুণগতমানে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ পাট উৎপাদনকারী পূর্ববঙ্গের কৃষক সমাজ অর্থকরী ফসল হিসাবে পাট চাষ শুরু করে। এর ফলে মুসলমান কৃষক পরিবারগুলির মধ্যে বিশেষত বড়ো ও মধ্য কৃষকদের মধ্যে সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন সূচিত হতে শুরু করে। এর ফলে এই কৃষক পরিবারগুলির পরবর্তী প্রজন্মের সদস্যদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে শুরু করে। ১৮৯৬-৯৭-এ ঢাকায় ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০ আর ফরিদপুরে ৭টি। ১৯২১-২২ ঢাকায় ইংরেজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ঢাকায় ৭৮টি আর ফরিদপুরে ২২টি। দ্বিতীয় পরিবর্তন আসে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের জীবনে। কাঁচা পাট ব্যবসায় মধ্য স্বত্বভোগীর উদ্ভব ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষির হাতে কোনও অর্থাগম তো

হলই না বরং মহাজনের সুদ না দিতে পেরে বহু কৃষকের জোত-জমি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়ে খেত মজুর ও ভাগচাষিতে পরিণত হয়। দুর্দশার কালোছায়া ঘনিয়ে আসে বাংলার প্রান্তিক চাষিদের জীবনে।

আর্থিক বৈষম্য শুধুমাত্র মুসলমান সমাজের প্রতিই ঘটেনি, ঘটেছিল অন্ত্যজ হিন্দুদের ক্ষেত্রে। হাড়ি-মুচি-ডোম-বাগদি-দুলে-চাঁড়ালরা তাদের পুরোনো পেশা ছেড়ে অন্য পেশায় প্রবেশ করতে না পারে তার জন্য তৎপর ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ। আর ঠিক এই কারণেই পূর্ববাংলার নমঃশূদ্র (চাঁড়ালবা) যারা বাহুবলে মুসলমানদের সমকক্ষ বলে ধরা হত তারা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় বর্ণহিন্দুদের পাশে দাঁড়ানোর উৎসাহ দেখাননি। মুসলমান সমাজের সাথে নমঃশূদ্ররা পূর্বপাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এর মধ্য দিয়ে অন্তজ্যদেরও বর্ণহিন্দুদের প্রতি শ্রেণি ঘৃণা বিষয়টা বোঝা যায়।

দেশ ভাগের পর শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানদের একটা বৃহৎ অংশ পূর্বপাকিস্তানে চলে যায়। বর্তমানে মুসলমান পরিবারগুলোর একাংশ বুঝতে সক্ষম হয়েছে যে, পরিবারের মধ্যে বা পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শিক্ষার প্রসার না ঘটাতে পারলে মুক্তি নেই। মইনুল হাসান তাঁর পুস্তিকাতে লিখেছেন স্বনিযুক্তি প্রকল্পে শতকরা ৯৫ শতাংশ মুসলিম প্রায় ১৫০০ জন ঋণ পাচ্ছে। বিগত ২ বছর স্কুলে মুসলিম যুব যে পরিমাণে চাকরি পেয়েছে সেটা রেকর্ড।[৭৪] সঙ্গতভাবে প্রশ্ন জাগে মুর্শিদাবাদ (লেখকের নিজের জেলা) ও মালদহে গত ২ বছরে কত কর্ম সংস্থান তৈরি হয়েছে তার মধ্যে সরকারিভাবে কত মুসলমান যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে। আরও যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আছে বেসরকারি ক্ষেত্রে যেখানে পছন্দ-অপছন্দের সাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে অনেক সময় মুসলমান যুবকরা কাজ পায় না। স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও এ রাজ্যের ২৪ শতাংশ জনগণের পুলিশ, মিলিটারি, স্কুল, কলেজ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান প্রতিনিধিত্ব কত শতাংশ। রাজ্যের এক চতুর্থাংশ জনগণকে উন্নয়নের মানচিত্রের বাইরে রেখে রাজ্যের সামগ্রিক কল্যাণ সম্ভব নয়।

আর্থিক বৈষম্যের প্রসঙ্গে সংখ্যালঘু জনজাতি জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে আলোচনা না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। সাঁওতাল, ওঁড়াও, মুণ্ডা, কোরা, খেরিয়া, শবর যারা বঙ্গের আদিম অধিবাসী কিন্তু যুগ-যুগ ধরে বঞ্চিত। সরলমনা এইসব জনজাতিদের প্রতারণা করা খুব সহজ হত। মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বর্ধমান, নদিয়া থেকে লোভী ব্যবসায়ীরা সস্তা দরে ফসল কিনে চড়া দরে বাজারে ফসল বিক্রি করত। শুধু তাই নয় ধূর্ত ব্যবসায়ীরা গরিব সাঁওতালদের কাছ থেকে মাল কেনার সময় এক রকমের বাটখারা আবার মাল বেচার সময় অন্য বাটখারা ব্যবহার করত। মাল কেনার সময় বেশি ওজনের বাটখানা আর বিক্রির সময় কম ওজনের বাটখারা ব্যবহারের ফলে সাঁওতালেরা দুই দিক দিযে ক্ষতিগ্রস্ত হত। 'এছাড়া মহাজনের দল 'তারা সুদও অত্যন্ত বেশি হারে আদায় কবত।[৭৫] ঐতিহাসিক

কালিকিঙ্কর দত্তর লেখা থেকে আমরা জানতে পারি 'এ সকল শস্যের বিরুদ্ধে দেওয়া হত সামান্য অর্থ, নুন-তামাক অথবা কাপড়। দুমকা মহকুমার কাঁথিকুণ্ডে বসবাসকারী কিছু বাঙালি শষ্য ব্যবসায়ী সাঁওতালদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যের চেয়ে বহু সরিষা বা ধান নিয়ে আসত। তারা সেই শষ্য সিউরিতে চালান দিত।'[৭৬]

'১৯০০ সালে দুর্ভিক্ষের প্রকোপে হাজার হাজার আদিবাসী উক্ত অঞ্চল ছেড়ে সিন্ধু প্রদেশের বহু অঞ্চল থর ও পার্দারে পর্যন্ত চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। প্রাচীনকালে অভ্যাগত আর্যযোদ্ধার আগমনে একবার নদীসিক্ত উর্বর উপত্যকার বসতি ছেড়ে দিয়ে আদিবাসীকে দুর্গম উপলবন্ধুর অরণ্য অঞ্চলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তারপর থেকে দুর্ভিক্ষের তাড়নায় শস্য ও শিকারের জন্য আদিবাসীদের যুগ-যুগ ধরে স্থান থেকে স্থানান্তরে চলে যেতে হয়েছে এবং আদিবাসীদের জীবনে আজও যাযাবরত্বের অস্থিরতা লেগেই আছে। যাযাবরত্বের কারণেই আদিবাসীদের সংস্কৃতিগত উন্নতি হয়নি।' (ভারতের আদিবাসী : সুবোধ ঘোষ, দেশ বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৬, ১৯ বৈশাখ ১৩৫৪। ৩ মে ১৯৪৭ দেশ; সুবর্ণ জয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন পৃ. ১২১)

১৯৩১-এর আদমশুমারির বিবরণ অনুসারে বাংলায় ১৯,২৭,২৯৯ জন আদিবাসী জনসংখ্যার হিসাব পাওয়া যায়। তার মধ্যে গোষ্ঠী ও অঞ্চলগত বিশ্লেষণ—

গোষ্ঠী	জনসংখ্যা	প্রধান বসতি অঞ্চল
চামকা	১,৩৫,৫০৮	পার্বত্য চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম
মুন্ডা	১,০৮,৬৮৬	চব্বিশ পরগনা, জলপাইগুড়ি
ওঁরাও	২,২৮,১৬১	জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর
সাঁওতাল	৭,৯৬,৬৫৬	বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, হুগলি, দিনাজপুর জলপাইগুড়ি, মালদা
টিপরা	২,০৩,০৬৯	পার্বত্য চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা রাজ্য

[ভারতের আদিবাসী : সুবোধ ঘোষ দেশ, বর্ষ ১৪ সংখ্যা ২৬, ১৯শে বৈশাখ ১৩৫৪, ৩ মে ১৯৪৭, সুবর্ণ জয়ন্তী প্রবন্ধ সংকলন, পৃ. ১২২]

পূরণ চাঁদ যোশী তার লেখা সানতাল রিবেলিয়ন প্রবন্ধে ওল্ডহাম সাহেবের বয়ান ব্যবহার করেছেন— 'পুলিশ ও মহাজনদের অত্যাচারের স্মৃতি যাদের দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলেছিল, আন্দোলন তাদের সকলকেই আকৃষ্ট করল, কিন্তু যে মূল ভাবধারাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা চলছিল তা ছিল সাঁওতাল অঞ্চল ও সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার চিন্তা'।[৭৭] ওই গ্রন্থেই সিদো আর কানহুর বক্তব্য বারবার তুলে ধরা হয়েছিল— 'খানগে সিদো আর কানহুকিন

হুকুমকে আ, রাজ আর সাউ যত বোন গচ্। চাবাকোওয়া আর দশার দেগঙ্গা পারমতে বোন লাগাকোওয়া আবানো : কু' আ' (হড় কারেন মার হাপড়ামকো রোযাঃ ক্ কাথাছ) অর্থাৎ সিদো আর কানহু বলল, আমরা রাজা মহাজনদের সবাইকে খতম করব, পরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দেব, আমাদের রাজ্য হবে।'[৭৮] ওই গ্রন্থে আরও উল্লেখ করা হয়েছে— '...তাদের শ্রমের অংশ লুট করে নেবার জন্য কোম্পানির অনুগত জমিদার ও মহাজনি ব্যবসাদারের দল হাত বাড়িয়েছে–– এ যে অসহ্য, তারা প্রতিবাদ জানান কিন্তু ব্রিটিশ শাসক তাদের কথায় কর্ণপাত করল না। দিনে দিনে অত্যাচার বেড়ে চলল।'[৭৯] আবারও উল্লেখ করা দরকার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে এই জনজাতিরা গভীর দুর্দশায় নিমজ্জিত হয়েছিল। বাঙালি সমাজের সাথে জনজাতিদের সম্পর্ক কালক্রমে হয়ে দাঁড়াল শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। আর যেহেতু প্রত্যক্ষ শোষণ করত তাই জনজাতিদের ক্ষোভ জমা হয়েছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে। অপরপক্ষে তারাই ছিল স্থানীয় প্রশাসন। পুলিশও এদের কথায় কাজ করত। অরণ্যচারী সাঁওতালরা যুগযুগ ধরে বনজ সম্পদ আহরণ করে বেঁচে ছিল। অরণ্যের অধিকার হারানোর ফলে অনাহারে মৃত্যু ছাড়া তাদের আর কোনও পথ রইল না। সাঁওতাল বিদ্রোহের সাথে ভূমিহীন অন্ত্যজ হিন্দু ও মুসলমানরা যোগ দিয়েছিল। ডব্লু.ডব্লু. হান্টারের মতে মনে হয় এই সময় সাঁওতাল ও হিন্দুদের মাঝামাঝি কিছু আধাআদিবাসী শ্রেণি ছিল, এবং কিছু কিছু নিম্ন শ্রেণির হিন্দুও এই বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল এবং অক্টোবরের মহোৎসবের অনুষ্ঠানের জন্য ব্রাহ্মণদের অপহরণ করেছিল।[৮০]

বেঙ্গল জুডিশিয়াল প্রসিডিংস (নং ১৫৮, ১৪ ফেব্রুয়ারি)-তে পাওয়া যায় মহাজনরাই সব বিশ্বাসঘাতকতা দুর্নীতি এবং নানারূপ অন্যায় আচরণ করেছে। বনভূমি শেষ হয়ে যাওয়ার ফলে এইসব অরণ্যাচারী মানুষের দুর্দশার কথা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুবিখ্যাত আরণ্যকে তার বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকী ১৮৬৭ সালে এক সরকারি রিপোর্টে বলা হয়েছে আদিবাসী জীবনের প্রায় সকল পথই স্বার্থান্বেষীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ব্যবসায়ী রূপী মহাজনরা জিনিসপত্রের কেনা বেচা ও খাদ্য সরবরাহের কারবারের সঙ্গে ধার দেনার ব্যাপারটা খুব কৌশলে সার্থকভাবে যুক্ত করে নিয়েছে। কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি ছোটো গোষ্ঠী মহাজন, কারবারি, বনবিভাগ, পূর্তবিভাগ ও আবগারি ভূমিকা নিয়ে আদিবাসী অঞ্চলে প্রভূত প্রভাব ও প্রতিপত্তি বিস্তার করেছে।

মোটকথা আমাদের এ কথা মানতেই হবে যে বাঙালি বর্ণহিন্দুদের অসীম লোভ অমিত শোষণ সমাজের নিম্নবর্গীয়দের বারে বারে দুর্দশার সম্মুখীন করেছে এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় জন্ম দিয়েছে সাম্প্রদায়িকতা ও আঞ্চলিকতাবাদের।

সামাজিক বৈষম্য-বিভেদ ও কারণ সমূহ

আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি যে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের ধারা বহমান ছিল। এই ধারা কল্লোলিত হয়েছিল নিম্নবর্গীয় মানুষদের মধ্যে ভারতীয় বর্ণভেদ প্রথা অনুসারে যারা নিচু জাতের লোক তাদের মধ্যে। পেশাগত কারণে বা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় সমশ্রেণিস্বার্থের মানুষের মধ্যে একে অপরের ঘনিষ্ঠ থাকতে ধর্ম কোনও বাধা হয়নি। এই মিলন হয়েছিল প্রধানত অন্ত্যজ হিন্দুদের সাথে নিম্নবর্ণের আতরাফ-আজলফ বা আয়জালদের সাথে। ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা এবং আশরাফ মুসলমানরা ধর্মের ব্যাপারে বা একই সম্প্রদায়ের নিম্নবর্ণের প্রতি সহনশীল ছিল না। ফলে ব্রাহ্মণদের কাছে অন্ত্যজরা ছিল অস্পৃশ্য আর আশরাফদের সাথে অন্যদের 'জল চল ছিল না'। নিম্নবর্ণের হিন্দু-মুসলমানদের কাছে জীবন সংগ্রামই ছিল মুখ্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, জমিদারের, মহাজনের অত্যাচার নিম্নবর্গীয়দের সমানভাবে বিদ্ধ করত। সুতরাং ধর্মের বিষয়টা ছিল তাদের কাছে গৌণ। সে যুগে ধর্মের বাইরে গিয়ে কিছু ভাবার শক্তি তাদের ছিল না, তাই তারা বেছে নিয়েছিল ধর্ম পালনের সহজপন্থা-সহজিয়া। একদিকে পির-সুফিদের মারফতি ধারার উদার আহ্বান অন্যদিকে শ্রীচৈতন্যর ভক্তিবাদ, বাউল-বৈষ্ণবদের সহজিয়া পন্থা এক সঙ্গমে মিলিত হয়েছিল।

আমরা পূর্বেই দেখেছি ১৯১১-র আদমশুমারিতে মুসলমানদের বর্ণের প্রধান বিভাগ ছিল ৫৪টি আর অপ্রধান বিভাগ ২৫টি বর্ণিত আছে। একইভাবে আমরা দেখেছি অতুল সুর বাঙালি নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ে হিন্দু প্রধান জাতি (বর্ণ) সমূহের ৩০টি বিভাগ দেখিয়েছেন, তফশিলভুক্তদের ৬৩টি বিভাগ আর জনজাতি সমূহের ১৪টি বিভাগ দেখিয়েছেন (তথ্যসূচি ১৩ ও ১৫ নং দ্রষ্টব্য) আশরাফ সম্প্রদায় হিন্দুকুলীনদের মতো তারাও মুসলমান সম্প্রদায়ের কুলীন। তাদের পদবি-সৈয়দ যাদের অধিষ্ঠান মুসলমান সমাজে ব্রাহ্মণদের মতো, সেখ, মুগল পাঠান মীর্জা, মল্লিক। 'আতরাফ-আজলফরা "রসীল" নামেও পরিচিত। এদের মধ্যে আবার ৪টি বিভাগ আছে। যেমন (১) কৃষিকর্মে নিযুক্ত মুসলমান (২) দর্জি, জোলা, ফকির ইত্যাদি (৩) কলু, কসাই, বারহি, নিকারি ইত্যাদি (৪) আবদাল বাম্বো, বেদিয়া ইত্যাদি'।[৮১] লক্ষ করলে দেখা যাবে সবটাই পেশাগত বিভাজন।

অমলেন্দু দে দেখিয়েছেন উচ্চবর্ণভুক্ত মুসলমানদের নিম্নবর্ণভুক্তদের নামকরণের ক্ষেত্রে যে ঘৃণা কাজ করেছে তা সাম্প্রদায়িক ঘৃণার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। আতরাফ

শ্রেণির মুসলমানরা 'কামিনা' বা 'ইতর' অথবা 'রসীল' নামেও অভিহিত হত। অধ্যাপক দে, মৈনুল হাসানের থেকে আরও বেশি বিস্তারিত বর্ণভেদ ও ঘৃণার বিষয়টি উপস্থাপিত করেছেন। 'আজলফ শ্রেণির মুসলমানরা চারটিভাগে বিভক্ত ছিল (ক) কৃষিকর্মে নিযুক্ত সেখ মুসলমান— আজলাফ সম্প্রদায় এদের স্থানই উচ্চে ছিল। (খ) দর্জি, জোলা, ফকির, রঙ্গবেজ (গ) বারহি, লাহেরি, জারি ত্যারা, ছিক, চুড়িদার, দাই, ধাওয়া, ধুনিয়া, গন্ধি কালাল, কসাই, কস্কু, কুনুজেরা, লাহেরী, মাহিফারোশ, মাল্লাই, নালিয়া, নিকারি (ঘ) আবদাল, বাখো, বেদিয়া, ভাট, দুম্বা, দফালি, ধোবি, হাজাম, মুচি, নগরচি, নাট, পানওয়ারিয়া, মাদারিয়া, তুতিয়া। আরজাল অবনমিত শ্রেণীর মুসলমান, ভানর, হালাল, খোর, হিজরা, কাসবি, লালবেগি, মাঙ্গতা, মেহতর প্রভৃতি এই শ্রেণির মুসলমান হিসেবে গণ্য হত।... এই তৃতীয় শ্রেণির মুসলমানদের মসজিদে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল এবং তাদের সাধারণ কবরখানাও ব্যবহার করতে দেওয়া হত না।'[৮২]

অস্পৃশ্যতা ও বর্ণঘৃণার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সাম্যের ধর্ম ইসলাম গ্রহণ করেছিল একদল অন্ত্যজ হিন্দু। কিন্তু হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার ভূত বেরিয়ে এসে মুসলমান ধর্মের কাঁধে চেপে বসল। অমলেন্দু দে আরও দেখিয়েছেন আর্থিক প্রতিপত্তি লাভের সাথে সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নেওয়া ও উচ্চবর্ণের পদবি গ্রহণ করে উচ্চবর্ণভক্ত হবার একটা আপ্রাণ প্রচেষ্টা আছে। 'গত বছরে আমি ছিলাম জোলা এই বছরে আমি একজন সেখ আগামী বছরে সৈয়দ হব।'[৮৩]

হিন্দুধর্মের বিচিত্র বিভাজন কখনও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য, কখনও পেশাগত বিভাজন, কখনও মনু বর্ণিত চতুর্বর্ণের একটি কল্পিত রূপরেখা কখনও মুসলমান বা দেশীয় রাজাদের প্রদত্ত শিরোপাকে বংশানুক্রমে ব্যবহারের সুবিধা গ্রহণ, সবমিলিয়ে এক জটিল আবর্ত সৃষ্টি করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথাকে ভারতীয় সমাজের প্রধান অভিশাপ বলে বর্ণনা করেছেন। ডব্লু.ডব্লু. হান্টার তার বিশ্লেষণে জানান 'প্রাচীন মধ্যদেশের সীমান্তবর্তী উত্তর বিহারে ইহা অজ্ঞাত। এখানে মনুর চতুর্বর্ণে বিভক্ত নয়, তারা আর্য, অনার্য ও শংকর জাতিতে বিভক্ত'।[৮৪] 'কঠোর বর্ণভেদ ব্যবস্থা সমগ্র সমাজকেই গ্রাস করেছিল, এই রাহু-গ্রাস থেকে মুক্তি ধর্মীয় ব্যবস্থার পরিচায়ক ব্রাহ্মণরাও পাননি। মধ্যদেশের ব্রাহ্মণরা আরো এক ধাপ এগিয়ে ঘোষণা করে যে, নিম্নবঙ্গের ব্রাহ্মণরা সামাজিক মর্যাদায় নয় ধর্মীয় যোগ্যতাতেও হীনতর।'[৮৫] হান্টার আরও লিখেছেন 'উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা বাংলার ব্রাহ্মণদের সাথে একসাথে আহার গ্রহণ করে না। এমনকী জেলখানার কয়েদিরাও বাঙালি ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণের চেয়ে বেত্রাঘাত শ্রেয় মনে করে।' হান্টার নিম্নবঙ্গের জনসাধারণের মধ্যে পাঁচটি ভাগ লক্ষ করেছিলেন '(১) আদিবাসী অনার্য জনজাতি (২) বৈদিক সারস্বত ব্রাহ্মণরা (৩) বিভিন্ন বৈশ্য পরিবার (৪) পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার প্রতিজ্ঞা হতে পলায়নকারী উদ্বাস্তুরা।'[৮৬] ব্রাহ্মণদের নিম্নবঙ্গে

আগমনের প্রচলিত ইতিহাস তিনিও স্বীকার করেন। রাজা আদি যজ্ঞ করার জন্য কান্যকুব্জ থেকে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সম্ভবত স্থানীয় ব্রাহ্মণদের দিয়ে ওই যজ্ঞ সম্পন্ন হবে না বলে তিনি ওই ব্রাহ্মণদের আনয়ন করেন বলে হান্টারের যে ধারণা তার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। 'স্থানীয় ব্রাহ্মণরা উত্তর ভারতের থেকে নিচু বলেই ওই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের তিনি নিয়ে আসেন। এই ব্রাহ্মণরা গঙ্গার পূর্বতীরে দেশীয় স্ত্রীলোকদের বিয়ে করে সন্তানের জন্ম দেয়। এই সন্তান-সন্ততিরা বারেন্দ্র বলে খ্যাত। সামাজিক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠা লাভের পর ওই ব্রাহ্মণরা আবার দেশ থেকে তাঁদের বৈধ স্ত্রীদের এনে গঙ্গার পশ্চিম তীরে (মূলত পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে) বসতি স্থাপন করেন। তাদের সন্তান-সন্ততিরা রাঢ়ি বলে খ্যাত।'[৮৭] হান্টারের এই মতকে সত্য বলে মানলে স্থানীয় ব্রাহ্মণদের বারেন্দ্র রাঢ়ি বাইরে কী পরিচিতি ছিল তার উল্লেখ নেই।

আবার বঙ্কিমভাষ্য অনুসারে 'যখন আদি শূর পঞ্চ ব্রাহ্মণকে কান্যকুব্জ হইতে আনয়ন করেন তখন বঙ্গদেশে সাড়ে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন এই প্রবাদ আছে।'[৮৮] এই ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল 'এলিট শ্রেণি' যারা কুলীন বলে খ্যাত। 'আদিশূর যে পঞ্চ ব্রাহ্মণকে হইতে আনয়ন করেন তাহাদের বংশ সম্ভূত কয়েক ব্যক্তিকে বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রদান করেন। প্রবাদ আছে বল্লাল সেন আদিশূরের পরবর্তী রাজা। কিন্তু এ কিংবদন্তি যে অমূলক এবং সত্যের বিরোধী ইহা বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র পূর্বেই প্রমাণিত করিয়াছেন। ওই পঞ্চ ব্রাহ্মণেব মধ্যে একজন শ্রী হর্ষ। তিনি মুখোপাধ্যায়দিগের আদি পুরুষ। বল্লাল সেন তাঁহার বংশে উৎসাহকে কৌলিন্য প্রদান করেন। উৎসাহ হইতে শ্রীহর্ষ ত্রয়োদশ পুরুষ। আদি শূরের পঞ্চ ব্রাহ্মণের মধ্যে দক্ষ একজন। দক্ষ চট্টোপাধ্যায়দিগের আদিপুরুষ। তাহার বংশোদ্ভূত বহুরূপকে বল্লাল সেন কৌলিন্য প্রদান করেন। বহুরূপ দক্ষ হইতে অষ্টম পুরুষ। ভট্টনারায়ণ হইতে দশম পুরুষ।'[৮৯] বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য কোনও স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। একদিকে তিনি বলেছেন আদিশূরের আগেও বঙ্গে ব্রাহ্মণ ছিল। অন্যদিকে তিনি বলেছেন এই দেড়শত বৎসরে পাঁচজন ব্রাহ্মণ বেড়ে দেড়শত ঘর হয়। অবশ্য বহুবিবাহের ফলে বেড়ে একাদশ শত হওয়াও অসম্ভব নয়। প্রশ্ন হল পাঁচ জন ব্রাহ্মণ এত ব্রাহ্মণ কন্যা পেলেন কোথা থেকে? আদিশূরের পূর্বে যে ব্রাহ্মণরা বাংলায় ছিল তাদের পতিত ব্রাহ্মণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করে ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরিষ্কার ভেদ রেখা টেনে দেন। পূর্বেই লিখেছি অগ্রদানীদের পূজাপাঠের অধিকার ছিল না। বল্লাল সেন কায়স্থদের মধ্যেও কৌলিন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। কায়স্থরা শংকর বর্ণোদ্ভূত। কায়স্থ শুধু এই বঙ্গদেশেই আছে। ব্রাহ্মণদের মধ্যেই যদি ভেদাভেদের এত বিচিত্র বিন্যাস থাকে, সমাজ পরিচালক হিসাবে ব্রাহ্মণরা সমাজকে মেলাবে কীভাবে।

পূজাপাঠের জন্য বাংলার স্থানীয় মানুষরা সম্ভবত পূজারি ব্রাহ্মণ তৈরি করে নিতেন। কান্যকুব্জ থেকে আগত ব্রাহ্মণরা সম্ভবত কুল মর্যাদা হানি হবে এই ভয়ে অন্ত্যজদের

পূজাপাঠে সম্মত হতেন না। এছাড়া বাংলার নিজস্ব লোকদেবতাদের পূজাপাঠের মন্ত্র বৈদিক শাস্ত্রে নিহিত ছিল না। বাংলার প্রাচীন অধিবাসীদের পাঁচালি পাঠ ও মঙ্গলকাব্যের দেবতাদের স্তুতি বর্ণনাই পূজা পদ্ধতির অঙ্গ। বাংলার মেয়েদের ব্রত কথার উৎপত্তিস্থলও লৌকিকতা। মনে রাখতে হবে হিন্দুধর্মে মেয়েদের পুজা পাঠের প্রথা নেই। স্থানীয় পূজারি ব্রাহ্মণ সৃষ্টির বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পালের 'আমার জীবন ও সমকাল' এ সমর্থন আছে 'সিলেটের সাহাদের নিজস্ব ব্রাহ্মণ থাকতেন, মনে হয় ব্রাহ্মণত্বের পুনর্জাগরণে যখন তাদের নিম্ন সামাজিক মর্যাদায় নামিয়ে দেওয়া হল, তখন সে ব্রাহ্মণরা তথাকথিত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ধর্মীয় ও পারলৌকিক আচার অনুষ্ঠানাদি পরিচালনা করতেন হয় তারা নিজেরাই অস্বীকৃত হন অথবা তাঁদের বাধা দেওয়া হয় সাহাদের কোনও প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করতে। সাহারাও যখন দেখলেন হিন্দু ধর্মের কাঠামোর মধ্যে তাদের থাকতে বাধ্য করা হচ্ছে তখন তারা নিজেদের মধ্য থেকেই একশ্রেণির ব্রাহ্মণ সৃষ্টি করে নিলেন। ...সিলেটের সাহা ব্রাহ্মণরা সাহাদের মতোই উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের সাথে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী ছিল।'[২০]

এবার আমরা দেখব বাংলার প্রাচীন বর্ণভুক্ত সম্প্রদায়গুলির জটিল অবস্থান। বঙ্কিম ভাষ্য অনুসারে, 'বাঙ্গালার মধ্যে মাল ও মালো বলিয়া দুইটি জাতি আছে। আবার বাঙ্গালীর উৎপত্তি প্রবন্ধে আছে 'মহাভারতের খর্বাকৃত অট্টাস্য কৃষ্ণকায় অনার্যদিগকে পাওয়া যায়। ...মনু বলিয়াছেন যে, আয়েগবি অর্থাৎ শূদ্র হইতে বৈশ্যাতে উৎপাদিতা স্ত্রীর গর্ভে নিষদের ঔরসে মার্গব বা দাস জন্মে। আর্যাবর্তে তাহাদিগকে কৈবর্ত বলে।... ঋগ্বেদ সমালোচনায় দাস নামে অনার্য জাতি পাওয়া যায়। দাস ধীবর কৈবর্ত তিনই এক'।[২১] প্রকৃতপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে হিন্দু পুরাণ ও ইংরেজ ঐতিহাসিকদের স্বার্থান্বেষী বয়ান মেলাতে গিয়ে এক কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেছেন। বর্তমান পশ্চিমবাংলায় কৈবর্ত বা মাহিষ্যরা সর্ব বৃহৎ বর্ণগোষ্ঠী। আমরা পূর্বেই দেখেছি পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর, হাওড়া. হুগলি, ২৪ পরগনা. বর্ধমান ও নদিয়া জেলায় এরা মূলত বাস করেন। তাদের কারও দাস পদবি বর্তমান লেখকের দৃষ্টি গোচর হয়নি। দাস এই পদবি শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয় বিহার ও ওড়িশাতেও আছে। অতুল সুরের মতে বল্লাল সেনের পরে 'আরও একটা শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছিল। সেটা হচ্ছে ব্রাহ্মণরা কোন জাতির হাতের জল গ্রহণ করবেন। এর জন্য নয়টি জাতি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়েছিল। সে জন্য তাদেব বলা হয় নবশাখ। এই নয়টি জাতি হচ্ছে— তিলি, তাঁতি, মালাকার, সদগোপ, নাপিত, বারুই, কামার, কুম্ভকার, গন্ধবণিক ও ময়রা। বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তম সংকরের অন্তর্ভুক্ত ছিল করণ ও অম্বষ্ঠ। এরাই পরবর্তীকালে কায়স্থ ও বৈদ্য নামে সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।'[২২] পাল রাজবংশের চারশো বছরে বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের যুগে ব্রাহ্মণ্যবাদের আধিপত্য খর্ব হলে পুরাণে জাতি বিন্যাস খর্ব হয়। 'কিন্তু পাল রাজগণের চারশত বৎসরের রাজত্বকালে সবই একাকার হয়ে ছিয়েছিল।'[২৩] বৃহদ্বর্থ পুরাণ সেন রাজাদের সমক্ষে রচিত।

এই পুরাণ অনুসারে ব্রাহ্মণ ব্যতীত বাংলার অন্যসকল জাতিই সংকর জাতি। এখানে সংকর জাতিদের তিনটি ভাগ করা হয়েছে। (১) উত্তম সংকর (২) মধ্যম সংকব (৩) অন্ত্যজ। বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে বাঙালি সংকর জাতি। তবে এই সংমিশ্রণ কার সাথে কার ঘটেছিল তার প্রকৃত হদিশ পাওয়া যায় না, কেন না বিভিন্ন বিভিন্ন পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র সমূহে এদের বিভিন্ন রকম উৎপত্তিব কথা বলা হয়েছে। কোথাও কোনও জাতি অনুলোম বিবাহের ফসল, আবার কোথাও বা তাবা প্রতিলোম বিবাহের ফসল। (তথ্যসূচি দ্রষ্টব্য)।[১৪] নাথ সাধক সম্প্রদায় যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। সুতরাং ধরে নেওয়া যায় ব্রাহ্মণদের কৃপার উপর নির্ভর না করে অথবা ব্রাহ্মণরা তাদের পূজাপাঠে অস্বীকৃত হলে তারা এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আবার বৈদ্যরাও অনেকে ব্রাহ্মণ জাত বলে যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন।

ব্রাহ্মণদের অস্পৃশ্যতা ও ঘৃণার হাত থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অন্ত্যজরা বাংলায় দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিল একথা পূর্বে আলোচনা করেছি। বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকারের সাথে সাথে ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে বৌদ্ধ শ্রমণরা পাহাড়ে কন্দরে পালিয়ে যায়। কিন্তু তার আগে বৌদ্ধধর্মের আঘাতে বঙ্গে ব্রাহ্মণদের অহমিকা চূর্ণ হয়ে যায়। হৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের পর দলে দলে অন্ত্যজরা মুসলমান ধর্মের ছত্রছায়ায় নিরাপদ আশ্রয় খুঁজছে, তখনই অস্পৃশ্যতার জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রেমের মন্ত্র দিয়ে বিপ্লবের জোয়ার আনল শ্রীচৈতন্যের বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ। বাংলার বৈষ্ণবদের দুটি ধারা, প্রথম ও শক্তিশালী ধারার কেন্দ্র নবদ্বীপ বা শ্রীচৈতন্যকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আমরা পূর্বেই দেখেছি বৈষ্ণব ধর্মে অস্পৃশ্যতা বিরোধী জাত-পাতের বিরোধী আন্দোলন নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যর আগেও ছিল। অদ্বৈতাচার্যর উল্লেখ আগেও করেছি। দ্বিতীয় ধারাটি ক্ষীণতোয়া হলেও খড়দহ। নিত্যানন্দর নেতৃত্বে এরা নবদ্বীপ থেকে পৃথক হয়ে গিয়েছিল। বর্তমানে মায়াপুরে বিদেশি সাহায্যপুষ্ট এবং বহু বিদেশিব অংশগ্রহণে তৃতীয় কেন্দ্রটি ধারে ও ভারে বর্তমানে বেশ শক্তিশালী। বৈষ্ণবদের মধ্যে জাতিভেদের বালাই না থাকার কারণে অন্ত্যজ মানুষ অন্তর দিয়ে এই ধর্মকে বরণ করে নিয়েছিল। এরই পাশাপাশি বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে অনেকগুলি গোষ্ঠী বিকশিত হয়েছিল। যেমন বাউল, আউল বাউল, সহজিয়া, কর্তাভজা, সাহেবধনী, বলাহাড়ি ইত্যাদি। কর্তাভজাদের দেখে বিস্ময়াবিষ্ট নবীনচন্দ্র সেন লিখেছিলেন 'ঘোষ পাড়ায় জাতিভেদ নাই।'

এতদসত্ত্বেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস অপরের প্রতি অবিশ্বাস-দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের এক সংঘাতময় অধ্যায় বাঙালি জীবনকে বারে বারে দীর্ণ করেছে। আর এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ হিন্দু ধর্মের ভেদাভেদ সম্পর্কে বলেন 'বিধি রহিয়াছে কিন্তু কেহ কখনো চেষ্টা করিয়াছেন? পৌরাণিক ধর্মের সহিত বৈদিক ধর্মের সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া কোন পণ্ডিত আজ পর্য্যন্ত হিন্দু ধর্মের একটা অখণ্ড আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন কি? ইহা কি সকলের দ্বারা সাধ্য?'[১৫] বৈদিক ধর্মের সাথে বিরোধ করেই প্রকৃতপক্ষে অন্ত্যজ মানুষদের প্রতিবাদের প্রতীক

হয়েই বাংলার লৌকিক ধর্ম মঙ্গল কাব্যের জন্ম। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস প্রণেতা আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে 'অতএব একান্তভাবে এই কাব্য ও দেবতা বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের কল্পনাপ্রসূত।'[২৬] এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য 'কারণ পুরাণ কেবল সংস্কৃত ভাষায় বদ্ধ নহে। প্রচলিত ভাষাতেও রচিত হয়। মনসার ভাসান সত্যপিরের কথা প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত। মেয়েদের ব্রতকথাও তাহার উদাহরণ। অন্নদামঙ্গলে যদিও পৌরাণিক শিবদুর্গার লীলা বর্ণিত এবং যদিও তাহার রচয়িতা ভারতচন্দ্র শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তথাপি তাহার মধ্যে জনসাধারণ-প্রচলিত আধুনিক কল্পনাবিকার সহজেই স্থানলাভ করিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও তাহাই। হরপার্বতীর কোন্দল, কোঁচ নারীদের প্রতি শিবের আসক্তি, নিজের গাত্রমল দিয়া দুর্গা কর্তৃক খেলাব পুত্তলি নির্মাণ ও তাহা হইতে গণেশের জন্ম এসমস্ত কাহিনি আধুনিক, প্রাদেশিক; শ্রুতি ইহার মূল নহে, লোকের কল্পনাই মূল, দেবতাকে নিজ পরিমাপে নির্মাণ চেষ্টাই ইহার প্রধান কারণ। ইহার মধ্যে উচ্চ অঙ্গের আধ্যাত্মিক রূপক বাহির করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসাধ্য এবং অসাধারণ লোকের পক্ষেও দুঃসাধ্য।'[২৭] পূর্বেও উল্লেখ করেছি এই লৌকিক দেবতারা গ্রামীণ অন্ত্যজদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যার থেকেও সৃষ্ট। 'বাংলার দক্ষিণ দিকের অধিকারী দেবতা বলে ব্যাঘ্রের অধিকারী দেবতা দক্ষিণা রায় বলে পরিচিত। দক্ষিণা রায় বাংলার নিজস্ব লৌকিক দেবতা।... দক্ষিণা রায়কে নিয়ে 'রায় মঙ্গল' নামে একটি মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। একই কাহিনি নিয়ে মুসলমান সমাজে কোনও এক মুসলমান কবি কাব্য রচনা করেছেন। কারণ বাঘের উপদ্রব তো হিন্দু ও মুসলমানে পার্থক্য করেনি।'[২৮] মনসামঙ্গলে পৌরাণিক দেবতা শিব আর লৌকিক সর্প দেবতা মনসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই। শৈব চাঁদ সদাগর মনসার পূজা দিয়ে (বাঁ হাতে হলেও) আত্মসমর্পণ করে। ধর্মমঙ্গলে কালকেতু ফুল্লরা এক ব্যাধের কাহিনি ও ধর্মঠাকুরের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা বা প্রতিষ্ঠিত হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসে আঘাত করে।

সমস্ত লোকধর্মের রূপকারকেই ব্রাহ্মণ্যবাদী ও শরিয়তিদের আক্রমণে ভিটেমাটি ছাড়া হতে হয়েছে।— 'বলরাম প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন সন্দেহ কি? কিন্তু নিছক ব্রাহ্মণ্য বিদ্বেষের জন্য তিনি একটা ধর্ম বিশ্বাস সৃষ্টি করেছিলেন এ কথা ঠিক নয়। আসলে আঠারো শতকের শেষের দিকে এদেশের শূদ্রজাতি নানা কারণে অসহায় হয়ে পড়েছিল। তাদের জীবনে কোনও সামাজিক নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ততা ছিল না। ফলে যে কোনও সময়ে নেমে আসত উচ্চবর্ণের দমনপীড়ন বা ফতোয়া যেমন বলরামকে করতে হয়েছিল গ্রামত্যাগ। কল্যাণীব রামশরণ পাল, কুষ্টিয়ার লালন শাহ্, হুদোর চরণ পাল, ভাগ্য গ্রামের খুশি বিশ্বাস, মেহেরপুরের বলরাম হাড়ি এঁরা সকলেই উচ্চবর্ণের ভ্রূকুটির বাইরে সাধারণ ব্রাত্যজনের বাঁচবার জন্য একটা জায়গা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। নিছক প্রতিবাদ নয়, টিকে থাকাও সংকীর্ণ শাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বাঁচা নয়, উদার মানবতা নিয়ে সহজ করে বাঁচা। তাই মূর্তিপূজা, অপদেবতা পূজা, অকারণ তীর্থভ্রমণ, দেবদ্বিজে বিশ্বাস, শাস্ত্র নির্ভরতা ও

আচার সর্বস্বতার বিরুদ্ধে এঁদের অস্ত্র ছিল জাতিভেদহীন সমন্বয় এবং নতুন মানবতাবাদী সহজ ধর্মাচারণ। কিন্তু কর্তাভজা সাহেবধনীরা অবতারতত্ত্ব মানেন। বলবাম সেটাও মানেনি। তিনি যুগলভজনও মানেননি। বলরাম ছিলেন বৈষ্ণবতারও বিরোধী এখানেই বলা হাড়ির অভিনবত্ব।' (গভীর নির্জন পথে, সুধীর চক্রবর্তী (আনন্দ) পৃ. ৩৮-৩৯)

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখ প্রয়োজন, হান্টার বলেছেন 'আর্যরা শুদ্ধ বংশ জাত আপন বংশধরদের যে ধর্ম বিশ্বাস হস্তান্তারিত করে। প্রথমটি তারই দ্যোতক; এবং পরবর্তীটি হচ্ছে কৃষ্ণকায়, নরবলিতে বিশ্বাসী মাংসাশী জংলি জনজাতিদের কুসংস্কারের এক খিচুড়ি।'[২২] হান্টার প্রথমত প্রথাগত আর্য জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও তাদের ধারণা আর্যরা খাঁটি ইউরোপীয় এই ধারণা থেকে বলেছেন। হান্টার জানতেন না মূর্তি পূজা অনার্যদের কাছ থেকে পাওয়া। দ্বিতীয়ত হান্টার দীর্ঘদিন রাঢ় বাংলার বীরভূমে থাকলেও বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতির সম্পর্কে অজ্ঞই ছিলেন। বাঙালি হিন্দুদের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী হল কালী, শাক্তরা কালীর পূজারি। বাংলার জনপদগুলিতে এমন জায়গা খুঁজে পাওয়া যাবে না যেখানে কালীমন্দির নেই। বামাক্ষ্যাপা-রামপ্রসাদ-রামকৃষ্ণরা সবাই শাক্ত। শক্তি সাধনা থেকে উদ্ভুত তন্ত্র সাধনা, শব সাধনা, পশু ও নরবলি একসময় অখণ্ড প্রতাপে চলত। বৈষ্ণবধর্ম বিস্তার লাভ করলে তন্ত্র সাধনা পিছু হটে যায়। বাংলার বিভেদের এই পৌনঃপুনিক হার সমাজের প্রতিটা কোণায় তার বিস্তৃতি আমাদের ঐক্যকে আত্মস্থ হতে বাধা দেয়। প্রতীকী হলেও এখনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধরা পরে ধর্মীয় বিদ্বেষ। এত বিস্তারলাভ করা বৌদ্ধধর্মর অবশেষ আর খুঁজে পাওয়া যায় না দুটি কারণে প্রথমত বেদ বিরোধী বুদ্ধ নবম অবতারের স্থান পায় ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রের সাথে সমঝোতায় এসে। গীতগোবিন্দে আছে 'নিন্দসি যজ্ঞবিধেরই প্রতিজাতম। সদয়-হৃদয় দর্শিত ধাতম কেশবধৃত বদ্ধ শরীর। জয় জগদীশ হরে' দ্বিতীয়ত 'বস্তুত বৌদ্ধধর্ম তার স্বরূপ নিয়ে বাংলায় আর বেঁচে রইল না, সেন বংশের পর পঞ্চদশ শতাব্দী নাগাদ বৌদ্ধধর্ম ও সম্প্রদায়গুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের সঙ্গে বাংলায় প্রধানত মহাযান বৌদ্ধধর্মের তন্ত্রসমূহ মিশে গেল। নিজস্ব সত্তা বাংলায় আর থাকল না।' (বাংলায় বৌদ্ধধর্ম অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গ দর্পণ, ১ম খণ্ড পৃ. ১২২) চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার কথা একবার স্মরণ করুন, নীচে অবস্থিত মৃত হস্তী (বৌদ্ধধর্মের প্রতীক) উপরে সিংহারূঢ় দেবী মূর্তি হিন্দু ধর্মের প্রতীক। পরাভূত বৌদ্ধধর্মের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিজয়ের প্রতীক এই মূর্তি। আবার শান্তিপুরে বৈষ্ণবদের রাস উৎসবের সময় শাক্তরা কালীপূজা করে। গোষ্ঠীগত-বর্ণগত-সম্প্রদায়গত-আন্তগোষ্ঠী দ্বন্দ্ব-সংঘাত যেন আমাদের ট্রাডিশনকে বহন করে চলেছে।

বাঙালির সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক পটভূমি

আমরা পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, বর্ণগত-সম্প্রদায়গত-গোষ্ঠীগত বিভেদের যেন এক বিচিত্র জাল আমাদের চারদিকে বিছিয়ে রেখেছে। এর থেকে বাইরে যাবার যেন কোনও পথ নেই, নিস্তার নেই। বাঙালির সাম্প্রদায়িকতার ঐতিহাসিক পটভূমিকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্যার গভীরে প্রবেশ না করে মুখ ঘুরিয়ে রাখা। এ প্রশ্নে আলোচনার অর্থ হচ্ছে সত্যের মুখোমুখি দাঁড়ানো। আর্য জনগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাগার্যদের মিশ্রণে হিন্দু সমাজের উদ্ভব একথা স্বীকার করতে হলে মানতে হবে প্রাগার্যদের মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠী দাস, দস্যু, অসুর পনি ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর সাথে দীর্ঘ এক সংঘাতময় পথের ইতিহাস। ভারতীয় জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে ধরা পড়ে হিন্দুদের মধ্যে আছে নার্ডিক, আলপীয় দিনারিক (আর্য), দ্রাবিড়, মোঙ্গলীয়, আদি অস্ট্রালয়েড এবং কোথাও কোথাও নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনযাপন পদ্ধতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, দর্শন জীবনবোধ সবই ছিল আলাদা। ফলে যে সরল সংমিশ্রণের কথা বলা হয় তার পেছনে আছে দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ইতিহাস, আছে বিজয়ী বিজিতর ইতিহাস। কাজেই যারা বলেন এদেশে মুসলমান আগমনের পর সাম্প্রদায়িক সংঘাতের শুরু তাহলে, বলতে হয় ইতিহাসের এত বড়ো বিকৃতি আর হয় না।

পূর্বেই বর্ণনা করেছি বাংলার ব্রাহ্মণদের উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণরা পতিত বলে মনে করত। বাঙালি জাতি বলতে আমরা কাদের বুঝব এবং কোন কোন গোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাঙালি জাতি সমষ্টি। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথায় 'বাঙালীর মধ্যে— অর্থাৎ বঙ্গ ভাষী জনগণের মধ্যে বামুন, কায়েত বদ্যি আছে, রাজপুত ছত্রী, বৈশ্য আছে, যারা নিজেদের খাঁটি বা মিশ্র আর্য বলে মনে করে থাকে, আছে অন্যজাতীয় ব্যক্তি যাদের উৎপত্তি হয়েছে দ্রাবিড় বা কোল অর্থাৎ নিষাদ থেকে, মোঙ্গল অর্থাৎ কিরাত থেকে। ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, বাউরি, পশ্চিমি ছত্রী, চট্টগ্রামের চাকমা, উত্তর বাঙলার রাজবংশী, পশ্চিম বাঙলার মাহিষ্য, হিন্দুস্থান থেকে আগত পশ্চিমা মুসলমান, কত বিভিন্ন বর্ণ বা সম্প্রদায়ের মানুষ, যাদের মূল বংশগত উৎপত্তি পৃথক তারা সকলেই বাঙালি বা বঙ্গভাষী জাতির শামিল হয়ে গিয়েছে।'[১০০] এর সাথে অবশ্যই যোগ করতে হবে বাংলার প্রাচীন জনসমষ্টি হাড়ি, পোদ, দুলে, বাগদি, শবর, নমঃশূদ্র (চাঁড়াল), তাম্বুলি ইত্যাদিদের। মনে রাখা আবশ্যক যে, বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি পরিপূর্ণ রূপ ধারণ করবার পূর্বে এই ভিন্ন ভিন্ন

বর্ণ গোষ্ঠীগুলির ধর্ম বিশ্বাস, ভাষা, সংস্কৃতি, জীবনচর্চা, দর্শন সবই ছিল ভিন্ন। এই মিলনের কাহিনি ভারতের মতো এত সংঘাতের রক্তে পিচ্ছিলের ইতিহাস না হলেও, এর মিলনের ইতিহাসে সংঘাত আছে। যে সংঘাতে কিরাত, নিষাদরা বনবাসী, পোদ, বাগদি, হাড়ি, চাঁড়ালরা বাস করতে লাগল সমাজের প্রান্তদেশে। অবশ্য ভারতের তুলনায় কম সংঘাতের ঐতিহাসিক কারণ আমাদের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় 'বাংলাদেশে এমন হবার কারণ আছে। প্রথমত, এত দূর দেশে আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির ঢেউ আসতে দেরি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের লোকদের প্রতি এই ধর্ম ও সংস্কৃতির ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের ভাব কাটতে সময় লেগেছে এবং বরাবরই তা একটা গণ্ডির মধ্যে থেকে প্রাণপণে ছোঁয়াচ বাঁচাবার চেষ্টা করেছে। তৃতীয়ত, বাংলার কৌম সমাজও আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতির স্রোত ঠেকাবার জন্যে প্রাণপণে জুঝেছে এবং যখন পারেনি তখনও সেই স্রোতে গা না ভাসিয়ে দেওয়া-নেওয়ার ভেতর দিয়ে একটা বোঝা-পড়ায় আসবার চেষ্টা করেছে। তাই বাংলাদেশে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতির কাছে মাথা নোয়ালেও ব্রাহ্মণ ও উচ্চতর দু-একটি সম্প্রদায়েরই বাইরে এই ধর্ম সংস্কৃতির বন্ধন শিথিল, তার প্রতি শ্রদ্ধা কুণ্ঠিত। চতুর্থত, বাংলাদেশে নানা রক্তের মেশামেশির ফলে ও অন্যান্য ঐতিহাসিক কারণে জাত-বর্ণের বাছবিচার দক্ষিণ ভারতের মতো এতটা কঠোর হয়ে উঠতে পারেনি।'[১০১]

অবশিষ্ট ভারত এর ফলে ভারতীয়দের সুচোখে দেখেনি দেখেছিল সম্প্রদায়গত ঘৃণার দৃষ্টিতে। ''মঞ্জরী মূলকল্প'' নামক একখানি প্রাচীন গ্রন্থে বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের আর্য-ভাষাভাষী লোকেরা 'অসুর' জাতিভুক্ত (সন্দেহ জাগে, এটা জানার পর দুর্গা পুজোর উদ্যোক্তারা আর অসুর বধ করবেন কিনা)। এটা মহাভারতের এক উক্তি থেকেও সমর্থিত হয়। সেখানে বলা হয়েছে যে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্মদেশের লোকেরা দীর্ঘতমা ঋষির ঔরসে, মহিষী সুদেষ্ণার গর্ভে অসুর-রাজ বলির ক্ষেত্রজ সন্তান।'[১০২] ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও পার্থক্য আছে পূর্ব ভারতের বিশেষত বাংলার সাথে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের। অমর্ত্য সেনের কথায় 'রামকে দেবতা হিসেবে পূজা করার রীতি প্রচলিত আছে ভারতের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে, কিন্তু অন্যত্র (যেমন, আমার জন্মভূমি বাংলায়), রামকে গণ্য করা হয় শুধুমাত্র রামায়ণ মহাকাব্যের নায়ক হিসেবে, দেবতার রূপে নয়।'[১০৩] আবার মহাভারতের কৃষ্ণ দেবতা হিসাবে সমগ্র বাংলায় পূজ্য। পূর্ব ভারতের লোকেরা কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলে মনে করে। শ্রীচৈতন্যের কৃষ্ণপ্রেমে সারা বাংলা মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল। সে কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আবার পশ্চিম ভারতে মূলত রাজস্থানে শিষ্ট সম্ভাষণ হিসাবে 'জয় রাম সা' বলা হয়। উত্তর ভারতের শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য কৃষ্ণকে অবতারত্ব দেননি। দিয়েছিলেন মহাভারত-এর এক গুরুত্বহীন চরিত্র বলরামকে। ভূ-ভারতে কোথাও বলরামের ভক্ত দেখা যায় না।

সম্ভবত সেন বংশের বল্লাল সেনের সময় বাংলার ব্রাহ্মণাধিপত্য পূজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়

বৌদ্ধধর্মকে অপসারিত করে। ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা সমাজের সর্বেসর্বা হলে সমাজকে অজগরের মতো আষ্টে-পৃষ্ঠে পেঁচিয়ে গ্রাস করতে লাগল। উদারতার পরিবর্তে সমাজ রক্ষণশীলতার অন্ধকূপে নিক্ষেপিত হল। এতকিছু সত্ত্বেও বেদবিদ্যার আচরণ বিধির শেকড় সমাজের গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ বাঙালি জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ছিল হাড়ি-পোদ-বাগদি-কেওড়া-কেওট-কৈবর্ত প্রভৃতিরা। ফলে ভিন্নতর সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপাদান মজুত ছিল। অপরদিকে অস্পৃশ্যতার সর্পিল গ্রাস, ধর্মান্ধতার অহংকার পারস্পরিক ঘৃণা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কোনও ঐক্য তো গড়েই তোলেনি বরং করেছিল বহুধা বিভক্ত। এর পূর্বে এ অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের জন্যই তাদের কাছে এল এমন ধর্ম যা মানুষকে ঘৃণার পরিবর্তে মানুষে মানুষে মিলনের কথা বলে, নেই কঠোর অনুশাসন, নেই ছুৎমার্গিতা। এমন একটা ধর্মই বাংলার অন্ত্যজ মানুষরা অন্তর দিয়ে চাইছিলেন। সে ধর্মই বৌদ্ধ ধর্ম। দলে দলে বিশেষত পূর্ববঙ্গের দলিত মানুষ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। পালরাজারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে বঙ্গে বৌদ্ধাধিকার ঘটে। ব্রাহ্মণ্যধর্ম সামরিক বিপর্যস্ত হয়ে পিছু হটে যায়। সেন আমলে আবার পুনঃ ব্রাহ্মণাধিকার ঘটলে বৌদ্ধদের 'পাষণ্ড' আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু যে বৌদ্ধধর্ম হিন্দুধর্মের সবচেয়ে বড়ো কু-প্রথা অস্পৃশ্যতাকে বর্জন করে বাংলার অন্ত্যজ মানুষের হৃদয় জয় করেছিল সেই বৌদ্ধধর্ম বাংলার মাটি থেকে অপসারিত হল কীভাবে। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ বিষয়ে সুন্দর বিশ্লেষণ করেছেন— 'তখন বৌদ্ধধর্মের অবসানের যুগ, বৌদ্ধধর্ম তখন তান্ত্রিকতা ও সহজিয়া মতের পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জমান। তুর্কিদের আগমন ও মুসলমান রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, এবং ভারতে (বিশেষ করিয়া বঙ্গে) বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ লাভ— এই দুইটি কাকতালীয় ন্যায়ে হইয়াছিল। জীবনী-শক্তিতে হীন বৌদ্ধধর্ম, নবশক্তিতে জাগ্রত পুরাণ ও তন্ত্রজীবী ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নিকট পরাভূত হইতেছিল; ব্রাহ্মণ ও তাহার অনুগামীর দল নব উৎসাহে তখন বেদ উপনিষদ ও তন্ত্রের সমন্বয়ে সৃষ্ট নব হিন্দু ধর্মকেই সু-প্রতিষ্ঠিত করিতেছিল। সমাজে তখন ব্রাহ্মণই প্রধানতম নেতা, বৈদ্য এবং কায়স্থ এ বিষয়ে ব্রাহ্মণের পাশে দাঁড়াইয়াছিলেন।'[১০৪] এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মার্কসীয় ধারার নিম্নবর্গীয় ইতিহাসের যিনি ভারতে অন্যতম পথিকৃৎ রামশরণ শর্মা— 'The varna system was also modified by the transformation at the Sudras in cultivators and the relegation of the vaisyas to the Sudras, with the result that the newly Brahminical order in Bengal and the South India Provided mainly has Brahamans and Sudras. The most spectacular development was the Proiitieration of Castes. Which affected the Brahmans, the kayasthas, the khastriyas as the Rajputs and above all the Sudras. The numbers of the mixed castes rose by leaps and baunds, and the untouchable castes increased enormously.'[১০৫]

তুর্কি বিজয়ের পর কালক্রমে বঙ্গে মুসলমানাধিকার ঘটল তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা অত্যন্ত জরুরি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অপসারণ ও

মুসলমানাধিকার এ দুটিকে কাকতালীয় বলে অভিহিত করলেও আদপেই তা নয়। এর পটভূমি তৈরি হয়ে গিয়েছিল বিভেদের জটিল ব্রাহ্মণ্যবাদী সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থার মধ্যেই। কোথাও দেখেছি, নিষাদ, চণ্ডাল, কিরাত, শবর, পুনিন্দ, শ্বপচ, পক্কস সবাই ম্লেচ্ছ সবাই চণ্ডাল বলে গণ্য। (অমর কোষ ১৯৯৬) 'সেই পাণিনির যুগে (খ্রিস্টপূর্ব-পঞ্চম শতাব্দীতে) হাড়ি, চণ্ডাল এত অচ্ছুৎ যে তাদের খাওয়া বাসন আগুনে পোড়ালেও শুদ্ধ হয় না, তাই তারা নির্বাসিত শূদ্র (পাণিনি ২।৪।১০)।'[১০৬] এই চণ্ডাল-হাড়িরাই বাংলার গরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী। এর কারণ সম্পর্কে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন 'ত্রয়োদশ শতকের শেষের দিক হইতেই রূপান্তরিত বৌদ্ধ সংখ্যাপুষ্ট হিন্দু সমাজ বিজেতা মুসলমানদের ধর্মের সম্মুখীন হইল। বাস্তবিকই ইহা দুইটি বিভিন্ন মুখী ধর্মের সংঘাত দুইটি বিপরীত ধর্মী সংস্কৃতির সংঘর্ষ। প্রথমে চলিল আত্মরক্ষা— এই আত্মরক্ষায় হিন্দু সমাজ একেবারে শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করিল।'

...এই ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে রক্ষণশীল নীতি গৃহীত হইল, এবং নানা সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইল। যাহাদের "ম্লেচ্ছ" বা "যবন" সংস্পর্শ ঘটিল সমাজ তাহাদিগকে নির্মমভাবে বর্জন করিতে লাগিল। আচার নিষ্ঠা হইল প্রবল, সমস্ত 'অনাচার' বাঁচাইবার জন্য সমাজ কূর্মের মতো আত্মসংকোচ নীতি গ্রহণ করিল।'

...এই শ্রেণির (নিম্নশ্রেণির) প্রাণধারণের অনিবার্য তাগিদে, নানা সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির আশায় উচ্চশ্রেণির ভ্রূকুটি ও শাসন এবং স্থান বিশেষে শাস্তি এড়াইবার জন্য দলে দলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইতে লাগিল। ধর্মান্তরের পরেই বিজেতা মুসলমানগণের বৈষম্যমূলক ব্যবহার, জিজিয়াকর প্রভৃতি হইতে রেহাই পাইয়া সমাজে তাহারা নিঃসঙ্কোচে মেলামেশা ও স্থান বিশেষে পদমর্যাদাও লাভ করিল। এইভাবে চতুর্দশ শতক ধরিয়া জাতিচ্যুতিকরণ অন্যদিকেও ধর্মান্তর গ্রহণ চলিল।'[১০৭] যাদের প্রতি নিয়ত গঞ্জনা, নেড়ে ইত্যাদি কদর্য গালাগাল শুনতে হত। সেই লাঞ্ছিত মানুষরা ইসলামের সাম্যের আদর্শকে গ্রহণ করে মুক্তি পেতে চাইল। সুপ্রকাশ রায়ের ভাষ্য অনুসারে বাংলায় প্রথম ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বৌদ্ধরা। যেহেতু বৌদ্ধরা নেড়া মাথায় তাদের ধর্মানুশাসন মেনে নেড়া মাথায় থাকত তাই ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাদের 'নেড়ে' বলে খ্যাপাত। সেই থেকেই মুসলমানদেরও নেড়ে বলে বিদ্রূপ করা হয়।[১০৮] সাধারণভাবে হিন্দু মহলে এরকম গল্প প্রচলিত আছে যে মুসলমানরা অহেতুক লড়ে যায় বলে তাদের নেড়ে বলা হয়, এর কোনও ঐতিহাসিক বা সামাজতাত্ত্বিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বাউলদের নিয়ে কিছু আলোচনা করব। আহমদ শরিফের এ প্রসঙ্গে সুচিন্তিত মতামত— 'উনিশ শতকের লালন সাঁই থেকে আমরা প্রচ্ছন্ন বিকৃত বৌদ্ধতান্ত্রিক বাউল [বজ্রকুল > বাউল] সঙ্গীত পেয়েছি'।[১০৯] অপরদিকে পঞ্চানন সাহার মতে 'বাউল শব্দটির উৎপত্তি নিয়ে মতভেদ আছে। বাউরা বা উন্মাদ থেকে বাউল এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার অনেকে বলেন যে সংস্কৃত "বাতুল" থেকে বাউল শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে অন্যদিকে সুফিরা সাধু ফকিরকে বলেন

আউলিয়া এই আউলিয়া শব্দটি থেকে আউল শব্দটি বাউল শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে কর্তাভজা সম্প্রদায় আউল চাঁদ নামক এক সাধু অষ্টাদশ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। (মধ্য যুগে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৪৩)"[১১০] যাই হয়ে থাকুক না কেন, বাউলদের জীবন দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনও আচারের ধার ধারে না, এক ধরনের বাউণ্ডুলে জীবন যাত্রা, কিন্তু বোহেমিয়ান কখনও নয়। বৌদ্ধ শ্রমণদের সাথে এদের জীবন যাত্রার একটা মিল পরিলক্ষিত হয়, আর হয় বৈষ্ণবদের মাধুকরীর সাথে। এই জীবন চর্চা অত্যন্ত বিষয় বুদ্ধি সম্পন্ন স্বার্থান্ধ ব্রাহ্মণতন্ত্র সহজে মানবে কেন। ড: মহাম্মদ শহীদুল্লাহ শূন্য পুরাণের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন মঙ্গলকাব্যগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। 'ব্রাহ্মণগণ ধর্মঠাকুরের পূজারি বৌদ্ধ ও মুসলমান উভয়ের প্রতি একই ব্যবহার করত।' ব্রাহ্মণদের অত্যাচারের কথা "নিরঞ্জনের উষ্মায়" স্পষ্ট বর্ণিত আছে। ধর্মঠাকুর মুসলমান বেশে এসে সত্যকর্মীদের রক্ষা করলেন (শূন্য পুরাণ এর ভূমিকা মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, পৃ. ৩৫)। একই কথা বলেছেন এম. এম. আকাশ 'স্থানীয় জনগণের যারা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতাপে অস্থির ছিল, বিশেষত অত্যাচারিত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীগণ এবং শূদ্রবর্ণের লোকেরা তারাই প্রধানত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। তারা অধিকাংশই ছিলেন সমাজের অধস্তন জনগোষ্ঠী।"[১১১] সুতরাং বাংলায় মুসলমানাধিকার আকস্মিক ঘটনা নয়, অদৃষ্টের পরিহাসও নয় আবার কাকতালীয়ও নয়, ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে অন্ত্যজ মানুষের তীব্র ঘৃণার ও ক্ষোভের পরিণাম। তুলনামূলকভাবে সাম্যের ধারণা যুগ লাঞ্ছিত মানুষদের আকৃষ্ট করেছিল এই ধর্ম, পরের পরিণতি যাইহোক না কেন।

ঐতিহাসিক কারণেই স্ববিরোধ বা দ্বন্দ্ব মুসলমান সমাজের মধ্যেও ছিল। প্রথমত, দ্বন্দ্ব ছিল মারফতিদের উদার ব্যবস্থার সাথে শরিয়তিদের কঠোর অনুশাসনের। রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ছিল শরিয়তিদের অনুসারী। মুসলমান শাসকরা যুদ্ধবিদ্যার বাইরে কিছুই জানত না, শিক্ষার জায়গা ছিল প্রায় শূন্য। এর জন্য তাদের নির্ভর করতে হত পারস্য থেকে আসা বিদ্বজ্জনের উপর। ইসলামি রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এবং আরবীর রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও পারস্য ছিল শিক্ষায় সংস্কৃতিতে সবচেয়ে অগ্রণী। পারস্যের সাথে ভারতের সুদূর অতীত থেকে যোগাযোগ ছিল। এছাড়া রাজকর্মচারীদের মধ্যে ফারসি ভাষা জানা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বাংলায় মীরজাফরের সময়কাল অবধি স্থানীয় মুসলমানরা রাজকর্মচারীরূপে স্থান পেত না। বাংলায় তুর্কি বিজয়ের প্রায় সাথে সাথে সুফিদের এদেশে আগমন। শুধুমাত্র প্রেমপ্রীতি উদারতা দিয়ে তারা অন্ত্যজ ও বৌদ্ধধর্মের ধর্মান্তরিত করিয়েছিলে কথাটা আংশিক সত্য। অনেকক্ষেত্রে স্থানীয় সমস্যা সমাধানে তারা বলপ্রয়োগ করেও সাধারণ মানুষের আস্থা অর্জন করেন। যেমন বদরপির চট্টগ্রামে আরাকান দস্যুদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন এবং দস্যু বিতাড়ন করেন। ১৮৭২ এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে বলা আছে আর্তের সেবা, কাঙাল ভোজন, রোগীর চিকিৎসা ও কেরামতির দ্বারাই সুফিরা জনমন জয় করেছিলেন।

একে কখনওই খোলা মনে নেননি শরিয়তিরা। পরবর্তীকালেও বাঙালি মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও উক্ত মূল্যায়নের সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। এনামুল হকের মতে 'শুধু বাংলাদেশ নহে, সমগ্র আর্যাবর্তে সুফিদের প্রবর্তনায় দলে দলে লোক ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহারা ইসলাম ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য সৌন্দর্য শ্রেষ্ঠত্বে আকৃষ্ট হওয়ার চেয়ে দরবেশদের কিরামত বুজরুকির দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন।'[১১২] আসাহাবুর রহমানও কিন্তু প্রচলিত মতের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেছেন এবং মনে করার সঙ্গত কারণ আছে যে তিনি ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'ভারতীয় উপমাহাদেশে সুফি সাধক ও দরবেশরা প্রেমপ্রীতির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করেছেন এ রকম একটা ধারণা প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এ বক্তব্যটি কোনও ঐতিহাসিক তথ্য দিয়ে প্রমাণিত নয়। রিচার্ড হটন এই প্রচলিত ধারণাটিকে অপমানিত করেছেন।... প্রকৃতপক্ষে অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও সুফি যোদ্ধারা ইসলাম প্রচার করেছিলেন বল প্রয়োগের মাধ্যমে।'[১১৩] লক্ষণীয় যে তাদের কারুর নাম বুৎকাশিম বা মূর্তি ধ্বংসকারী।[১১৪]

এসব সত্ত্বেও মানতে হবে যে বহু পিরকে শুধুমাত্র মুসলমানরাই মানত এমত সিদ্ধান্তটা ঠিক নয়। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ মিশ্র "শেখ শুভদয়" নামক গ্রন্থে পিরদের আলৌকিক ক্ষমতা ও বিজিতদের আশ্রমের উপর পিরের দরগা স্থাপনের উল্লেখ করেছেন। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে 'মুসলমানরা বাংলা জয় করিবার পর অনেক সুফি, দরবেশ ও পির এইসব তান্ত্রিক সাধুকে স্থানচ্যুত করিয়া তাহাদের বাসস্থানেই দরগা প্রতিষ্ঠান করেন। পিরগণও অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন। ...ফলে তান্দ্রিক সাধুর শিষ্যরা অনেক স্থান মাহাত্ম্যে এবং এইসব আলৌকিক ক্ষমতার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়া পিরের দরগায় আসিত এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত।'[১১৫] এইসব পির ফকিররের প্রতি আবার শরিয়তিদের কীরূপ ঘৃণা জাগ্রত ছিল তার উদাহরণ, ১৯১০ সালে একটি পুস্তিকায় মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানানো হল—

'বাংলার নানা স্থানে নেড়ার ফকির
জীবন্ত পিশাচরূপে হইয়াছে জাহির
শয়তানের চেলা তারা, আদত শয়তান
উহারা মোসলেম নহে, জানিবে একিন...
আপনাকে হীন জাতি কভু না ভাবিবে
মোসলেম সর্বোচ্চ জাতি মনেতে রাখিবে।'

এতগুলো ধর্মের দ্বন্দ্বের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বহুমাত্রিকতা বোঝানোর জন্য নয়, ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহকে বোঝবার জন্য। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ সত্যে উপনীত হওয়া যায়— প্রথমত, হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বেই ভারতে প্রথম সাম্প্রদায়িক সংঘাত নয়। এর উৎপত্তি ভারতে আর্য

সভ্যতা বিকাশের সময় থেকে। দ্বিতীয়ত, হিন্দু ধর্ম যেহেতু কোনও সুনির্দিষ্ট একটা বিশ্বাস নয়, ফলে সংঘাত এসেছে বারে বারে শৈবদের সাথে শাক্তদের, শাক্তদের সাথে বৈষ্ণবদের। হিন্দুদের সাথে বৌদ্ধদের ও জৈনদের সর্বশেষে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব বাঙালির সমাজ জীবনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে। তৃতীয়ত, দিগভ্রান্ত বৌদ্ধধর্মের অভ্যন্তরে মহাযানদের সাথে হীনযান, বজ্রযান সহজিয়া মতগুলোর দ্বন্দ্ব। আহমদ শরিফের ভাষায় 'এই বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির কালে নির্জিত বৌদ্ধরা বাহ্যত ব্রাহ্মণ সমাজশ্রয়ী হয়ে তাদের শাস্ত্রীয় বিশ্বাস সংস্কার চালু রাখার চেষ্টায় ছিল, শূন্যবাদী ধর্মঠাকুর পূজারি, নাথ পন্থী, সহজপন্থী এবং যোগ-তান্ত্রিক সাধন পন্থী এবং সাধারণ হিন্দু মুসলিম বাউলরাই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধই। তারা, আদিনাথ, চন্দ্রনাথ, বৎসলা, যক্ষ, ক্ষেত্রপাল প্রমুখ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধদেবতাও হিন্দু দেবতারূপে পূজিত হতে থাকেন।'[১১৬] জটিল এক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দ্বন্দ্বসমূহের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে বাংলার সমাজ। চতুর্থত, বাংলার বিশেষত্ব হল মুসলমান সমাজের মধ্যেকার দ্বন্দ্বসমূহ শরিয়তিদের সাথে মারফতিদের, পরে অবশ্য শরিয়তপন্থীদের বিরুদ্ধে হানাফিপন্থীদের বাংলায় জাগরণ ঘটে, যদিও শরিয়তিদের সাথে অসম লড়াই এ-ধারা বেশিদিন টিকে থাকেনি। আবার মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে আশরাফদের সাথে আতরাফ আজলফদের দ্বন্দ্ব। পঞ্চমত, ব্রাহ্মণ সমাজের সাথে অন্ত্যজ বাংলার প্রাচীন আদিবাসীদের দ্বন্দ্ব আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় যে ব্রাহ্মণ্য সমাজে কঠোর অনুশাসন ও অস্পৃশ্যতা, সেই ব্রাহ্মণ সমাজের অভ্যন্তরের দ্বন্দ্ব যথা রাঢ়ি-বারেন্দ্র-অগ্রদানিদের দ্বন্দ্ব আবার উত্তর ভারতের ব্রাহ্মণদের সাথে দ্বন্দ্ব। সর্বশেষ দ্বন্দ্ব ঘনিভূত হয়েছে হিন্দুদের সাথে ব্রাহ্মণদের সর্বোপরি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণকারী ও ইয়ংবেঙ্গল সোসাইটির সদস্যদের সাথে।

এ দ্বন্দ্বের ওঠানামা যেন এক 'পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা'র সংঘাতে চলেছে আজও বাংলার সমাজ। যে সংঘাতের ইতিহাস চলেছে শত-শত বৎসর ধরে বিরামহীনভাবে। আগে লিখেছিলাম বাংলার জলদ আবহাওয়ায় বিকশিত হয়েছিল সম্প্রীতি। আবার লিখতে হচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মে বাংলার জলদ আবহাওয়ায় আগাছার অস্বাভাবিক বৃদ্ধি হয়। বাংলার সামাজিক জীবনে সেই আগাছাই হল সাম্প্রদায়িকতা।

এ-যেন আমাদের এক ঐতিহাসিক নিয়তি।

শিক্ষার প্রসার ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত

ব্রিটিশ শাসনের প্রাক্কালে ও তার পরবর্তীতে মুসলমান সমাজের স্থান এবং তার থেকে উদ্ভুত সংঘাত নিয়ে পর্যালোচনা এই পর্যায়ে জরুরি। আমাদের মনে রাখতে হবে দেশের এক বৃহৎ জনসমষ্টিকে শিক্ষার মূল ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন রাখার অর্থ সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া। যে যুগান্তকারী ভুল করেছিলেন নব জাগরণের ব্যক্তিত্বরা। ইংরেজ আমলে মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের কী চোখে দেখা হত তার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায় নীরদ চৌধুরীরর আত্মজীবনীতে— In the first place, we felt a retrospective hostility towards the Muslims for their one-time domination of us, the Hindus; secondly, on the plane of thought we were utterly indifferent to the Muslims an element in contemparary society; thirdly, we had friendliness for the Muslims of our own economic and social status with whoom we came into personal contact; our fourth feeling was mixed concern and contempt for the Muslim peasant, whoom we saw in the same light as we saw our low-caste Hindu tanants or in other words, as our live stock? [১১৭] সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা মুসলমান সমাজে জাগরণের চেষ্টা চালানো হয়। 'বাংলা শিক্ষা 'বিদাত' এবং ইংরেজি শিক্ষা 'হারাম' এই ফতোয়া জারি হয়েছে।'[১১৮] এর প্রভাব অল্পবিস্তর বাংলার গ্রামে-গঞ্জে পড়ে। 'উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় অ্যাডাম সাহেবের যে রিপোর্ট বের হয় তাতে দেখা যায় প্রাথমিক স্তরেই হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রদের সংখ্যা ছিল ১৮:১ অনুপাত। ইংরেজ সরকার সুকৌশলে তুর্কি মোগল বাদশাহর জাত ও জ্ঞাতি, মুসলিমদের অজ্ঞতার নিরক্ষরতার, নিঃস্বতার, দুস্থতার, দরিদ্রতার জন্য হিন্দুদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ শাসন-শোষণ বঞ্চনাকে দায়ী বলে প্রকৃত ইতিহাসে অজ্ঞ ও দরিদ্রতার অবিজ্ঞ মুসলিম মনে ধারণা বদ্ধমূল করে দিতে থাকে। তাতে আবার সমর্থন জোগাতে থাকে গোড়া থেকেই ইংরেজদের স্বীকৃতিতে ও সমর্থনে বাঙলাভাষী মুসলিমদের অভিভাবকত্বে ও নেতৃত্বে স্বেচ্ছায় আসীন উর্দুভাষী মুসলিমরা, যারা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হয়েও কেবলই মুসলিম এবং বাঙালি নয়— এ পরিচয়ে গর্ববোধ করে আজও।'[১১৯] ১৮৯০ সালের পর থেকে আরবি-ফারসি-উর্দু ছেড়ে মুসলমান সমাজ ইংরেজি শিক্ষায় সম্পৃক্ত হয়, সেঁ সময় বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায় শুধু লেখাপড়া করাই নয় সরকারি

চাকরির সিংহ ভাগ তাদের দখলে চলে গিয়েছিল। পলাশি পূর্ববর্তী নবাবি আমলে বাংলার শাসন ব্যবস্থার তিনটি প্রধান স্তম্ভ ছিল (ক) সামরিক ও বিচার, (খ) রাজস্ব (গ) অর্থনৈতিক; প্রথমটিতে ছিল মুসলমান প্রাধান্য। তবে তাদের বেশিরভাগই বহিরাগত আশরাফ মুসলমান। প্রধান প্রধান জমিদারি ব্যবসা বাণিজ্যে ছিল একচেটিয়া হিন্দুদের কর্তৃত্ব। হিন্দু জমিদার ও ব্যবসায়ীরা যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে শাসন ব্যবস্থার বাইরে ছিলেন তবু তাদের বাদ দিয়ে শাসন ব্যবস্থা চলা সম্ভব ছিল না। ঐতিহাসিক সুমিত সরকারের কথায়— 'In pre-Palasy Bengal, the Muslim as the ruling community controlled the army and the machinary of criminal justice and as amils and faujdars stapped the top most rung of the administrative ladder. But the Hindu upper castes retained an important and in same ways even a pre-eminent positions in society.'[১২০] আহমদ শরিফ আরও বলেছেন 'সাধারণবাবে গত সাড়ে সাতশো বছর ধরে গাঁয়ে হাটে মাঠে, অর্থে ও চিত্তে, শিক্ষায়-প্রশাসনে, পঞ্চায়েতে অধিজন বর্ণ হিন্দুরই ছিল নেতৃত্বে প্রাধান্য। অতএব ইংরেজ আমলেই দেশজ মুসলিমরা সরকারি চাকরি অর্থ সমাজ শিক্ষার সুযোগ হারিয়ে আকস্মিকভাবে দরিদ্র ও অশিক্ষিত হয়ে পড়ে বলে যে বিশ্বাস চালু রয়েছে তার মধ্যে কোনও তথ্য বা সত্য নেই। আর এও সত্য নয় যে, বহু দেশজ মুসলিমের আয়মা, মদদেমাস বা ওয়াকফ সম্পত্তি ছিল, যা ছিল এবং যাদের ছিল তারা মোটামুটি মামলা মোকদ্দমা করেও শেষ নিষ্পত্তিকাল ১৮৪৬ সাল অবধি ভোগ দখল করেছে।'[১২১] প্রাক ব্রিটিশ যুগে বাঙালি বর্ণহিন্দুরা ফারসি ভাষা শিক্ষা করতেন, কারণ সে সময় রাজকার্য ফারসি ভাষায় পরিচালিত হত। রামমোহন রায় ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ব্রিটিশ পর্বে ওই বর্ণহিন্দুরাই আবার রাজকার্যের ভাষা ইংরেজি শিখতে এগিয়ে আসেন।

আমরা এর আগেও আলোচনা করেছি, সমাজে উচ্চ বা নীচ বর্ণ নিরূপণের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থানই মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। সাধারণভাবে ধর্মান্তরিতরা সবাই পতিত বা অন্ত্যজ হওয়ার কারণেই অর্থনীতির প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাস করতেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর শ্রেণি মানেই অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর উচ্চবর্ণভুক্তশ্রেণি। ইংরেজ এদেশে আগমনের পরে বাঙালি মুসলমানদের উপর অর্থনৈতিক আক্রমণ আসেনি এরকম মূল্যায়ন করলে তা হবে একদেশদর্শী। প্রথমত, রাজানুগ্রহে আশ্রিতদের হিন্দু মুসলমান যাই হোক না কেন তাদের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। শুধুমাত্র মীরজাফরের বংশধররাই নয় জগৎ শেঠের স্ত্রীকেও ব্রিটিশের দেয় খোরপোশের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, কৃষি, কুটিরশিল্প ও জগৎ বিখ্যাত বাংলার বয়ন শিল্পকে ধ্বংস করে দেওয়ার ফলে, এদের জীবনে নেমে আসে গভীর অন্ধকার। মনে রাখতে হবে এদের গরিষ্ঠ অংশই ছিল মুসলমান। আহমদ শরিফ আবারও বলেছেন '১৩৩৮ সনের স্বাধীন

গৌড় সুলতানের আমল থেকে নওয়াব মীরজাফরের ও তার সন্তানদের দরবার অবধি অনুসন্ধানে দেশজ মুসলিম মেলে না। এতেই বোঝা যায় স্বধর্মী বলেই এসব নির্জিত দেশজ মুসলিমের প্রতি কোনও তুর্কি মুগল, শাসকগোষ্ঠীর কোনও দায়িত্ববোধ ও কর্তব্য চেতনা ছিল না, যেমন ছিল না ইংরেজদের নিম্নবর্ণের খ্রিস্টানদের প্রতি।'[১২২] সুতরাং আমরা এই স্বতঃ সিদ্ধান্তে আসতে পারি কী নবাবি আমলে কী ইংরেজ আমলে শিক্ষার কারণে চাকরির সুযোগ পেত উচ্চবর্ণের হিন্দুরা। বাংলার মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ আমাদের কাছে বিশ্লেষণ করেছেন অমলেন্দু দে— 'কিন্তু পলাশির যুদ্ধের পর ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অবস্থার মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। খুব দ্রুতগতিতে মুসলমানরা দুরবস্থায় পতিত হল।'[১২৩] অধ্যাপকদের মন্তব্য আমরা পূর্বেই বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছি।

দেরিতে হলেও মুসলমান সমাজের একটি অংশ শিক্ষা বিস্তারে প্রয়াসী হন। যদিও আবদুল ওদুদ-এর কথায় 'স্থূল বুদ্ধি শাস্ত্র ব্যবসায়ীরা প্রভুর হুকুমে মুসলমান তেরশত বৎসর আগেকার 'শরীয়ত'-এর হুবহু প্রবর্তনের স্বপ্ন দেখে।'[১২৪] আনিসুজ্জামানের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি ১৮৭১ সালে বাঙালি মুসলমানের স্কুল কলেজে পড়া ছাত্রের শতকরা হার জনসংখ্যার ১৪.১ ভাগ ১৮৮১ (অর্থাৎ দশ বছর পর) তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.৮ শতাংশ। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের হার ছিল নগণ্য ১৮৮১-৮২ সালে প্রেসিডেন্সির ২৭৩৮ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১০৬ জন মুসলমান শতকরা হার মাত্র ৩.৮ শতাংশ। অবশ্য এই হার ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বোত্তম।[১২৫] এই অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে বঙ্কিমচন্দ্র সাম্য প্রবন্ধে লেখেন 'পৃথিবীতে যত প্রকার বৈষম্যের উৎপত্তি হইয়াছে ভারতবর্ষের পূর্বকল্পিত বর্ণবৈষম্যের ন্যায় গুরুতর বৈষম্য কখনও কোনও সমাজে প্রচলিত হয় নাই। এই গুরুতর বর্ণবৈষম্যের ফলে ভারতবর্ষ অবনতির পথে দাঁড়াইল। সকল উন্নতির মূলে জ্ঞানোন্নতি, বর্ণবৈষম্যে জ্ঞানোন্নতির পথ রোধ হইল— শূদ্র জ্ঞানালোচনার অধিকারী নহে... ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক ব্রাহ্মণেতর বর্ণ। সুতরাং, অধিকাংশ লোক মূর্খ রহিল।'[১২৬] রবীন্দ্রনাথও একই সংক্ষোভে কাজী ইমদাদুল হক এর গ্রন্থ ''আবদুল্লাহ'' পাঠ করে আবদুল ওদুদকে এক পত্রে লেখেন— 'দেখলুম যে ঘোরতর বুদ্ধি অজ্ঞতা হিন্দুর আচারে হিন্দুকে পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত করেছে সেই অজ্ঞতাই ধুতি চাদর ত্যাগ করে লুঙ্গি ও ফেজ পরে মুসলমানের ঘরে মোল্লার অন্ন জোগাচ্ছে।'[১২৭] একদিকে যখন বর্ণহিন্দুদের একটা বৃহৎ অংশ সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতির মূলধারায় নিজেকে অবিচ্ছিন্ন রেখেছে, তখন অমলেন্দু দের কথায় মুসলমান শিক্ষিত সমাজ 'ক্ষমতাচ্যুত হয়ে একদিকে তারা আরবি-ইরানি-তুরকি ঐতিহ্যকে আকড়ে থেকে নিজেদের পৃথক ধর্মীয় সত্তায় ও বংশ মর্যাদায় আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, আর অন্যদিকে নিম্নশ্রেণির মুসলমানের উপর প্রভাব বিস্তার করে অগ্রসর হিন্দু সমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে সরকারের নিকট হতে সুবিধা লাভের চেষ্টা করেন। একই সাথে দরিদ্র মুসলমান পরিবারের সন্তানরা

প্রথাগত শিক্ষা না গ্রহণ করে শুধু ইসলামি শিক্ষায় শিক্ষিত হলে আত্মীয় পরিজনরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন।'[১২৮]

এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে কাজী নজরুল ইসলাম লেখেন— 'আমাদের বাঙালি মুসলমানদের মধ্যে যে গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, তাহা পৃথিবীর আর কোনও দেশে কোনও মুসলমানের মধ্যে নেই বলিলে বোধহয় অত্যুক্তি হইবে না। মৌলানা ও মৌলভি সাহেবদের সওয়া যায় মোল্লাও চক্ষু কর্ণ বুজিয়া সহিতে পারি কাঠ মোল্লার অত্যাচার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইসলামের কল্যাণের নামে ইহারা যে কওমের জাতির ধর্মের কী অনিষ্ট করিতেছেন, তাহা বুঝিবার মতো কোনও জ্ঞান নাই বলিয়া ক্ষমা করা যায় ইহাদের প্রত্যেকেই "মন মনসা ফরিদ বাগানেমে ইট।" ইহাদের নীতি মুর্দা দোজখ মে যায় য়্যা বেহেশত মে যায়, মেরা হালুয়া রুটি মে কাম।' ...চোগা চাপকান দাড়ি টুপি দিয়া মুসলমান সাজার দিন গিয়াছে। পৃথিবীর আর সব মুসলমানদের কাছে আজ আমরা পাঁচ শতাব্দী পিছনে পড়িয়া রহিয়াছি।'[১২৯]

'দেশ' পত্রিকার ২ অক্টোবর ২০০৫-এর চিঠিপত্র কলমে এ. কে. বিশ্বাস জানান '১৯১১ সালে গোখলে সকলের জন্য শিক্ষার বিল আনলে স্থানীয় সরকারে যারা আছেন তাদের বৃহত্তর অংশই এর বিরুদ্ধে ভোট দেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেন। এমনকী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রশ্নও তিনি বিরোধিতা করেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও এর তীব্র বিরোধিতা করেন। সৈয়দ আমির আলি নিজেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত করে বাঙালি মুসলমান সমাজের সংস্কার কল্পে মুসলমান সমাজের মুখপাত্র হন। এ-হেন আমির আলিকে সাধারণ মুসলমান সমাজে শিক্ষার আলো প্রবেশের দায়িত্ব দিলে, তিনি তা নিতে অস্বীকার করেন। এর উত্তরে তিনি লেখেন একজন মুসলমানের উচিত ইসলামের আদর্শ ও হজরত মহম্মদের জীবন ও কর্মের শিক্ষা অনুসারে চলা উচিত। সাধাবণ মুসলমানের আধুনিক শিক্ষা গ্রহণের তিনি বিরোধী ছিলেন। শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায় কোনওভাবে চাননি যে সাধারণ গরিব মুসলমান ও অন্ত্যজ হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষা উচ্চ শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করুক। এটা তাদের একচেটিয়া হিসাবে করতলগত করে রেখেছিলেন। এর ফলে জন্ম নিয়েছে শুধু নয় বৃদ্ধি পেয়েছে অন্ধ ধর্মীয় ভাবনা, গরিব মুসলমানরা শুধু মাত্র ধর্ম শিক্ষাকে মাপকাঠি করায় সমগ্র বাঙালি মুসলমান সমাজ রয়ে গিয়েছে অসীম অজ্ঞতার অন্ধকারে। সৃষ্টি হয়েছে এক সাম্প্রদায়িক অসারতা, আজকাল প্যান-ইসলামইজমকে হাতিয়ার করে দুই বাংলায় সন্ত্রাসবাদ মাথা চাড়া দিচ্ছে তাঁকে শুধু বাইরের মদতে হচ্ছে বলা মানেই বাঙালি সমাজের স্ববিরোধিতাগুলিকে অস্বীকার করা। যে শিক্ষিত মুসলমান সম্প্রদায় বাড়ির গৃহ ভৃত্যের জন্য সাধারণ গরিব মুসলমান সম্প্রদায়কে নীচে দাবিয়ে রেখেছে তাতে না হয়েছে নিজেদের, না হয়েছে সমাজের মঙ্গল। আসলে কতিপয় জমিদার-জোতদার ও পরবর্তীতে অর্থবান মুসলমানরাই হয়েছেন মুসলমান সমাজের পরিচালক। মৌলবিরা হয়েছেন তাদের

হাতের ক্রীড়নক। সবচেয়ে বড়ো যে সমস্যা যা পূর্বেও উল্লেখ করেছি, বাঙালি মুসলমান সমাজে হিন্দু বাঙালি সমাজের মতো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব হয়নি, যা তাদের অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায়। আবার ও মহম্মদ কাজী আবদুল ওদুদের কথা উল্লেখ করতে হয়— 'মুসলমানরা যে দুটি কারণে ইংরেজি শিখতে এগোল না তার প্রথমটি ধর্মনাশ এর ভয় দ্বিতীয়টি নব রাজশক্তির প্রতি মুসলমানের বিরূপতা দীর্ঘ ওয়াহাবি বিদ্রোহের ভিতরে রয়েছে যার সুস্পষ্ট পরিচয়।'[১৩০]

অতীতে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন একশ্রেণির মুসলমানের অন্ধ সমর্থন আদায় করেছে তেমনি ইংরেজি শিক্ষা করতে না চাওয়া মুসলমান যুবকদের হাতে সাহেবরা নিগৃহীত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিনয় ঘোষের বক্তব্য— '১৮৩৫ সালে যখন কলকাতা শহরের আট হাজার মুসলমান মেকলের ইংরেজি শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন এবং ১৮৫০ সালে যখন মাদ্রাসার ইংরেজ অধ্যক্ষকে ইটপাটকেল ও পচা ডিম ছুঁড়ে মেরেছিলেন তখন কিন্তু হিন্দু সমাজে ক্রমবর্ধমান শিক্ষিত চাকুরিজীবী মধ্যশ্রেণির বিকাশ হয়েছে।'[১৩১] এর ফলে আজও মুসলমান সমাজ শিক্ষার মূলধারায় পিছিয়ে রয়েছে। ষাট-এর দশক থেকে এই ধারার পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে মইনুল হাসান লিখেছেন 'কয়েকটি জেলার কলেজগুলোতে ৬০ সালের আগে মুসলমান সন্তানদের নামই প্রায় পাওয়া যেত না। কিন্তু মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, ২৪ পরগনা জেলার একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় মুসলমান ছাত্ররা ব্যাপকভাবে আসতে শুরু করল কৃষির ক্ষেত্রে উন্নত পন্থায় চাষ করার প্রবণতা বাড়ল।'[১৩২] অবশ্য তিনি এও স্বীকার করেছেন 'একসময় বিদেশি শিক্ষাটাকে একেবারেই পরিত্যাগ করেছিল মুসলমান সমাজ। তারপর অভিজ্ঞতাতে প্রমাণিত হয়ে গেছে তাদের ভুল চিন্তাগুলো। আবার জ্ঞান বিজ্ঞানের শাখাতে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করার মানসিক জোর এই সমাজ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু এখনও মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার একেবারেই নগণ্য।'[১৩৩] এর ফলে অর্ধেকই এখনও অন্ধকারে। আর আরও শতগুণ প্রতিযোগিতার মনোভাব বর্ধিত হওয়া দরকার। অবশ্য উল্লেখ্য যে বাংলাদেশের শিক্ষায় অগ্রগতির হার অনেক বেশি। এই অগ্রগতির পিছনে তিনটি প্রধান কারণ (১) ১৯৪৭ ও ১৯৬৪-তে পশ্চিম বাঙলার শিক্ষিত মুসলমানের একটা বড়ো অংশ পূর্ব পাকিস্তানে চলে যাওয়া (২) পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলন (৩) স্বাধীন বাংলাদেশ গঠন, যা বাংলাদেশকে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে অনন্য মাত্রা দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা

আলোচনার প্রারম্ভেই আমাদের নিরুপণ করতে হবে কোন কোন সাহিত্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্যের সাথে অনুবন্ধী আর সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্যেব তত্ত্বই বা কী তার অনুসন্ধান জরুরি। যে সাহিত্য নিজের জাতি-ধর্ম-বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য অপরের জাতি, ধর্ম বা বর্ণকে হেয় প্রতিপন্ন করে, ঘৃণা করতে শেখায়, মিলনের পরিবর্তে বিভেদ জাগ্রত করে এবং সাহিত্যের মধ্য দিয়ে পরধর্ম বিদ্বেষকে ইন্ধন দেয় তাকেই আমরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্য বলব। বাংলা সাহিত্যের গভীরতা, উদারতা তার চলমান স্রোতাভিমুখ, তার স্বাভাবিক পরিণতি ভ্রাতৃত্ববোধ ও পরম্পরায় চলে আসা মিলনের বহমান ধারা। ভারতীয় সাহিত্য ধারায় এর নজির এত বেশি নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের বিপরীত মুখী ধারার উপস্থিতি অনুধাবন না করা হবে একদেশদর্শী ও পক্ষপাত দুষ্ট। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সাম্প্রদায়িকতার দানবকে জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টা অতীতের লোক সাহিত্য ও বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যর মধ্যে ছিল ও আছে।

হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কঠোর অনুশাসন ও তাকেই স্বাভাবিক বলে ধরে নেওয়ার উদাহরণ পাওয়া যায় পনেরো শতকের কবি মালাধর বসুর কবিতায়—

> 'পুরাণ পড়িতে নাই শূদ্রের অধিকার
> পাঁচালী পড়িয়া তর এ ভব সংসার'

একই সময়ে বিজয় গুপ্তর মনসামঙ্গলে হিন্দুর প্রতি মুসলমান কর্মচারীর অকথ্য অচ্যাচারের বর্ণনা আছে—

> 'যাহার মাথায় দেখে তুলসীর পাত।
> হাতে গলে বান্ধি নেয় কাজির সাক্ষাৎ॥
> বৃক্ষতলে থুইয়া মারে বজ্র কিল
> পাথরের প্রমাণ যেন মারে বজ্র কিল॥

আবার রাখাল বালকরা মনসার ঘট পেতে পূজা করলে তাদের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচার করার উল্লেখ এই সাহিত্যে আছে, এমনকী যে কুম্ভকার ঘট বানিয়েছিল তাকেও গ্রেপ্তাব করার পর কাজীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

> 'হারাম জাত হিন্দুর এত বড় প্রাণ।
> আমার গ্রামেতে বেটা করে হিন্দুয়ান॥

গোটে গোটে ধরব গিয়া যতেক ছেমরা।
এড়া রুটি খাওয়াইয়া করিব জাতি মারা।।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে' আছে—

'যতেক বেদের মত, সকলি করিল হত, নাহিমানে আগম পুরাণ
মিছামালা ছিলিমিলি, মিছাজপে ইলিমিলি মিছা পড়ে কলমা কোরান
যত দেবতার মঠ ভাঙি ফেলে করি হঠ, নানা মতে করে আনাচার।
বামন পণ্ডিত গায় থুতু দেয় তার গায়, পৈতা ছেঁড়ে খোঁটা মোছে আর।।

এখানে আরও একটি বিষয়ের উল্লেখ না করলে আলোচনা একদেশদর্শী হবে। কবি যশোরাজ খান ও কবীন্দ্র পরমেশ্বর কাব্যে হোসেন শাহের প্রশংসা করলে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত লেখেন 'যশোরাজ খান নামক কবি তাঁহাকে 'জগৎ ভূষণ' এবং কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁহাকে 'কলিযুগের কৃষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হোসেন শাহের স্বরূপ বর্ণনা মনে না করিয়া মধ্যযুগের বাঙালি কবির দীর্ঘ-দাসত্ব-জনিত নৈতিক অধঃপতনের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করাই অধিকতর সঙ্গত'।[১৩৪] শুধুমাত্র বিজয় গুপ্তর মনসামঙ্গল কাব্য দিয়ে কবীন্দ্র পরমেশ্বর-এর মূল্যায়ন পক্ষপাতদুষ্ট বলেই প্রতিভাত হয়। আমাদের মনে রাখতে এই সমসাময়িক যুগজয়ী বাংলা সাহিত্যগুলিতে আছে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, চণ্ডীদাসের পদাবলি ও অবশ্যই মঙ্গলকাব্য যেখানে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছিল, এই সাহিত্যগুলিতে সাম্প্রদায়িক বিভেদের নজির নেই। 'বিপ্রদাস পিপলাই হোসেন শাহের রাজত্ব লাভের দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহার মনসামঙ্গল রচনা করেন।'[১৩৫] বিপ্রদাস পিপলাই এর সাহিত্যে বিজয় গুপ্ত বর্ণিত বিভেদের উল্লেখ নেই এবং তার কৃত 'মনসামঙ্গল'ই সর্বাধিক জনপ্রিয় ও পরিচিতি লাভ করে।

মধ্যযুগে মুসলমান সাহিত্যকারগণ রচিত সাহিত্যেও সাম্প্রদায়িকতা দোষ দুষ্ট কাব্য পাওয়া যায় তার উল্লেখ পূর্বেই পেয়েছি। আলাওলের সিকান্দরনামায় আছে—

অগ্নি পূজে যে সমস্ত অহুর্মজদা জেরথুস্ত
নিজ দ্বীনে সকলি আনিল।
ইরানী সকল প্রতি আদেশিলা মহামতি
অগ্নিপূজা ছাড়হ তুরিত
আছ এ ঈশ্বর এক সর্বস্থানে পরতোক
তানে মাত্র সেবিতে উচিত (পৃ. ১২৬)

এর পূর্বেও প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সময়ে সাহিত্যে ভেদাভেদ ও পারস্পরিক ঘৃণার বিষয়ে বিভিন্ন আলোচ্য পর্বে আলোচনায় এসেছে। এ কথাও উঠে এসেছে প্রাচীন সাহিত্যকাররা সমাজে যে ভেদাভেদ ছিল তার স্বরূপকে তুলে ধরেছেন আবার কখনও স্থানীয় শাসকদের স্তুতি করবার জন্য তার ধর্মের জয় ও পরধর্মের বিনাশ সাধন করেছেন।

আধুনিক যুগের এদেশে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে সাম্প্রদায়িকতাবাদী সাহিত্য নতুন মাত্রা লাভ করে। এ আলোচনায় প্রবেশ করতে গেলে পূর্বানুবৃত্তি প্রয়োজন।

একথা ভুললে চলবে না বাংলার নব জাগরণের রূপকাররাই-প্রথম এদেশে ইংরেজ শাসনকে স্বাগত জানিয়েছিল শুধু তাই নয়, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এর কোনও বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তর ফলে লাভবান দেশীয় মুৎসুদ্দিবর্গ ও ইংরেজ শাসকদের ঔপনিবেশিক নীতি দেশীয় কৃষক ও হস্তশিল্পীদের অবর্ণনীয় দুর্দশার সামনে দাঁড় করিয়েছিল দেখেও তাদের বিবেকের দংশন হয়নি। প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ও তাঁরা বিদ্রোহীদের নৈতিক সমর্থন দূর অস্ত, বরং সক্রিয় বিরুদ্ধতায় শামিল হয়েছিল। দু-একজন ছাড়া প্রায় সবাই নীল বিদ্রোহের বিরুদ্ধতায় শামিল হননি। এই নবজাগরণের রূপকাররা ছিলেন প্রধানত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ ও বৈদ্য, যারা ইংরেজ শাসকদের সেবা করার মধ্য দিয়ে আত্মোন্নতিকেই মোক্ষ বলে ভেবেছিলেন। এর ফলে ইতিহাস দর্শনের ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের পক্ষপাতদুষ্ট ও উদ্দেশ্যানুগ মত নবজাগরণের রূপকারদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এর ফলে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও বর্ণভেদ প্রকট হয়েছে সুশোভন সরকারের এই মত পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও একই মনোভাব প্রতিফলিত হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার-এর বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকদের পক্ষপাতদুষ্ট মতামত স্পষ্ট ধরা পরে। ওই ঐতিহাসিকরা 'মনে করতেন মুসলিম যুগ ভারতে বিদেশি শাসনের যুগ এবং আগের যুগের সঙ্গে সে যুগের পার্থক্য হল হিন্দু সংস্কৃতির তথাকথিত অবক্ষয়। আবার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতায় যারা আচ্ছন্ন হয়েছিলেন তাঁরা ভারতের ইতিহাসকে এমনভাবে দেখেছেন যেন গজনির মামুদের সঙ্গে এই ইতিহাসের সূচনা। মুসলিম যুগকে তারা দেখেছেন বিধর্মীদের বিরুদ্ধে ইসলামের বিজয়ের প্রতীক বলে।' এ যুগ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে চিরন্তন দ্বন্দ্বের ধারণার ফলে এ যুগ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা বিকৃত। সাম্প্রদায়িক প্ররোচনায় প্রভাবিত হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকরা একটি সাধারণ ভুল করেছেন সেটি হল হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পার্থক্যই যেন সবচেয়ে বড় কথা।[১৩৬] পূর্বে উল্লেখিত এই ভুলটি সম্পর্কে এখন বিশ্বাসে উপনীত হতে হচ্ছে এটি ইচ্ছাকৃত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং শুধু রাজনীতিতেই নয় এর ছায়া প্রচ্ছায়া পড়েছিল সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতিতে।

বঙ্কিমচন্দ্র যিনি বাংলা সাহিত্যে নবজল ধারা বর্ষণে সঞ্জীবিত করেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে ব্যক্তিজীবনে তিনি বাংলা তথা ভারতের প্রথম দুই ছাত্রের মধ্যে একজন। তিনি ব্যক্তিজীবনে ইংরেজ সরকারের ডেপুটি হিসাবে কর্মরত ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র সামাজিক ক্ষেত্রে রক্ষণশীলই ছিলেন না সাম্প্রদায়িক সাহিত্যকেও সঞ্জীবিত করেছিলেন। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ ও বহুবিবাহ নিরোধকল্পের উদ্যোগের বিরুদ্ধে লেখনী

ধারণ করেছিলেন। জাতীয়তাবাদ বলতে তিনি বুঝতেন হিন্দু জাতীয়তাবাদ। স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে উদ্বেলিত আনন্দমঠ উপন্যাস প্রথমে ইংরেজ শাসকদেব বিরুদ্ধে লিখিত হলেও পরবর্তীতে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লেখনী ধরার সাহস তাঁর ছিল না। তিনি বিদ্রোহ দেখিয়েছিলেন পরাভূত মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে জন্ম দিয়েছেন বাংলা সাহিত্যে হিন্দুত্ববাদের। গ্রাম্য লোকেরা মুসলমান দেখিলেই তাড়াইয়া মারিতে যায়। কেহ কেহ সেই রাত্রে দলবদ্ধ হইয়া মুসলমানদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের ঘরে আগুন দিয়া সর্বস্ব লুটিতে লাগিল। অনেক যবন নিহত হইল, অনেক মুসলমান দাড়ি ফেলিয়া গায়ে গায়ে মৃত্তিকা মাখিয়া হরিনাম করিতে আরম্ভ করিল।'[১৩৭] স্বদেশ প্রেমের মন্ত্রে দেশের অগণিত বিদ্রোহীরা যে উপন্যাস পড়ে বিদ্রোহের দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সেই আনন্দমঠ-এর প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন 'বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী... ব্রিটিশ এদেশকে অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়া সুশাসন আনয়ন করিয়াছেন।'[১৩৮]

যুগান্তরে 'বঙ্কিমচন্দ্রের রাজনীতি' শীর্ষক নিবন্ধে লেখা হয়— 'আশ্বিনের হিতবাদীতে জনৈক লেখক বঙ্কিমবাবুর রাজনীতি আলোচনা করিতে যাইয়া ভাণ্ড ভরিয়া গরল তুলিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে এই মহাবিষ অমৃত নামে তিনি বাঙ্গালীকে পান করাইতে চাহেন। আমাদের বিশ্বাস ঐ বিষ খাইলে দাসত্বের গলিত কুষ্ঠ আরোগ্য ত হইবেই না, বরঞ্চ এ আসুরিক তরুণ দেশহিত ব্রতী বাঙ্গালী যুবকের সর্ব্বনাশ ঘটিবে— তাহারা জেলখানার কয়েদির নীলকুর্ত্তি ও লোহার শৃঙ্খলেই সুখবোধ করিতে শিখিবে।' (যুগান্তর প্রথম বর্ষ ৪৪ সংখ্যা, ২৭ জানুয়ারি ১৯০৭; ১৩ মাঘ রবিবার ১৩১৩ অগ্নিযুগের অগ্নিকথা যুগান্তর, পৃ. ৩২১)

ওই প্রবন্ধের শেষাংশে লেখেন— 'বঙ্কিম স্বাধীনতা চাহিতেন. শক্তির লীলা ভালবাসিতেন, কিন্তু জীবিকার জন্য বঙ্কিম গবর্নমেন্টের চাকর এবং তিনি যে যুগের লোক সে যুগের ভারত ইংরাজের সম্মোহনে মুগ্ধ, রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিক্ষাজীবী এবং ভয়ে তটস্থ। সুতরাং বঙ্কিম তাঁহার গ্রন্থের অনেক স্থানে কখনও নিজের ভ্রান্ত বিশ্বাস বশে ইংরাজের চাটুবাদ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার সৃষ্ট অমৃতসিন্ধুর হলাহল, ইহাই সেই ষোড়শ কলাপূর্ণ কৌমুদী প্রোজ্জ্বল শরচ্চন্দ্রে কলঙ্ক।' (তদেব, পৃ. ৩২৪)।

মহারাষ্ট্রে তিলকের 'হিন্দু মেলার' অনুকরণে কলকাতায় 'হিন্দুমেলা' সংগঠিত হয়। এই মেলার উদ্দেশ্য অতীতের গৌরব গাথা তুলে ধরে বর্তমানে আত্মশ্লাঘা অনুভব করা ও উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করা। এই মেলা তথাকথিত হিন্দু শহুরে হিন্দু ভদ্রলোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ঠাকুর পরিবার সে সময় বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার প্রাণকেন্দ্র ছিল। সেই ঠাকুর পরিবারের সক্রিয় সাহায্যে এই হিন্দুমেলা গড়ে উঠেছিল। এই হিন্দুমেলা, যার প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, জানকী ঘোষাল ও সরলা দেবী। রবীন্দ্রসাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ আছে এমন কথা অতিবড়ো নিন্দুকও বলবেন না। যাঁর লেখনী থেকে ভারতের মিলনের ধারা স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ অনুভূত হয়, যাঁর

জীবনচর্চা আমাদের অন্যায়-অবিচার ও সাম্প্রদায়িক হীন চিন্তার বিরুদ্ধে লড়তে প্রেরণা দেয়। কখনও মনে হয় ঘটনার পারিপার্শ্বিকতায় তিনিও যেন কিছুটা দুর্বল। রবীন্দ্রনাথ নিজেও লিখেছেন 'আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিযুক্ত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়।'[১৩৯] অবশ্য রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে এই মেলায় কোনওদিনই অংশগ্রহণ করেননি। তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন 'আজকাল ভারতবর্ষে মুসলমান সমস্যাই একটি প্রধান সমস্যা। জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ লোক কংগ্রেসের প্রতিকূল কেন, তাহার কারণ স্পষ্টই রহিয়াছে। মুসলমানেরা এখনো হিন্দুদিগকে বিজিত প্রজার জাতি বলিয়া মনে করে, মুসলমানরা দেখিতেছে যে হিন্দুরা অন্য প্রকার যুদ্ধক্ষেত্রে— অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে, বাজারে সরকারি চাকরিতে জয়লাভ করিয়া তাহাদের প্রতিশোধ লইয়াছে।... এই বিপদ নিবারণের একটি মাত্র উপায় মুসলমানের অজ্ঞতাকে একেবারে ধ্বংস করা, বিপদ দেখিয়া সর্বপ্রথমে যিনি চিৎকার করিয়া নিজের জাতভাইকে সাবধান করিয়া দিলেন তাঁহার নাম সৈয়দ অর্থাৎ মহম্মদের উত্তরাধিকারী।

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, আলিগড়ে তিনি একটি কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন। কলেজটি বেশ উন্নতিলাভ করিতেছিল, এমন সময় খবর আসিল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হিন্দুরা কেমন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। যাহারা পিছাইয়া পড়িয়াছে তাহাদের পক্ষে সমূহ বিপদ। সৈয়দ একলাফে সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। মুসলমানদের অধিকাংশই তাঁহার অনুগামী হইলেন।'[১৪০] এর ফল যা হবার তাই হল মুসলমান সমাজ আরও বেশি বেশি করে বাঙালি সংস্কৃতির সাথে বিচ্ছিন্ন হতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের হতাশা ও আবেগকে অবলম্বন করে চরমপন্থী আন্দোলন চরম হিন্দুত্ববাদী পথে বিস্তৃতি লাভ করে, সাহিত্যেও তার ছায়া পড়ে। 'এই স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুয়ানির গন্ধ মুসলমান সমাজের এক বিপুল অংশকে আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে রাখল।'[১৪১] তৎকালীন প্রখ্যাত বাঙালি বুদ্ধিজীবী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'Nationalism– its past present and future' নিবন্ধে লেখেন 'The revival of an ancient glory is also the revival of an ancient enmity. They always tended to open old wounds, to revive old feuds.'[১৪২]

সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক বোধ সমাজে দর্পণের প্রতিবিম্ব হয়ে প্রতিফলিত হয়। ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতায় বিরক্ত রবীন্দ্রনাথ কাদম্বিনী দত্তকে লেখা এক চিঠিতে লেখেন 'আমাদের দেশের ধর্মই মানুষের সঙ্গে প্রভেদ ঘটিয়েছে। আমরাই ভগবানের নাম করে পরস্পরকে ঘৃণা করেছি। শিশুকে জলে ফেলেছি। বিধবাকে নিতান্ত অকারণে তৃষ্ণায় দগ্ধ করেছি। নিরীহ পশুদের বলিদান করেছি। এবং সকল প্রকার মুক্তবুদ্ধিকে একেবারে লঙ্ঘন করে সকল নিরর্থকতার সৃষ্টি করেছি, যাতে মানুষকে মূঢ় করে ফেলে। আমরা ধর্মের নামেই অপরিচিত

মুমূর্ষুকে পথের ধারে পড়ে মার খেতে দিই পাছে জাত যায়— অপরিচিত মৃতদেহকে সৎকার করিলে মানুষের সম্পর্কে বীভৎস জন্তুর চেয়ে বেশি ঘৃণা করি।'[১৪৩] সাম্প্রদায়িকতা-অস্পৃশ্যতা-বর্ণান্ধতা-ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর আজীবন ঘৃণা, তাঁর সাহিত্য চয়ন কখনওই তার অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো হয়নি। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত সঙ্গীত 'গাও ভারতের জয়'-এ তিনি লেখেন—

'ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ, পৃথুরাজ, আদিনী
ভারতের ছিল সেতু। অবনের ধূমকেতু। আশুর্বন্ধু দুষ্টের দলনী।[১৪৪]

রাজনারায়ণ বসু ও নবগোপাল মিত্রদের কাছে 'হিন্দুত্ববাদ' ও 'জাতীয়তাবাদ' এই দুটিই সমার্থক ছিল। আর এই কারণেই হোসেনুর রহমানের মূল্যায়ন 'এই 'নেশন স্টেট' শেষ পর্যন্ত হিংসার জাতীয়তাবাদে পরিণত হচ্ছে প্রতিদিন। রবীন্দ্রনাথ যত স্বদেশী সমাজের কথা বলেছেন তত স্বদেশী রাষ্ট্রের কথা বলতে চাননি। আমরা যতটা সামাজিক ততটা রাষ্ট্রিক নয়। সেই অর্থে আমরা ন্যাশনালিস্ট নয় বলতে পারেন Indianist। রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী, রামমোহন ও বিবেকানন্দ কেউ একই অর্থে ন্যাশনালিস্ট নন।'[১৪৫] আর তাই রবীন্দ্রনাথ পারেন হিন্দু মুসলমান সমস্যার অতলে প্রবেশ করে অন্তর্নিহিত কারণকে খুঁজে আনতে। 'হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপত্ব আছে। এ পাপ অনেকদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনও মতেই নিস্কৃতি নাই।[১৪৬] অবশ্য ধর্মনিরপেক্ষতার বর্ণান্ধতার অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিষ্ঠিত আদর্শ শান্তিনিকেতনেও কখনও শোনা যায় এর ব্যত্যয়। এরকমই ঘটনা শান্তিনিকেতনের ছাত্র সত্যজিৎ রায়ের কাছ থেকে জানা যায়— 'গল্পটা আমাকে বলেন; বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় "তুই তো ব্রাহ্মণ, এ পংক্তিতে খেতে বসেছিস কেন? ব্রাহ্মণদের পংক্তিতে চাল আর ঘিটা ভালো পাওয়া যায়।" বিনোদদাকে বলেছিলাম আগে কোথাও তো একথা বলেননি, বিনোদদা বললেন না বলিনি, রবীন্দ্রনাথ আমার অসামান্য শ্রদ্ধার মানুষ তাই— রবীন্দ্রনাথের প্রতি তো আমাদের প্রত্যেকেরই একটা বিশেষ শ্রদ্ধার জায়গা সর্বদাই আছে, তাঁর অসাধারণ জীবন কর্মপ্রতিভা এসব তো আর এখন একটা গল্পে মিথ্যা হয়ে যায় না। আবার গল্পটাও সত্যি। এমনই কোনো সংস্কারকে নিখিলেশের মতো কেউ একজন হয়তো নিজের অজান্তেই স্বাভাবিকভাবে স্বীকার করে নেয়।[১৪৭]

কবি নবীনচন্দ্র সেনকে এক সময় মধ্যবিত্ত হিন্দু সম্প্রদায় তাঁর বীররসে গাঁথা কবিতাগুলির জন্য আদর্শ কবি বলে স্বীকার করে নিতেন। প্রাচীন হিন্দুর জয়গাথার জন্য অনেকেই নবীনচন্দ্র সেনকে রবীন্দ্রনাথের উপরে স্থান দিতেন এবং বহু পাঠকই তাঁকে হিন্দুত্ববাদী কবি বলে গর্ব করেন। যদিও নবীনচন্দ্র সেনের তাতে সঠিক মূল্যায়ন হয় না। প্রকৃতপক্ষে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ থেকে প্রভাষ পর্যন্ত হিন্দুদের অতীত গৌরব গাথা লেখার জন্যই তাঁকে এই অভিধায় অভিহিত করা হয়েছে, যেমন 'হতাশা' কবিতায়—

'ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর
কেন পড়িলাম আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয় আর্যবংশ কীর্তিচয়
কেন দেখিলাম তাহা। কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশতে মোরা অধীন পামর।' [নবীনচন্দ্র সেন শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ]

ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধেও নবীনচন্দ্র সেনের বহু কবিতা আছে। হিন্দুত্ববাদীরা প্রকৃতই এই জনপ্রিয় কবিকে হিন্দুত্ববাদী বলে আত্মতৃপ্তি লাভ করত। তা না হলে—

'ঝম ঝম করি ব্যান্ডে যেমন
জয় "ভিকটোরিয়া" বাজিল তখন
উল্লুক আকৃতি ভল্লুক নয়ন।
মোসাহেব বেশি বিকট দর্শন
জনৈক বাঙালি আসিল নিকট
অপমান ভয়ে দিলাম চম্পট।' [তদেব]

এইসময় বেশ কিছু পত্রিকা হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে। প্রকাশ্যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার পক্ষে লেখনী ধরে খ্যাতি অর্জন করেন রাজনারায়ণ বসু ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ। রাজনারায়ণ বসুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হিন্দুত্ববাদী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঘোষণা করে— 'উচ্চতর আস্থা লাভ করতে আমরা হিন্দু জাতিকে উত্তেজিত করিব।'[১৪৮] ১৮৬১ সালে শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে দেশাত্মবোধ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা গঠন করে রাজনারায়ণ বসু বলেন 'পাশ্চাত্য সমাজ ও ধর্মের তুলনায় অর্থাৎ খ্রিস্টান ধর্মের তুলনায় হিন্দুধর্ম শ্রেষ্ঠ।' এই কারণেই শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৮০-১৯০০ সাল পর্যন্ত বাংলার নব জাগরণকে হিন্দুত্বের জাগরণ বলে স্পষ্ট দিক নির্দেশ করেন।' শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্ত ১৮৪০ সনে বিজ্ঞানদায়িনী সভায় বলেন : 'যবন নৃপতিগণের অধীনে বাঙ্গালীরা যদ্রূপ দুর্দশা সাগরে নিমগ্ন ছিল, তাহা স্মরণ করিতে হইলে কঠিন হৃদয় একেবারে বিদীর্ণ হইয়া যায়। তাঁহারা এদেশের রাজা ছিলেন বটে, কিন্তু প্রজারা প্রায় তাহাদিগের অধীনে সুখী ও সুস্থির চিত্ত থাকিতে পারিতেন না বরং নিয়তই অনিয়ম ও অত্যাচারের সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।'[১৪৯] ১৮৫০ সনে "সর্বশুভকরী" পত্রিকায় লেখে 'এই দেশ যখন দুরন্ত যবনজাতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়াছিল তৎকালে ঐ দুর্বৃত্ত জাতির দৌরাত্ম্যে আমাদিগের সুখ সম্পত্তির একেবারেই লোপপ্রাপ্তি হইয়াছিল।... দুশ্চরিত্র যবনজাতির ভয়ে স্ত্রীলোকদিগের প্রকাশ্য স্থানে গমনাগমন ও বিদ্যানুশীলন সম্পূর্ণরূপে স্থগিত হইয়া গেল। সকলেই আপনাপন জাতি প্রাণ কুলশীল লইয়া শশব্যস্ত। স্ত্রী জাতিকে বিদ্যাদান করিবে কি পুরুষদিগেরও শাস্ত্রালোচনা মাথায় উঠিল।'[১৫০] ১৮৭০ সনে "সোমপ্রকাশ"-এ লেখা এসেছে : 'মুসলমানদিগের রাজত্বকালে প্রজাদিগকে যে সমস্ত অত্যাচার ও পীড়া

সহ্য করিতে হইয়াছিল, এক্ষণে ঐ সকল অত্যাচারের কথা শুনিলে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।'[১৫১] সাম্প্রদায়িকতার স্ফুরণ দেখে বাংলা আধুনিক সাহিত্যে হিন্দুত্ববাদ-এর জনক বঙ্কিমচন্দ্র "বঙ্গদর্শন"-এ লেখেন 'রাজনারায়ণ বসুর উপর পুষ্প চন্দন বৃষ্টি হউক। এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক।'[১৫২] ভূদেব মুখোপাধ্যায় সৈয়দ আহমেদের নাম করে লেখেন 'বঙ্গ দেশের মুসলমানদিগকে গোমাংস খাইতে, বিধবার বিবাহ দিতে, দেবপূজার দ্রব্য গ্রহণ না করিতে এবং হিন্দুদের নিমন্ত্রণে না যাইতে শিখাইয়াছিলেন।'[১৫৩] ঠাকুরবাড়ি সংগঠিত হিন্দুমেলা উপলক্ষে গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর লেখেন 'মেলার প্রথম উদ্দেশ্য বছরের শেষে হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা।' এ উপলক্ষে ১৮৭৪ সালে অমৃতবাজার পত্রিকার লেখায় হিন্দুত্ববাদের প্রাবল্য চোখে পড়ে— 'আমরা যখন দেখিব হিন্দুমেলার সুবিস্তীর্ণ বঙ্গভূমি মল্লবেশধারী হিন্দু সন্তানগণে পরিপূর্ণ, বাঙ্গালীর (হিন্দু লেখক) তেজস্বী অশ্ব অবলীলাক্রমে ও অশেষ কৌশলে সঞ্চালিত করিয়া দর্শকগণকে বিমোহিত করিতেছেন, যখন দেখিব হিন্দু সন্তান বন্দুক তলোয়ার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উদ্দমের সহিত উৎসাহ পূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছেন... সেইবার জানিব হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য অনেকাংশে সুসিদ্ধ ও সফল হইয়াছে।'[১৫৪] হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু গরিমাকে জাগ্রত করার জন্য আহ্বান করেন—

'তবে ভিন্ন ভিন্ন জাতি পদতলে
কেনরে পড়িয়া থাকিস সকলে
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে
স্বাধীন হইতে করিস মন?
কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন সম
হিন্দু-বীরদর্প, বুদ্ধি পরাক্রম?
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম
গান্ধার অবধি জলধি সীমা?...

হিন্দু জাতীয়তাবাদের ও সাম্প্রদায়িকতাবাদের তীব্রতা ও তৎকালীন অবস্থা অনুধাবন করা যায় হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর লেখায়—

> 'কাব্য পুরাণ সাহিত্য আদি শাস্ত্রের যত কিছু উপাখ্যান অভ্রান্ত বলে শিক্ষিত মহলে বিবেচিত হতে লাগল। হিন্দুশাস্ত্র থেকে জ্ঞান আহরণ করেই পাশ্চাত্যবাসীরা যত কিছু বৈজ্ঞানিক উন্নতি করেছে একথার প্রতিবাদ করা তখন বিপদজনক হয়ে পড়েছিল।... টিকি, তুলসীপাতা ও মালা, গঙ্গাজল, গোবর, গোমূত্র প্রভৃতির ক্ষমতা শিক্ষিত মহলেও দৃঢ়ভাবে প্রবিষ্ট হল।'[১৫৫]

একই ধ্বনির অনুরণন পাওয়া যায় অপর এক বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর কথায়—

'বিপ্লববাদ সনাতনী হিন্দুর মধ্যে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের মধ্যে অনেকেই

আবার হিন্দুধর্ম পুনরুত্থানকারীর দলে ছিলেন, কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হইল।'[১৫৬]

স্বাভাবিকভাবেই এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী চিন্তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছিল বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতিতে। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক তপন রায়চৌধুরীর মন্তব্য :

'The uneven development of Bengali Hindus and Muslim middle class and the distance which most Urdu speaking Muslim of Bengal maintained from the nationalist organisation ensured the failure of nationalism in Bengal to absorb the Muslim intelegensia. The anti-Muslim rhetriaic of patriotic Bengali Hindu writers and the stage-play provoked before long an inevitable retreat– in the work of the poet and the later of the east while treatment of Mir Musharaf Hossain.'[১৫৭]

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে যেমন হিন্দুত্ববাদের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল তেমনই মুসলমান সাহিত্যকারদের একাংশ এর বিরুদ্ধবাদী হয়ে একদিকে প্যান-ইসলামইজম-এর অনুপ্রবেশ ঘটাবার চেষ্টা করল, অপরদিকে অসম্পৃক্ত আরবি ফারসির ব্যবহার ভাষার সৌন্দর্যকে কলুষিত করছে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ভাষায় সাম্প্রদায়িক অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে সমান সোচ্চার সমান ক্ষুরধার 'সর্বপ্রথমে বলে রাখি আমার স্বভাবে এবং ব্যবহারে হিন্দু-মুসলমানে কোনও দ্বন্দ্ব নেই দুই পক্ষেরই অত্যাচারে আমি সমান লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হই এবং সে রকম উপদ্রবকে সমস্ত দেশেরই অগৌরব বলে মনে করে থাকি।'[১৫৮] আবার লেখেন 'আজকাল সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিকে আশ্রয় করে ভাষা ও সাহিত্যকে বিকৃত করার যে চেষ্টা চলেছে তার মতো বর্বরতা আর হতে পারে না।. . এমনতর নির্মম অন্ধতা বাংলা প্রদেশেই এত বড়ো স্পর্ধার সঙ্গে আজ দেখা দিয়েছে বলে আমি লজ্জা বোধ করি। বাংলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্পর্কে তাঁদের কঠিন নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম।'[১৫৯] বাঙালি মুসলমান সমাজের জীবনযাত্রার সম্পর্কে বাংলা সাহিত্যে যে অভাব রয়েছে সে সম্পর্কে এক পত্রে লেখেন 'শক্তিমান মুসলমান লেখকরা বাংলা সাহিত্যে মুসলমান জীবনযাত্রার বর্ণনা যথেষ্ট পরিমাণে করেননি, এ অভাব সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত সাহিত্যের অভাব। এই জীবনযাত্রার যথোচিত পরিচয় আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক এই পরিচয় দেবার উপলক্ষে সমাজের নিত্য ব্যবহার্য শব্দ যদি ভাষায় স্বতঃই প্রবেশ লাভ করে তবে তাতে সাহিত্যের ক্ষতি বৃদ্ধি হবে না, বরং বল বৃদ্ধি হবে। বাংলা ভাষার অভিব্যক্তির ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আছে।...'[১৬০]

এই সময়ে মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে সাহিত্য সৃষ্টিতে প্রচারের ভাষায় যে সাম্প্রদায়িক আবেগ সৃষ্টি হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯০৭ সালে প্রকাশিত এক ইস্তাহারে।

'এক দিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি। দেখ বাংলা দেশে তোমাদের সংখ্যা অধিক, তোমরা কৃষক, কৃষিকাজই ধন উৎপত্তির বীজ, হিন্দু ধন কোথায় পাইল? হিন্দুর ধন কিছুমাত্র নাই, হিন্দু কৌশলে তোমার ধন নিয়া ধনী হইয়াছে।... আমরা স্বজাতি আন্দোলন করিয়া আত্মোন্নতি করিব।'

এরপর মুসলমানদের প্রতি আহ্বান করা হয়—

'শুনরে মোসলমানগণ হয়ে একমন
দিয়ো না হিন্দুর ঘরে আপনার ধন
মোসলমান অধম সেই মোসলমান অধম
হিন্দুর সহিত করে বন্দেমাতরম।'[১৬১]

১৯০৪ সালে খাঁটি মুসলমান বানানোর জন্য প্রতিষ্ঠা হয় 'ইসলাম মিশন', ১৯১১ সালে 'অঞ্জুমানে ওয়াওজন বাঙ্গালা', ১৯১৩ সালে 'অঞ্জুমায়ে ওলামায়ে বাঙ্গালা।' ১৯১৮ সালে অঞ্জুমানের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে তাদের ঘোষিত কর্মসূচিতে আছে— 'নামমাত্র মোছলমানদিগারে খাঁটি মোছলমান করা এবং অমোছলমানদের এছলাম ধর্মে দীক্ষিত করা।' বাংলা ভাষা ও শব্দ তত্ত্ব মুসলমানদের কাছে নিরাপদ নয় বলে অর্থহীন ও কুৎসিত অসঙ্গতভাবে আরবি-ফারসির ব্যবহার যত্রতত্র শুরু হয় কবি ফররুখ আহমেদ এর কবিতার কয়েকটি ছত্র—

'জুলফিকারের, খালেদি বাজুর তুমি সওয়ার
উমরের পথে বিশ্বের দ্বারে হে অম্লান
পার হয়ে গেছ বিয়াবন আর খাড়া পাহাড়
সবল হাতের কব্জায় কবে ছিলে সওয়ার।'

[নিশান, মোহাম্মদী ১৩৫১]

'সায় ফুল্লার কুওৎ আবার নামছে কলবে দুর্নিবার
খালেদি বাজুর তলোয়ার নাচে মুমিনের হাতে খরন্দু

[স্বপনে আজাদী, নওবাহার]

মুকাখ খারুল ইসলাম লেখেন—

'ইসমাইলের বদলি দুম্বা-চামের-তাম হতে
য়ুসুফের জামা আনিছে আমাতে য়াকুব মনের কথা'

[পাগলা ঘণ্টা, সওগাত ১৩৫৪]

অন্ধ অর্থহীন কুৎসিতভাবে বিদেশি শব্দের ব্যবহার দেখে ব্যথিত সপ্তদশ শতাব্দীর কবি আবদুল হাকিম তীব্র ধীক্কার জানান—

'যে সবে বঙ্গেতে জন্মি হিংসে বঙ্গবানি
সে সব কাহার জন্ম নির্ণয় না জানি।

দেশি ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুড়ায়।
নিজদেশ ত্যাগী কেন বিদেশে না যায়।।'

ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে কাজী নজরুল ইসলাম তীব্র শ্লেষের সঙ্গে লেখেন—

'যবন না আমি কাফের ভাবিয়া
খুঁজি টিকিদাড়ি নাড়ি কাছা।'

[আমার কৈফিয়ত]

তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতাকে ব্যঙ্গ করে আজাহারউদ্দিন ইসলাম লেখেন কৈফিয়ৎ কবিতা

'মরুর দেশের ঢঙ্গে শুরু করে কেহবা বাঙলা লিখা
মওকা বুঝিয়া কেহ কেহ করে উর্দুরে আজ নিকা
অর্থ চিন্তা সবারি মাঝে খেলিতেছে মাস মাস
সাধে কি সকল লেখক করিছে বোগদাদী ভাষা চাষ'।[১৬২]

১৯১২ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ এবং মুসলিম লিগের আশ্বাস মতো মুসলমান সমাজের একাংশের প্রত্যাশা ছিল চাকরিব; মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশা হতাশায় পরিণত হলে তা পরিস্ফুট হয় গ্রাম্য কবির কবিতায়। উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি ছিল কার্জনের প্রস্তাবেও তাই এই বিলাপ।—

'কিবা হইল ওগো পানি
বড় আশা দিচ্ছিল লাট বাহাদুর কৈরা মেহেরবানি
দারগ্-গিরি চাকরি দিবে, সাথে বইসা খানা খাইবে,
ওরে... সাদি দিবে আমি দেহামু কোরদানি।
হজুরেতে আর্জি দিলাম, দারগা-গিরি না পাইলাম,
ওরে, এত আশা কইরা শেষে, নছিবে হানকি-ধোয়া পানি।
মোমিন বলে শোন মিঞা ভাই, হিদুর সাথে মিলরে
ওরে ঘর ভাঙাইনা দুশমন ওরা রে.
ভাই রে। রাইখো ওদের চিনি।
ওদের খালি কথারই ফাঁকি,
ওদের চিনাও ভাইরে চিন্‌লা নাকি,
ওরা মিঞা মশায়, আমরা দুই ভাই,
দেলে খাঁটি রাইখো জানি।'

পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদের প্রথম বার্ষিকিতে সৈয়দ এমদাদ আলি বলেন 'সর্ব প্রথমে ভাবের বিপ্লব ঘটাইবার জন্যই আপনারা সাহিত্য সৃষ্টি করিবেন, কিন্তু নিজেদের তালিম ও তমদ্দুনের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আপনাদের কাজ করিতে হইবে। কোরানের শিক্ষা ও আদর্শ আপনারা সম্মুখে রাখিবেন। মনে রাখিবেন আপনারা মুসলমান।'[১৬৩] এর ফলে ইসলামি সাহিত্যে

আধুনিকতার সূচনা হল না বহাল রইল মধ্যযুগীয় ধারা। হুমায়ুন আজাদের কথায় 'তার বদলে সৃষ্ট করতে চেয়েছেন এমন এক সাহিত্য যা অধেয়তে মধ্যযুগীয় এবং আধারে অমার্জিত অসংস্কৃত। তাঁরা সাহিত্যে নবজাগরণ আনতে চেয়েছিলেন ইসলামি ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে, যা আধুনিককালে শুধু অসম্ভবই, হাস্যকরও। তাঁরা ভাষাকে করে তুলতে চেয়েছিলেন আরবি ফারসি উর্দুর মিশ্রণে অপরিশ্রুত।[১৬৪]

গ্রাম্যজীবন গ্রামের মানুষের সমস্যা তুলে ধরলেও, অত্যন্ত জনপ্রিয় এই কথা সাহিত্যিকের লেখনীতে প্রায় অনুপস্থিত গ্রামবাংলার বৃহৎ জনসমষ্টি মুসলমান চরিত্র। "মহেশ" গল্পের গফুর আর "শ্রীকান্ত"র বন্ধু গোহর ছাড়া আর কোনও মুসলমান চরিত্রর হদিশ পাওয়া যায় না। এখানে রবীন্দ্রসাহিত্যের সাথে শরৎসাহিত্যের পথের দূরত্ব। পথিকৃৎ রবীন্দ্রনাথ এদেশের সাম্প্রদায়িক সমস্যাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি কোনও সম্প্রদায়ের পিঞ্জরে নিজেকে আবদ্ধ হতে দেননি, তাই তিনি পক্ষপাতহীন হয়ে সমস্যার মূলে পৌঁছোতে পেরেছেন, পেরেছেন ঐতিহাসিক সত্যোপলব্ধি করতে। ধর্মীয় গোঁড়ামির বিরুদ্ধে বারে বারে জেহাদ ঘোষণা করেছেন। শরৎচন্দ্রের পথ চলা ঠিক পথিকৃতের পথে নয়। অবশ্য এই দুই মহান সাহিত্যিকের আলোচনার সময় মনে রাখতে হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে দুজনের আবির্ভাব। আবার ভুললে চলবে না গ্রামে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর বৃহদাংশই মুসলমান। তাঁদের বাদ দিয়ে সাহিত্যের পরিপূর্ণতার মধ্যে বিস্তর ফাঁক থেকে যায়। গ্রামের মানুষ বলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য ধারায় গ্রামীণ সমস্যা ও হিন্দু ধর্মের কু-সংস্কারগুলিকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তুলে ধরলেও তার প্রতিবাদের পরিণতিতে ঘটেছে হিন্দু পুনরুত্থান। এই পুনরুত্থান দেখাতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র (১৩১৬) প্রায় দশ বছর পর তাঁর "দত্তা" (১৩২৫) প্রকাশিত হয়।[১৬৫] গোরা ধর্মীয় গোড়ামি ছেড়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান নয় ভারতবর্ষের মানবতার পূজারি হতে চান। সেখানে এক বৌদ্ধিক বিকাশের পূর্ণতা পায়। পরিবর্তে দত্তায় হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান দেখানো হয়। বিভিন্ন প্রবন্ধে অত্যন্ত নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে হিন্দু-মুসলমান সমস্যাকে বর্ণনা করেছেন। ১২ মাঘ ১৩৪২-এ পঠিত ভাষণে জনৈকা জাহান-আরার পত্রের উত্তরে লেখেন— 'বাংলাদেশের একটা বড় সমাজের মধ্যে এর ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।... আমি তোমাদের মুসলমান সমাজের কথাই বলছি।' 'রাগের উপর কেউ কেউ ভাষাটাকে বিকৃত করে তুলতেও যেন পরাঙ্মুখ নন। এমনি চোখে ঠেকে। অজুহাত তাদের নেই তা নয়, কিন্তু রাগ পড়লে একদিন নিজেরাই দেখতে পাবেন অজুহাতের বেশিও সে নয়। যে কারণেই হোক, এতদিন বাংলাদেশের হিন্দুরাই শুধু সাহিত্যচর্চা করে এসেছেন। মুসলমান সমাজ এদিকে উদাসীন।' আবার লিখলেন— 'যদিচ বলা চলে, সাহিত্যিকদের মধ্যে কতজন তাঁদের রচনায় মুসলমান চরিত্র এঁকেছেন, ক'টা জায়গায় এতবড়ো বিরাট সমাজের সুখ-দুঃখের বিবরণ বিবৃত করেছেন। কেমন করে তাদের সহানুভূতি পাবেন, কীসে তাদের হৃদয় স্পর্শ করবে।'[১৬৬]

সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা প্রবন্ধে তিনি লেখেন— 'নূতন শাসনতন্ত্রে সমগ্র ভারতের বিশেষত বাংলাদেশের হিন্দুদিগের প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে এতবড়ো অবিচার আর কিছুতে হতে পারে না।'...

'...তারপর এতবড়ো অবিচার যে আমাদের— হিন্দুদের উপর হল, এ তারা জেনেও নীরব রইলেন— এটাই সকলের চেয়ে দুঃখের কথা। এটা কি তারা বোঝেন না যে, এই যে বিষ, এই যে ক্ষোভ হিন্দুদের মনের মধ্যে জমা হয়ে রইল— একদিন না একদিন তা রূপ পাবেই, তার যে একটি প্রতিক্রিয়া আছে এও তারা কি ভাবেন না? এরকম করে তো আর একটা দেশ চলতে পারে না, একটা জাতি বাঁচতে পারে না, এটাও তো তাদের জন্মভূমি। দেখুন কেবল দিলেই হবে না গ্রহণ করার শক্তিও একটা শক্তি। আজ যদি তারা মনে করেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ঢেলে দিলেন বলেই তাদের পাওয়া হল— একদিন না একদিন টের পাবেন এতবড়ো ভুল আর নেই।'[১৬৭]

১৯৩৬ সালে অ্যালবার্ট হলে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির ভাষণে শরৎচন্দ্র এই কথাগুলি বলেন। ব্যক্তিজীবনে তিনি কংগ্রেস দলের হাওড়া জেলার সভাপতি ছিলেন। ব্রিটিশ সৃষ্ট বিভাজনের কৌশলের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে ছিল কংগ্রেস। কংগ্রেসের একাংশের মতো অদৃশ্য সুতোর টানে তাঁর মতো উদারচেতার দৃষ্টি বিভ্রম ঘটল কেন তা নিয়ে গবেষকরা অনেকদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলবেন।

ঘটনা এটা প্রমাণ করে যে, বাংলার নাড়িতে রক্তধারায় সাম্প্রদায়িকতা কখনও কখনও প্রাণ পেয়ে যায়।

আমরি বাংলা ভাষা

মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের বাংলা ভাষা নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকলেও, সাধারণ হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-জৈনদের এ ভাষা নিয়ে আবেগের অন্ত ছিল না। বাঙালি কৃষক তার সুখ-দুঃখের বারমাস্যা প্রকাশ করত এই ভাষায়, পুঞ্জিভূত আবেগের জমা বহিঃপ্রকাশ ঘটত এই ভাষায়। হোসেনুর রহমানের কথায় 'বাঙালির জীবনে যে গীতিময়তা আছে, যে ভাষায় বিলাসিতা আছে, যে আতিশয্যবোধ আছে তা বোধ করি মারাঠি মানসিকতায় নেই।'[১৬৮] জাগরণের যুগে মত পথের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মধুসূদন দত্তরা উপলব্ধিতে এনেছিলেন মাতৃভাষার উন্নতি বিধান ব্যতীত জাতির বিকাশ লাভ সম্ভব নয়। তাই তাঁরা ব্রতী হলেন ভাষার উন্নতি সাধনে। পাশ্চাত্যের নবলব্ধ জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভাষা। বিশ্ব-সাহিত্য থেকে আহরিত অমূল্য রতনগুলি একের পর এক বিজয়মাল্য হিসাবে পরিয়ে দিতে লাগলেন বাংলা ভাষালক্ষ্মীর গলায়। শেষ জীবনে তাই মধু কবির উপলব্ধি—

'মাতৃভাষা রূপখনি
পূর্ণ মণি জালে।'

ভাষাচর্চার ওই একই পথ ধরে এগোলেন না আমির আলি বা আবদুল লতিফের মতো মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা। ধর্ম ও রাজনীতি হল তাদের জীবনে ও কর্মে, বিশ্বাসে ও আচরণে একমাত্র লক্ষ্য। বাংলা ভাষা ছাড়া বাঙালির বিকাশের কোনও পথ নেই এই কথাটি আমির আলি বা লতিফ বুঝেও বুঝতে চাইলেন না। এদিকে স্যার সৈয়দের সংগঠনিক কর্মযজ্ঞের আগেই আমির আলি এবং আবদুল লতিফের কর্মযজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে। বাঙালি মুসলমানকে ইংরেজি শিখতে হবে, পশ্চিমায়ন তার মুক্তিমন্ত্র, অর্থাৎ আধুনিক শিক্ষা চাই এসব তারা বললেন। কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে কলকাতার মুসলমানকে, বাংলার মুসলমানকে গভীরতর অর্থে সম্প্রদায় সচেতন করে তুললেন। বাংলার পরিবর্তে আরবি ও উর্দু মুসলমানের জীবনের ধর্ম ও সমাজবোধের একমাত্র রক্ষাকবচ এই বোঝালেন। আমির আলি ইংরাজিতে "দি স্পিরিট অব ইসলাম" লিখে মুসলমানকে মুসলমান হিসাবে গৌরবান্বিত করলেন।'[১৬৯] আর ঠিক এ কারণেই আহমদ শরিফ বলেছিলেন 'আত্মপরিচিতিতে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি বাঙালি মুসলমানদের ১৯৩০ সন অবধি সুস্থ হতে দেয়নি।'[১৭০] অত্যন্ত সচেতনভাবেই আহমেদ শরিফ এই শব্দচয়ন করেছিলেন। প্রথমত, ব্রিটিশ শাসনের ফল স্বরূপ এই বিকৃতি ঘটেছিল। দ্বিতীয়ত, এই বিকৃতিকে সংশোধনের জন্য সে সময় শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ও এগিয়ে আসেননি। তৃতীয়ত, লোকসাহিত্যের মিলনের ধারাকে তুলে ধরার প্রয়োজনীয়তা কোনও সম্প্রদায়ই বোধ করেননি। চতুর্থত, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমান সম্প্রদায়ের অতীতে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা ছিল। সে কথা বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় আত্মবিস্মৃত হয়েছিল। দৌলত কাজীর "ময়না ও লোর চন্দ্রানী", আলাওলের "পদ্মাবতী ও সিকান্দরনামা" বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হাসান রাজার গান এখনও লোকমুখে ফেরে। ষোড়শ শতাব্দীর লালন ফকির থেকে যাত্রাপথের আরম্ভ। লোক সংস্কৃতির, লোক সাহিত্যর সব ধারা পরিপুষ্ট হয়েছে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত উদ্যোগে। শরিয়তি আইনের বিধানের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির ভূমি থেকে বাঙালি মুসলমানের শিকড় ভূমি থেকে উৎপাটিত হল। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন যে মিলনের ধারা শরিয়তি আইনে সম্ভব নয়। মিলন হয়েছিল দুইটি সাগরের।'[১৭১]

এ প্রসঙ্গে একটি দুষ্প্রাপ্য দলিল আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। হোসেনুর রহমান মুক্ত বুদ্ধির মানুষরা যা নিয়ে সোচ্চার হন যে, একজন মানুষকে কেন প্রথমেই তাঁর ধর্ম পরিচয় দিতে হবে। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান যুবক সম্মিলনীর সভা, স্থান ও কাল কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট ২ অগাস্ট (১৭ শ্রাবণ) রবিবার ১৯৪২ সালে কে. এম. জাকরিয়া তার ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন— 'আমরা এই সাড়ে পাঁচ কোটি বাঙালি একই ভাষা বলি, এই আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত, একই সংস্কার ও কৃষ্টির পরিচয় লইয়া মনুষ্য সমাজে আমরা পরিচিত। ...'নিখিলবঙ্গ বাঙালি মুসলমান যুবক সমিতি' কেন যে নামটা তাহারা

এরূপভাবে রাখিলেন, তাহা আমি বুঝি না। এমন বিভাজন আমাদের দুর্বল করেছে, হাস্যাস্পদ করেছে... ধর্মের দোহাই দিয়া এবং এই ধর্মটা নামের সহিত সংশ্লিষ্ট করিয়া কতগুলো অবাঞ্ছিত লোক চারিদিক দিয়া আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করিয়া নিজের এবং নিজেদের পরিবার ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য কিছু কিছু আপাত সুবিধা করিয়া জন্মভূমি ও জাতির আত্মসম্মানকে অতি নিম্নস্থানে আনিবার প্রয়াস পাইতেছে; লজ্জায় আমার মাথা নত হইয়া যায়। যে স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিগণ যাহাদের আমি চিরদিনই মাতৃভূমি ও মাতৃভূমির সকল সন্তানদের মহাশত্রু বলিয়া মনে করিয়াছি তাহারা যে কোনও স্তরের হউক না কেন আমি তাহাদের ঘৃণা করি। তাহাদের একেবারে উচ্ছেদই হইবে দেশের অনতম সুকর্ম।'[১৭২] তাঁর এই বক্তৃতা সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলার বিবেক হয়ে ঝরে পড়েছে। তিনি এও বলেন 'বাংলার মুসলমানের অভাব অভিযোগ ইরান-ইরাক-তুরস্ক কিংবা পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশের মুসলমানরা বুঝবে না।... আমি তোমাদিগকে করজোরে অনুরোধ করিতেছি তোমরা সকল দিক দিয়া বাঙালি হও। তোমার প্রতিবেশী তোমার সুখ দুঃখে সহায়ক ও সহানুভূতিকারী একই দেশ মায়ের সন্তান ও অন্যান্য বাঙালিরা তোমাদের একান্ত আপন।'[১৭৩]

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে মুসলমান সমাজের এক ক্ষুদ্রাংশ অনুভব করতে শুরু করেন, মুসলমান সমাজ বাংলা সাহিত্য কর্মে ব্রতী না হলে সমাজ-সাহিত্য-সংস্কৃতির মূল ধারার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে। এই উদ্দেশ্যে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ। পত্রিকার প্রধান উদ্যোগীদের অন্যতম মুজফ্‌ফর আহমদের কথায় 'বাঙলা ১৩২৫ সালের বৈশাখ মাসে (খ্রিস্টাব্দ ১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাস) সমিতির একখানা ত্রিমাসিক মুখপত্র বার হয় নাম দেওয়া হয়েছিল বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা। ...মহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ) ও মহম্মদ মোজাম্মেল হক সাহেব ছিলেন পত্রিকার যুগ্ম সম্পাদক। শহীদুল্লাহ সাহেব তখনও বসিরহাটে ওকালতি করতেন পত্রিকা সম্পাদনার কাজে তিনি তেমন নজর দিতে পারতেন না। পরে অবশ্য তিনি ওকালতি ছেড়ে দিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার হয়ে আসেন। সেই সময় তিনি কিছুদিন বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির বাড়িতে ও আমার সঙ্গে একই ঘরে ছিলেন।'[১৭৪] প্রকৃতপক্ষে এই পত্রিকা পরিচালনার অধিকাংশ কাজই মুজফ্‌ফর আহ্‌মদকেই করতে হত। আধুনিক যুগে মুসলমান যুবকদের সাহিত্যকৃতির সঙ্গে যুক্ত করার কাজে এ কাগজটিই পথিকৃৎ।

আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ করতে গেলে প্রাচীন সাহিত্যের ধারা থেকে আমরা কি এক ও অভিন্ন? সমগ্র বাংলা জুড়ে কি একই সাহিত্যধারা প্রবাহিত হয়েছে তার সমস্ত সত্তায়? আমাদের এখানে অনেক সাহিত্যিক ছিলেন, পণ্ডিত ছিলেন বহু কালজয়ী গ্রন্থ বাংলায় রচিত হয়েছিল, তার অভিন্নতা কি সারা বঙ্গদেশ জুড়ে প্রসারিত ছিল? যারা বৃহৎ জনগোষ্ঠী তারাই অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ সেই হাড়ি-মুচি-ডোম-চণ্ডাল-দুলে-বাগদি-চাঁড়াল-শবরদের

জীবনচর্চা কি কোনও সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে? চর্চা হয়নি বাংলাদেশের এই আদিম অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ইতিহাস, যা অলিখিতই থেকে গেছে। ঐতিহ্যক্রমে মুসলমান সমাজও অস্পৃশ্যতা দোষে কলুষিত হয়েছে। আজলফদের কদর্য নামে ভূষিত করা হয়েছে, যেমন-কামিনহিজরা, হালালখোর, নিকিরি, ইতর ইত্যাদি। এদিকটাকে সযত্নে আড়ালে রেখে আমরা সম্প্রীতির মিথ্যা আস্ফালন করে, মিথ্যা আত্মাভিমান দেখিয়ে নিজেদের আত্ম প্রতারণা করেছি। ফলে এক অভিন্ন সাহিত্যধারা সমগ্র বাংলার মানচিত্র জুড়ে বহাল থাকেনি 'আমরা দেখেছি, ধর্মমঙ্গল রাঢ় অঞ্চলের বাইরে যায়নি। এখনকার বীরভূম ও বর্ধমানের কিছু অংশের বাইরে কখনও ধর্মমঙ্গল রচিত হয়নি। আমরা দেখেছি মনসামঙ্গল পূর্ববঙ্গের কোথাও কদাচিৎ লিখিত হয়েছে। আমরা ষোলো শতকের চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব ধর্মান্দোলনের ফলে দশ হাজার বৈষ্ণবপদ পেয়েছি, এবং তিনশোর মতো পদকার পেয়েছি— দীনেশ সেন বোধ হয় ২৮৭ জনের নাম সংগ্রহ করেছিলেন। এই কবিদের কারও বাড়ি প্রেসিডেন্সি এবং বর্ধমান বিভাগের বাইরে নয়। আমরা দেখেছি এই যে মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গল— এর একটাও পূর্ববঙ্গে রচিত হয়নি। অতএব সারা বাংলা দেশটা ১৮১৮ সনের আগে পর্যন্ত খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন ছিল সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে।'[১৭৫] তিনি আরও লিখেছেন ১৮১৮ থেকে সংবাদপত্র সাময়িক পত্র ইত্যাদির প্রকাশ হওয়ার আগে কোনো সর্ববঙ্গীয় সাহিত্যও ছিল না। কোনো সর্ববঙ্গীয় একাত্ম চিন্তা চেতনাও ছিল না।'[১৭৬]

অপরদিকে অন্ধকারের আড়ালে থাকা অস্পৃশ্য ও নিপীড়িত বর্ণভুক্ত সম্প্রদায়গুলোর মধ্য থেকেও যেন কালো মেঘের মধ্যে আলোর ঝলকানি দেখা যেতে লাগল বাংলার এক বৃহৎ জনগোষ্ঠী যোগী ও নমঃশূদ্র বা চাঁড়ালদের মধ্য থেকে এক ক্ষুদ্রাংশও আধুনিক শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অল্প একথা উল্লেখেরও প্রয়োজন আছে। ১৮৭২ সালে আব্দুল-মৌড়ীর কিছু কৈবর্ত যোগীদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করলে জাতিচ্যুত হন, এই সময় উত্তেজিত যোগীরা সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের কাছে প্রশ্ন করেন যোগী জাতি কি অপবিত্র এবং তাহাদের সাথে কীরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য? এর উত্তরে পণ্ডিত সমাজ যোগী জাতিকে 'সদ্ব্যবহার যুক্ত' বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯০১ সালে রিজলির ট্রাইবস অ্যান্ড কাস্টস অব বেঙ্গল গ্রন্থের মূল্যায়নে যোগীরা দ্বিমত পোষণ করে যোগী হিতৈষণী সভা স্থাপন করে। ১৯০৫ সালে (বৈশাখ ১৩১১) 'যোগীসখা' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশ করে। 'যোগীসখা' শুধু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধেই নয়, যোগী সমাজের মধ্যেও বর্ণভেদ প্রথার উচ্ছেদসাধন কল্পে লেখনী ধারণ করেন। ১৩১৫ ভাদ্র (১৯০৮ সাল) সংখ্যায় জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন: 'জাতীয় উন্নতিতে এখন স্বার্থপর ব্রাহ্মণের একাধিপত্য নাই, পাশ্চাত্য উদারতা উপযুক্ততার পুরস্কার দিতেছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৩২১ ভাদ্র (১৯১৪ সন) সংখ্যায় লেখা হয় 'আমরা এই ঘোর দুর্দিনে পিতৃস্বরূপ রাজার কার্যে সকলে আত্মদান করিতে পারিব না, কিন্তু,

যাহারা প্রাণ দিতে যাইতেছেন তাঁহাদের সাহায্য করা কর্তব্য। গভর্নমেন্ট জানেন আমরা অতি নিরীহ রাজভক্ত। রাজভক্ত প্রকাশের এমন সুবিধা আর হইবে না।'[১৭৭] অনেক বিলম্বে হলেও অধিক সুবিধালাভ ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু ও পরে মুসলমানদের মতো রাজভক্তি প্রকাশের আতিশয্য দেখা দেয় এবং এটা দেখা দেয় পূর্বোক্তদের মতো বাড়তি সুবিধা লাভের জন্য। এই আন্দোলনের অংশ স্বরূপ যোগীদের একাংশ যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। যজ্ঞোপবীত ধারণকারীদের যোগীসখা প্রকৃত যোগী ধর্ম শিক্ষা দেওয়ার জন্যও নিবন্ধ লিখতে শুরু করেন। 'যোগীসখা, বৈশাখ, ১৩২১ (১৯১৪ খ্রিঃ) এ প্রশ্ন করা হয়, যাহারা উপবীত গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের দ্বারা চাষ কি সম্ভব হইবে? উত্তরে প্রকাশ যে, যে কোনও শিল্প বা ব্যবসায়ে লাভ হওয়া সম্ভব, সেই দিকেই সকলের অগ্রসর হওয়া উচিত।'[১৭৮]

নমঃশূদ্রদের মধ্য থেকেও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও রাজভক্তি দর্শনের প্রমাণ পাওয়া যায়। নির্মলকুমার বসুর মতে নমঃশূদ্রদের স্ববৃত্তি বলতে কৃষি ও নৌকা চালনা বোঝায়। খালবিল ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব যেখানে বেশি বিশেষত, পূর্ববাংলায় নমঃশূদ্ররা সেই সব জায়গায় বেশি বসবাস করে। 'নমঃশূদ্রগণের মধ্যে নমঃশূদ্র হিতৈষিণী সমিতি নামে যে প্রতিষ্ঠান আছে অথবা পতাকা, নমঃশূদ্র সুহৃদ প্রভৃতি যে সকল পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সেগুলি বিবেচনা না করিয়া আমরা কেবল একটি বিষয়ে লক্ষ নিবন্ধ করিব।'

শ্রী রাইচরণ বিশ্বাস নামে জনৈক লেখক নমঃশূদ্র সুহৃদ (জানুয়ারি খ্রিঃ ১৯০৮) পত্রিকায় লেখেন—

> 'আমরা ব্রাহ্মণের জাতি, হিংসা হেতু হউক বা ক্রোধবশত হউক, আমাদিগকে অনেকে না ভালবাসিতে পারেন, কিন্তু যুগান্তর ধরিয়া আমাদের ব্রাহ্মণোচিত আচার ব্যবহার দেখিয়া সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে নমঃশূদ্র জাতি প্রাচীন মুনিঋষির অর্থাৎ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সন্তান। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় আর্য কৃষিকার্য, সেই প্রাচীন ও বর্তমান সময়ের মহা গৌরবের ব্যবসায়।'[১৭৯]

জাতিতত্ত্ব ও নমস্য কুল দর্পণ নামক একটি গ্রন্থে অনুরূপ মত প্রকাশিত হয়। নমঃশূদ্র জাতির মধ্যে পূর্বে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণত্বের দাবির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বিধবা বিবাহ নিরোধের জন্য একটি আন্দোলনও দেখা দিল। শিক্ষার দাবি নমঃশূদ্রদের পক্ষ থেকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলে ১৯১৬-র এপ্রিল সংখ্যার পতাকা পত্রিকায় লেখা হয়:

> 'ব্রিটিশ রাজের কৃপায় যাহা একটু জ্ঞানকণা লাভ করিয়াছি, তাহার দ্বারাই এখন জানিতে সমর্থ হইয়াছি— আমরা কী ও আমাদের শক্তি কতটুকু। ২৫ লক্ষ লোক লইয়া যে সমাজ গঠিত সে সমাজ চিরকাল ঘুমাইয়া থাকিতে পারে না। হিন্দু সমাজের অন্ধ হিন্দু রাজের কৃপায় আমরা এতদিন ঘুমাইয়াছিলাম এখন জাতিভেদ জ্ঞানশূন্য সমদর্শী বিপুল শক্তিশালী ব্রিটিশের কৃপায় জাগিলাম।

> ক্ষুদ্রচিত্ত ব্রাহ্মণকৃত আইনের শাসনে বাধ্য হইয়া আমাদের বাণী মন্দিরের চতুঃসীমানায়ও যাইতে দিতেন না। তোমার চিন্তা করিবার কী আছে? স্বয়ং ব্রিটিশ রাজ অশিক্ষিতের বন্ধু দরিদ্রের চিরসহায়, অনুন্নত জাতি সমূহের আশা ভরসা তোমার সহায় হইবেন।'[১৮০]

ইংরেজ সরকারে প্রদত্ত শিক্ষাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ ঢাকার নমঃশূদ্র সমাজ বঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করে। শৈশবের একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে নমঃশূদ্রদের প্রতি ব্রাহ্মণ সমাজের মনোভাব ব্যক্ত করে এ প্রসঙ্গে-র ইতি টেনে মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে বর্ণভেদ প্রথা সম্পর্কিত সাহিত্যে প্রবেশ করব। আমাদের গ্রামের প্রান্তে একটি মাত্র নমঃশূদ্র পরিবার বাস করত, একঘর কায়স্থ ব্যতীত বাকিরা সবাই ব্রাহ্মণ পরিবার। অত্যন্ত দরিদ্র এই নমঃশূদ্র পরিবারের বড়ো ছেলেটি অত্যন্ত পরোপকারী ছিল, কারুর অসুস্থতার খবর পেলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করে প্রয়োজনে একাই ছোটাছুটি করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করত। শহর থেকে আমাদের গ্রামের দূরত্ব প্রায় চার মাইল। আমাদের শৈশবে ওই অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর এক মহড়া হয়েছিল। ওই পরিবারের বাচ্চারা গোবর কুড়োতে গিয়ে একটি পরিত্যক্ত বোমা পায় এবং সেটাকে খেলার দ্রব্য মনে করে খেলতে গেলে সেটা ফেটে কয়েকজন বাচ্চা ও তাঁদের মা মারা যান। ওই যুবকটি গ্রামবাসীদের তার মায়ের শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ করলে নমঃশূদ্রদের বাড়িতে শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ গ্রহণে অসম্মতি প্রকাশ করে। বিংশ শতাব্দীর ষাট-এর দশকের প্রথমদিকের সে ঘটনা মনে করে এবং এখনও এসব ব্রাহ্মণ পিতৃব্যদের কথা ভেবে ঘৃণা হয়। নিজেকে কলঙ্কিত মনে হয়।

হিন্দু সমাজের সবচেয়ে বড়ো কু-প্রথার প্রভাব মুসলমান সমাজকে তিলে তিলে গ্রাস করছিল। ব্রাহ্মণদের মতো আশরাফ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আতরাফ-আবদাল-আজলাফ-আরজালদের উপর। মুসলমান সমাজের জাতিভেদ নিয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। ১৩৩৪ সনে (১৯২৭ সালে) রাজারামপুরের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষক মোহম্মদ ইয়াকুব আলি মুসলমানের জাতিভেদ নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বইটি যথেষ্ট সমাদরলাভ করে। '১৯১১ খ্রিস্টাব্দের আদম শুমারি বিবরণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গদেশীয় কর্তৃপক্ষ মুসলমানদিগকে শেখ, সৈয়দ, মোগল, পাঠান প্রভৃতি ৮০ প্রকার জাতিতে বিভক্ত করিয়া ইসলাম ধর্মাবলম্বী লোকসংখ্যা ও তাহাদের জাতি নিরূপণ করিয়াছেন। কিন্তু এদেশে মুসলমানগণের এই প্রকার জাতিভেদ এক অপূর্ব ঘটনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ, পৃথিবীপৃষ্ঠে অপর কোনো দেশে মুসলমান সমাজে এরূপ জাতিভেদ নাই।'[১৮১] অপর এক জায়গায় মুসলমান সমাজের জাতিভেদ প্রথার স্বরূপ তুলে ধরেন এবং এর বিরুদ্ধে মুখর হন।—

> 'কিন্তু এদেশে মুসলমানের জাতিভেদ প্রকরণে কেবলমাত্র সেন্সাস কর্তৃপক্ষের দোষ নির্ণয়ে একদেশদর্শিতা প্রকাশ পাইবে। এ দেশীয় অজ্ঞ এবং অশিক্ষিত মুসলমানগণও প্রতিবেশী হিন্দুর অনুসরণে আপনাদিগের মধ্যে জাতিভেদ প্রচলনে

চেষ্টিত দেখা যাইতেছে। ইহার কারণ এই যে বহু শতাব্দী যাবত হিন্দুর সহিত একত্র বসবাস করিয়া হিন্দুর প্রভাব মুসলমানের সমাজে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। অপরদিকে মুসলমানগণ সাধারণত অশিক্ষিত বলিয়া ইসলামি আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িতেছে।... অধিকন্তু যাঁহারা হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া স্বল্পকাল মুসলমান সমাজভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা বংশ পরম্পরাগত জাতিভেদ সংস্কার প্রভাবে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও জাতিভেদ প্রচলনে চেষ্টিত রহিয়াছেন। সুতরাং মুসলমান সমাজের অপরিচিত এই ভেদনীতি মূলে ভারতীয় মুসলমান সমাজে হিন্দু প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।'[১৮২]

'বঙ্গদেশে মৎস্য ব্যবসায়ী দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে যেরূপ হিন্দু জাতীয় নিকারী আখ্যা প্রচলিত আছে, সেইরূপ অন্যান্য দীক্ষিত মুসলমানগণের মধ্যে বিশ্বাস, মণ্ডল, প্রামাণিক প্রভৃতি হিন্দু আখ্যারও প্রচলন রহিয়াছে। কিন্তু এই সকল মুসলমান এ সম্বন্ধে ইসলামের বিধান সম্যক অবগত হইতে পারে নাই বলিয়া বর্তমান অবধি তাহাদের মধ্যে এই সকল হিন্দু আখ্যার বহুল প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়।... জোলা, কলু, চাষা প্রভৃতি ব্যবসায় মূলক আখ্যাও বিধর্মীর হীন জাত্যর্থে মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং এসকল আখ্যার প্রচলনও রহিত হওয়া কর্তব্য।'[১৮৩]

'...কোনো কোনো স্থলে ইহাও পরিলক্ষিত হয় যে, বংশাভিমানী মুসলমানগণ বিদ্যাশিক্ষার্থী মুসলমান ছাত্রদিগকে জায়গির দান করিয়া কালক্রমে তাহাদিগকে চাষা, নিকারি, কলু বা জোলার সন্তান জানিতে পারিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া আপন আপন বংশগৌরব বা শরায়াত রক্ষা করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, যে আলেমগণ নবি করিমের খলিফা বলিয়া হাদিস শরিফে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই আলেমগণ কৃষি ও শিল্প ব্যবসায়জীবীর বংশ সম্ভূত হওয়ায় তাহারা তাহাদের পশ্চাতে নমাজ পড়িতেও অসম্মত হয়। এই সকল দেখিয়া-শুনিয়া মনে হয়, বাংলার এই ভুঁইফোড় আশরাফগুলি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ সন্তান নয় কি? ভণ্ডামির নীচতা বোধ হয় ইহা অপেক্ষা নীচে নামিতে পারে না। মূর্খগণ কোরান হাদিস খুলিয়া দেখুক, যে মুসলমান সমাজে তাহাদের এই ভণ্ডামিপূর্ণ শরাফতের স্থান নাই।[১৮৪]

এই গ্রন্থের সমালোচনায় সওগাত পত্রিকা লেখে—

'ইসলাম সাম্য–– বিশ্বভ্রাতৃত্ববাদের ধর্ম।... কিন্তু ভাবতীয় মুসলমান সমাজের অবস্থা স্বতন্ত্র। এখানে হিন্দু প্রতিবেশীর সংখ্যা প্রবল; ফলে হিন্দুদের দেখাদেখি এদেশের মুসলমান সমাজেও জাতিভেদের তারতম্য ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির কদর্যতম দিকটা এখনো মুসলমান সমাজে আমরা না পাইলেও

তাহাদের প্রাচীনত্বের কৌলিন্য গর্ব এবং ব্যবসাতে উচ্চ-নীচ বিভাগটা বেশ ঢুকিয়া পড়িয়াছে। কাপড় কেনার ব্যবসা করিয়া তাঁতিগণ, মাছের ব্যবসা করিয়া নিকারিগণ এবং এইরূপ আরও অনেক ব্যবসায়ী মুসলমানগণ অকারণে সমাজে নিগৃহীত অবস্থায় রহিয়াছেন। ফলে সাম্যবাদী মুসলমান সমাজেও আশরাফ-আতরাফ নামক দুইটা শ্রেণির সৃষ্টি করা হইয়াছে।'[১৮৫]

অত্যন্ত অল্প হলেও অন্ত্যজদের ক্রমোচ্চ শ্রেণিতে উত্তরণ ঘটানোর জন্য উদ্যোগী হয়ে লেখনী ধরার প্রক্রিয়া ও ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন এবং উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু বাঙালিদের মতো ইংরেজ রাজভক্তি প্রদর্শনের মতো একই লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতই মুসলমান সমাজের সাম্যর ধারণাকে হিন্দু সমাজ ভালো চোখে দেখেনি। মুসলমান মাত্রই খাওয়া-দাওয়া আচার-বিচারের কড়াকড়ি অর্থাৎ টোটেম টাবু থেকে মুসলমানকে মুক্তি দিয়েছে। সমতা আছে প্রত্যেক মুসলমানের ধর্মাচরণের। এটা আশ্বস্ত করেছিল অন্ত্যজ হিন্দুদের আর অস্বস্তি বাড়িয়েছিল উচ্চবর্ণভুক্তদের। "সব্বই জঠ জব্বেই খাই" ('কীর্তিলতা) দেখে বিদ্যাপতি নিশ্চয় ঘৃণাবোধ করেন। "এক রুটি পাইলে হাজার মিএগ্রা খায়" এ দৃশ্য দেখতে দেখতে বোধহয় রূপরাম (১৭শ শতকে) একটু হিংসাই করতেন।[১৮৬]

বিভেদের ধারা সাহিত্যের ভাষায় যেমন ছিল, তেমন ছিল তার কথ্যভাষায়, এমনকী উচ্চারণ ও ব্যুৎপত্তিতেও বজায় ছিল সেই ধারা। কথ্য ভাষা ভৌগোলিক অবস্থান পরিবর্তনের সাথে সাথে বদলায়, বাংলার ক্ষেত্রে এটা মারাত্মকভাবে সত্য। কথ্যভাষার ক্ষেত্রে চব্বিশ পরগনার উত্তরের সাথে দক্ষিণের ধ্বনিগত পার্থক্য আছে। পার্থক্য আছে নদিয়ার সাথে মুর্শিদাবাদের, বীরভূমের সাথে বাঁকুড়ার, বাঁকুড়ার সাথে পুরুলিয়ার, জলপাইগুড়ির সাথে কোচবিহারের। পূর্ববঙ্গের কথ্যভাষায় এতই পার্থক্য যে এক জেলার কথ্য ভাষা অন্য জেলার মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে। আবার ধর্ম ভেদে কথ্য ভাষায় ধ্বনিগত ব্যুৎপত্তিগত পার্থক্যকে সূচিত করে।

মৌলনা মনিরুজ্জামান সাপ্তাহিক 'সুলতান (ছোলতান) পত্রিকায় নিবন্ধ লিখে বাংলার মুসলমানদের 'স'-এর পরিবর্তে 'ছ' ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ নিয়ে নজরুল 'সওগাত' পত্রিকায় 'চানাচুর' শিরোনামে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি প্রকাশ করেন।[১৮৭] নজরুল যত ব্যঙ্গই করুন না কেন গ্রাম্যজীবনে আজও তা প্রোথিত হয়ে আছে। 'ছ'-এর ব্যবহার দুভাবে হয়, প্রথমটি হয় প্রথাগতভাবে নিরক্ষর মুসলমানরা 'স'-এ পরিবর্তে 'ছ'-এর ব্যবহার করেন। দ্বিতীয়টি গ্রামের শিক্ষিত ও অবস্থাপন্নরা গরিব-নিরক্ষরদের নাম বক্রোক্তি করে উচ্চারণের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, আর এর প্রভাবেই 'সাত্তার' হয়েছে 'ছাত্তার', 'সয়ীদ' হয়েছে 'ছয়ীদ' মুসলমান হয়েছে 'মোছলমান', যেমন 'মুছলমানি কথা দেখি মনেহ ওরাই' 'বাঁচিলে বাঙ্গালা ভাসে কোঁপে কি গোসাই।' অবশ্য উল্লেখ্য যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষজন 'স' কে 'ছ' উচ্চারণ না করলেও ইংরেজি 'S' শব্দের মতো উচ্চারণ করেন। এ ব্যাপারে চালু

রসিকতা আছে 'Sাম বাজারের SSী বাবু (শ্যাম বাজারের শশীবাবু) যে জল জীবনের অপর নাম, সেই জল আর পানির একসাথে জল-চল বাংলার সমাজে আর হল না। কোনও মুসলমানকে জল বলতে শোনা যায় না, হিন্দুরাও কখনওই পানি উচ্চারণ করেন না কারণ ওটা মুসলমানি ভাষা। সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোনও মুসলমানের নামের আগে শ্রী ব্যবহার অশিষ্টতা, সেখানে আরবি শব্দ জানাব (বাংলার শ্রী শব্দের মতো শিষ্টতা সূচক) বলাই শিষ্টতা। বৈষ্ণব পুরুষদের গোঁসাই বলে সম্ভাষণ করা হয়। বাঙালি হিন্দুরা শিষ্টতা বিনিময়ের জন্য করজোরে নমস্কার বিনিময় করেন, আর মুসলমান সমাজের একে অপরের সাথে দেখা হলে 'সালাম ওয়ালেকুম' পক্ষান্তরে প্রত্যভিবাদনের জন্য 'য়ালেকুম সালাম' ব্যবহার করেন, কোনও কিছুর শেষে 'খোদা হাফেজ' বলাটাই বিধেয়।

বাংলা ভাষার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে অনেক আরবি-ফারসি শব্দ জড়িত হয়েছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের খ্যাতিমান সমালোচক প্রমথ চৌধুরীর মতে 'ফারসি শব্দকে তালাক দিলে বাংলা ভাষার সংসার অচল হয়ে পড়বে।' আবার পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যর মতে 'আমরা নরম গরম পছন্দ করি। আস্তিন গুটিয়ে জবরদোস্তি করতে এগিয়ে যাই। বলি কমজোরির দিন ফুরিয়েছে। ইনকিলাব জিন্দাবাদ দিয়ে চলি পছন্দ না হলে মুরদাবাদ আওয়াজ তুলি।'[১৮৮] সুতরাং ফারসি শব্দ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু মুসলমান সমাজের একাংশের অর্থহীন আরবি-ফারসির ব্যবহার ভাষার সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। অতীত থেকে বহু মুসলমান বুদ্ধিজীবী-এর প্রতিবাদ জানিয়ে আসছেন। অনেক সাধারণ বাঙালি এখনও ভুল ইংরেজি বলে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, ঠিক তেমনি বাঙালি মুসলমানের একাংশও অর্থহীনভাবে আরবি-ফারসি ব্যবহার করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে।

বাঙালি হিদুদের মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে 'ঈশ্বর' 'স্বর্গীয়' এবং মৃত ব্যক্তির নামের আগে (ঁ চন্দ্রবিন্দু) ব্যবহারের রীতি আছে, মুসলমানদের ক্ষেত্রে 'মরহুম' শব্দ ব্যবহার হয়। ব্রাহ্মণ বিধবারা নামের পরে অনেক ক্ষেত্রে স্বামীর পদবির পরিবর্তে 'দেবী' ব্যবহার করেন, অন্ত্যজদের ক্ষেত্রে 'দাসী' ব্যবহার করা, অবিবাহিত মেয়েরা কুমারী বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে শ্রীমতী ব্যবহৃত হয়। বাঙালি মুসলমান মহিলাদের ক্ষেত্রে বিধবা হলে 'বেওয়া' বিবাহিতাদের ক্ষেত্রে বেগম আর কুমারীদের নামের আগে মুসাম্মাত ও নামের শেষে খাতুন ব্যবহার করা হয়। বাঙালি গ্রামীণ মুসলমানদের কথ্য ভাষায় শুধু মাত্র 'স' পরিবর্তে 'ছ'ই ব্যবহৃত হয় না, 'ন' এর বদলে 'ল' এবং 'এ'র পরিবর্তে 'ই' ব্যবহৃত হয়। যেমন এটা লিলি (নিলি) কেন, এটা করতি (করতে) হবে না। বাঙালি হিন্দুরা মুসলমানদের সম্বোধনের ক্ষেত্রে বক্রোক্তিতো করেনই কখনও তা অশ্লীলতার পর্যায়ে দাঁড়ায়। মুসলমানদের 'নেড়ে' বা 'লেড়ে', 'মিঞা', 'মোল্লা' বিদ্রূপাত্মকভাবে ব্যবহৃত হয়, সর্বশেষ কাটা (যেহেতু মুসলমান সম্প্রদায়ের লিঙ্গ-র ত্বকচ্ছেদ দ্বারা সুন্নত হয়) শব্দটি অশ্লীলভাবে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দগুলির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পূর্বেই বিশ্লেষিত হয়েছে। সাধারণভাবে হিন্দুরা মনে করে

মুসলমানরা লড়াকু জাত বলে লেড়ে বা নেড়ে ব্যবহৃত হয়, এ ধারণা সম্পূর্ণই ভুল পূর্বেই বলা হয়েছে। নির্যাতিত বৌদ্ধরা প্রথম মুসলমান ধর্মগ্রহণ করেন, মুণ্ডিত মস্তক বলেই তাদের এই বক্র অভিধাতে ব্যঙ্গ করা হত। পক্ষান্তরে মুসলমান দ্বারা হিন্দুদের হিঁদু, হোঁদু কখনও বা হাদু শব্দগুলি বিদ্রূপাত্মকভাবে সম্বোধিত হয়। এ প্রসঙ্গে বাঙ্গাল ঘটির লড়াই সুবিদিত। সাহিত্যের ভাষাতেও বাঙ্গাল ভাষার ব্যবহার আছে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি পদ্মা নদীর মাঝিতে পূর্ববঙ্গীয় ভাষা, সাহিত্যে উজ্জ্বল হয়েছে। অতি সম্প্রতি তসলিমা নাসরিন তাঁর আত্মজীবনীমূলক লেখায় বাঙ্গাল ভাষার অত্যন্ত সুন্দর ব্যবহার করেছেন।

জীবনচর্চা, লোকাচার এমনকি মানুষের সুখ-দুঃখের বারমাস্যার মধ্য দিয়ে ভাষা-সাহিত্য ফুল্লকুসমিত হয়। সুকুমার সেনের একটি মন্তব্য স্মর্তব্য। 'তুরক' [তড়ুক] অথবা 'তরুক সওয়ার' অর্থে এখন বোঝায় অশ্বারোহী বা পদাতিক সৈনিক, কিন্তু শব্দটি আসিয়াছে জাতিবাচক 'তুর্ক' বা প্রাকৃত 'তরুক্ক' 'তুলক্ক' শব্দ হইতে। এদেশে মুসলমান আগমনের প্রথম যুগে তুর্কি সৈনিক বিভীষিকার বস্তু ছিল।' (নজরুল নিখেছেন 'মোদের হাতে তুর্কি নাচন। নাচলে তাধিন তাধিন বেশ') সুকুমার সেন আবার লিখেছেন— 'হিন্দু ও তুর্কিরা একত্রে বাস করিতেছে। একের ধর্ম অন্যের উপহাসের খোরাক জোগায়। কেউ আজান ডাকে, কেউ বেদ পাঠ করে। কারো সমাজে মেলামেশা কারো সমাজে ভেদভাব প্রকট। পণ্ডিতদের কেউ বলে ওঝা কেউ বলে খোজা। কেউ পালন করে উপবাস, কেউ রোজা (রমজান)। কেউ ব্যবহার করে তাম্রকুণ্ড, কেউ বা কুজো। কেউ নমাজ পড়ে, কেউ করে পূজা। কত তুর্কি পথে যেয়ে বেগার ধরে। ব্রাহ্মণ বটুকে (বড়) ধরিয়া মস্তকের উপর গরুর রাঙ (হাড়) চড়াইয়া দেয় (ধর্মনাশের জন্য) তাহারা ফোঁটা 'চাটে' (তুলিয়া দিয়া) পৈতা ছিঁড়িয়া দেয় ও ঘোড়ার উপর চড়াইতে চাহে। তাহারা ধোয়া উড়িধানে মদ চোলাই করে। মন্দির ভাঙিয়া মসজিদ তৈরি করে। ধরণী পূর্ণ হইল কবর ও গোমঠে। ছোট হইলেও বড়কে মারিতে চায়।'[১৮২] উপসংহার টানব রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিখ্যাত ছত্র দিয়ে—

> ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
> অন্ধ সে জন মরে আর শুধু মারে।

বাঙালির জীবনচর্চায় সাম্প্রদায়িকতা

বাঙালির জীবনচর্চায় তার সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতা ও পরধর্ম বিদ্বেষ কীভাবে সমাজ জীবনে স্থান করে তার নিরীক্ষণ অত্যন্ত জরুরি। ধর্ম নিয়ে তাণ্ডব, হানাহানি শুধুমাত্র ধর্মশাস্ত্রগুলি বা ধর্মীয় ক্রিয়া প্রকরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এর শিকড় প্রোথিত সমাজজীবনের অনেক গভীরে। মনে রাখতে হবে সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে সংঘাত মানব সমাজের সবচেয়ে প্রাচীন সমস্যাগুলির মধ্যে অন্যতম। গোষ্ঠী জীবন থেকে যে সংঘাতের সূত্রপাত ক্রমে তা ছড়িয়ে পড়েছে শিরায় শিরায়, তার প্রভাব অনুভূত হয় সংস্কৃতিতে, জীবন চর্চায়, ধর্ম ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব জন্ম থেকে শিশুকে শেখায় নিজের ধর্মকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে ও অপরকে ঘৃণা করতে এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তার প্রভাব পড়ে তার চাল-চলন, কাজকর্ম ও কথা-বার্তায়। সমাজে বেড়ে ওঠা শিশুর চৈতন্যে প্রোথিত হয় এই ধারা। ফলত সমাজের তখনকার মূল্যবোধ, সংস্কার ও বিশ্বাসের সাথে একাত্ম হয়ে ওঠে। প্রাচীন সমাজে পৃথক নৃ-গোষ্ঠীর সংঘাত ছিল গোষ্ঠী জীবনে বড়ো সমস্যা।

সংস্কৃতির বিকাশ ধারায় ধর্ম একটা পর্যায়ে এসে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সংস্কৃতি বিকশিত হতে চায় বৈচিত্র্যে, চায় জীবনবোধে, আর ধর্ম চায় সনাতন চায় স্থবিরত্ব, উভয়ের দ্বন্দ্বটাও এখানেই নিহিত। গোপাল হালদারের মতে—

'আবার পিতৃতান্ত্রিক কোনো কৌমতন্ত্রে হয়তো সকলেই, একসময় বুঝতেন— স্ত্রীলোক তুচ্ছ পদার্থ, পুরুষের একখানা হাড় দিয়ে সে গড়া, কিংবা গাছ-লতার বুঝি প্রাণ নেই। সভ্যতার সেরূপ এক স্তরে তাই সূর্য বন্দনাই ধর্ম, নদীপূজাই ধর্ম। স্ত্রীলোকের যখন "রুহ্" নেই তখন সে "নাপাক" বলেই গণ্য। তেমনি কোনো স্তরে প্রাণী আঁকা বা রূপায়ণ করা যখন হারাম বলে গণ্য হয় তখনও গাছ-লতা-পাতা আঁকা ইসলামের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিষয়ে ধারণা বা "রিলিজিয়ন" জীবনযাত্রা বা কালচারের এক-একটা স্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা, এমনকী, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় পরিবেশের দ্বারাও প্রভাবিত। অবশ্য সভ্যতার সে স্তর উত্তীর্ণ হলে ইডিয়লজি বা জগৎ ও জীবনবোধও ক্রমশ বদলে যেতে বাধ্য কালচারের তাই তাগিদ। কিন্তু 'রিলিজিয়ন' চায় সেই বিশেষ এক স্তরের জগৎ ও জীবনবোধকে চিরন্তন করে রাখতে। কালচারের অন্তর্ভুক্ত হলেও তার রিলিজিয়ন নামক এই অংশের ঝোঁকটা হল কালচারেরই গতিকে অস্বীকার করে একটা বিশেষ জগৎ-ও জীবনবোধকে "শাশ্বত", "সনাতন", "ধ্রুব সত্য"

বলে আঁকড়ে থাকা। কোনো একটা অতীন্দ্রিয় বা অ-পার্থিব "সত্যের" নামে রিলিজিয়ন তাই সমসাময়িক কালচারের ধারাকে চায় নিয়ম-কানুন (condification) দিয়ে বাঁধতে।'

'রিলিজিয়নের লক্ষ্য হল তাই সৃষ্টি নয়, স্থায়িত্ব (conservation), রিলিজিয়ন হল স্থিতি ধর্মী (static)। রিলিজিয়ন এই উদ্দেশ্যে জগৎচিত্র তৈরি করে, নিয়ম-নীতি রচনা করে "কোড" বানায় সমাজকে সেই বনিয়াদে বেঁধে স্থাণু করতে চায়— যেন কিছুতেই মানুষ "সনাতন সত্য" থেকে ভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু কালচার তার এই প্রয়াসকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলে— খানিকটা হয়তো রিলিজিয়নকে পাশ কাটিয়ে যায়, ফাঁকি দিয়েও চলে।'[১১০]

তিনি স্থির সত্যে উপনীত হন 'রিলিজিয়ন ও কালচারের মধ্যে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। রিলিজিয়ন অপরিবর্তনীয়, আর কালচার বিকাশশীল।'[১১১]

এর মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা যায় 'কিন্তু তবু তার মধ্যেও যে কতটা গতিবিমুখতা আছে তা আমরা বেশ জানি।'[১১২]

সম্প্রীতির ধারাকে শুধুমাত্র হিন্দু মুসলমান মিলনের ধারা হিসেবে তিনি দেখেননি দেখেছেন বিপ্লবী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ বলে। শুধুমাত্র বাংলায় নয় এই বিপ্লবী চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল সমগ্র ভারত জুড়ে। তাঁর কথায়—

> 'সেদিনের বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে এই ছিল মানব চিত্তের একমাত্র পরিচিত ও স্বাভাবিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ। খ্রিস্টান মিস্টিক মুসলমান সুফি আর ভারতের নানক, কবীর থেকে বৈষ্ণব আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি সকলে আসলে সমস্ত মধ্যযুগের ভেতরকার বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ। এঁরা প্রত্যেক 'অর্থোডক্স্' রিলিজিয়ন-এরই বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী— আধ্যাত্মিকতার কারণেই। সুফিবাদ সেই ইসলাম বিদ্রোহী মানুষদেরই দান। তাদের এই ইরানি-হিন্দি ধারা এসে মেশে এ-দেশের পুরানো সহজিয়া বৌদ্ধ শাক্ত ও বৈষ্ণব ঐতিহ্যের সঙ্গে। বাংলার মধ্যযুগের কবিতায় একটি প্রধান দানই এদের— আর এদেরও অনেকেই মুসলমান, লালনশাহ থেকে মদন বাউল পর্যন্ত। মধ্যযুগের এই কবি সাধকদের ধারায় ও হিন্দু মুসলমান ভেদ করতে যাওয়া অসম্ভব।'[১১৩]

পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে ওয়াহাবি ও ফরাজিদের ধর্মসংস্কার আন্দোলন সাংস্কৃতিক ঐক্যকে ধ্বংস করেছে মিলনের স্রোতস্বিনী ধারা হয়েছে লুপ্ত। ধর্মীয় অনুশাসনের নিগড়ে কালচারকে করছে রুদ্ধ ফলে বাঙালি মুসলমান সমাজ বিশ্বপ্রগতির বিপরীত পথে অর্থাৎ প্রতিক্রিয়ার পথে হাঁটতে শুরু করেছে। বাঙালি মুসলমান এর ফলে হয়েছে পশ্চাদ্গামী মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ নিকষ অন্ধকারে নিমজ্জিত এক সত্তা। বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, যাতে মুসলমানের অবদান বড়ো কম নয় তার থেকে শিকড় তুলে আরবীয় সাজতে চেয়ে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমান সংস্কৃতি হয়েছে শিকড়হীন, ময়ূর পুচ্ছধারী কাক-এর মতো। কারণ আশরাফিরা এদের কখনওই খাঁটি মুসলমান বলে স্বীকৃতি দিতে রাজি ছিল না।

> 'রিলিজিয়নের ঝোক স্থাণুত্বের দিকে, প্রতিক্রিয়া পরায়ণতার দিকে। কালচারের প্রকৃতি গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। কাজেই ধর্মের পুনরুজ্জীবনে অনেক ক্ষেত্রে কালচারের গতি বন্ধ হয়। এই ওয়াহাবি দৃষ্টিভঙ্গিতে আবার শুধু সপ্তম শতাব্দীর আরব ঐতিহ্যই পবিত্র ও গ্রাহ্য; অন্য সব প্রায় দাহ্য ইংরেজি সভ্যতা শাসন তো নিশ্চয়ই, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিও, এমনকী, ফারসি-সভ্যতা এবং ভারতীয় মুসলমানের অনেক সৃষ্টিও অগ্রাহ্য। এই দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাঙালি হিন্দু ঐতিহ্যের কোঠা তো অপবিত্রই, এমনকী, বাঙালির যৌথ সংস্কৃতিও বর্জনীয় হল। যেটুকু 'বাঙালি ঐতিহ্যের' ক্ষেত্র তাও অনেকাংশে পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে; তার উপরে চাপানো দরকার হল ওয়াহাবি-পরিশোধিত সেই বিশুদ্ধ ইসলামের তত্ত্ব, নিয়ম কানুন, আচার-বিচার।'[১৯৪]

তারা আধুনিক যুগে গোপাল হালদারের কথায় বাঙালি মুসলমান "বাবু কালচারের পালটা তাঁরা গড়তে চান মিঞা কালচার"।

বিপরীতে অস্পৃশ্যতার অভিজ্ঞতার বিবরণ পাই সৈয়দ শাহেদুল্লাহর বর্ণনা থেকে—

> 'বয়স তখন ১৮ বছর হবে। ১৯৩১ সাল। একদিন এক কাজে নিকট আত্মীয়কে নিয়ে মেমারি গেছি। তখন আমরা বাইরে বেরোলেই শিরওয়ানি পড়তে অভ্যস্ত ছিলাম। উভয়ের পরিধানেই ওই পোশাক ছিল। মেমারিতে ঘণ্টাখানেক থাকার পরে ক্ষুধার উদ্রেক হল। সামনে এক মিষ্টি ও খাবারের দোকানে কিছু খাবার ও মিষ্টির জন্য দাঁড়ালাম। দুজনার হাতে দুই ঠোঙা দিয়ে দোকানদার উঁচু থেকে খাবার নিক্ষেপ করে দিচ্ছিলেন। আত্মীয়টি বরাবর শহরে থাকেন খুব অমর্যাদা লাভ করলেন, রুষ্টও হয়ে গেলেন। বললেন "পয়সা দিয়েছ তো কী হবে, ফেলে দাও খেতে হবে না।"[১৯৫]

মুসলমান সমাজকে ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রেখে ইংরেজ তোষণ করার মতো যুগান্তকারী ভুল শিক্ষিত বাঙালি হিন্দু সমাজ করেছিল তার ফলভোগ আজও বাঙালি জাতিকে করতে হচ্ছে। এর স্থায়ী প্রভাব বাঙালির সাহিত্য-সংস্কৃতিতে পড়েছিল। এই বিভেদের তীব্রতা অনুভব করা যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখায় 'ইংরেজ গ্রন্থকাররা এইরূপে হিন্দুদিগের মনোমধ্যে মুসলমানদিগের প্রতি একটি গূঢ় বিদ্বেষ বীজ বপন করিয়া দিতেছেন। আধুনিক ইংরেজি শিক্ষিত যুবকদিগের হৃদয়ে মুসলমান জাতি এবং মুসলমান ধর্মের প্রতি যতটা বিদ্বেষ দেখা দিয়াছে, পূর্বকালের পারস্য ভাষায় সুশিক্ষিত, সদব্রাহ্মণদিগেরও মনে তাহার অর্ধাংশ দেখা যাইত না।'[১৯৬] ইংরেজ তোষণ ও মুসলমান বিদ্বেষের সুন্দর উদাহরণ দিয়েছেন শাহেদুল্লাহ "মানসিংহ" কাব্যটি খুলে দেখলে এর অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে—

> "যবনের কত ভালো ফিরিঙ্গির মত
> বর্ণভেদ নাহি করে না দেয় সুন্নত।।

শৌচে আচমন নাহি যাহা পায় খায়

কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়" (মানসিংহ— ভারতচন্দ্র)

'আচারকে ধরে শুধু ভিন্ন সম্প্রদায়ের সমালোচনা নয়, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিঙ্গিদিগকে তুলে ধরা হচ্ছে। খাওয়া-দাওয়া ওঠাবসায় হিন্দুর ভেদাভেদ সাম্যের দৃষ্টিতে তার সমালোচনা এক জিনিস কিন্তু ফিরিঙ্গির একসঙ্গে খাওয়া ওঠাবসা কত ভালো সেটা দাঁড়ায় অন্য কথা। এইভাবে ফিরিঙ্গি তোষণে জন্মায় সাম্প্রদায়িকতা।'[১১৭] এদিক থেকে বিচার করলে ফিরিঙ্গি তোষিত বাবু কালচারও শিকড় ছেঁড়া কুৎসিৎ বিকৃতকাম সংস্কৃতি।

ধর্মভেদে সংস্কৃতির বিভেদ তাঁকে রুখবার জন্য রবীন্দ্রনাথের প্রয়াস অবশ্য স্মরণীয়—

> 'যখন কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা দূত-সহযোগে কলকাতার বাইরে ছড়িয়ে চলেছে তখন বোলপুর অঞ্চলে মিথ্যা জনরব রাষ্ট্র হয়েছিল যে, হিন্দুরা মসজিদ ভেঙে দেবার সংকল্প করছে। এইসঙ্গে কলকাতা থেকে গুণ্ডার আমদানিও হয়েছিল। কিন্তু, স্থানীয় মুসলমানদের শান্ত রাখতে আমাদের কোনো কষ্ট পেতে হয়নি কেননা তারা নিশ্চিত জানত আমরা তাদের অকৃত্রিম বন্ধু।
>
> আমার অধিকাংশ প্রজাই মুসলমান। কোর্‌বানি নিয়ে দেশে যখন একটা উত্তেজনা প্রবল তখন হিন্দু প্রজারা আমাদের এলাকায় সেটা সম্পূর্ণ রহিত করবার জন্য আমার কাছে নালিশ করেছিল। সে নালিশ আমি সঙ্গত বলে মনে করিনি, কিন্তু মুসলমান প্রজাদের ডেকে যখন বলে দিলুম কাজটা যেন এমনভাবে সম্পন্ন করা হয় যাতে হিন্দুদের অকারণে আঘাত না লাগে তারা তখনই তা মেনে নিলে। আমাদের সেখানে এ পর্যন্ত কোনও উপদ্রব ঘটেনি। আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ। আমার সঙ্গে আমার মুসলমান প্রজার সম্বন্ধ সহজ ও বাধাহীন।'[১১৮]

খুব সঠিকবাবেই রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেছিলেন 'ফুটো কলসিতে জল তুলতে গেলে তা পড়ে যায়, তা নিয়ে জলের বা কলসির উপর চোঁখ রাঙিয়ে লাভ কী।' বাঙালির সংস্কৃতিতে প্রাচীন যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদ অন্ত্যজ অথবা হিন্দু মুসলমানের সামগ্রিক ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব কতখানি।

> 'কাজেই সংস্কৃতির কথাই যদি বলতে হয় তা হলে বলতে হবে যে, মানুষের সংস্কৃতিতে সেকালে বারো আনা প্রভাব ছিল ধর্মের এবং পার্থিব ও সামাজিক নিয়মের। প্রবন্ধ পড়তে গিয়ে নরেন বিশ্বাস সংস্কৃতির সংজ্ঞা দেওয়ার একটা চেষ্টা করেছেন। তাঁর সঙ্গে আমরা বলতে পারি সংস্কৃতি হচ্ছে চেষ্টা দ্বারা অর্জিত আচরণ। মানুষ উৎকর্ষ অর্জন করতে চায়। উৎকর্ষ অর্জন করবার— Excel করবার শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করবার, সুন্দরতমকে পাওয়ার মহত্ত্বে পৌঁছবার চেষ্টার পেছনেই মানুষের সংস্কৃতির অস্তিত্ব।'[১১৯]

আর ঠিক এখানেই সংস্কৃতির সঙ্গে ধর্মের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্ব প্রবাহিত ছিল বর্ণভেদ প্রথার মধ্যে। দলিতদের সংস্কৃতিকে দলন করেছে বাংলায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা। আমরা পূর্বেই দেখেছি ধর্মঠাকুরের কাছে অন্ত্যজদের আকুল আর্তি—

'এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টি সংহরণ এ বড় হইল অবিচার।'

এসত্ত্বেও মানতে হবে গোঁড়া আদর্শের সাথে অন্ত্যজদের সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকলেও পরিবর্তনের মাত্রায় একটা সাযুজ্য এবং পারস্পরিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। হিতেশরঞ্জন সান্যালের মতে—

> 'পরপর নিম্নতর সারির জাতিগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রভাবের মাত্রা ক্রমশ হ্রাস পেতে দেখা যায়। সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মাত্রা নামমাত্র দেখতে পাওয়া যায় ক্রমোচ্চ শ্রেণি বিভাগের নিম্নতম ধাপের জাতিগুলির মধ্যে অর্থাৎ অন্ত্যজদের মধ্যে, যেমন বাগদি, বাউরি, মুচি, ডোম এবং হাড়ি, যারা তাদের উপরের জাতিগুলির চেয়ে তাদের মূল সংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনেক বেশি পরিমাণে আঁকড়ে ধরেছিল।'
>
> '...সাধারণত একটি জাতির অপবিত্রতার মাত্রা পরিমাপ করা হয় সেইজাতির প্রতি ব্রহ্মণদের মনোভাবে। যে ব্রাহ্মণগণ শূদ্রদের যাজন করে না তারা পবিত্রতম বলে বিবেচিত হয়। অবশ্য সৎশূদ্র জাতিগুলির পুরোহিত হিসাবে কাজ করলে ব্রাহ্মণের জাতি দুষিত নাও হতে পারে। তবে এদের হাতের পানীয় জল গ্রহণ করলে ও হাতে প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণে তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণের জাতি দূষিত হত। কতগুলি জাতি আছে যাদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণ পানীয় জলও গ্রহণ করে, কিন্তু দূষণের ভয়ে তাদের পুরোহিত হয় না। আরও নীচে কতগুলি জাতি আছে যাদের কাছ থেকে ব্রাহ্মণরা পানীয় জলও গ্রহণ করে না।'[২০০]

এর বিপরীতে অন্ত্যজরা ধরে রাখতে চেষ্টা করে তার আদিম সাংস্কৃতিক ধারাকে এর মধ্য দিয়ে সে খুঁজে পেতে চায় তার সত্তার স্বাতন্ত্র্য, তার ঐতিহ্যকে।

> 'একটি শ্রেণির স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্যগুলি সম্ভবত সৃষ্টি করেছিল এক বা ততোধিক গোষ্ঠী, যেগুলি ক্রমে বিস্তৃত হয়ে একটা শ্রেণিতে পরিণত হয়েছিল, তাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার থেকে। এইভাবে পূর্ববাংলার যোগীদের ভেতরে একাদশ এবং মাস্যা শ্রেণি অথবা ঢাকার তাঁতিদের ভেতরে কম্পনিয়া শ্রেণি। তারা পূর্ব পুরুষগণ দ্বারা প্রবর্তিত অথবা অনুসৃত বৈশিষ্ট্যসূচক রীতি বা প্রথার মধ্যে স্বাতন্ত্র্যের উৎস খুঁজে পায়। একাদশ যোগীরা মৃত্যুর পরে একাদশ দিনে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে সেখানে মাস্যাগোষ্ঠী শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করে একটি মাস পূর্ণ হলে।'[২০১]

এরফলে বিভিন্ন বর্ণগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক একটি শুধু সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতারই সৃষ্টি করে না, সৃষ্টি করে একটি স্থায়ী উত্তেজনক পরিস্থিতির যা সমাজকে বিভক্ত

করে অসংখ্য খণ্ড উপখণ্ডে। এ অবস্থায় বাঙালির অখণ্ড সংস্কৃতির কথা বলা আত্মপ্রতারণার শামিল। সমাজের ভিন্ন ভিন্ন বর্ণজাতি-সম্প্রদায়গুলির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব সমানভাবে হাজির থেকেছে তাদের সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যেও। বাংলার সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বের উপস্থিতিকে অস্বীকার করলে সংস্কৃতিতে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাবের বিচারে বড়ো ভুল হয়ে যাবে।

জনজীবনের এই সমস্যাগুলি বাকধারা হয়ে ফুটে ওঠে মানুষের মুখে। এবং বাকধারা হয়ে ফুটে ওঠা ধারণাকে সে সত্য বলে ভাবতে বিশ্বাস করে এর মধ্য দিয়ে অপরকে ছোটো করতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। মাত্র কয়েকটি বাক্যের সমষ্টি যা অসামান্য গুরুত্ব বহন করে লোক জীবনে, তাকেই আমরা প্রবাদ বলি। আমাদের দেখার উদ্দেশ্য সমাজ জীবনে উৎকট ধর্মবিদ্বেষ বা অপরকে ঘৃণা অথবা নিজের সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির যা যুগযুগ ধরে চলে আসছে, তা কীভাবে আমাদের বাগধারার মধ্যে প্রবেশ করে প্রবাদ বাক্যে দাঁড়িয়েছে।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ আমাদের সুবিদিত। একে কেন্দ্র করে একের বিরুদ্ধে অপরের বিদ্বেষ ও ঘৃণা পরিস্ফুট হয়েছে আমাদের জীবনচর্চায়, প্রতিফলিত হয়েছে প্রবাদ বাক্যে। প্রবাদের সংখ্যাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অধিকাংশ প্রবাদই হিন্দু সমাজকৃত মুসলমান বিরোধী, হিন্দু থেকে মুসলমানে ধর্মান্তরিতদের উপর ক্ষোভ স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাদে। আমাদের অত্যন্ত সুবিদিত যে গো-মাংস হিন্দুর নিষিদ্ধ খাদ্য বস্তু; তাই প্রবাদটা এইরূপ :

'হিদু যদি মুসলমান হয়
গোরু খেতে কম নয়।

অনেকে আবার শেষোক্ত লাইনটিকে 'গোরু খাবার যম হয়' বলে অভিহিত করেন। আবার মুসলমানদের নিকৃষ্টতা বর্ণনার জন্য নিম্নোক্ত প্রবাদগুলি আছে—

(ক) 'ধানের মধ্যে আগুন বান*
মানুষের মধ্যে মুসলমান'

(বি.দ্র. আগুন বান ধানের মধ্যে এক নিকৃষ্ট প্রজাতি)

(খ) 'জল জঙ্গল আঁধার রাত
এড়েগোরু নেড়ে জাত।'

অথবা (গ) 'গোরুর মধ্যে এড়ে, জাতের মধ্যে নেড়ে।'

মুসলমান সমাজের প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার অভাবের কথা বোঝানোর জন্য কথায় কথায় হিন্দুদের মুখে মুখে ফেরে—

'হিন্দুর ভালোবাসা
মুসলমানের মুরগি পোষা।'

মুসলমান সমাজের 'তুতো' (অর্থাৎ খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো, মামাতো, ইংরেজিতে

যাকে কাজিন বলা হয়) সম্পর্কে বিবাহের বিধি আছে, যা হিন্দু সমাজে নিষিদ্ধ, তাই—

'চাচা আপন চাচি পর
চাচির মেয়ে বিয়ে কর।'

আমরা আগেও দেখেছি মোল্লা শব্দটি ব্যঙ্গার্থে ব্যবহৃত হয়। একজন মোল্লা বা মৌলবির যাবার বা বিধান দেবার সর্বোৎকৃষ্ট জায়গা মসজিদ, তাই ব্যঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত প্রবাদ

(ক) 'মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।'
(খ) 'মোল্লা দাড়ি ওষুধে লাগে।'

মুসলমানদের সর্বোচ্চ ধর্মস্থান মক্কায় যারা হজ করতে যায় তাদের 'হাজি' বলা হয়। এরা মুসলমান সমাজে সবচেয়ে ধর্মনিষ্ঠ বলে সম্মানিত হন। তাদের প্রতি ব্যঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত—

প্রবাদ— (ক) 'যত হাজি, তত পাঁজি।'
অথবা (খ) 'আগে কাজি, পরে হাজি, শেষে পাঁজি।'

মুসলমানদের মোল্লা মৌলবি হয়ে ওঠার বাসনা নিয়ে আগেও আলোচনা করেছি। হঠাৎ মৌলবি হয়ে ওঠার বাসনা নিয়ে ব্যঙ্গ্য বিদ্রূপ আছে, তবে মনে হয় এই বিদ্রুপ বা ব্যঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত প্রবাদগুলো মুসলমান সমাজকৃত প্রবাদ :

(ক) 'কলি কালের মুনশি মোল্লা নামে হবে দড়
না মানবে কোরান কেতাব, ইজ্জত করবে বড়ো।'
(খ) 'কেতাব নেই কোরান নেই মন্নু খন্দকার।'
(গ) 'সেদিন একহাটে পেঁয়াজ বেঁচলাম, মোল্লা হলে কবে।'
(ঘ) 'মোসলমানের তোবা জাত থাকে তো বাবা।'

বাংলার মুসলমান সম্প্রদায় সাধারণভাবে গরিব হওয়ার কারণে তাদের ছেলেমেয়েদের ভালো খাওয়া-পড়ার বাসনা অন্যায় বলে বিবেচিত হয়ে থাকে। নিম্নোক্ত প্রবাদটি পূর্ববঙ্গীয় এবং এটি আমার মায়ের কাছে শোনা— 'ভাত জোটে না শেখের বেটি হালুম হালুম করে।'

খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে আরবীয় রীতি হল একপাত্রে আহার করা। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের উল্লেখিত প্রবাদটি স্মরণযোগ্য—

'পড়েছি মোগলের হাতে
খানা খেতে হবে সাথে।'

আবার উভয় সম্প্রদায়ের বিপরীত আচরণ নিয়েও কটাক্ষ আছে প্রবাদে

'হিন্দুর দাড়ি, মুসলমানের নারী, গাঙের কূলে বাড়ি
বনে চড়া গাই, এ চারে বিশ্বাস নাই।'

'কালো বামুন বেটে মুসলমান কটা শূদ্রকে' কটাক্ষ করা হয়েছে। সাধারণ ধারণা ব্রাহ্মণরা আর্য জাতির বংশধর সুতরাং বর্ণসংকর না হলে ব্রাহ্মণরা কালো হয় না আবার মোগল পাঠানের বংশধররা বেটে হবে না এই ধরে নেওয়া যায়; শূদ্রদের ক্ষেত্রে তারা

হীন জাতির বংশধর বর্ণ সংকর না হলে তার গাত্র বর্ণ কটা (অর্থাৎ মাঝারি) হওয়া সম্ভব নয় বলে ধরেই এই প্রবাদ।

পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুদের নিয়ে কম কটাক্ষ করেছে। প্রবাদও অনেক কম। প্রথমে আসব খাদ্যাভাস নিয়ে, মুরগি হিন্দুদের নিষিদ্ধ ভক্ষ্য ছিল। মুরগিকে রাম পাখি বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়া মুরগি আবর্জনায় চড়ে, নোংরা খায় তাই মুরগি ছিল হিন্দুর অভক্ষ্য। হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক বিভেদ নিয়ে নজরুল ব্যঙ্গ্য করে লিখেছেন— 'মোদের মুরগি রাম পাখি হল তোমাদের দোহে তুষিতে' সেই মোতাবেক মুসলমানের প্রবাদ— 'হিন্দু কি জানে কুঁকড়ার (মুরগি) মূল।'

গুরুভক্তি শরিয়তি মুসমলানদের কাছে পরিত্যাজ্যই শুধু নয় কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এই প্রবাদে হিদু নামের বিকৃতি করা হয়েছে— 'হাঁদুর গোসাই পরেমশ্বর।'

মূর্তি পূজার বিরোধী মুসলমান সমাজ। রঙচঙে দুর্গামূর্তির ভেতরের কাঠামো খড়ে ভর্তি অর্থাৎ অন্তঃসারশূন্য। তাই কটাক্ষ করে প্রবাদ—

'হিঁদুদের দুগগা পুজো
উপরে চিকন চাকন
ভিতরে খড়ের বুজো।'

সমাজে বিরোধ বাধিয়ে দিয়ে মোল্লা-পুরুতরা আখেরে লাভ করে, তাই প্রবাদ—

'মোল্লা থেকে পুরুত, চুনো থেকে পুঁটি
বিরোধ ভাঙিয়া গেলে করে ছোটাছুটি।।'

হিন্দু সমাজের অভ্যন্তরে বর্ণভেদ প্রথার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ক্ষোভ সমাজজীবনে বিদ্যমান ছিল. কঠোর অনুশাসন গুলির রক্ষাকর্তা ছিলেন ব্রাহ্মণরা, নির্যাতিত অন্ত্যজদের স্বাভাবিক ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছিল তাদের বিরুদ্ধে। ক্ষোভের প্রকৃতি অনুসারে

(ক) 'কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ
যে না মারে তার পাপ'

(খ) 'বামুন, গোরু, ছাগল
তিনই দড়ির পাগল'

(গ) 'বামুন বাক্স বাঁশ
তিনে সর্বনাশ'

(ঘ) 'বামুন বদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান'

(ঙ) 'বামুন চোষা কলকে কায়েত চোষা গাঁ'

একবার ভাবুন তো প্রবাদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এই দ্বেষ কি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের চেয়ে কিছু কম ছিল; এমনিতেই বামুনরা 'চালকলা খেকো' বলে তাদের বদনাম আছে।

ব্রাহ্মণদের অদম্য লোভ, এর বিরুদ্ধে কটাক্ষ প্রবাদ হয়ে ঝরে পড়েছে।

(ক) 'বামুন গণক কাউয়া
তিন পরের খাইয়া'। (প্রবাদটি পূর্ববঙ্গীয়)

(খ) 'বামুন দক্ষিণা ধরে
ঢেঁকির নামে চণ্ডী পড়ে।'

(গ) 'চোর মরে কাশে।
বামুন মরে আশে।'

(ঘ) 'বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলেই যান।'

(ঙ) 'লোভী বামুন কচু খেয়ে
এবার এল কোদাল নিয়ে।'

(চ) 'মরা বামুন গাঙে ভাসে
চিঁড়ে দইয়ের নামে ভেসে ওঠে।'

(ছ) 'ব্রাহ্মণের উদর
ছিটে বেড়ায় ঘর'

(জ) 'বামুন বাড়ির ভাত
কপালে দিও হাত'

(ঝ) 'বামুনের পাতে লবণ নেই
ধোপার পাতে চিনি'

(ঞ) 'বামুনের রাগ ঘরের আগুন'

(ট) 'বারো নারকেল তেরো বামুনের ঘর'

(ঠ) 'লাখ টাকায় বামুন ভিখারি'

(ড) 'বামুন মুরুব্বি ধোপা গোমস্তা
এদের নেই বুম ব্যবস্থা'

বামুনের লোভ নিয়ে নানান গল্প প্রচলিত আছে। এক বাড়িতে ব্রত উপলক্ষে গৃহস্থ দুখানা শশা জোগাড় করেছে, তার মধ্যে একটা নিটোল অপরটি খুঁতযুক্ত। গৃহবধূ কোনটা পুরোহিতকে দেবেন ঠিক করতে না পেরে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করলে উত্তরে পূজারি বলেন—

'ব্রতয় দেবেন শশা
তার আবার জিজ্ঞাসা।'

অন্যরকম একটি প্রবাদ আছে—

'বারো কাঁদি নারকেল তেরো কাঁদি কলা
আজ আমাদের উপবাসের পালা'

এছাড়াও অসংখ্য মিশ্র প্রবাদ আছে ব্রাহ্মণকে নিয়ে, সবচেয়ে পরিচিতকে দিয়ে শুরু— (ক) চেনা বামুনের পৈতে লাগে না, (খ) বামুন দক্ষিণা ধরে ঢেঁকির নামে মন্ত্র পড়ে, (গ) বামুন মন্ত্র পড়ে পাঠা কি শোনে, (ঘ) বামুন ঘরে খাবে ভাত গোবর দেবে আড়াই হাত। (ঙ) বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর, (চ) বামুনের ঘরে মূর্খ হলে ক্রিয়া পণ্ড করে/রোজার ঘরে মূর্খ হলে রোগীর দফা সারে।

বামুনের পরে বাঙালি হিন্দু সমাজে কায়স্থদের স্থান। তাদের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকে ব্যঙ্গ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছে— (ক) 'কায়েতের বুদ্ধি আঁতে/বানরের বুদ্ধি দাঁতে।' (খ) 'কায়েতের বুদ্ধি ঘণ্টার বাদ্যি'। (গ) 'কাক ধূর্ত না কায়েত ধূর্ত।'

বৈদ্যরা বঙ্গদেশের একটি বর্ধিষ্ণু সম্প্রদায় এবং এরা ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলে কথিত আছে। চিকিৎসার বিষয়ে বোধহয় মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা আজকের মতোই, তাই তাদের নিয়ে প্রবাদের অন্ত নেই—

(ক) 'চওড়া বৈদ্য ল্যাংড়া গাই
টেংরা মাছ জেংরা ভাই।'

(খ) 'বৈদ্য হল সৃষ্টি ছাড়া
হাতুরের যশ বাড়া।'

(গ) 'বৈদ্য বারেন্দ্র বোড়া
তিন নষ্টের গোড়া।'

গ্রাম্য ব্যবস্থায় বৈদ্য ছাড়া চিকিৎসার দায়িত্ব ছিল কবিরাজদের উপর। কবিরাজদের নিয়ে ব্যঙ্গ্যার্থে প্রবাদ—

(ক) 'চূর্ণ, চিন্তা, চালবাজি
তিন নিয়ে কবিরাজি।'

(খ) 'কথা, কড়া, কারসাজি
তিন 'ক'তে কবিরাজি।'

(গ) 'লাথি চড়ে নাহি লাজ
আমার নাম কবিরাজ।'

(ঘ) 'জল জোলাপ, জোচ্চরি
তিন নিয়ে ডাক্তারি।'

(ঙ) 'আনাড়ি বৈদ্য জান নষ্ট
কাঠ মোল্লায় ইমান নষ্ট।'

এবার আমরা প্রবেশ করব সেই সমস্ত অন্ত্যজ শ্রেণি যাদের আর্থিক দুর্বলতার জন্য নিচু পেশা গ্রহণ করতে হয়েছে এবং তাঁদের বর্ণ ও নির্ধারিত হয় পেশার ভিত্তিতে। প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় সমাজে এই প্রথা চলে আসছে। আর্য সমাজের চতুর্বর্ণ নির্ধারিত

হয়েছিল পেশার ভিত্তিতে। ব্রাহ্মণের অধিকারে শিক্ষা জপতপ, ক্ষত্রিয় রাজ্যশাসন, বৈশ্য কৃষিকাজ আর শূদ্র এই তিন বর্ণের দাসত্ব করবে। কামার-কুমোর, ধোপা-নাপিত এরা সব শেষোক্ত শ্রেণির। প্রবাদের মধ্য দিয়ে তাদের নিন্দা বা ছোটো করবার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। এই বিদ্বেষ কোনও কোনও ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের থেকে কম নয়। একটা প্রবাদের মধ্য দিয়ে অবশ্য সমাজে তাঁদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়েছে। সমাজে একঘরে করা বলতে আমরা বুঝি— 'ধোপা নাপিত বন্ধ'। এদের নিয়ে বহু প্রচলিত প্রবাদগুলি নিম্নরূপ শুধুমাত্র নাপিতকে নিয়ে প্রবাদ—

(ক) 'মানুষের মধ্যে নাপিত ধূর্ত পাখির মধ্যে কাউয়া
দেবতার মধ্যে কানাই ধূর্ত যারে না যায় পাওয়া।'

(খ) 'ছেলের হাতে মসি
নাপিতের হাতে অসি'

(গ) 'নাপিতের ষোলো চোঙা বুদ্ধি'।

(ঘ) 'অকেজো নাপিতের বোঝা ক্ষুর।'

(ঙ) 'নিন কামানে বেড়াল ধরে কামাও

(চ) 'গোবরে পোকা গোবর খোঁজে ব্যাং খোঁজে ডোবা
সিংহাসনে বসলেও, রাজা হয় না ধোবা।'

শুধুমাত্র ধোপাকে নিয়ে প্রবাদ—

(ক) 'বামা ধোপা শ্যামা ধোপা, সব ব্যাটারই এক চোপা।'

(খ) 'যার ফাঁটে তার ফাঁটে ধোপার তাতে কি।'

(গ) 'ধোপা পরের কাপড়ে শোভা।'

(ঘ) 'ধোপার গাধা' (নির্দয়ভাবে খাটানোর উদাহরণ)

ধোপা-নাপিত-কামার-কুমারদের মিলিত প্রবাদ—

(ক) 'ধোপা-নাপিত কুমোর কামার
যে বিশ্বাস করে সেও এক চামার।'

(খ) 'নাপিত বৈদ্য ধোপা চোর
যুগী বৈরাগী নেইকো ওর*।'

(গ) 'ধোপার বাসি, নাপিতের আসি।'

(ঘ) 'কুমোর নষ্ট হাড়ি ফাঁটা, তেলি নষ্ট মাথায় ছাতা

* 'ওর' = শেষ

গোয়ালাদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা তারা দুধে জল মেশায়, সে বিশ্বাস প্রতিফলিত হয় প্রবাদে। এর মধ্যে সবচেয়ে চালু প্রবাদ—

(ক) 'গোয়ালার নিজের দই কি টক হয়।'

(খ) . 'গয়লার ধর্ম কেঁড়ের বাইরে।'

(গ) 'গয়লার দই গয়লায় বখনায়।'

(ঘ) 'গাই গয়লায় বন্ধুত্ব থাকলে বনে গিয়েও দুধ দেয়।'

(ঙ) 'চাষার চাষ দেখে এসে চাষ করল গোয়াল,
ধানের সাথে খোঁজ নেই বোঝা বোঝা পোয়াল।'

কামারকে নিয়ে প্রবাদ— 'পথে পেলাম কামার/দাঁ গড়িয়ে আমার।'

শুঁড়ি সম্প্রদায় যারা মদ তৈরি করে, স্বাভাবিক কারণেই বর্ণ হিন্দুরা তাদের ঘৃণার চোখে দেখে। মদ্যপায়ী মাতালদের কাছে তারাই ছিল আরাধ্য।

(ক) 'চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা
শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল।'

(খ) 'কথাতে সাউ শুঁড়ি
কথাতে বাটপারি'

কখনও বা মুসলমানদের সাথে এক পঙক্তিতে এনে ঘৃণা প্রকাশিত হয়েছে—

(গ) 'শোড় শুঁড়ি এঁড়ে নেড়ে
যে বিশ্বাস করে সে ভেড়ের ভেড়ে।'

কখনও আবার মুচির সাথে এক পঙক্তিতে

(ঘ) 'মুচির নেই নাক, শুঁড়ির নেই কান।'

আমাদের জীবন ধারণের মূল উপাদান খাদ্যশস্য নিজের শ্রমের বিনিময়ে উৎপন্ন করে যে কৃষক, সেই 'চাষা' বলে ব্যঙ্গার্থে নাম তাদের নিয়ে প্রবাদের অন্ত নেই। অবশ্য কখনও কখনও তাদের ভাগ্য বিরূপতার কথাও বলা হয়েছে। লোকের মুখে ফেরে যে প্রবাদটি— 'চাষারে বুদ্ধি' এছাড়া, (ক) 'আশায় মরে চাষা'। (খ) 'চাষার এগারো মাস দুঃখ'। আর সকল মাস সুখ স্বচ্ছলতা নিয়ে ব্যঙ্গ—

(গ) 'খাটে কিষান কাটে না নাড়া, তার মাগের নথ নাড়া।'

অজ্ঞতা নিয়ে প্রবাদ— (ঘ) 'আষাঢ়ে মাটি/চাষাড়ের ঘরের বেটি।'

চাষির চেহারা নিয়ে— (ঙ) 'চাষার মুখ না আখার (আখা—উনুন) মুখ'

ভাগ্যের মার নিয়ে— (চ) 'কী করবে ভালো গোরু কী করবে সারে।
দেবতা না দিলে চাষা কী করতে পারে'

(ছ) 'হালিয়া হাল চষে কৃষাণ বোনে ধান
আগে খায় চোর ছোট্টা পিছে খায় কৃষাণ।'

মুচি, মেথর, চামার, ডোম, চণ্ডাল, চাঁড়াল, হাড়ি, পোদ অর্থাৎ যারা পতিত-অস্পৃশ্য তাদের নিয়ে প্রবাদে যে সাম্প্রদায়িক তাচ্ছিল্য ফুটে উঠেছে তার কোনও তুলনা মেলা ভার,

(ক) 'বাঁশ বনে ডোম কানা'

(খ) 'ডোমের পুতে যমের দূত'

(গ) 'ডোমের নেই যমের ভয়'

(ঘ) 'বাগদির পুত যেন যমদূত'

(ঙ) 'ডোম বাগদি হোড়েল (চোর) জাত/পোষ মানে না আর্ধেক রাত'

মুচি নিয়ে প্রবাদ—

(ক) 'মুচির এক কাম, খায় শোয় আর সেঁয়ে চাম'

(খ) 'মুচির আবার মাঙতো (মাজতো—সুন্দরী) বউ'

চণ্ডাল ও চাঁড়াল নিয়ে প্রবাদ—

(ক) 'চাঁড়ালে কি জানে কর্পূরের গুণ
শুঁকে শুঁকে বলে সৈন্ধব নুন'

(খ) 'বামুন আর চণ্ডালে হাতি আর বেড়ালে'

(গ) 'চাড়ালের গদ্দি (গদ্দি—রসিকতা) কুড়ালের কোপ'

(ঘ) 'চোর না চণ্ডাল'

হাড়ি সম্প্রদায়কে নিয়ে প্রবাদ— 'হাড়ির যখন লক্ষ্মী ছাড়ে, শুয়োরকে (হাড়িরা শুয়োর পালে) ঝাঁটা মারে'

পোদ সম্প্রদায়কে নিয়ে—

(ক) 'হাঁদা পোদ, ওলকে বলে তালের নোদ'

(খ) 'কি জানি কি লেখা জোখা, এক এক পোদ এক এক টাকা'

(গ) 'এক টাকায় পোদ চৌধুরী' (জমিদার)

বৈষ্ণবদের নিয়ে প্রবাদ—

(ক) 'হোই গোঁসাইয়ের খোদা গোঁসা।'

(খ) 'নেড়া মাথায় খোচার ভয়, নেড়ে খোঁজে ঈদ পরব।'

(গ) 'বাবাজিকে বাবাজি তরকারিকে তরকারি।'

(ঘ) 'ভাত দেবার নাই কিল মারার গোঁসাই।'

(ঙ) 'গোঁসাই ঠাকুর মরে, মান রক্ষার তরে।'

(চ) 'গোঁসাই এর চেয়ে কসাই ভালো।'

(ছ) 'গৌর-চন্দ্রিকা'

গুরু নিয়ে চালু প্রবাদ—

'যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ি বাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'

বাঙালির পদবি নিয়ে প্রবাদে কটাক্ষ স্তুতি কম নেই। মনে পরে শৈশবে বাল্য এক সাথি খেলায় বা দুরন্তপনায় হেরে গেলে আমার উদ্দেশ্যে সুর করে বলত— 'চক্রবর্তী

বক্রপান ছেঁড়া জুতোয় জল পান।' এর তাৎপর্য বা অর্থ বুঝতে পারিনি, শিবরাম চক্রবর্তী জীবিত থাকলে তার কাছে জানতে চাইতাম চক্রবর্তী কি ছেঁড়া জুতোয় জল পান করতেন কিনা। পদবি নিয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবাদটি—

(১) 'মুখটি কুটিল বড়ো, বন্দ্যঘটি সাদা
এদের মাঝে বসে আছেন চট্ট হারামজাদা।।
ঘোষ বোস মিত্র এরা কুলের অধিকারী
অভিমানে বালীর দত্ত যান গড়াগড়ি।।'

(২) 'মোষের শিং ভেড়ার শিং তারে বলি কি শিং
সিং এর মধ্যে ছিল এক গঙ্গা গোবিন্দ সিং।'

(৩) 'পোঁদে নেই চাম, চৌধুরী নাম।'

অথবা (৪) 'চৌধুরী চৌধুরী বড়নাম, ছাগলে চিবায় পোদের চাম'

(৫) 'ঘোষকে নেড়ে ভাল'

(৬) 'ঘোষাল রসাল বড়ো বন্দ্যঘটি সাদা'

(৭) 'পালেদের পূজায় তামাশা, একখানা বাতাসা
একবার চাইলাম দিলে না, আবার চাইলাম দিলে না
আমরা অত ছোঁচা না।'

(৮) 'লক্ষ্মণ সাহা আর লক্ষ্মণের হাড়ি'

মুসলমান সমাজের পদবির অস্তিত্ব সেভাবে না থাকলেও একটি প্রবাদ যা আগেও উল্লেখ করেছি—

'আগে থাকে আল্লা উল্লা শেষে হয় উদ্দিন
তলের মহম্মদ উপরে যায়, কপাল ফেরে যদ্দিন।'

শুধুমাত্র ধর্ম-বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বিরোধই নয় প্রাদেশিকতা আঞ্চলিকতাও প্রবেশ করেছে বাঙালি জীবনচর্চায় ও প্রবাদে। এই রসিকতা কখনও এমন নিম্নস্তরের যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিভেদকে লজ্জা দেবে। পূর্ববঙ্গীয় ও পশ্চিমবঙ্গীয়দের 'বাঙ্গাল' 'ঘটি'র লড়াই সর্বজন বিদিত। শুধু খেলার মাঠে নয় স্বাধীনতা পূর্ব কংগ্রেস দলেও এই লড়াই উত্তেজনার খোরাক জোগাত। এই অভিধা দুটি কেন হয়েছিল তা আমার জানা নেই। মনে হয় দুটি শব্দের অর্থই বোকা। বাঙালদের নিয়ে সর্বপ্রথম প্রবাদটি এইরূপ—

'বাঙাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু
লাফ দিয়া গাছে ওঠে লেজ নাই কিন্তু।'

রসিকতার এর থেকে কুরুচিপূর্ণ ব্যবহার ভাবা যায়? একি আমাদের লজ্জা দেয় না? চিন্তার উদারতা নিয়ে বাঙালির সর্বজনীন গর্ব আছে। অথচ আমরা উড়ে, মেড়ো খোট্টা, পাঁইয়া ইত্যাদি ভূষণে বিভিন্ন প্রদেশের মানুষকে বিভূষিত করেছি। বিভিন্ন প্রদেশের মানুষকে নিয়ে

নিকৃষ্ট রসিকতা বহু সংস্কৃতি সম্পন্ন মানুষকে করতে দেখে বাঙালির জীবনচর্চার এই অন্ধকারময় দিক আমাকে বিস্মিত করেছে, আহত করেছে। বাঙাল নিয়ে আরও প্রবাদ আছে—

(ক) 'বাঙাল পুঁটিমাছের কাঙাল'
(খ) 'হনুরে চীন হুজ্জুতে বাঙাল'
(গ) 'ঘর মুখো বাঙালি রণমুখো সেপাই'
(ঘ) 'ভাঙা নৌকাই বাঙালের গোঁসা'
(ঙ) 'কাঙাল বাঙাল খদ্যে তিন নিয়ে নদ্যে'

পশ্চিমবঙ্গীয়দের নিয়ে প্রবাদ—

(ক) 'ঘটি কেনা গঙ্গারাম' (খ) 'রাঢ় না চোয়াড়'

স্থান মাহাত্ম্য নিয়ে প্রবাদমালায়ও আছে বিদ্রূপ ও কটাক্ষ, একে আমরা দুই ভাগে ভাগ করেছি এক পশ্চিমবঙ্গীয় দুই পূর্ববঙ্গীয়। রাজধানী কলকাতা নিয়ে শুরু করতে গিয়ে মনে পড়ে দাদাঠাকুরের সেই শাশ্বত উক্তি—

'কোলকাতা সে আজব ভুলে ভরা
হেথা বুদ্ধিমানে চুরি করে
বোকায় পরে ধরা।'

(ক) 'বেটা মাটি মিথ্যে কথা এই তিন নিয়ে কলকাতা'
(খ) 'কলকাতার হিস্ট্রি, গুড়ে নেই মিষ্টি'
(গ) 'তেঁতুলে নেই টক কলকাতার ঢপ'

এরপর সবচেয়ে বেশি যে স্থান নিয়ে প্রবাদ তার নাম শান্তিপুর। শান্তিপুরি ভদ্রতাকে নিয়ে রসিকতা সর্বজনবিদিত।—

(ক) 'তাঁতি-গোঁসাই পচা ভুর, এই তিন নিয়ে শান্তিপুর।'
(খ) 'শান্তিপুরের রসের সাগর এক ঘরে তিন নাগর।'
(গ) 'উপোর মেয়ে কুন্ডি, অগ্রদ্বীপের খোঁপা,
শান্তিপুরের হাত নাড়া গুপ্তিপাড়ার চোপা'

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চল নিয়ে প্রবাদ—

কালীঘাট— (ক) 'কালীঘাটের বাঙাল'
(খ) 'কালীঘাটের চণ্ডী পাঠ'
(গ) 'দিয়ে নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়'

বিভিন্ন জেলা—(১) 'বাঁশ, বাকস, ডোবা, তিন নদের শোভা।'
(২) 'মোগল, মিশি, মাথা ব্যথা তিন দেখতে হুগলি আসা।'
(৩) 'চাল চিঁড়ে গুড় এই তিন নিয়ে দিনাজপুর।'
(৪) 'কঁজড়া, কাওয়ারি, নূর তিন নিয়ে মেদিনীপুর।'

	(৫)	'হাতে পান মুখে চুন তবে জানবে মানভূম।'
	(৬)	'পোস্তটক কলাইয়ের ডাল এই তিন বীরভূমের চাল।'
	(৭)	'আম আমড়া কুঁজরা ধান এই তিন নিয়ে বর্ধমান।'
অথবা—	(৮)	'লম্বা কোঁচা কাছাটান তবে জানবে বর্ধমান।'
	(৯)	'চোর চোট্টা হারামজাদ এই তিন নিয়ে মুর্শিদাবাদ।'
	(১০)	'আঁকুড়া বাঁকুড়া-বাসী মুড়ি খায় রাশি রাশি।'
স্থাননাম নিয়ে	(১)	'চিঁড়ে, চেটাই ঝেঁতলা তিন নিয়ে চেতলা।'
	(২)	'গাঁজা গুলি অন্নভাঙা তিন নিয়ে ফরাসডাঙা।'
	(৩)	'কাগজ, কলম, কালি এই তিন নিয়ে বালি।'
	(৪)	'গাঁজা, তাড়ি, প্রবঞ্চনা এই তিন নিয়ে শরশুনা।'
	(৫)	'গালি খিলি মতিচুর তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর।'
	(৬)	'বাঁদর, সভাকর মদের ঘড়া এই তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া।'
অথবা—	(৭)	'গুপ্তিপাড়ার মাটি বাঁদর গড়ে খাঁটি।'
	(৮)	'কালো কাপড় মাথায় চুল বাড়ি কোথায় ভাটকুল।'
	(৯)	'ধেদ্ধেড়ে গোবিন্দপুর।'
	(১০)	'কলাপাতা কাঠের আঁটি এই তিন নিয়ে বৈদ্যবাটি।'

পূর্ববঙ্গের স্থান নাম নিয়ে কটাক্ষ আছে প্রবাদে। কখনও স্থানীয় অধিবাসীরা একে পরিবর্তন করে স্তুতিতে পরিণত করেছেন। সবচেয়ে পরিচিত প্রবাদটি বরিশালকে নিয়ে—

'আইতে শাল যাইতে শাল
তার নাম বরিশাল।'

অথবা— 'ধান, খুন, খাল— তিন নিয়ে বরিশাল।'

ঢাকা শহরকে নিয়ে— 'বেহায়া, বেরসিক, বাঁকা,— তিন নিয়ে ঢাকা।'

স্তুতিতে অর্থান্তর হয়েছে— 'বিদ্বান, বুদ্ধিমান, টাকা,— এই তিন নিয়ে ঢাকা।'

চট্টগ্রাম বা চাঁটনা নিয়ে—

(ক) 'উদুখুলে ক্ষুদ নেই চাঁটগায়ে বরাত'

(খ) 'জেড় বুড়ির ভাড়ানি, চাঁটগায়ে বরাত'

ফরিদপুর নিয়ে প্রবাদ— 'চোর-চোট্টা, খেজুড় গুড়, তিন নিয়ে ফরিদপুর।'

অর্থান্তরে স্তুতিতে— 'সাধু, পির, খেজুড়গুড়, এই তিনে ফরিদপুর।'

যশোর নিয়ে পাগলা দাশুতে সুকুমার রায় যশোরের প্রবাদটি প্রতিধ্বনিত করেছেন—

'ক্ষীণ দেহ খর্বকায় মুণ্ড তাহে ভারি,
যশোরের কই যেন নরমূর্তি ধরি।'[২০২]

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উত্থান

সাম্প্রদায়িক রাজনীতির সাথে শ্রেণিসম্পর্ক অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকার মতো নির্বুদ্ধিতা আর হয় না। ধর্ম ও সম্প্রদায়িকতার একটা সুনির্দিষ্ট শ্রেণিগত ও রাজনৈতিক দৃষ্টির প্রতিফলন থাকে। ধর্মের মতো সাম্প্রদায়িকতা বাস্তব জগতের প্রতিবর্ত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। সাম্প্রদায়িকতা সবসময় মেহনতি মানুষের শ্রেণি দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। কার্ল মার্কসের পুঁজি গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ধর্মের সাথে উৎপাদন সম্পর্কের বিশ্লেষণ করেছেন।

> '...ধর্মীয় জগৎটা হল বাস্তব জগতের প্রতিবর্ত মাত্র। যে-সমাজের ভিত্তি হল পণ্য উৎপাদন, যেখানে সাধারণভাবে উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদনগুলোকে বিভিন্ন পণ্য আর মূল্য হিসেবে ধরে পরস্পরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করে, যা দিয়ে তারা তাদের পৃথক পৃথক প্রতিজনিক শ্রমকে সমসত্ত্ব মানবীয় শ্রমের মানে পরিণত করে— এমন সমাজের পক্ষে বিমূর্ত মানুষের তন্ত্র সমন্বিত খ্রিস্টধর্ম, আরও বিশেষভাবে সেটার প্রটেস্ট্যান্টবাদ, ডিইজম ইত্যাদি বুর্জোয়া রকমফের হল সবচেয়ে মানানসই রূপের ধর্ম।
>
> যতই অসম্পূর্ণভাবে হোক, অর্থশাস্ত্র বাস্তবিকই মূল্য এবং সেটার পরিমাণ বিশ্লেষণ করেছে এবং এইসব রূপের তলায় কী আছে সেটা আবিষ্কার করেছে। কিন্তু কখনও একবারও প্রশ্ন তোলেনি যে, শ্রম কেন সেটার উৎপাদনেব মূল্য হিসেবে প্রকাশ পায়; আর শ্রম-কাল কেন প্রকাশ পায় সেই মূল্যের পরিমাপ দিয়ে। এইসব সূত্র, যাতে সন্দেহাতীত হরফে এই মার্কা মারা রয়েছে যে সেগুলো সমাজের এমন একটা অবস্থার বস্তু যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়া মানুষের নিয়ন্ত্রিত না হয়ে বরং মানুষের উপর কর্তৃত্ব করে, এমনসব সূত্র বুর্জোয়া বোধ শক্তির কাছে খোদ উৎপাদন কর শ্রমেরই মতো প্রকৃতি থেকে চাপিয়ে দেওয়া স্বতঃসিদ্ধ অবশ্যম্ভাবিতা বলে প্রতীয়মান হয়। এইভাবে সামাজিক উৎপাদনের বুর্জোয়া রূপের পূর্ববর্তী রূপগুলোকে বুর্জোয়ারা ধরে সেই একই কায়দায় যেভাবে ফাদারেরা ধরেছিল প্রাক্‌খ্রিস্টানি ধর্মগুলোকে।'[২০৩]

বর্তমান সময় পর্যন্ত শ্রেণি সম্পর্ককে উহ্য রেখে সাম্প্রদায়িকতা ও তার রাজনৈতিক পটভূমি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেকেই স্বখাত সলিলে ডুবে মরছেন। আর এই কারণেই ধর্মের মধ্যে সাম্য বা সম অধিকারের কথা বলা হয় তার অস্তিত্ব খুব বেশি সময় বেঁচে

থাকে না। এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত অ্যান্টি ডুরিং লিখতে গিয়ে বলেন—

> 'খ্রিস্টধর্মে কেবল একটা বিষয়ে সমস্ত মানুষের সমতা স্বীকৃত ছিল সেটা হল এই যে, সমানভাবেই সবার জন্ম আদিপাপে— এটা দাস আর উৎপীড়িতদের ধর্ম হিসেবে এর প্রকৃতির সঙ্গে যথাযথভাবে মানানসই ছিল। তাছাড়া এই ধর্ম মানত বাছাই করা লোকেদের সমতা সেটার উপর জোর দেওয়া হত কিন্তু শুধু একেবারে শুরুতে। এই নতুন গোড়ার দিককার পর্বগুলিতে যে সাধারণের মালিকানার কিছু কিছু লক্ষণ যায় সেটাকে সত্যিকারের সম-অধিকারের ধারণার চেয়ে বরং সমাজচ্যুতদের মধ্যে সংহতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ধরা যায়। অতি স্বল্পকালের মধ্যেই যাজক আর অযাজকদের মধ্যে পার্থক্য স্থাপিত হবার ফলে এই জায়মান খ্রিস্টানি সমতারও অবসান ঘটে।'[২০৪]

সাম্প্রদায়িকতা সবসময় পরিচালিত হয় শ্রমিকশ্রেণি ও মেহনতি মানুষের শ্রেণি চেতনাকে দুর্বল করতে এবং ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতা সবসময় শোষক শ্রেণিগুলির সমস্বার্থে কাজ করে।

> 'বুর্জোয়া শ্রেণি সকল সময়ে সচেষ্ট হয় নিজের স্বার্থের সাথে সারা দেশের স্বার্থকে এক করে দেখতে। এ প্রচেষ্টায় তারা সাধারণত বিফল হয় না। কিন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয় তখনই তারা চাতুর্যের সাথে রচনা করে কোনও রাজনৈতিক বিভ্রান্তি আমাদের দেশের এই বিভ্রান্তি সমূহের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা এখনও সর্বপ্রধান কার্যকর এবং সর্বাপেক্ষা মারাত্মক।
>
> সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে বুর্জোয়াশ্রেণি চেষ্টা করে অন্যান্যদের শ্রেণি চেতনাকে বিনাশ করতে। স্বাধীনতা-পূর্ব যুগে সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন ছিল অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বুর্জোয়া প্রতিযোগিতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য। কিন্তু স্বাধীনতা-উত্তরকালে সাম্প্রদায়িকতার প্রয়োজন নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত নিম্নবিত্ত লোকেদের শ্রেণি চেতনার কণ্ঠরোধ করা। সম্প্রদায়গত বুর্জোয়া স্বার্থের প্রতিষ্ঠা এবং আজ পর্যন্ত সমগ্র পাক-ভারতীয় উপমহাদেশে বুর্জোয়া স্বার্থে উদ্ধারকার্যে ব্যবহারযোগ্য।'[২০৫]

বাংলাদেশের রাজনীতিতেও এটা সমানভাবে সত্য। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী ও দেশীয় সামন্ত ও মুৎসুদ্দিরা নিম্নবর্ণের ও নিম্নবর্গের কৃষক ও হস্তশিল্পীদের সাম্প্রদায়িকতার কষাঘাতে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। প্রাক-ইংরেজ যুগে বাঙালির রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বা রাজ্য পরিচালনার কথা প্রায় শোনাই যায় না। মুঘল যুগের কিছু শক্তিশালী সামন্তপ্রভুকে ইংরেজ আমলে হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থানের জন্য স্বাধীন হিসাবে দেখানোর চেষ্টা হয়েছে। আহম্মদ শরিফের মতে—

> 'আমাদের সবচেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য, দুই হাজার বছরের মধ্যে অশোক সুদ্ধ ধরলে তেইশশো বছর হবে এই তেইশশো বছরের মধ্যে আমরা বাঙালি বলে

মাত্র এক স্বদেশি রাজার নাম শুনি। তিনি শশাঙ্ক। তারও অন্য মত আছে। শশাঙ্ক মুর্শিদাবাদে-কর্ণসুবর্ণে রাজত্ব করতেন। কেউ কেউ বলেন যে তিনি আসাম থেকে এসেছিলেন। এই একজনের নাম পাই। আর কারও নাম পাই না। তারপর অনেক পরে নাম পাই আমরা এক বিদ্রোহী সামন্তের, নাম দিব্যক। দিব্যক, রুদ্রক আর ভীম নামে তিন পুরুষ, এই দেখি। আর আমরা বাঙালি শাসক দেখি না। হুসেন শাহ সৈয়দ হলে বাঙালি হল না। সৈয়দ হলে বাঙালি হওয়া যায়— সে যুগে তা হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। হুসেন শাহ হয় সৈয়দ হিসেবে সত্য না হয় বাঙালি হিসেবে সত্য। আর এক বাঙালিকে জানি, যাকে বাঙালি বলে স্বীকার করলেও করা যায়, না করলেও ক্ষতি হয় না তিনি হচ্ছেন রাজা গণেশ। গণেশ ব্রাহ্মণ যদি হন, তাহলে বাঙালি হতেই পারেন না, বহিরাগত। তাঁর ছেলে যদু জালালুদ্দিন বা মহেন্দ্র এবং তাঁর পৌত্র সহ সবাই মিলে ১২/১৩ বছর রাজত্ব করেন। এছাড়া বাঙালি কখনও বাংলাভাষী অঞ্চলে ১৯৪৭ এর আগে রাজত্ব করেননি। ১৯৪৭ এর পরের ইতিহাস বলার দরকার হয় না আপনারা জানেন।'[২০৬]

এমনকী সিরাজদৌল্লা-মীরজাফরদের সময় রাজনৈতিক-কূটনৈতিক কাজে প্রকৃত বাঙালিদের অস্তিত্ব প্রায় নেই। রাজবল্লভ ও জগৎশেঠদের প্রকৃত বাঙালি বলা হবে কিনা সে সংশয় আজও দূরীভূত হয়নি। একমাত্র ব্যতিক্রম মহারাজ নন্দকুমার। ব্রাহ্মণ হলেও এতদিন পরে তাঁর বাঙালিত্ব নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

ইংরেজ আমলের প্রথম অব্দে বাঙালি হিন্দু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণের দ্বারা বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীরূপে পরিগণিত হয়েছে। ১৮৮৫ সালের কংগ্রেস দল গঠনের সময় থেকে বাঙালির রাজনৈতিক জীবনের পথ চলা। একদিকে হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থান অপরদিকে প্যান-ইসলামইজম এই দুই পথের সংঘাত বাংলার রাজনৈতিক জীবনে প্রায় সর্বদা বিদ্যমান থেকেছে। ভারতে প্রথম জনগণনা হয় ১৮৭২ সালে। '১৮৭২ সাল পর্যন্ত বাংলার হিন্দুর সংখ্যা মুসলমানের তুলনায় কিছু বেশি ছিল। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশের জনবিন্যাস পরিবর্তিত হয়। ১৮৮১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে দেখা যায় মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর সংখ্যার তুলনায় সামান্য বেশি। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানের সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেল। ১৮৭২ সালে সেন্সাস রিপোর্টে এইচ বিভারলি লেখেন যে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলমান হিন্দু সমাজের নিম্নশ্রেণি থেকে আগত। হিন্দু সমাজের বর্ণবৈষম্যের ফলে সামাজিক জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য তারা অনেকেই ইসলামধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেনযুগ হইতেই বৌদ্ধধর্মের প্রতি তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা ক্রমে ক্রমে বর্ধিত হইতেছিল, তারপর বিদেশি ধর্মের প্রচণ্ড আঘাতে আত্মরক্ষা ও সংরক্ষণের সময় সমাজ হিন্দুধর্মের বাহিরের লোকদিগকে একেবারে চাহিল না। ইহারা কোনো বৌদ্ধ সমাজের

আশ্রয় না পাইয়া হিন্দু সমাজের তাচ্ছিল্য ও সংরক্ষণপ্রীতির ভীষণ কঠোরতা এবং অর্থনৈতিক ও নানা পারিপার্শ্বিকের চাপে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হইল।'[২০৭] অন্ত্যজদের অনেককে সে সময় জনগণনায় হিন্দু হিসেবে স্বীকার না করায় হিন্দু জনসংখ্যার ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তন ঘটে।

অত্যন্ত দ্রুত সংখ্যা হ্রাস বর্ণহিন্দুদের আতঙ্কিত করেছিল। মুসলমান সমাজের আশঙ্কার কারণ ছিল ভিন্ন। প্রথমত, মুসলমান রাজত্বের অবসান তাদের প্রত্যক্ষ কোনও ক্ষতি না করলেও তারা আশঙ্কিত হয়েছিল সমূহ বিপদ বলে। যদিও এ আশঙ্কার কারণ সম্পূর্ণই মনস্তাত্ত্বিক। আমরা ইতিপূর্বেই দেখিয়েছি হুসেনশাহ থেকে মীরজাফরের বংশধরদের সময় কাল পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থা ছাড়া বাকি সমস্ত বিভাগেই উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা ছিল হয় ব্রাহ্মণ না হয় উচ্চবর্ণভুক্ত হিন্দু। ইংরেজ আমলে প্রভূত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছিল কৃষক ও হস্তশিল্পীদের মতো নিম্নবর্গীরা, যাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান সম্প্রদায়। দুই সম্প্রদায়ের ভিন্নমুখী নিরাপত্তাহীনতার মধ্য দিয়ে বাঙালির রাজনীতিতে প্রবেশ। এই সময়ে বাঙালির রাজনৈতিক উত্থান ঘটে ভিন্নমুখী হলেও সাম্প্রদায়িক পথে। একদিকে হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান অপরদিকে প্যান-ইসলামইজম এই ছিল দুই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। অবশ্য এর বাইরে তৃতীয়ধারা থাকলেও তার শক্তি ছিল ক্ষীণ। কাজী আবদুল ওদুদের মতে মূলত মোগল আমলের ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল বাংলার মুসলমানকে দুর্দশাগ্রস্ত করে তুলেছিল।

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে এই পরিবর্তনের সূচনা হল না বরং এর পরিণতি ঘটল। আর একভাবে বড়ো বড়ো মুসলমান ঘরের পক্ষে এটি বিষম ক্ষতির কারণ হল— এই বন্দোবস্তের প্রবণতা হল যেসব হিন্দু কর্মচারী সাক্ষাৎভাবে প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়-আদি করতেন তাদের জমিদার বলে স্বীকার করার দিকে। ১৭৮৮-৯০ সালের ভূমি-বন্দোবস্তের হাতে লেখা রিপোর্ট আমি মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। ১৭৯৩ সালের আইন সংগ্রহে মধ্যস্বত্বভোগীদের কথা কিছু থাকলেও এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ যে সেইদিনের ভূমিকর আদায়কারী কর্মচারীদের পূর্ববর্তী ব্যবস্থার মাত্র তিনটি অঙ্গের দিকে দৃষ্টি ছিল— সরকার, প্রজার কাছ থেকে যিনি সাক্ষাৎভাবে খাজনা আদায় করতেন সেই স্থানীয় আমলা অথবা জমিদার, আর জমি যারা চাষআবাদ করত সেই প্রজারা। আমাদের নতুন ব্যবস্থায় মাত্র তিনটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত হয়েছিল। এ ভিন্ন মুসলমান আমলের ভূমিকর আদায় সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি-ব্যবস্থা হয় বাদ দেওয়া হয়েছিল না হয় আস্তে আস্তে বাদ পড়ে গিয়েছিল।'[২০৭] অবশ্য তিনি মুসলমান আমলের অল্পলোকের স্বার্থরক্ষাকারী ব্যবস্থার উল্লেখ করে হান্টার সাহেবের মত উল্লেখ করেন—

> 'প্রকৃত ব্যাপার এই যে মুসলমান আমলে রাজ্য শাসন ছিল বহুকে রক্ষা করবার জন্য নয় বরং মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে সমৃদ্ধ করবার যন্ত্র। প্রত্যেক

জেলার অল্প কয়েকটি পরিবার আনন্দে বিলাসে দিন কাটাবে এ জন্য অগণিত চাষিকে যে গ্রীষ্মের খররৌদ্র ও বর্ষা বারিধারা নগ্ন পিষ্ঠে সহ্য করে পরিশ্রম করতে হয়, মনে হয়, একথা শাসকদের হৃদয়কে স্পর্শ করেনি অথবা তাদের বিবেককে বিচলিত করেনি।[২০৮]

এর ফলে এমন মনে করবার কোনও কারণ নেই যে মুসলমান শাসনে কৃষকরা ভালো অবস্থায় ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলনকে সেদিক থেকে কখনওই কৃষকশ্রেণির পক্ষে বলা যাবে না। বরং মুসলমান সাম্প্রদায়িকতার পুনরুজ্জীবন বলা যায, এবং বলা যায় সাম্প্রদায়িকতার রাজনীতি যে শ্রেণি দৃষ্টিতে পরিচালিত তার সবই বিদ্যমান ছিল এই বিদ্রোহে কৃষক শ্রেণির স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল। বরং ফরাজি আন্দোলনে গরিব কৃষক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষাকারী কিছু দাবি ছিল। সবচেয়ে বড় কথা এই সাম্প্রদায়িক ধর্ম আন্দোলন বাঙালি মুসলমানদের কাছে প্রগতির দরজা বন্ধ করে দিয়েদিল। বদরুদ্দিন উমরের মতে—

'ওয়াহাবি আন্দোলনের মতো প্রতিক্রীয়াশীল আন্দোলন উত্তর ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বিস্তৃত হয়ে মুসলমান সমাজের শিক্ষা-দীক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং উন্নতিকে করল মারাত্মকভাবে ব্যাহত।... এর ফলে হিন্দুরা যখন এককরে দেখল স্বদেশ ও সমাজকে, মুসলমান ধর্মের হাজার হাজার লোক তখন ধর্মপ্রীতি প্রাবল্যে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হল স্বদেশভূমি ভারতবর্ষ। এদিক থেকে তাই ওয়াহাবি আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াশীলতার তুলনা আর নাই।[২০৯]

এই বিদ্রোহের ফলে সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিশ্বাসের সম্পর্ককে নষ্ট করে দিতে সমর্থ হল ইংরেজ রাজশক্তি। দিকে দিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেড়েও কৃষক বিদ্রোহের গতি স্তিমিত হল। হিন্দু মুসলমান কৃষকের শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি ঝাপসা হল। ছিন্ন হল বহুযুগ ধরে গড়ে ওঠা কৃষকের লোকসংস্কৃতির বন্ধন।

১৮৫৭-র ২৯ মার্চ বারাকপুরে মঙ্গল পাণ্ডের গুলিচালনার মধ্য দিয়ে বিদ্রোহের দাবানল সারাভারতব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। স্ফুলিঙ্গ থেকে যে দাবানল হতে পারে সারা ভারত সেদিন অনুভব করলেও বাংলা ছিল গভীর সুপ্তিতে নিমগ্ন। সুপ্তিতে নিমগ্ন বললে বোধহয় মিথ্যা বলা হয়। ইংরেজ শাসনের মোহগ্রস্ত বাঙালি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় কপট নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল। সেই সময় লন্ডনে বসে মহান চিন্তানায়ক কার্ল মার্কস প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধের সমর্থনে নিউইয়র্ক ট্রিবিউনে কালজয়ী প্রবন্ধাবলি লিখতে শুরু করেন। বাঙালির নিদ্রার ঘোর তার শতবর্ষ পরেও কাটেনি। আর কাটেনি বলেই শুধু মার্কসবাদ বিরোধীরাই নয়, মার্কসবাদী চিন্তায় দীক্ষিত রজনীপাম দত্ত বা বিনয় ঘোষরা কেউই এর তাৎপর্য বুঝতে পারেননি। এইসময় মার্কস জার্মান পত্রিকা 'নয়ে রাইনসে টু-সে টাং'-এ তাঁর ঐতিহাসিক ঘোষণা করেন— 'যদি কোনও দেশ অপব দেশকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে তবে সে তার (শ্রমিকশ্রেণি—লেখক) নিজের শৃঙ্খলকেই দৃঢ়বদ্ধ করে'। এই বিদ্রোহ ব্যর্থ হলে ইংরেজদের বেনিয়ান রাজা

নবকৃষ্ণ দেব তাঁর বাড়িতে উৎসব পালন করে, এবং এ উপলক্ষে ভোজসভায় কলকাতার নবজাগরিত সমস্ত বাঙালি হিন্দুকে নিমন্ত্রণ জানান। এই সান্ধ্য ভোজসভায় যোগ দেননি দুই বাঙালি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্ত। এর মধ্য দিয়ে তৎকালীন রাজনীতিতে শিক্ষিত ও বর্ণহিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হয়।

১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গকে সামনে রেখে শিক্ষিত বর্ণ-হিন্দুদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ। এই সময় দুই সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির আতুরঘর ও জন্ম বাংলার মাটিতে সুনির্দিষ্ট হয়ে যায়। এই সময় হিন্দু রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদের পুনরুত্থান ঘটে। একথা বললে অত্যুক্তি হবে না বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যে হিন্দুত্ববাদের জন্ম দিলেও রাজনীতিতে এই ধারার জনক অরবিন্দ। 'দেশমাতা জগদীশ্বরীর থেকে ভিন্ন নন, আর জন্মভূমি তো দেবী দুর্গারই প্রতীক'— অরবিন্দের এই উপলব্ধি চরমপন্থীদের দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বেও বিপিনচন্দ্র পাল দুর্গার মধ্যে 'বাঙালির শাশ্বত আধ্যাত্মিকতাকে মূর্ত হতে দেখেছিলেন। চরমপন্থীরা শক্তিকে দৈব অভিলাষেরই দ্যোতনা বলে মনে করতেন। ইতিহাস প্রবাহের চালিকা এই শক্তিই রূপান্তরিত হয় জাতীয়তাবাদে।'[২১০] অপর ঐতিহাসিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, যিনি অরবিন্দর যুগান্তর দলের সর্বকনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন পরে তিনি উপলব্ধিতে আনেন যে হিন্দুরা স্বদেশ প্রীতি ও স্বধর্মপ্রীতিকে পৃথক করে না দেখার ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ধর্মীয় প্রভাব দেশের বৃহত্তর স্বার্থের ক্ষেত্রে সমূহ ক্ষতি করেছে। 'বিপ্লববাদ সনাতনি হিন্দুদের মধ্যেই আবদ্ধ হইয়াছিল এবং ইহাদের অনেকেই হিন্দু ধর্ম পুনরুত্থানকারীর দলে ছিলেন। কাজেই বিপ্লববাদ হিন্দু জাতীয়তায় পরিণত হইল।'[২১১] আর এক প্রখ্যাত ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে— 'গণেশ আর ভবানী পূজা, শিবাজী আর বীরাষ্টমী পালন, কালীর মূর্তির সামনে বিপ্লবীদের শপথ গ্রহণ স্বদেশি ও বিপ্লবী ও বিপ্লবী-আন্দোলনকে হিন্দু চরিত্রে আবৃত করে দিয়েছিল।'[২১২] পূর্বে নবগোপাল মিত্র একে বর্ণনা করেন— 'Hindu nationality... in not confined in Bengal. It embraces all of Hindu name and Hindu faith thought the length and breadth of Hinduism, neither geographical position nor the Language is counted a disability. The Hindus are... to be a religious nation.'[২১৩] সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়ও এক ধ্বনির অনুরণন শোনা যায়— 'আপনাদিগের পুরাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বাভিমান এইভাবে আমাদের মধ্যে জাগিয়া ওঠে। তাহারই মধ্যে আমাদের আধুনিক স্বদেশিকতা বা ন্যাশনালিজমের ভিত্তি স্থাপিত হয়।'[২১৪] প্রখ্যাত ঐতিহাসিক রোমিলা থাপার এযুগ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় অনেক ঐতিহাসিকের ভুল ধরিয়ে দিয়েছেন যে, 'অনেক ঐতিহাসিক মনে করতেন মুসলমান শাসনের যুগ বিদেশি শাসনের যুগ এবং এই সময় হিন্দুদের অবক্ষয়ের যুগ' (রোমিলা থাপার এর পূর্বকাল ও পূর্ব ভাবনা পূর্বেই উদ্ধৃত হয়েছে পৃ. ২১)। এযুগ সম্পর্কিত ব্যাখ্যায় প্রতিফলিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক ভাবনা। হিন্দু মুসলমানের চিরন্তন

দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যার ধারণার ফলে এ যুগ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা হয়েছে বিকৃত। সাম্প্রদায়িক প্ররোচনায় প্রভাবিত হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিকরা একটি সাধারণ ভুল করেছেন, সেটি হল, হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মীয় পার্থক্যই যেন সবচেয়ে বড় কথা। প্রাগুক্ত একই ভুল বাংলার ইতিহাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, যদুনাথ সরকার এবং পরবর্তীতে রমেশচন্দ্র মজুমদাররা করেছেন।

রাজনীতিতে একদিকে জমিদার ও মুৎসুদ্দিদের দল কংগ্রেস ও চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির কৃষকের শ্রেণি স্বার্থ-বিরোধী ভূমিকা এবং প্রকাশ্যে হিন্দুত্ববাদের অস্ফালনের প্রতিক্রিয়ায় ও ইংরেজদের রাজশক্তির প্রত্যক্ষ মদতে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকার নবাব সলিমুল্লার নেতৃত্বে মুসলিম লিগ গঠিত হয়। একই বছর হিন্দু মহাসভাও গঠিত হয়।[২১৫] অস্বীকার করা যাবে না বাঙালি হিন্দু-যুবকদের জাগ্রত ক্ষোভেব বহিঃপ্রকাশ দেখে কিছুটা দেরিতে হলেও বিশেষ সুবিধা দেবার লোভ দেখিয়ে মুসলিম লিগ গঠন করায় কার্জন, শুধু তাই নয় এই কাজে আর্থিক সহযোগিতা এক লক্ষ পাউন্ড ঋণ নামমাত্র সুদে দেওয়াও হয়। ১৮৮৫ সালে ঠিক এইভাবেই হিন্দু জনতার ক্ষোভকে প্রশমিত করার জন্য ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ মদতে জমিদার ও এলিটদের দল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। ঐতিহাসিক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মতে— 'স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান অনুপ্রেরণা হিন্দু ভাবধারা থেকে এলেও বাংলার মুসলমান যে তাতে যোগ দেয়নি তা নয় আব্দুল রসুল, লিয়াকৎ হুসেন প্রমুখের নাম এই বঙ্গদেশে স্মরণীয়। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের হাতে অস্ত্র ছিল ভেদনীতি, আর তাই প্রয়োগ করে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে বঙ্গভঙ্গের সমর্থক বানানো হল। সরকারি আনুকুল্যে ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের পত্তন হল। দেশ তখন প্রকৃতই মেতে উঠেছিল, আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলনের স্থান খুবই উচ্চে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির তলোয়ারকে আমরা ভোঁতা করে দিতে পারিনি তা স্বীকার না করে কোনও উপায় নেই।[২১৬] এদিকে মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে The Statesman লেখে—

> 'It is evidently still necessary to protest against the systematic attempts that are being made to be set Hindus and Mussalmans at variance with each other. The most recent occassion that has been turned to this sinster purpose is the educational conference that has hold at Dacca three weeks ago and was followed by a meeting at which an All Indian Muslim League was in agurated.'
>
> '...there is an important difference between the awaking activity of the Indian Muslims Community, educational and politicial sectajian organisation original to carry an anti Indian Propaganda.'[২১৭]

১৯০২ সালের ২৪ মার্চ কলকাতায় ব্যারিস্টার পি. মিত্রের পরিচালনায় অনুশীলন সমিতি গঠিত হলেও এর প্রকৃত প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় ঢাকায় পুলিন দাসের নেতৃত্বে। সদস্যদের

গীতা স্পর্শ করে শপথ গ্রহণ করে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হত এছাড়া প্রত্যেক সদস্যর গীতাপাঠ বাধ্যতামূলক ছিল।[২১৮] বিপ্লবী প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলীর কথায় 'বাংলার বিপ্লবীদের বিপ্লব-সাধনার ভিত্তিই ছিল স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ভগবদ্গীতা ও বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা।'[২১৯] এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক অমলেশ ত্রিপাঠীর মতে 'পুলিন দাসের 'অনুশীলন সমিতি' অল্পকালের মধ্যে সন্ত্রাসবাদী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়ে। বি.সি. অ্যালেনের (২১ সেপ্টেম্বর, ১৯০৭ তারিখের) রিপোর্ট ও এইচ.এল. সলকেলর্ডের (১০ ডিসেম্বর ১৯০৮) রিপোর্টে দেখা যায় 'অনুশীলন' জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগের কোনও চেষ্টাই করছে না। বরং অল্প সময়ের মধ্যে তার কাজকর্মে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার সুর ধরা পড়ে।'[২২০] এই সময় বঙ্গের সর্ববৃহৎ চরমপন্থী গোষ্ঠীর অনুশীলন সমিতির কর্ণধার সংগঠনের মুখপত্রে লেখেন 'নিয়ম করিলাম সমিতিতে মুসলমান সদস্য নেওয়া হইবে না।'[২২১] এই সাম্প্রদায়িক রেশারেশির ফলে ১৯০৭ সালে সাম্প্রদায়িক বিরোধ তুঙ্গে ওঠে 'মৈমন সিং এবং জামালপুরের দাঙ্গা' (২১ এপ্রিল, ১৯০৭)-কে ঢাকার নবাব ও ব্রিটিশ আমলাদের গোপন ষড়যন্ত্রের ফল বর্ণনা করেও অরবিন্দের পক্ষে মৈমনসিং-এর কৃষকদের উপর কোনও প্রভাব বিস্তারই করা সম্ভব হয়নি। তিনি এটা উপলব্ধি করেননি, এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পিছনে মোল্লাদের উসকানি এবং আমলাদের কূটনীতি থাকলেও সাধারণ মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিদ্বেষ বীজ বপন করা হয়েছিল অনেক আগেই, এর জন্য দায়ী ছিল বছরের পর বছর ধরে জমিদার মহাজনদের নির্মম শোষণ-নিপীড়ন! সমস্যার সমাধানের জন্য অরবিন্দ মৈমনসিংবাসীদের কুমিল্লার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বলপ্রয়োগের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিবিধানের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এটা যে স্থায়ী সমাধান হতে পারে না তা একবারও তাঁর মনে আসেনি।[২২২] চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলির এই সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখে হেমচন্দ্র দাস কানুনগো সংক্ষুব্ধ মন্তব্য করেন 'তখন শুধু যে আন্দোলন হিন্দুয়ানি আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল তা নয়,... তথাকথিত ওই স্বদেশি আন্দোলনের সময়ই এই প্রভাব চরমে উঠেছিল।'[২২৩]

এই ঘনায়মান সাম্প্রদায়িকতার সময়ে সংবাদ মাধ্যমগুলি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক শক্তিগুলির সহায়ক শক্তির কাজ করে। বদরুদ্দিন উমর আমাদের দেখিয়েছেন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কখন লাগে এবং তখন প্রচার মাধ্যমগুলির ভূমিকা কতখানি—

> 'সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তির চূড়ান্ত পরিণতি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায়। একই এলাকাভুক্ত দুই সম্প্রদায়ের লোকদের পরস্পর বিরোধিতা ও তিক্ততা জান্তব এবং অস্বাভাবিক পর্যায়ে অবনমিত হলে তখনি সম্পূর্ণ হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মানসিক প্রস্তুতি এ অবস্থায় অনেক সাধারণ মানুষও লিপ্ত হয় অস্বাভাবিক আচরণে।
>
> ...যে প্রচার মাধ্যমগুলির উল্লেখ করা হল সেগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে কারা? এবং কোন স্বার্থের তারা প্রতিনিধি? সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার চরিত্রকে বোঝবার জন্য একথা জানা প্রয়োজন।...

উচ্চ-মধ্যবিত্ত স্বার্থ প্রধান রাজনৈতিক দলগুলিই অধিকাংশ সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যম সমূহের সমার্থক, মালিক এবং নিয়ন্তা। এজন্য এগুলির মাধ্যমে শুধু দাঙ্গার ক্ষেত্রেই নয় জীবনের সকল ক্ষেত্রেই উচ্চ-মধ্যবিত্ত স্বার্থ সূক্ষ্মভাবে রক্ষার ব্যবস্থা হয়, এ-জন্যই দেখা যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রে দেশের সকল সংবাদপত্রের ভূমিকা এক হয় না। কোনও কোনও সংবাদপত্র হয়তো দাঙ্গা মনোবৃত্তির বিরোধিতা করে কিন্তু জনমত গঠনে তাদের প্রভাব অন্যগুলির তুলনায় অপেক্ষাকৃতভাবে দুর্বল।'[২২৪]

বাংলার সংবাদপত্রের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে অতীতে সংবাদপত্রগুলি যতখানি সাম্প্রদায়িক ছিল ততটাই ছিল ইংরেজ রাজশক্তির অনুগত, অর্থাৎ শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে কখনওই তারা ছিলেন না ১৮৫৭ সালের ২০ জুন ইংল্যান্ডের রানিকে ''পৃথিবীশ্বরী'' ''ইংলন্ডেশ্বরী'' 'জননীর নিকট পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইয়াছি' বলে লেখে— 'যবনাধিকারে আমরা ধর্ম বিষয়ে স্বাধীনতাপ্রাপ্ত হই নাই, সর্বদাই অত্যাচার হইত।'[২২৫] বিপিনচন্দ্র পালের লেখা থেকে জানতে পারি যে সেই অনেক সংবাদপত্র ও সাময়িকী সাম্প্রদায়িকতার পথ ধরেছিল। সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্ববাদী লেখক চন্দ্রনাথ বসু ও ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বঙ্গবাসী পত্রিকায় লেখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। ব্রাহ্ম মেয়েদের লক্ষ করে উক্ত লেখকদ্বয় তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাত হানেন। 'একদিন শিক্ষিত ব্রাহ্ম মহিলাদের উপর অকথ্য আক্রমণ করা হয়।' ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মমহিলারা কাগজের সম্পাদক দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীকে বঙ্গবাসীর তরফে ক্ষমা চাওয়ার দাবি করলেন। তিনি সেই দাবি অমান্য করলে ব্রাহ্মরা 'বঙ্গবাসী' কাগজ বয়কট করেন এবং 'সঞ্জীবনী' কাগজ প্রকাশ করেন। এরপর বিপিনচন্দ্র পালের ভাষ্য অনুসারে উভয় পক্ষের লড়াইয়ে 'বঙ্গবাসী' শীঘ্রই পরিণত হল হিন্দু সমাজের তত্ত্বগত ও সমাজগত রক্ষণশীলতার দুর্গে 'সঞ্জীবনী'র প্রভাব সীমাবদ্ধ রইল তার ব্রাহ্ম সমব্যথীদের সভায়। এই বিভাজন একদিকে যেমন 'বঙ্গবাসী'কে ঠেলে দিল হিন্দু গোঁড়ামির দিকে অপরদিকে 'সঞ্জীবনী'ও পৌঁছয় ব্রাহ্ম গোঁড়ামির শেষ বিন্দুতে।'[২২৬] সংবাদ প্রভাকরের মতোই রক্ষণশীল মুসলমানদের মুখপাত্র 'ইসলাম প্রচারক' একই ভাষায় বিদ্বেষ বিষ ঢালতে লাগল—

> 'বঙ্গভাষায় ইংরেজি আমল হইতে যে প্রকার অমানুষিক অত্যাচার উৎপীড়নের হস্ত বিস্তার এবং ঘোর অবজ্ঞেয় গ্লানি, কুৎসা ও কলঙ্কজনক অলীক অশ্লীলভাষিণী হলাহল নিস্যন্দিনী রসনা এবং লেখনীর পরিচালনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে দুঃখ সন্তপ্ত নিরীহ মুসলমানগণের কোমল প্রাণ বিদ্বেষের বিষদৃশ দীপ্ত ত্রিশূলাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া যাইতেছে।...
>
> কবি ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র, কবি হেম ও নবীনচন্দ্র হইতে আরম্ভ করিয়া তাহদের শিষ্যানুশিষ্য হারান, নারান, মধু,

যদু, চুনীরাম, পুঁটিরাম, পাঁচুরাম পর্যন্ত সকলেই মুসলমান জাতিকে পৈশাচিক গালাগালি এবং তাহাদের গৌরবান্বিত পূর্বপুরুষগণকে কুৎসিৎ চিত্রে অঙ্কিত করিতে কিছুমাত্র কসুর করিতেছেন না।[২২৭]

এ প্রসঙ্গে ইংরেজিতে প্রকাশিত 'বন্দেমাতরম' ও বাংলায় প্রকাশিত 'যুগান্তরের (১৯০৬-০৮) নাম স্মর্তব্য। তৎকালীন সময়ে উক্ত কাগজদুটি চিন্তা-চেতনায় শুধু বাংলা নয় সমগ্র ভারতের মধ্যে সর্বাধিক অগ্রগামী ছিল। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির সূত্রপাত বাংলায় যার হাত ধরে তিনি অরবিন্দ ঘোষ। এই পত্রিকা দুটোতে প্রকাশ্যে কোথাও অরবিন্দর নাম না থাকলেও এই কাগজদুটির স্রষ্টাদের মধ্যে প্রধান অরবিন্দ ঘোষ। বন্দেমাতরম পত্রিকা একসাথে সাম্রাজ্যবাদীর প্রসাদপুষ্ট Englishman, Miror, Induprakash, Bengalee, Statesman ও Times (London) পত্রিকার সাথে লড়াই চালালেও পত্রিকার দার্শনিক দৃষ্টি ছিল ভবানী মন্দির-এর শেষ ছত্র The Message of Matter-এর বার্তা— 'Aryabhumi made of her clay and reared by her sun and winds I am the Bhagaban Bharati, Mother of India...'

...you will be helping to create a nation, to consolidate an age to Aryanise a world.' [Bhabani Mandir Sri Aurobindo Early Political writings, Bande Mataram, Aurobindo Ashram Pandichari, p. 70-71]

By The Way শীর্ষক নিবন্ধে লেখা হয়— 'The case for the Mahomedans as presented by this brilliant special pleader is that they were goaded to madness. ...But at last the Hindus began to form bodies of volunteers and learn stick play and sword play. This was the last insult which drove the Mohomedans to madness. That Hindus should learn Sword play and stick play is enough, in Mr. Grith openion, to justify out rage, plunder, Murder, mutilition and violation of women. After this, he says, no wonder the Mohomedans began to ask their leaders 'What is this?'

[9th may 1907—IBID, page-331-332]

যুগান্তর (১৯০৬-০৮) তৎকালীন সময়ে একটি ব্যতিক্রমী কাগজ। পত্রিকার সম্পাদক বা কর্মাধ্যক্ষকে ইংরেজ শাসনের কোপে বার বার পরিবর্তন করতে হয়েছে। এমনকী বিজ্ঞাপন দিয়ে কর্মাধ্যক্ষ প্রকাশক-মুদ্রকের খোঁজ করতে হয়েছে। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ছাড়া ক্রমানুযায়ী যেসব পরিচালকদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, দেবব্রত বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বৈকুণ্ঠ আচার্য, ফনীন্দ্রনাথ মিত্র, বিভূতিভূষণ রায় প্রমুখ। কিন্তু ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর পরিচালনার পরবর্তীতে পত্রিকার হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতি দূরগামী হয়েছে। এই পত্রিকায় রুশ বিপ্লবের খবরই শুধু নয় বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিদ্রোহ বিপ্লব ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের খবর এই কাগজে লেখা হয়েছে। এই পত্রিকায়ই একমাত্র ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহকে প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতাযুদ্ধ বলে ব্যক্ত হয়েছে, ও সাম্প্রদায়িক গুজবের বিরুদ্ধে খাজা সালিমুল্লাহর

বিবৃতি প্রকাশিত হয়েছে। এতদসত্ত্বেও 'আজ মুসলমানের উত্থিত লাঠিতে কোন কালসর্পের ফণা লুকাইয়া রহিয়াছে দেখিয়াছ কি? এ সর্প এত শীঘ্র যে মুসলমানের লাঠির মধ্য হইতে উঁকি মারিয়াছে, এত শীঘ্র যে ধরা দিয়াছে তজ্জন্য ভগবানকে ধন্যবাদ দাও। এতদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে এই কালসর্প নিজ কলেবর ভারতবাসীর রক্তে পরিপুষ্ট করিতেছিল।' [যোগাক্ষ্যাপার চিঠি, যুগান্তর দ্বিতীয় বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১৪ এপ্রিল ১৯০৭, ১লা বৈশাখ ১৩১৪, অগ্নিযুগের অগ্নিকথা যুগান্তর, শ্রী অরবিন্দ প্রকাশন পৃ. ৪৩৮]। অথবা 'পুনার "বিহারী" প্রশ্ন করিতেছে যে দুর্গামূর্তি চূর্ণ করিল আর বঙ্গে ভীষণ রক্তগঙ্গা বহিল না কেন? মহারাষ্ট্রে বা পঞ্চনদে একান্ত ঘটিলে আজ নিঃশস্ত্র মারাঠা ও জাঠের কটিতট হইতে গুপ্ত তরবারী নিষ্কোষিত হইত।' [নবতন্ত্রের কথা, দ্বিতীয় বর্ষ ১০ম সংখ্যা ১৯ মে ১৯০৭, ৫ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩১৪, তদেব, পৃ. ৫১২]

ভবানী মন্দিরের হিন্দুত্ববাদী উত্থানের প্রকাশ এই পত্রিকায়ও পাওয়া যায়। "বেদ, উপনিষদ, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থগুলি আমাদিগকে জগতের সর্ববিধ জ্ঞানই প্রদান করিয়া থাকে। আমরা নিত্য নিত্যই উহাই অধ্যয়ন করিব। ওইসকল মহামূল্য গ্রন্থাদিই আমাদিগের নিত্য পাঠনীয় হউক।" [ধর্মপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় বর্ষ ৪৪ সংখ্যা ৪ এপ্রিল ১৯০৮, ২২শে চৈত্র, ১৩১৪, তদেব, পৃ. ৮৩১]। এসব সত্ত্বেও এই কাগজ দুটিকে শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিলে তা হবে একদেশদর্শী।

মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের পরিচালিত 'শিখা' পত্রিকা ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'স্বাধীন ভারতের দাস' নামক প্রবন্ধে লিখল— 'ভারতীয় জাতীয়তার যে আদর্শ হিন্দু গড়িয়া তুলিয়াছে তা সম্পূর্ণ হিন্দু জাতীয়তা, তাহাতে স্বতন্ত্র সত্তা বিশিষ্ট অন্য সম্প্রদায়ের স্থান নাই।'[২২৮] ১৯১৭ সালে 'আল-ইসলাম' পত্রিকা ডি.এল.রায়ের 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল : 'তা অশোক, নিমাই, রাসমণি, প্রতাপাদিত্যের কথা বলেন কিন্তু গিয়াসুদ্দিন খান, ইসা খান প্রমুখ মুসলমানদের কোনও উল্লেখ নেই। বাংলার জনসংখ্যা সাতকোটি তার অর্ধেকের বেশি মুসলমান। তবে কেন হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে নিয়ে গঠিত এই বিশাল বাঙালির জন্য রচিত একটি জাতীয় সঙ্গীত থেকে মুসলমানদের বাদ রাখা হয়েছে।'[২২৯] দেশের তিন দিকপাল ঐতিহাসিক বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লেখেন—

> 'তাদের ধ্যানে তাঁদের ধারণায়, ভারত সংস্কৃতি যে আর্য ঐতিহ্যবাদী হিন্দুধর্মেরই নামান্তর ভারতীয় জাতি বলতে বোঝায় হিন্দুদেরই-এর আভাস খুব অস্পষ্ট ছিল না। এই প্রসঙ্গে শিবাজী এবং গণপতি উৎসবে তিলকের উদ্যোগের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উল্লেখ করা যায় অরবিন্দের— যিনি জাতীয়তাবাদকে গ্রহণ করেছিলেন ধর্ম হিসেবে। যাঁর আধো-অতীন্দ্রিয়, আধো-আধ্যাত্মিক চেতনায় ভারতবর্ষ পরিগ্রহ করেছিল মাতৃকা-রূপে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলনের শুভ

উদ্বোধন হয়েছিল গঙ্গাসলিলে পুণ্যাবগহনের মধ্য দিয়ে। কালী মূর্তিকে সামনে রেখে সন্ত্রাসবাদীদের সংগ্রামে শপথ নিতে হয়। এ-ধরনের আচার অনুষ্ঠান স্পষ্টত ধর্মীয়; তাদের মধ্যে উচ্চবর্ণের হিন্দুত্বই প্রকট।... আর হিন্দু ধর্মের ভাব প্রতিমা ও আচার অনুষ্ঠানকে আশ্রয় করে কোনো আন্দোলন গড়ে উঠলে মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের অনুগামীরা যে তাকে নিজেদের, বিশ্বাস ও প্রবৃত্তির বিরোধী বলে মনে করবেন এটা খুবই স্বাভাবিক।... রাণাপ্রতাপ বা শিবাজীকে যদি 'জাতীয় বীর' বলে গণ্য করা হয়, তা হলে ধরে নেওয়া হয় যে মুঘল শাসকেরা পুরোপুরি বিদেশি, জাতীয়তাবিরোধী শক্তিই তাঁদের মধ্যে রূপ পেয়েছিল। অথচ রাণাপ্রতাপ বা শিবাজীর মতোই ভারতীয় ছিলেন আকবর এবং ওরঙ্গজেব। তাঁরা সবাই সমানভাবে শাসকশ্রেণির প্রতিনিধি, যে পারস্পরিক সংঘর্ষে তাঁরা লিপ্ত হয়েছিলেন তা তাঁদের যুগের রাজনৈতিক সংঘর্ষের পরিচায়কমাত্র।'[২৩০]

এখানে উল্লেখ করতে হবে শিক্ষিত বাঙালি বর্ণহিন্দু সম্প্রদায়ের চাকরির নিরাপত্তাহীনতা বাড়িয়ে দিয়েছিল মুসলমানদের চাকরির অধিকার, হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালি সম্প্রদায়কে আশঙ্কিত করেছিল। দ্বিতীয়ত শহরের শিক্ষিত এলিট সম্প্রদায় (যাদের হাতে বেশকিছু জমিদারি ছিল) ও গ্রামের জমিদার ও মহাজনদের প্রতি শ্রেণি ঘৃণা শুধু মুসলমনদেরই ছিল না, অন্ত্যজ হিন্দু দুলে-বাগদি-শবর-ডোম-মুচি-মেথর-চাঁড়ালদের শ্রেণি ঘৃণা জাগ্রত করেছিল। পূর্ববঙ্গের সর্ববৃহৎ বর্ণসম্প্রদায় নমঃশূদ্ররা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় কখনওই বর্ণহিন্দুদের পাশে দাঁড়াননি। এমনকী বাংলার ভূমিজরা কোল-ভীল-মুণ্ডাদেরও বর্ণহিন্দুদের বিরুদ্ধে শ্রেণি বিদ্বেষ এত তীব্র ছিল যে, তার তীব্রতা ছিল ইংরেজ শাসকদের থেকে বেশি। এর অনেক পরে স্বাধীনতা সংগ্রামী অরুণচন্দ্র গুহ এই বিদ্বেষের ফল নিয়ে অকপট স্বীকারোক্তি করেছেন 'তখন ভেবে দেখিনি, মুসলমানদের মধ্যে এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে।'[২৩১]

১৯২১-২২-এ গান্ধীজির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে সারা ভারতের সাথে বাংলাও উত্তাল হয়ে ওঠে। আন্দোলনকে ঘিরে এত ব্যাপক উচ্ছ্বাস, জন-কল্লোলের তীব্রতা ইতিপূর্বে ভারত কখনো দেখেনি। দেশ এতদিনে একজন প্রকৃত জন গণ মন অধিনায়ককে খুঁজে পেল। আন্দোলন হঠাৎ প্রত্যাহৃত হলে জনমনে ছড়িয়ে পড়ে হতাশা এর সাথে খিলাফৎ আন্দোলনের ডাক হিন্দু মুসলমানের সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়। সাইমন কমিশন এক প্রতিবেদনে লেখেন ১৯২২-২৭ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে শুধুমাত্র বৃহৎ দাঙ্গার সংখ্যা ১১২টি। মো: আবদুল মোহামেইন লেখেন, '১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের জন্ম হয়, ১৯২০ সন থেকে ১৯৪৬ সন পর্যন্ত যতগুলি হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়েছে এত সংখ্যক দাঙ্গা অখণ্ড বাংলার আর কোনও স্থানেই কখনও হয়নি।'[২৩২] কলকাতায় ১৯২৬ সালের

এপ্রিল থেকে জুলাই দাঙ্গায় শুধু সরকারি মতে ১৩৮ জন প্রাণ হারান। বেসরকারি মতে কত হতভাগ্য প্রাণ হারিয়েছেন তার লেখাজোখা নেই। এই দাঙ্গায় সংবাদপত্রের ভূমিকা ও তার অভিজ্ঞতা লেখেন মজফ্‌ফর আহমদ—

> 'দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলি প্রতিদিন সাম্প্রদায়িক বিষ ছড়াচ্ছিল। মৌলবি মনীরুজ্জমান ইসলাম আবাদী সেই কয়জন মুসলমানের একজন যাঁরা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তিনি উদার ও অসাম্প্রদায়িক লোক রূপে পরিচিত ছিলেন। এক সময় 'সোলতান' নামে তাঁর একখানা বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ ছিল এবং বহুকাল আগে তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দাঙ্গার সময় হঠাৎ একসকালে এই কাগজের ছোট্ট একটি দৈনিক সংস্করণ বার হয়ে গেল এবং বার করলেন আলি আহমেদ ওলি নামে তাঁর একজন স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। কী সাম্প্রদায়িক বিষই না ছড়িয়েছিল এই 'সোলতান'। দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকার তখন বাঁচা না বাঁচার ধুকপুক চলছিল দাঙ্গার দৌলতে কাগজখানা দাঁড়িয়ে গেল। এই দাঙ্গা ছড়ানোর অপরাধে দু'একখানা কাগজের বিরুদ্ধে মোকদ্দমাও হচ্ছিল। সোলতানের আলি আহমদ ওলিরও হিন্দি সাপ্তাহিক 'মাওয়ালা'র সম্পাদকের পনেরো দিনের না এক মাসের (ঠিক মনে নেই) সশ্রম কারাদণ্ড হল। জেলখানায় তাদের দুজনকেই যখন ঘানিতে জুড়ে দেওয়া হল তখন দুজনেই সেখানে এক হয়ে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে লাগলেন।... দাঙ্গার বিরুদ্ধে আমরা তো লিখছিলাম, তাছাড়া উর্দুতে ইশতিহার ছাপিয়ে উর্দুভাষী লোকেদের ভিতরে তা ছড়িয়েছিলেম। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির তরফ হতে ইংরেজি ইশতিহাবও আমরা বেঁটেছিলেম। এই ইশতিহাব খানা শ্রী গৌরাঙ্গ প্রেসে ছাপা হয়েছিল। তা পড়ে প্রেসের মালিক এবং আনন্দবাজার পত্রিকার অন্যতম মালিক শ্রী সুরেশচন্দ্র মজুমদার কিঞ্চিত অবজ্ঞার সুরে আমায় বলেছিলেন "আপনারা মশাই মহাপ্রাণ ব্যক্তি, আর আমরা হলাম অল্পপ্রাণ লোক!'[২৩৩]

এর মধ্যে বাংলার রাজনীতিতে ঐক্যের রূপালি রেখা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের নেতৃত্বে স্বরাজ্য দলের প্রতিষ্ঠা। যুগ যুগ বঞ্চিত মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে অর্থনৈতিক দাবি রেখে মুসলমান জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছিল। দেশবন্ধুর আকস্মিক প্রয়াণে সেই ঐক্য গড়ার সম্ভাবনা শেষ হয়ে যায়। কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা বাংলায় সেভাবে পরিলক্ষিত হয়নি। এর মধ্যেই ঘটে যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের সবচেয়ে কলঙ্কিত ইতিহাস দেশভাগ, রাজনীতি পর্যালোচনায় বোঝা যায় যা অনিবার্যই ছিল। কিন্তু বাঙালির ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কিত ইতিহাস দেশভাগ বললে ভুল মূল্যায়ন হবে, কারণ সারা দেশের সাথে বাংলারও নিয়তি ছিল তাই। বাংলার

ইতিহাসে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় রাষ্ট্রীয় মদতে ১৯৪৬-এর নোয়াখালির দাঙ্গা। ১৯৪৬-এর কলকাতার দাঙ্গা পর্যবেক্ষণ করে আবদুল মোহামেইন আমাদের একটি মূল্যবান তথ্য দেন, যার থেকে দাঙ্গার শ্রেণি দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়—

> 'কলকাতার দাঙ্গার ব্যাপারে একটা বৈশিষ্ট্য আমি বরাবরই লক্ষ করেছি সেটা হল এই দাঙ্গায় দুই সম্প্রদায়ের দরিদ্র লোকেরা সাধারণত মারা পড়ে।
>
> অবস্থাপন্নদের একে অপরের সাথে যোগাযোগ থাকে, সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করেন... সংকটের সময় একে অপরকে রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে, যতদূর সম্ভব সাহায্য করে।
>
> আর কিছু না পারুক পুলিশকে খবর দেওয়া এবং পুলিশ না আসা পর্যন্ত সম্ভব হলে নিজের বাড়িতে কোনও গুপ্ত স্থানে সাময়িকভাবে হলেও লুকিয়ে রেখে বাঁচার চেষ্টা করে।'[২৩৪]

এই সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক 'মিলানকলি' উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে মনষ্যত্বহীন বিচ্ছিন্নতাবাদীতে পরিণত করেছিল। 'পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতাবাদ যে কোনও সমাজের জন্য শেষ পর্যন্ত মঙ্গল হয় না, সমাজের সার্বিক উন্নতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

এবং এমন বিচ্ছিন্নতাবাদ বুদ্ধিজীবীদের শেষ পর্যন্ত বেশি ক্ষতিগ্রস্ত করে, তারা বিশ্বজনীন মানব জীবনের বাস্তব চরিত্রটাকে অনুধাবন করতে পারে না।'[২৩৫] হেগেল লিখেছিলেন 'ইতিহাসের একমাত্র শিক্ষা একটাই। সে শিক্ষা এই : মানুষ তার অতীত থেকে কোনও শিক্ষাই লাভ করে না'[২৩৬] আর এই শিক্ষা গ্রহণ না করাই যেন বাঙালির এক ঐতিহাসিক নিয়তি।

তথ্যসূচি

১. প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ : কার্লমার্কস, পৃ. ৪১

২. OXFORD DICTIONARY, p. 232-233 : Commune শব্দ থেকে Community শব্দের উৎপত্তি

৩. রবীন্দ্ররচনাবলী, দশমখণ্ড, প:ব: সরকার সং, পৃ ২৭৮

শ্রী আব্দুল করিম বি.এ. রচিত 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' পুস্তকের সমালোচনা দ্রষ্টব্য।

৪. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৮

৫. ড: মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ : রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণের' ভূমিকায় লেখেন—

'নিরঞ্জনের রুষ্মায়' আছে ব্রাহ্মণের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ধর্মঠাকুর বৌদ্ধ ও মুসলমানদের পক্ষ নেন। এই সাহিত্য মুসলমানদের ও বৌদ্ধদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। পৃ. ৩৫

৬. বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (মধ্যযুগ) : জগদীশনারায়ণ সরকার, পৃ. ৯

তিনি আরও বলেছেন— 'ব্রাহ্মণ্য অত্যাচারের ফলে ধর্মঠাকুর সৎধর্মীদের রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন।' (প্রাগুক্ত)

অধ্যাপক অনিলচন্দ্র সরকার মনে করেন লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে দাস হিসাবে বিক্রি করা হত। অবশ্য বিক্রি করার আগে তাদের ধর্মান্তরিত করা হত। 'War was probably the most important source of supply of slaves prisoners of war mostly Hindus. Were reduced to slavery After Qutubuddin's victory of Kalingas, says Hassan Nizami, fifty thousand men were made to near the yoke and chain of slavery. (Anil Chandra Banerjee– The State and Society in Nothern India page. 205 বাংলার ক্ষেত্রে এই মতকে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় বা সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মানেন না।

৭. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৮০

৮. মহাত্মা গান্ধী শরৎ বসুর চিঠির উত্তরে ২৪মের পত্র. চিঠির বয়ান নিম্নরূপ—

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিও ও আমরা, সরোজ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪১০

প্রিয় শরৎ

তোমার পত্র পেয়েছি, খসড়াটিতে এমন কিছু নেই যার থেকে মনে করা যেতে পারে যে নিছক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে কিছু করা যাবে না। প্রত্যেক আইনের জন্য কার্যনির্বাহীদের এবং আইনসভার হিন্দু সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন ও অনুমোদন থাকতে হবে। খসড়া চুক্তিটিতে থাকতে হবে যে, বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি আছে এবং তার মাতৃভাষা হচ্ছে বাংলা। উলটো খবর সত্ত্বেও নিশ্চিত হতে হবে যাতে করে কেন্দ্রীয় মুসলিম লিগ প্রস্তাবটি সমর্থন করে।

তোমাদের

বাপু

৯. বিশ শতকে বাঙালি : আহমদ শরিফ, পৃ. ৩০

১০. বাঙালীর ইতিহাস, আদিপর্ব (সংক্ষেপিত সংস্করণ), পৃ. ২০০

১১. আমার জীবন ও সমকাল : বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ৪২ (প:ব:রা: পুস্তক পর্ষদ)

১২. রায়তের কথা : প্রমথ চৌধুরী ১৯২০ সালে লিখিত, উদ্ধৃতি . হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃ. ১৯৪

১৩. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : অতুল সুর, পৃ. ৪৯-৫১, জিজ্ঞাসা প্রকাশ

লেখক আটটি জেলার জাতিগত বিশ্লেষণ দিয়েছেন। এখানে লেখক দেখিয়েছেন রিজলি দেখিয়েছেন রাজবংশী কোচ ও পালিয়াদের উৎপত্তি একই উৎস থেকে। পোদরা নিজেদের পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। তবে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী তারা বৈশ্য ও শূদ্রের সংমিশ্রণে সংকর জাতি। মনে হয় প্রাচীন সাহিত্যে পুণ্ড্রজাতি হতে তারা অভিন্ন। যদি তাই হয় তা হলে তারা বাঙলার প্রাচীন জাতি। কেননা পুণ্ড্রদের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে আছে। বাগদিরা নিজেদের ব্যগ্র ক্ষত্রিয় বলে দাবি করে। (তদেব, পৃ. ৩২)

১৪. তদেব : পৃ. ৫৫-৫৬

রবীন্দ্রনাথদের পূর্ব পুরুষরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার পিরালি গ্রাম থেকে এই কারণে সমাজচ্যুত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়।

১৫. তদেব, পৃ. ৫৭

জাতি	শিরাকার-সূচক	নাসিকা-সূচক
মুসলমান	৭৭.৯	৭৭.৫
নমঃশূদ্র	৭৮.১	৭৪.২
পোদ	৭৭.৮	৭৬.২

(প্রাগুক্ত)

১৬. ভাষা আন্দোলন : শ্রেণি ভিত্তি ও রাজনৈতিক প্রবণতা সমূহ : এম.এম. আকাশ পৃ. ১৫

১৭. Census Report of India 1911, Table-XIII, page 198-202

ও জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন-নির্মলকুমার বসু, বঙ্গদর্পণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১

১৮. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ, অমলেন্দু দে, পৃ. ১২১

১৯. Murder in the name of Allah-Hazarat Mirza-Tahir Ahamed Cambridege Univercity Press; p. 1-2

২০. ধর্মের উৎস সন্ধানে : ভবানীপ্রসাদ সাহু (প্রবাহ), পৃ. ১৩

২১. তদেব, পৃ. ১৬৬-১৬৭

২২. উদ্ধৃতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পঞ্চানন সাহা, পৃ. ৭

২৩. শ্রীচৈতন্য ও তাহার পার্ষদগণ— গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, কলকাতা, বিশ্ব. পৃ. ১৯৫৭

২৪. Reaserch about Muslim Aristrocracy in East Pakistan— Abdul Majid Khan উদ্ধৃতি : অমলেন্দু দে, তদেব, পৃ. ১২৩-১২৫

২৫. পরিচয় ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ : প্রমথ চৌধুরী লিখেছেন যে অনেক মুসলমান মনে করেন যে 'ভারতবর্ষের মুসলমান মাত্রই মোগল-পাঠানের বংশধর : যেমন অনেক হিন্দুর বিশ্বাস যে হিন্দুমাত্রেই মুনিঋষিদের বংশধর। এ উভয় বিশ্বাস সমান অমূলক অর্থাৎ অধিকাংশ হিন্দু ও যাদৃক আর্যবংশী, অধিকাংশ মুসলমান ও তাদৃক রাজবংশী।' হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক তদেব, পৃ. ৩১ টিকা দ্রষ্টব্য।

২৬. 'ভারতে মুসলমান' যদুনাথ সরকার : প্রবাসী আশ্বিন ১৩৩৭

২৭. কালান্তর প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫৩৮

২৮. মধ্যযুগে বাঙলা ও বাঙালি-অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ২৪০

২৯. প্রাগুক্ত : বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছেন : তাদের গ্রামে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বাস ছিল, হিন্দু-মুসলমনের মধ্যে মেলামেশা যথেষ্ট প্রীতিপূর্ণ ছিল। পিতার বাড়িতে কেবল পূজার সময় ছাড়া বাকি সব সময়েই আমাদের প্রতিবেশী মুসলমান জমিদারকে নিমন্ত্রণ করা হত। তাছাড়া ঈদ প্রভৃতি মুসলমান পরবে, বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠানে আমাদের দুই পরিবারে উপহার বিনিময়ের রেওয়াজ ছিল (আমার জীবন ও সমকাল, পৃ. ৬৩)

৩০. রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, প:বঙ্গ সরকার সংস্করণ, পৃ. ৬৭২

শ্রীযুক্ত কালিদাস নাগকে লেখা হিন্দু-মুসলমান শীর্ষক পত্র। শান্তিনিকেতন থেকে ৭ আষাঢ় ১৩২৯-এর পত্র। এই পত্রের শেষে গুরুদেব বলেছেন 'শিক্ষার দ্বারা, সাধনার দ্বারা সেই মূলের পরিবর্তন ঘটাতে হবে— ডানার চেয়ে খাঁচা বড়ো এই সংস্কারটাকেই বদলে ফেলতে হবে— তার পরে আমাদের কল্যাণ হতে পারবে। হিন্দু-মুসলমানের মিলন যুগ পরিবর্তনের অপেক্ষায় আছে। কিন্তু একথা শুনে ভয় পাবার কারণ নেই; কারণ অন্য দেশে মানুষ সাধনার দ্বারা যুগপরিবর্তন ঘটিয়েছে। গুটির যুগ থেকে ডানা মেলার যুগে বেরিয়ে এসেছে। আমরাও মানসিক অবরোধ কেটে বেরিয়ে আসব, যদি না আসি তবে নানাঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায়।' (তদেব, পৃ. ৬২১)

৩১. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা, ডা: পঞ্চানন সাহা, পৃ. ১১৮

৩২. উদ্ধৃতি : তদেব, পৃ. ১১৭

৩৩. মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা : মইনুল হাসান, পৃ. ১৫

৩৪. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১৪

৩৫. মানুষ রতন ধন এবং লোকধর্ম : করুণাসিন্ধু দাস (লোক সংস্কৃতি গবেষণা, পৃ. ৫৬৫ সাম্প্রদায়িকতা ও লোকসংস্কৃতি বিশেষ সংখ্যা)

৩৬. পূর্ব ও পশ্চিম; সমাজ : রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড, প-বঙ্গ সরকার সং, পৃ. ৪২৫ এখানে উল্লেখ করা দরকার ঔরঙ্গজেবের সময়ে সতীদাহ নিষিদ্ধ ছিল।

৩৭. বিশ শতকের বাঙালি : আহমেদ শরিফ, পৃ. ১৬

লেখকের মতে 'ইংরেজী ভাষার জ্ঞান রামমোহনের পরেই হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এবং বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন সিংহ, অজয়কুমার দত্ত, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রমুখকে করে তুলল সমকালীন, মনে-মগজে-মননে-রুচিতে-সংস্কৃতিতে বিলেতি মানুষ।' (প্রাগুক্ত)

৩৮. আহমেদ শরিফ লিখেছেন : 'আত্মপরিচিতিতে বিকৃতি ও বিভ্রান্তি বাঙালি মুসলিমদের ১৯৩০ সন অবধি সুস্থ হতে দেয়নি' একথা আগেও উল্লেখ করেছি। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কারণ মাতৃভাষা বাঙলা না উর্দু কি হবে ঠিক করতে না পেরে। (পৃ. ১২, বিশ শতকের বাঙালি)

৩৯. বেগম রোকেয়া : উদ্ধৃতি : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পৃ. ৯০

৪০. কাজী নজরুল ইসলাম উদ্ধৃতি : আমারে দেব না ভুলিতে মহাজারুল ইসলাম, পৃ. ২২৪, নবজাতক

৪১. মানুষ যেন আর ভাগ না হয়— আবুল বাসার : ভেঙোনাকো শুধু ভাঙা নয় পুস্তিকায় মুদ্রিত, জাতীয় সংহতি সংসদ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৩

৪২. ধর্ম, দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ : হোসেনুর রহমান (মিত্র ঘোষ), পৃ. ৩৪

৪৩. মুসলিম সমাজ ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা : মইনুল হাসান, পৃ. ১৯

৪৪. সাজনের গানে তিতুমীরের লড়াই— গিরিন্দ্রনাথ দাস সম্পাদিত, পৃ. ২৬

৪৫. তদেব, পৃ. ২৭

৪৬. মইনুল হাসান, তদেব, পৃ. ২০

তিনি এ প্রসঙ্গে আরও লেখেন 'যাত্রাগানের আসর নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আসলে দৈনন্দিন জীবনের ফাঁকফোকরগুলো মানুষের ভরে থাকে এই সাংস্কৃতিক চর্চার মধ্যে দিয়েই। মুসলমান সমাজ সেখান থেকে কার্যত বাতিল হয়ে গেল।

নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কেও মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে ফারাক হয়ে গেলেন। ধুতি পরা মুসলমান ছেড়েই দিলেন। আসলে বাঙালি মুসলমান নিজেদের দৈনন্দিন সামাজিক সাংস্কৃতিক জীবনকে কার্যত পাল্টে দিল। এক আশ্চর্য মিথ্যা স্বতন্ত্রবোধ এর পিছনে কাজ করছে। একটি বহিরাগত সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হবার চেষ্টা মুসলমান সমাজের ক্ষতি করেছে প্রভূত। (প্রাগুক্ত)

৪৭. তদেব, পৃ. ১৭-১৮

৪৮. ১৯৩৫ সালে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ নিয়ে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তিনি এই মন্তব্য করেন। উদ্ধৃতি, হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক, পৃ. ১১৭

৪৯. বাংলার পুনর্জন্ম : বরুণ দে, বাংলার রেনেসাঁস (অনীক) পৃ. ৪৪৯-৫০

৫০. তদেব, পৃ. ৪৭

৫১. বাংলার নবজাগৃতি : একটি অতিকথা, বিনয় ঘোষ, বাংলার রেনেসাঁস, পৃ. ২৮

এই গ্রন্থটি ১৯৭৯-তে প্রকাশিত হয়। এর তিরিশ বছর পূর্বে (তখন লেখকের বয়সও তিরিশ বছর) বাংলার নবজাগৃতি নামক লেখাটি লেখেন 'প্রথম খণ্ড' 'পশ্চাদভূমি' হিসাবে ১৩৫৫ সালে। তারপর ১৩৮৫ সন আরও তিরিশ বছর কাটল, ইতিহাস চর্চার আদিগঙ্গা দিয়ে অনেক ঘোলা জল বয়ে গেল দেখলাম। অনেক প্রশ্ন জাগল মনে অনেক প্রশ্ন।' (তদেব, পৃ. ২৮)

৫২. তদেব, পৃ. ৩৬

৫৩. উদ্ধৃতি : বাংলার রেনেসাঁস : চরিত্র বৈশিষ্ট্য— অরবিন্দ পোদ্দার : বাংলার রেনেসাঁস, পৃ. ৬১

৫৪. উদ্ধৃতি : History of Indian Social and Political Ideas— B. B Majumdar. p. 53

৫৫. আনন্দমঠ : প্রথমবারের বিজ্ঞাপন বসুমতি সাহিত্যমন্দির

৫৬. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও উনবিংশ শতকের বাঙালী সমাজ— বদরুদ্দিন ওমর

উদ্ধৃতি : নবজাগরণ-এর নব মূল্যায়ন : সুচরিতা সেন, বাংলার রেনেসাঁস, পৃ. ৮৬-৮৭

৫৭. রবীন্দ্রজীবনী. ১ম খণ্ড— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৪৫৬

৫৮. Notes on the Bengal Renaissance-এর সংযোজনী টীকা : সুশোভন সরকার প্রথম প্রকাশ-১৯৭৯ বাংলার রেনেসাঁস : পৃ. ১২

লেখক এখানে আধা ঔপনিবেশিক দাসত্ব কথাটি ব্যবহার করে মার্কসবাদের বিচারে আরও একবার ভুল করে গিয়েছেন। যে সময়ের কথা তিনি মূল্যায়ন করছেন সেটা অষ্টাদশ শতাব্দী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ পাকাপাকি ভারতবর্ষকে একটি স্থায়ী ঔপনিবেশে পরিণত করেছে অনেক আগে। হতে পারে এটি লেখকের অনবধানগত ত্রুটি, যদিও কাম্য নয়।

৫৯. বাংলার নবজাগরণ : সমীক্ষা ও সমালোচনা— বিনয় ঘোষ : বাংলার রেনেসাঁস; পৃ. ২৫

৬০. লোকহিত, কালান্তর : রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড (প:ব: সংখ্যা) পৃ. ৫৯৯

৬১. ধর্মদ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ— হোসেনুর রহমান, পৃ. ২২-২৩

৬২. তদেব, পৃ. ৩১

৬৩. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১৭

৬৪. তদেব, পৃ. ১৭-১৮

৬৫. বেগম রোকেয়া উদ্ধৃতি : ধর্ম দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ, পৃ. ৩৬

৬৬. তদেব, পৃ. ৭৫

৬৭. হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা : পঞ্চানন সাহা (বিশ্ববীক্ষা), পৃ. ৮৫

ড: নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ লিখেছেন : 'The economic weakerness of the Muslim middle class in the nineteenth century very much influenced the history of India from

the begining of the twentieth century . in the services, in the professions and even in inland trade the Hindus were now wellestablished Communalism, when it came, become so effective of the difference in the economic level between the two Communities' (Economic Background) of the century in studies in the Bengal Renaissan– N K Sinha (Jadavpur) p 7

৬৮. তদেব পৃ. ৮৪

৬৯. Swadeshi Movement in Bengal— Sumit Sarkar, p. 410

৭০. তদেব, পৃ. ১২৬

৭১. দীননাথ সেনের জীবনী ও আদিনাথ সেন (ধর অ্যান্ড সন্স), পৃ. ৭২

তৎকালীন পূর্ববঙ্গ, ২য় খণ্ড

৭২. মুক্তির সন্ধানে ভারত : কংগ্রেস পূর্ব যুগ— যোগেশচন্দ্র বাগল, পৃ. ২১৯

W.W. Hunter ১৮৭৩ সালে বাংলার মুসলমান সমাজের উপর পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা করে গ্রন্থটি রচনা করেন গ্রন্থটির নাম Muslims in Bengal।

মুক্ত চিন্তনের অধিকারী আহমেদ শরিফ উক্ত গ্রন্থটিকে 'সত্য-মিথ্যা তত্ত্বে-তথ্যে মুসলিম তোষণমূলক এবং হিন্দু দ্বেষণাজনক গ্রন্থ রচনা করিয়ে ভেদনীতি প্রয়োগে হিন্দু মুসলিম সম্পর্ক তিক্ত করতে থাকে।' (বিশ শতকের বাঙালি, পৃ. ১১-১২)

৭৩. জেমস লঙ : উদ্ধৃতি : হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক, পৃ. ৯৬

১৮৬৯ সালে ২১ জানুয়ারির সভায় জেমস লঙ এই মন্তব্য করেন। এছাড়া ১৮৬৭ সালে তিনি তিন সপ্তাহ মুর্শিদাবাদের নবাবদের প্রাসাদে থাকেন। এই সময় তিনি মুসলমান সমাজের দুর্দশা নিয়ে আলোচনা করেন (মুসলিম সমাজ কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা মৈনুল হাসান, পৃ. ১২)

৭৪. মৈনুল হাসান, তদেব, পৃ. ৪১

৭৫. সাওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস— ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে (পার্ল পাব), পৃ. ৩৭-৩৮

৭৬. সান্তারা ইনসারেকসারেশন— কালিকিঙ্কর দত্ত, পৃ. ৪-৫

৭৭. উদ্ধৃতি : সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস, পৃ. ৫, সানতাল রিবেলিয়ন, পি.সি. যোশী

৭৮. তদেব, পৃ. ৫ : হরকোরেন মারে হাপড়ামকো রেয়াক্ কাথা (মূলগ্রন্থ) পৃ. ২৪৩

৭৯. প্রাগুক্ত

৮০. এনালাস অফরুরাল বেঙ্গল ডব্লু ডব্লু হান্টার, পৃ. ২৫০

৮১. মৈনুল হাসান, তদেব, পৃ. ২২

৮২. বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ অমলেন্দু দে, পৃ. ১২১

৮৩. প্রাগুক্ত

৮৪. গ্রামবাংলার ইতিকথা ডবলিউ ডবলিউ হান্টার ভাষান্তর অসীম চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ৬৫

৮৫. তদেব, পৃ. ৬৫

৮৬. তদেব, পৃ. ৬৬

৮৭. তদেব, পৃ. ৬৬

৮৮. বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড, সাহিত্য সংসদ

৮৯. প্রগুক্ত

৯০. আমার জীবন ও সমকাল-- বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ৪৪

৯১. বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. বঙ্কিমচন্দ্র কায়স্থদের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন— কন্যাকুব্জ থেকে আগত পাঁচজন ব্রাহ্মণের সাথে যে পাঁচজন ভৃত্য এসেছিল তারাই কায়স্থ। এর প্রকৃতপক্ষে কোনও ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণমাত্রায় প্রভাবিত হয়েছেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকদের দ্বারা

৯২. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় : অতুল সুর, পৃ. ৪৭

৯৩. তদেব, পৃ. ৩৮

৯৪. তদেব পৃ. ৩৮ : এটা নীচের তালিকা থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে—

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণ সূত্র
১. অম্বষ্ঠ	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫, ৭, ১, ১২
	২. ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪
২. আগুরি	করণ	রাজপুত্র	৮
৩. উগ্র	১. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	১, ৫, ১২, ৬
	২. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৯
	৩. বৈশ্য	শূদ্র	৪
৪. কর্মকার	১. বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
	২. শূদ্র	বৈশ্য	২
	৩. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	৪. ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৬
৫. করণ	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৬
৬. চর্মকার	১. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	৯
	২. বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৯
	৩. বৈদেহক	নিষাদ	৬
	৪. অয়োগব	ব্রাহ্মণ	৮

	৫. তিবর	চণ্ডাল	৩
	৬. তক্ষণ	বৈশ্য	২
৭. তিলি	গোপ	বৈশ্য	২
৮. তেলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
৯. তামলি	বৈশ্য	ব্রাহ্মণ	২
১০. কংস বণিক	ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	২
১১. চণ্ডাল	শূদ্র	ব্রাহ্মণ	৬
১২. নাপিত	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
	২. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৯
	৩. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
	৪. ক্ষত্রিয়	নিষাদ	৮
১৩. বাগ্‌দি	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৩
১৪. হাড়ি	লেট	চণ্ডাল	৩
১৫. সুবর্ণ বণিক	১. অম্বষ্ঠ	বৈশ্য	৩
	২. বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
১৬. গন্ধবণিক	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৯
	২. অম্বষ্ঠ	রাজপুত্র	৭
১৭. কায়স্থ	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
১৮. কৈবর্ত	১. নিষাদ	আয়োগব	৫
	২. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	৩. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	৭
	৪. নিষাদ	মগধ	৬
১৯. গোপ	১. বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	২
	২. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৭
২০. ডোম	লেট	চণ্ডাল	৩
২১. তন্তুবায়	১. শূদ্র	ক্ষত্রিয়	২
	২. বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
২২. ধীবর	১. গোপ	শূদ্র	২
	২. বৈশ্য	ক্ষত্রিয়	৪

জাতি	পিতা	মাতা	প্রমাণ সূত্র
২৩. নিষাদ	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	কৌটিল্য
	২. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৬
	৩. ক্ষত্রিয়	শূদ্র	৩
২৪. পোদ	বৈশ্য	শূদ্র	৩
২৫. মালাকার	১. বিশ্বকর্মা	ঘৃতাচি	৩
	২. ক্ষত্রিয়	ব্রাহ্মণ	২
২৬. মাহিষ্য	ক্ষত্রিয়	বৈশ্য	৪, ১২
২৭. মোদক	ক্ষত্রিয়	শূদ্র	২
২৮. রজক	১. বৈদেহক	ব্রাহ্মণ	৮
	২. ধীবর	তিবর	৩
	৩. করণ	বৈশ্য	২
২৯. বারুজীবী	১. ব্রাহ্মণ	শূদ্র	২
	২. গোপ	তন্তুবায়	১৩
৩০. বৈদ্য	১. ব্রাহ্মণ	বৈশ্য	৫
	২. শূদ্র	বৈশ্য	৬
৩১. শুঁড়ি	১. বৈশ্য	তিবর	৩
	২. গোপ	শূদ্র	২

প্রমাণ সূত্র : ১. বৌধায়ন ধর্মসূত্র, ২. বৃহদ্ধর্মপুরাণ ৩. ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ
৪. গৌতম ধর্মসূত্র ৫. মনুসংহিতা ৬. মহাভারত
৭. পরাশর ৮. সূত্র সংহতা ৯. উশানস সংহিতা
১০. বিষ্ণু ধর্মসূত্র ১১.বশিষ্ঠ ধর্মসূত্র ১২. যাজ্ঞবল্ক্য ১৩. জাতিমালা

বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অতুলসুর, পৃ. ৩৮-৪০

৯৫. সাকার ও নিরাকার— রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, (প:ব: সরকার) পৃ. ২৮৩

সাকার নিরাকার তত্ত্ব। শ্রী যতীন্দ্রমোহন সিংহ, বি.এ. প্রণীত লেখার প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি লেখেন। উক্ত লেখকের উক্তি 'সকল শাস্ত্রের মূলে এক শ্রুতি— এক শ্রুতির দ্বারা সকল শাস্ত্রের বিরোধ ভঞ্জন করিবার বিধি রহিয়াছে।' এর উত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে বর্ণিত মন্তব্য করেন।

৯৬. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ৭৬৭

৯৭. সাকার ও নিরাকার, তদেব, পৃ. ২৮৪

৯৮. বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, প্রাগুক্ত

৯৯. গ্রাম বাংলার উপকথা, ডব্লুউ ডব্লুই হান্টার তদেব, পৃ. ৭৯

১০০. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, (প: ব: বাংলা আকাডেমি) পৃ. ৩২

১০১. বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, ড: নীহাররঞ্জন রায় সংক্ষেপিত সংস্করণ, পৃ. ২০০

১০২. বাঙালীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, অতুল সুর, পৃ. ৩৫ : লেখক আরও বলেছেন মনে হয় এই উক্তির পিছনে আছে দীর্ঘতর কোনো জাতির সহিত রক্ত সংমিশ্রণের কাহিনি (প্রাগুক্ত)

১০৩. সংকটের মুখে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতা, অমর্ত্য সেন, পৃ. ১২

'রামায়ণ প্রশ্নে লেখক আরও বলেছেন— 'মহাকাব্য হিসাবে রামায়ণ অবশ্যই ভারতের সর্বত্র জনপ্রিয়— সেই জনপ্রিয়তা ভারতের বাইরেও প্রসারিত, যেমন, থাইল্যান্ডে ও ইন্দোনেশিয়ায় (এমনকী থাইল্যান্ডের ঐতিহাসিক রাজধানী আয়থায়ার সাথে অযোধ্যার নামের সাদৃশ্য রয়েছে)। তথাপি, অসাধারণ মহাকাব্য রামায়ণের সাহিত্যিক প্রভাবের প্রসঙ্গ থেকে যে বিষয়টিকে পৃথকভাবে দেখতে হবে তা হল রামকে দেবতা বানানোর প্রয়াস। বস্তুতপক্ষে ওই প্রাচীন মহাকাব্যেও রামকে দেবতার পরিবর্তে একজন স্বার্থত্যাগী মহৎ নৃপতি হিসেবেই গণ্য করা হয়েছিল।' (প্রাগুক্ত)

১০৪. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, পৃ. ১১

১০৫. Social Changes in Early Mediaeval India (PPH), p. 27

১০৬. মানুষ রতন ধন এবং লোকধর্ম- - করুণা সিন্ধু দাস, লোকসংস্কৃতি গবেষণা সাম্প্রদায়িকতা ও লোকসংস্কৃতি, পৃ. ১৪০৭

১০৭. বাংলার বাউল ও বাউলগান— উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৬৩-২৬৪

১০৮. ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম— সুপ্রকাশ রায়

১০৯. বিশ শতকের বাঙালি— আহমেদ শরিফ, পৃ. ২১

১১০. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা— পঞ্চানন সাহা, পৃ. ৬০-৬১

১১১. ভাষা আন্দোলন : শ্রেণিভিত্তিক রাজনৈতিক প্রবণতা সমূহ— এম. এম. আকাশ পৃ. ৫

১১২. বঙ্গে সুফি প্রভাব : ড: এনামুল হক (ঢাকা), পৃ. ৯১

১১৩. ভারতীয় উপ-মহাদেশে ধর্ম : আসহাবুর রহমান, পরিচয়, নভেম্বর ১৯৮৪

১১৪. প্রাগুক্ত

১১৫. ভারতের রেনেসাঁস— রমেশচন্দ্র মজুমদার, উদ্ধৃতি : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক নতুন ভাবনা, পৃ. ২৩৩

১১৬. বাংলা ও বাঙালি সাহিত্য : আহমেদ শরিফ, পৃ. ১৩৯

১১৭. Autobiography of An Unknown Indian · Nirod C. Chaudhary, p. 233

১১৮. মুসলিম সমাজ— মইনুল হাসান, পৃ. ২৫

১১৯. বিশ শতকের বাঙালি— আহমেদ শরিফ (নবজাতক প্রকাশন) পৃ. ১২

১২০. Swadeshi Movement in Bengal, Sumit Sarkar, p. 40

তারিখ-ই বাঙলার লেখক সলিমুল্লাহ লিখেছেন কেমব্রিজ ইতিহাসের তথ্য 'Murshid Quli Khan is said to have emplayed none but Bengali Hindus in the collection of the revenues, because they are most easily compelled by punishement to discover their malpracties.'

(The New Cambridge History of India—11-2, P.J. Marshall Page-501

১২১. মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : আহমেদ শরিফ, পৃ. ২০২

১২২. বিশ শতকে বাঙালি, তদেব, পৃ. ১১

১২৩. বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ অমলেন্দু দে : উদ্ধৃতি হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক, পৃ. ৮৭

১২৪. সম্মোহিত মুসলমান, কাজী আবদুল ওদুদ : কাজী আবদুল ওদুদ, আবদুল কাদিরকে লেখা এক চিঠিতে লেখেন 'হিন্দুরা আলোর পথে জীবনের পথে পা বাড়াতে চেয়েছে, কিন্তু "মুসলমান"? যারা সামান্য লাভের আশায় ক্ষমতার কাছে চির অবনত শির অথবা গোঁয়ার তারাই তার প্রিয় শ্রদ্ধেয় নেতা, যারা জলজ্যান্তভাবে কাণ্ডজ্ঞান হীন, নীতিহীন এমনকী শাস্ত্রজ্ঞান হীন, সেই বুভুক্ষের আজও তার ধর্ম জীবনের নেতা। আর তার সাহিত্যের আসরে রুচিহীন অর্ধ শিক্ষিতের দলের আজও প্রবল প্রতাপ।' (উদ্ধৃতি : কাজী আবদুল ওদুদ : জীবন ও সাহিত্যকর্ম— শহিদুল ইসলাম; চতুরঙ্গ, মার্চ ১৯৯৩)

১২৫. মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য : আনিসুজ্জামান (ঢাকা ১৯৬৪) পৃ. ৮৭

১২৬. সাম্য : বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড; প্রথম অংশ, সাক্ষরতা প্রকাশন, পৃ. ৫০০-৫০১

১২৭. কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রনাথকে আবদুল্লাহর সমালোচনা লিখতে দিলে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৩ লেখা পত্রে এই মন্তব্য করেন।

১২৮. বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও মুসলিম সমাজ— অমলেন্দু দে, পৃ. ৪০

১২৯. যৌবনের ডাক · কাজী নজরুল ইসলাম; সওগাত, বার্ষিক সংখ্যা ১৩২৯

১৩০. বাংলার মুসলমানের কথা— কাজী আবদুল ওদুদ, পৃ. ২২

১৩১. বাংলার বিদ্বৎসমাজ— বিনয় ঘোষ, পৃ. ২৪

১৩২. মুসলিম সমাজ ও কয়েকটি প্রাসঙ্গিক আলোচনা-- মৈনুল হাসান, পৃ. ২৪

১৩৩. তদেব, পৃ. ২৬

১৩৪. মধ্যযুগে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ— রমেশচন্দ্র দত্ত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) পৃ. ৫০-৫১

১৩৫. তদেব, পৃ. ৫৩

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজিতে লিখিত বাংলার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগে (History of Bengal, Vol-II) সুলতান হোসেন শাহের বংশ সম্বন্ধে অধ্যাপক হবিবুল্লাহ যে উক্তি করিয়াছেন তাহার প্রথম অংশেব সারমর্ম এই যে উক্ত বংশের উদার শাসন নীতির আশ্রয়েই বাঙালীর যে সাহিত্যিক প্রতিভা এতদিন রুদ্ধগতি হইয়াছিল তাহা অবরোধ মুক্ত হইয়া বেগবতী নদীর মতো প্রবাহিত হইয়াছিল এবং চরম উন্নতি হইয়াছিল।' (প্রাগুক্ত) এই মত খণ্ডন করে তিনি লেখেন 'হোসেন শাহের রাজত্বকাল ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ। ইহার পূর্বেই চণ্ডীদাসের পদাবলী, কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ এবং মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। (প্রাগুক্ত)

১৩৬. পূর্বকাল ও পূর্বভাবনা— রোমিলা থাপার, পৃ. ২১

১৩৭. আনন্দমঠ, চতুর্থ খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ : বঙ্কিমরচনা সংগ্রহ; উপন্যাস খণ্ড, সাক্ষরতা প্রকাশনা, পৃ. ৭২

আনন্দমঠের অষ্টম পরিচ্ছেদের অংশ মহাপুরুষ বলিলেন, ইংরেজ এক্ষণে বণিক— অর্থ সংগ্রহেই মন রাজ্য শাসনের ভার লইতে চাহে না, এই সন্তান বিদ্রোহের কারণে তাহার রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে, কেননা রাজ্য শাসন ব্যতীত অর্থ সংগ্রহ হইবে না, ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তান বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।' (তদেব, খণ্ড, পৃ. ৭৩৫)

১৩৮. আনন্দমঠ প্রথমবারের বিজ্ঞাপন : বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৩৯. জীবনস্মৃতি— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী ত্রয়োদশ খণ্ড (প:ব:স:সং) পৃ. ৪৯

১৪০. উদ্ধৃতি : স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য— সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায়, পৃ. ১৭১-৭২

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর : ভারতের রাষ্ট্রীয় মহাসভা শীর্ষক প্রবন্ধে আষাঢ় এবং শ্রাবণ ১৩১৫ বঙ্গাব্দতে প্রকাশিত।

১৪১. হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক ও নতুন ভাবনা— পঞ্চানন সাহা, পৃ. ১৫১

১৪২. Modern Review : January 1910

১৪৩. কাদম্বিনী দত্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র

১৪৪. সাধারণী ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৭৪-এ উদ্ধৃত

১৪৫. ধর্মদ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ— হোসেনুর রহমান, পৃ. ২৯

১৪৬. বঙ্গবিভাগ, রাজাপ্রজা সমূহ রবীন্দ্ররচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৩৫২ (প:ব:স:/সং)

১৪৭. বারমাস পত্রিকায় সত্যজিৎ রায়ের সাক্ষাৎকার

১৪৮. তত্ত্ববোধিনী আশ্বিন ১৩১০ বঙ্গাব্দ

১৪৯. উদ্ধৃতি মধ্যযুগে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি (শ্রী অশোকবিকাশ ভট্টাচার্য স্মৃতি বক্তৃতা) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, পৃ. ৪১

১৫০. প্রাগুক্ত

১৫১. প্রাগুক্ত

১৫২. ভারত কলঙ্ক : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৭৯

১৫৩. ভারতবর্ষে মুসলমান : প্রথম অধ্যায়, জাতীয় ভাব— ভূদেব মুখোপাধ্যায়, উদ্ধৃতি হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক, তদেব, পৃ. ১৩১

১৫৪. উদ্ধৃতি হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক, তদেব, পৃ. ১০৬-১০৭

১৫৫. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা— হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, পৃ. ১৫৫

১৫৬. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম— ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৬-১৭

১৫৭. Europe reconsider— T. P. Ray Choudhary, p. 13

১৫৮. ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা . রবীন্দ্ররচনাবলী দশম খণ্ড, প:ব:স: পৃ. ৭৮৯

মক্তব মাদ্রাসায় বাংলা নামে প্রকাশিত, প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪১, এম.এ. আলতাফ চৌধুরীকে লিখিতপত্র আবুল ফজলকে লিখিত ৬-৯-৪০-এ লিখিতপত্র।

১৫৯. তদেব, পৃ. ৭৯০ ১৭ বৈশাখ ১৩৪১ এ আলতাফ চৌধুরীকে লিখিত পত্র।

১৬০. তদেব, পৃ. ৭৯১ আবুল ফজলকে লিখিত ৬.৯.৪০ এ লিখিত পত্র।

১৬১. The Bengalee, 5th May 1907 ed. উদ্ধৃতি : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, পঞ্চানন সাহা, পৃ. ১৫৭

১৬২. ভাষা আন্দোলন : সাহিত্যিক পটভূমি— হুমায়ুন আজাদ (ঢাকা ইউনিভার্সিটি প্রেস) পৃ. ১৫-১৬

১৬৩. তদেব, পৃ. ৩

১৬৪. তদেব, পৃ. ১০

১৬৫. গোরার প্রকাশ প্রবাসী পত্রিকায়— ১৩১৪ সালের ভাদ্র হইতে ধারাবাহিকভাবে মুদ্রিত হইয়া ১৩১৬ সালের ফাল্গুনে (উক্ত ফাল্গুন-সংখ্যায় দুই দফায় মুদ্রিত) এই উপন্যাস সমাপ্ত হয় এবং ১৩১৬ সালেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। প্রবাসীতে পাঠের বহুলাংশ প্রথম সংস্করণে পরিত্যক্ত হয়। পুনরায় ১৩৩৪ সালে প্রকাশিত বিশ্বভারতী সংস্করণে প্রবাসী হইতে অনেক অংশ গৃহীত হয়। বর্তমান সংস্করণে প্রবাসী হইতে আরো কিছু অংশগ্রহণ করা হইয়াছে। (গ্রন্থ পরিচয়, রবীন্দ্ররচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, (বিশ্বভারতী), পৃ. ৮১৪)

দত্তার প্রকাশ ভারতবর্ষ পত্রিকায়। বইটি ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র সংখ্যায় ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যা ভারতবর্ষে পত্রিকায় প্রথম ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ওই বছরই ভাদ্র মাসে (২ সেপ্টেম্বর ১৯১৮) গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় অ্যান্ড সন্স থেকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।' (গ্রন্থ পরিচিতি, শরৎ রচনাবলী জন্ম শতবার্ষিকী সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৬০৫)

১৬৬. বর্ষবাণী : ৩য় বর্ষ ১৩৪২ শরৎ রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সম্মেলন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫১৭ ১৮

১৬৭. তদেব, পৃ. ৫২০

১৬৮. ধর্মদ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ— হোসেনুর রহমান, পৃ. ২২

১৬৯. তদেব : পৃ. ২৩

১৭০. বিশ শতকে বাঙালি— আহমেদ শরিফ, প. ১২

১৭১. বাঙ্গালীর সংস্কৃতি — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১১
'ইসলাম বাঙ্গালায় আসিয়াছিল, তাহা নিজেকে বাঙ্গালীর পক্ষে সহজগ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই "মজম উল-বহরৈন" অর্থাৎ 'দুইটি সাগরের সম্মিলন' হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। (প্রাগুক্ত)

১৭১. ধর্ম দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ— হোসেনুর রহমান, পৃ. ৩৭-৩৮

১৭৩. তদেব, পৃ. ৩৮

১৭৪. কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা— মুজফ্ফর আহ্মেদ, পৃ. ১

১৭৫. বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে— আহমেদ শরিফ বঙ্গদর্পণ

১৭৬. প্রাগুক্ত

১৭৭. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন— নির্মলকুমার বসু; পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৯৬

১৭৮. তদেব, পৃ. ৩৯৮

১৭৯. তদেব, পৃ. ৩৯৮-৩৯৯

১৮০. প্রাগুক্ত

১৮১ মুসলমানের জাতিভেদ— মোহম্মদ ইয়াকুব, পৃ. ১
উদ্ধৃতি : বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন— নির্মলকুমার বসু, বঙ্গদর্পণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪০১

১৮২. তদেব, পৃ. ১৬, উদ্ধৃতি : তদেব, পৃ. ৪০২

১৮৩. তদেব, পৃ. ৩৪, উদ্ধৃতি : প্রাগুক্ত

১৮৪. তদেব, পৃ. ৩৯, উদ্ধৃতি তদেব, পৃ. ৪০৩

১৮৫. বিভিন্ন জাতির মধ্যে সামাজিক আন্দোলন : তদেব, পৃ. ৪০০-৪০১

১৮৬. বাঙালি মুসলমান ও মুসলিম কালচার— গোপাল হালদার, বঙ্গদর্পণ, ১ম খণ্ড পৃ. ৩৬২
১৯৪৬ সালের ২রা মার্চ প্রেসিডেন্সি কলেজের মুসলমান ছাত্রনিবাস জিন্নাহ হলে তাদের এ সম্মেলনে উক্ত শীর্ষক বক্তৃতা করেন।

১৮৭. সাপ্তাহিক সওগাত, ১৭ই আগস্ট ১৯২৮, চানাচুর শীর্ষক লেখা : কাজী নজরুল ইসলাম, পৃ. ১৬

দৈনিক ছোলতান পত্রিকায় মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী বাংলা 'স'র বদলে 'ছ' লেখার জন্য মুসলমান সমাজকে আহ্বান জানার উত্তরে নজরুল লেখেন 'এত দ্বারায় ছর্ব সাধারণ ভাই ছাহেবগণকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানানো যাইতেছে যে, একটি রোজানা কাগজ বাঙ্গাল জবানে না চাইলে মোছলমানের কাজ চলে না, আমাদেরই বা পেট চলে কি বিধায় আমরা সহসা একটি দৈনিক আখবার ছাপিতে লাগিয়া যাইতেছি। একবার দেলের মধ্যে খেয়াল হইল আখবারের নামখানা কি করা যায়? ছোলতান নামখানা খুব ভাল আছিল। অথচ ওই নামে একটি কাগজ চালু থাকা বিধায় নামখানা নেওয়া গিয়াছিল না। আছছা তাতেই খেতি কি!!! দুইখানা শখছের নাম (বা এছম) যখন আখচার এইরকম হইয়াছে তখন আমরা ছোলতান নামখানা লইলে হরজ কিছুই হইতে পারিত না।... (প্রাগুক্ত)

১৮৮. বাংলা ভাষা— পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য

১৮৯. মধ্যযুগে বাঙ্গালি— সুকুমার সেন, পৃ. ৬

১৮০. বাঙালি মুসলমান ও মুসলিম কালচার, তদেব, পৃ. ৩৫৬

১৯১. প্রাগুক্ত

১৯২. প্রাগুক্ত

১৯৩. তদেব, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬

১৯৪. তদেব, পৃ. ৩৬৮

১৯৫. ভেদ-বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা : অতীত ও বর্তমান-সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, তদেব, পৃ. ৩৪৪

১৯৬. ভূদেব মুখোপাধ্যায় রচনা সম্ভার (সম্পাদনা-প্রমথনাথ বিশী) পৃ. ১৩

১৯৭. ভেদ-বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা : অতীত ও বর্তমান, তদেব, পৃ. ৩৪৯-৩৫০

১৯৮. হিন্দু-মুসলমান, কালান্তর : রবীন্দ্ররচনাবলী দ্বাদশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৬৭০

১৯৯. বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে— আহমেদ শরিফ; বঙ্গদর্পণ, ১ম খণ্ড, পৃ. ২১৭

২০০. বাংলায় 'জাতি'র উৎপত্তি— হিতেশরঞ্জন সান্যাল; বঙ্গদর্পণ ১ম খণ্ড; পৃ. ১৫৪-১৫৬ প্রবন্ধটি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিজিৎ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'জাতিবর্ণ ও বাঙালি সমাজ' গ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত।

২০১. তদেব, পৃ. ১৫৭

২০২. প্রবাদগুলি সংগৃহীত হয়েছে—

১। বাংলা প্রবাদ— সুশীলকুমার দে

২। বাংলা প্রবাদমালা-- মহ: হানিফ পাঠান

২০৩. পুঁজির ১ম খণ্ডের এই রচনাংশগুলি ১ম পরিচ্ছেদের, পৃ. ৮৩-৮৫

উদ্ধৃতি : ধর্ম প্রসঙ্গে, মার্কস এঙ্গেলস (প্রগতি প্রকাশন), পৃ. ১৩৪-১৩৫

২০৪. অ্যান্টিডুরিং— এঙ্গেলস উদ্ধৃতি ধর্মপ্রসঙ্গে, তদেব, পৃ. ১৪৪

২০৫. সাম্প্রদায়িকতা— বদরুদ্দিন ওমর (নবপত্র), পৃ. ৬৪-৬৫

২০৬. বাংলার সংস্কৃতি প্রসঙ্গে— আহমদ শরিফ, বঙ্গদর্পণ (১ম খণ্ড), পৃ. ২১৪

২০৭. বাংলার মুসলমানের কথা— কাজী আবদুল ওদুদ, তদেব, পৃ. ২৭৩-২৭৪

২০৮. হান্টার-এর উদ্ধৃতি : তদেব, পৃ. ২৭৭, হান্টারের নিজের কথায়—

'The truth is that under the Mohammadanas Government was an engine far enriching the few, not protecting the many. It never seems to touched the hearts on moved the conscieness of the rulers, that a vast population of husbandman was tailing bare backed in the heat of summer and in the rain of outamn, in order that a few, families in each district might lend lives of luxurious case. It is only after we had began to break away from the system which we had virtually engaged to up hold that the existance of the people discloses itself. The greatest wrong which we did to the Musalman aristrocracy was in defining their rights (our Indian Mussalmans— W.W.Hanter, উদ্ধৃতি প্রাগুক্ত)

২০৯. সাম্প্রদায়িকতা— বদরুদ্দিন ওমর, পৃ. ৪১

২১০. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব— অমরেশ ত্রিপাঠী (আনন্দ), পৃ ৭৬

২১১. ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম— ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, পৃ. ১৬-১৭

২১২. ভারতবর্ষের ইতিহাস— হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২৩

২১৩. Quoted from History of Freedom Movement, Book II Chapter II, By R. C Majumdar.

২১৪. সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি : হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক— ড: পঞ্চানন সাহা, পৃ. ১০৬

২১৫. বদরুদ্দিন ওমর : তাঁর সাম্প্রদায়িকতা নামক গ্রন্থে লেখেন 'এই দুই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানই ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত' (পৃ. ৯৪)

পুলক নারায়ণ ধর : তাঁর হিন্দু মুসলমান সম্পর্কের প্রতিন্যাস এ লেখেন— '১৯০৬ সালে মুসলিম লিগের জন্ম হয়। ইংরেজরা সক্রিয়ভাবে তাকে সহযোগিতা করে গেছে। ১৯০৬ সালে হিন্দু মহাসভাও গঠিত হয়।' (হিন্দু মুসলমান সম্পর্ক স্বপ্ন পূরণ না স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস— অর্জুন গোস্বামী সম্পাদিত (রক্তকরবী) পৃ. ১৩৮

আহমদ শরিফ : 'মুসলিম লিগ হয়েছিল লর্ড মিন্টোর পরামর্শে' (বিশ শতকে বাঙালি, পৃ. ৩৩)

২১৬. ভারতবর্ষের ইতিহাস— হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৫২৬

২১৭. The Statesman 22 January, 1907

২১৮. অনুশীলন সমিতির ইতিহাস— জীবনতারা হালদার, পৃ. ১১

২১৯. বিপ্লবীর জীবন দর্শন— প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, পৃ. ১৮৯

২২০. ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব— অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ. ১২২
বি. সি. অ্যালেন. রিপোর্ট অন দি অনুশীলন সমিতি ২১শে আগস্ট, ১৯৯০
হোম পল, ফেব্রুয়ারি ১৯০৮, নং ৭০-৭১৯; এইচ.এল.সল্‌কেল্‌ড, ওই ১০ ডিসেম্বর ১৯০৮, হোম পল, আগস্ট ১৯০৯, ২১নং ডিপোজিট (তদেব, পৃ. ১৫৩)

২২১. উদ্ধৃতি : হিন্দুমুসলমান সম্পর্ক, তদেব, পৃ. ১১০

২২২. ভারতের মুক্তি সংগামে চরমপন্থী পর্ব, তদেব, পৃ. ১২২

২২৩. বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা— হেমচন্দ্র দাস কানুনগো, পৃ. ১৫৫

২২৪. সাম্প্রদায়িকতা— বদরুদ্দিন ওমর, পৃ. ৬১-৬৩

২২৫. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, তদেব, পৃ. ১১২
এখানে উল্লেখযোগ্য যে যখন এই নিবন্ধ প্রকাশিত হয় তখন সমগ্র ভারতবর্ষে মহাবিদ্রোহের আগুন জ্বলছে।

২২৬. আমার জীবন ও সমকাল— বিপিনচন্দ্র পাল, পৃ. ২৫৪

২২৭. ইসলাম প্রচারক নভেম্বর ডিসেম্বর, ১৯৯৩ : উল্লেখ মুসলমান ও স্বদেশী আন্দোলন— অমর দত্ত, মূল্যায়ন, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৮৯

২২৮. শিখা পত্রিকার স্বাধীন ভারতের দাস : উদ্ধৃতি, হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, তদেব, পৃ. ১১৫

২২৯. আধুনিক ভারত ও সাম্প্রদায়িকতাবাদ : বিপান চন্দ্র, পৃ. ১৬২

২৩০. স্বাধীনতা সংগ্রাম, বিপান চন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে, পৃ. ৪১-৪২

২৩১. গান্ধীজি, ভারত বিভাগ, গান্ধী পরিক্রমা— অরুণচন্দ্র গুহ, সংকলন গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত উদ্ধৃতি হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক, তদেব, পৃ. ১১৫

২৩২. কলকাতার দাঙ্গা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, মো. আবদুল মোহামেইন, পৃ. ১০
হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক স্বপ্নপূরণ না স্বপ্নভঙ্গের ইতিহাস, অর্জুন গোস্বামী, সম্পাদিত

২৩৩. কাজী নজরুল ইস্‌লাম স্মৃতিকথা— মুজফফ্‌র আহমেদ, পৃ. ১৯২

২৩৪. কলকাতার দাঙ্গা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ— মো. আবদুল মোহামেইন, তদেব, পৃ. ৮৫

২৩৫. আধুনিকতা ও ধর্মরিপেক্ষতা— হোসেনুর রহমান, পৃ ১৪

২৩৬. হেগেলের উদ্ধৃতি : বাঙ্গাল নামা— তপন রায়চৌধুরী, দেশ ২রা অক্টোবর ২০০৬, পৃ. ৮১

সমন্বয়ের গান
বাঙালি জীবন ও সাহিত্যে পিরদের স্থান

প্রাচীন যুগ থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পিঞ্জরে বদ্ধ মানুষ বারে বারে আগল ভেঙে পেতে চেয়েছে মুক্তির স্বাদ। কখনও বস্তুবাদী চার্বাকদের যুক্তির জালে আবদ্ধ হয়ে দ্বিজ শ্রেষ্ঠরা রক্ত চক্ষু দেখিয়েছে, প্রয়োজনে খুন করবার ফতোয়া জারি করেছে। কখনও আবার সমাজের অভ্যন্তরে সৃষ্ট স্ববিরোধ থেকে ফাটল ধরেছে, বৌদ্ধ ও জৈনরা বেদ মানতে অস্বীকার করেছে, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে দাবি করেছে উদারতা। কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভিধানে উদারতার কথা লেখা নেই। সুতরাং দাও এদেরকে নাস্তিক করে, সমাজচ্যুত করে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মনুসংহিতা থেকে নাস্তিক শব্দের তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছেন।

শ্রুতিঃ চ বেদঃ বিজ্ঞেয় ধর্মশাস্ত্র তুবৈস্মৃতিঃ।
তে সর্বামেসু অমিমাংসে ত্যাভাৎ ধর্ম হি নির্বভেই॥
যঃ অবনম্যতে মূলেহেতু শাস্ত্রা শ্রায়ন দ্বিজঃ।
যঃ সাধুভিঃ বৈহিষ্কার্যেঃ নাস্তিক বেদ নিন্দক॥

অর্থাৎ বেদকে শ্রুতি ধর্ম শাস্ত্রকে স্মৃতি বলে মানবে। এই দুই হল সমস্ত ধর্মের মূল। তা নিয়ে কোনও তর্ক চলবে না, চলবে না সংশয় প্রকাশ। হেতু শাস্ত্র অবলম্বন করে কোনও দ্বিজ যদি শ্রুতি স্মৃতির অবমাননা করে তা হলে সাধু ব্যক্তিরা তাকে একেবারে দূর করে দেবেন। বেদ নিন্দুকরা নাস্তিক।[১]

অপরদিকে ইসলাম ধর্মের শরিয়তি শৃঙ্খলার কঠোর বাঁধনে বাঁধবার প্রয়াস প্রথম থেকেই বিদ্যমান। আল্লাহ ব্যতীত অপর কিছুর ভাবনা যারা করে তারা 'কাফের', আল্লাহর বাণী কোরান বা 'খতম উন নবীর' বিষয় প্রশ্ন তোলার মতো অপরাধ আর কিছুতে হয় না।

> 'কোরআনের কোনও উক্তি সম্বন্ধে "কেন?" এই প্রশ্ন করা চলবে না, কোরআনে যা আছে, যেভাবে আছে তাইই মানতে হবে, এই যে বিচার বিরোধী মত, এটি অষ্টম শতাব্দীর ইমাম আবু হানিফার বিচারবাদের মতোই সুপ্রাচীন।'[২]

ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মতো এখানেও শরিয়তি মতের সুন্নিদের আধিপত্য আজও বিদ্যমান। যেটুকু খোলা হাওয়া ছিল পয়গম্বরের সময়ে রাজাদের হাতে পরে তা পর্দায় আটকে গিয়েছে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় কীভাবে কঠোর শৃঙ্খলার গারদ ভেঙে বেরিয়ে সুফি-বাউল-বৈষ্ণব-দরবেশদের সমষ্টি বাংলার জলদ আবহাওয়ায় ফুল্ল বিকশিত হল, যে ভাবনা আজও অবাক বিস্ময়ে হার মানে। রবীন্দ্রনাথের গানের রেশ ধরে বলা যায়—

'ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,

মোদের ততই বাঁধন টুটবে।'[৩]

সুফি মতকে বুঝতে হলে ইসলাম ধর্মের ইতিহাসের বিবর্তন নিয়ে প্রথমেই আলোচনায় প্রবেশ করতে হবে। এর উৎপত্তির ইতিহাস আমাদের কাজে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন ক্রান্তদর্শী সৈয়দ মুজতবা আলি 'পারসিক পণ্ডিতমণ্ডলী সরল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন কিন্তু তাহাদের ধার্মিকমন শুধু শরিয়ত [ক্রিয়াকাণ্ড] মানিয়া তৃপ্ত হইল না। এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে আজ মুসলমান ধর্ম বলিতে আমরা সুস্পষ্ট সত্তাবাদ বিশ্বাস ও আচরণের ফিরিস্তি পাই তখনও তাহা গড়িয়া ওঠে নাই। শুধু যে চারি ইমাম মালিক, হন্‌বল্‌, হানিফা ও শফর মতবাদ তখন নানারকমের তর্কজাল সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা নহে অন্যান্য নানা সম্প্রদায় তাঁহাদের সমস্ত চিন্তা শক্তি এই তর্কযুদ্ধে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কালমিরা গ্রিক দর্শন দিয়া কোরানের বাক্য বিশ্লেষণ ও সমর্থনে নিযুক্ত হইলেন, মুতাজিলারা ঈশ্বরের স্বরূপ দিয়া স্বর্গনরক, কর্মফল নিয়া তর্ক জুড়িলেন। কদরী ও জবরীরা কর্মে মনুষ্যর স্বাধীনতা পরাধীনতার আলোচনা করিলেন ও কিরামিতারা একেশ্বরবাদকে এতই উচ্চ আসন দিলেন যে কাবার কৃষ্ণ প্রস্তরকে সম্মান প্রদর্শন পৌত্তলিকতা বলিয়া প্রচার করিলেন। শিয়া মতবাদ মদিনায় জন্মগ্রহণ করে কিন্তু তাহার পরিপুষ্টি হইল পারস্যে। গণতান্ত্রিক আরবের মধ্যে মহাপুরুষ মুহম্মদের বংশধরগণের বিধিদত্ত অধিকার স্বীকৃত হইল না, কিন্তু প্রাচীন ইরানে ভূপতিকে ঈশ্বরের অবতার রূপে স্বীকার করা হইত বলিয়া আলি ও তাহার বংশধরগণ শুধু যে রাজনৈতিক সমর্থন পাইলেন তাহা নহে, ধর্ম ক্ষেত্রেও স্বীকৃত হইল যে তাহাদের বাণী আপ্তবাক্য। কোরান যে রূপ অভ্রান্ত ইহাদের বাণী সেইরূপ পূত, তাঁহাদের জীবন নিষ্কলঙ্ক।'[৪]

সুতরাং যেভাবে প্রচারিত হয়ে আসছে ইসলাম ধর্ম একমাত্রিক, তা কখনওই নয় বরং বহুমাত্রিক ধর্মীয় লেলাকাচারগুলি এবং তাদের জীবনের বৈচিত্র্যময়তা পারস্য কখনওই বর্জন করেনি। বরং ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে সুফিমত এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কি বিজয়ের সূত্র ধরে সুফিরা এদেশে প্রবেশ করেন।

সুফিদের উৎপত্তি নিয়ে নানা মত প্রচলিত আছে। অনেকের মতে পশমি বস্ত্র পরিধান করা সাধকরাই সুফি। কারও মতে আহস্ উল বাফফা অর্থাৎ হজরত মহম্মদ (দ) এর সময় যারা মসজিদের মেঝেতে বসে সাধনা করতেন তাদের থেকেই সুফি শব্দের উৎপত্তি,

আবার কারো মতে 'সাফাই আইয়াল' অর্থাৎ যারা সামনের সারিতে যারা নমাজ আদায় করতেন তাঁদের থেকেই সুফি শব্দের উৎপত্তি।[৫] সুফিদের নিজেদের ব্যাখ্যায় সুফি শব্দের ব্যাখ্যা আছে— একদা তাপস 'মহম্মদ ওয়াসা' 'সোফ' নামক স্থূল কম্বল পরিধান করে 'কতিবা' নামক এক সাধু পুরুষের নিকট উপস্থিত হন। 'কতিবা তাঁকে সোফ পরিধান করার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ওয়াসা নিরুত্তর থাকেন। কতিবা পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন,— তুমি উত্তর দাও না কেন?'

'ওয়াসা বললেন— যদি বলি বৈরাগ্য বশত 'সোফ' পড়েছি তবে আত্মশ্লাঘা করা হয়। যদি বলি দারিদ্র্য হেতু সোফ পড়েছি তবে ঈশ্বরকে নিন্দা করা হয় তাই নিরুত্তর আছি'।[৬] বৈভবহীন বৈরাগ্যের মধ্যে থেকে ঈশ্বর সাধনায় ব্যাপৃত থেকে সচ্চিদানন্দ হতে চান সুফির জুনিদ বাগদাদির কথায় এর আরও একটা ব্যাখ্যা আছে— 'সুফি হলেন পরিত্রাতা ঋষি, মৃত্তিকাবৎ তাঁর উপর সমুদয় জঞ্জাল নিক্ষিপ্ত হয়। কিন্তু তা হতে সমুদয় কল্যাণ বহির্গত হয়, যিনি নির্লিপ্ত তিনিই সুফি।'

খ্যাতকীর্তি জ্ঞানী কাজী আবদুল ওদুদ সুফি ধর্মের উৎপত্তির যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দেন। 'সুফিমত বহুমতের সমষ্টি। তার সে সবের একটি সাধারণ লক্ষণ এই যে তাতে গুরুর আনুগত্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। শাস্ত্রকেও সুফিরা মানেন, কিন্তু পির বা গুরুকে বিশেষভাবে মানেন; সত্যের সত্যকার ভাণ্ডারী গুরু— এই তাঁদের বিশ্বাস, আর তাঁদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বিশ্বের যিনি বিধাতা তাঁর সঙ্গে প্রেমের যোগ বা পরমাত্মীয়তা স্থাপন করা। সুফি মত মুসলমান জগতে ও মুসলমান সংশ্লিষ্ট জগতে দীর্ঘকাল প্রভাব বিস্তার করে চলে। চতুর্দশ শতাব্দীতে সুফিমতের এই গুরুবাদের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ উথাপন করেন ইমাম ইবনে তায়মিয়া। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে যথেষ্ট সম্মান লাভ করেন কিন্তু সুফি প্রাধান্য খর্ব করতে পারেন না। সুফিবাদের আনুষঙ্গিক গুরু পূজা তার অশেষ বৈচিত্র্য নিয়ে মুসলমান জগতে ব্যাপকভাবে প্রভাবশীল হয়ে চলে।'[৭] আবার একটি ইতিহাস সম্মত ব্যাখ্যা দিয়েছেন সৈয়দ মুজতবা আলি।

'ইহার মধ্যে আরেক ভাবতরঙ্গ আসিয়া পারস্যের ধর্ম জগৎকে আলোড়িত করিল। নিওপ্লাতনিজমের রহস্যবাদ ইস্কন্দরিয়ায় পুষ্টি সাধন করত আরবিতে অনূদিত হইয়াছিল। দুই-একজন আরব সাধু এই রহস্যবাদের [সুফি বা ভক্তি মার্গের] দিকে আকৃষ্ট হইলেন, উল্লেখ করা প্রয়োজন ইহা ইসলামে নুতন নহে। কুরানের 'নূর' অধ্যায়ে আল্লার যে বর্ণনা করা হইয়াছে তাহাতে রহস্যবাদের উৎস পাওয়া যায় আল্লা যদি 'নূরই' (জ্যোতি) হইলেন তাহা হইলে শুধু শরিয়তের বিধান মানিয়া তাঁহাকে কী করিয়া পাইব? মানুষের ভিতরে নূর আছে তাহাকে পঞ্চেন্দ্রিয়র তমসান্ধকার কাটাইয়া বিশ্বনূরের সহিত মিলিত হইতে হইবে। তাহার জন্য কৃচ্ছ্রসাধন দরকার— ধ্যানের প্রয়োজন আর কে না জানে মহাপুরুষ ঐশী প্রাপ্ত হইবার পূর্বে মাসের পর মাস থিবার পর্বত কন্দরে ধ্যান মগ্ন ছিলেন। সুফিরা

বলিলেন, শাস্ত্রের তর্কজালে বন্দি হইয়ো না, স্বয়ং মহাপুরুষ যে মার্গ গ্রহণ করিয়া নূর পাইয়াছিলেন সেই পথ ধর।

পারস্যে সুফি সাধনা প্রসার করিল, তাহার মূলতত্ত্ব হইল শরিয়ত অনুসরণ করিয়া পঞ্চেন্দ্রিয়ের সংযম করিবে, সেবা দ্বারা গুরুকে (মুরশিদ) তুষ্ট করিবে, তিনি দিবেন জ্ঞান— পূর্বেই বলিয়াছি শিয়ারা ইমাম ও হুজ্‌জৎকে (গুরু) অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতেন। আর সর্বশেষে ভক্তির সাধনা ঈশ্বরকে রসস্বরূপে আরাধনা করিয়া সমাধিস্থ হইবে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের কর্মদ্বার রুদ্ধ হইবে ও তাহার চরম পরিণতি পরমালোকের সহিত মানবের ক্ষুদ্র আলোকের সম্মেলন— 'কোণের প্রদীপ মিলায় যথা জ্যোতি সমুদ্রেই।' হর্তেন প্রমুখ জর্মন পণ্ডিতদের মতে সুফির 'আনা লু হক' (আমিই ঈশ্বর) ভারতবর্ষীয় প্রভাবে গঠিত হইয়াছিল— হয়তো বৌদ্ধ নির্বাণও তাহাতে যুক্ত হইয়াছিল। মাসিন্ন প্রমুখ ফরাসি পণ্ডিতগণ আপত্তি করিয়া বলেন সুফি মার্গের এই চরম ফল পারস্যের নিজস্ব সম্পত্তি। সে তর্ক এখানে অবান্তর।'

'সুফি মার্গের সাধনা পারস্যের চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করিল, প্রাচীনপন্থীরা ঘোর প্রতিবাদ তুলিলেন কিন্তু তাহার সমাধান করিলেন সাধু গজ্জাল। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ও সুফি। তাঁহার অপূর্ব লেখনীর বলে সুফি মতবাদ পাংক্তেয় হইল ও সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোল্লিখিত বহুমত সুফি ধর্মের ভিতরে আসিয়া আশ্রয় লইল।'[৮] এখানে একটি বিষয় উল্লেখ দরকার। মুজতবা আলির 'তাহার মূলতত্ত্ব হইল শরিয়ত', এই যুক্তি অধিকাংশই মানেন না। আরবে শুধু নয় বাংলায়ও মারফতি ধারাকে ধ্বংস করে শরিয়তি শাসন প্রতিষ্ঠা করে ওয়াহাবি বিদ্রোহ। এ প্রসঙ্গে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতকে এখানে উপস্থাপিত করব।

> 'বাঙ্গলা দেশে যে মতের মুহম্মদীয় ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল তাহা খাঁটি শরিয়তি অর্থাৎ কোরান অনুসারী ইসলাম নহে। শরিয়তি মত অন্য কোনও ধর্মের সঙ্গে সহযোগ করিতে প্রস্তুত নহে। সুফি মতের ইসলামের সহিত বাঙ্গলার সংস্কৃতির মূল সুরটুকুর কোনও বিরোধ হয় নাই। সুফি মতের ইসলাম সহজেই বাঙ্গলায় প্রচলিত যোগ মার্গ ও অন্যান্য সাধন মার্গের সঙ্গে একটা আপস করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল। মধ্য যুগে তুর্কি বিজয়ের পর হইতে, যে ইসলাম বাঙ্গলায় আসিয়াছিল তাহা নিজেকে বাঙ্গালির পক্ষে সহজগ্রাহ্য করিয়া লইয়াছিল। বাঙ্গলাদেশে প্রচলিত ইসলাম ধর্ম বাস্তবিকই 'মজাম উ-ল বহরৈন। অর্থাৎ দুইটি সাগরের সম্মিলন হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।'... 'যদিও বাঙ্গালি জাতির অর্ধেকের উপর মুসলমান সংস্কৃতি, অর্থাৎ আরবি ফারসি ও উত্তর ভারতের মুসলমান মনোভাব ও বাস্তব সভ্যতা, রীতিনীতি এবং চিন্তাপ্রণালী বাঙ্গালি মুসলমানদের জীবনেও কার্যকর হয় নাই।'[৯]

বাংলার বৈষ্ণব-বৈরাগী ও বাউলদের জীবন চর্চার সাথে একবিন্দুতে মিলেছিল সুফিদের জীবনবোধ। শ্রীচৈতন্য ব্রাহ্মণ্যবাদের অস্পৃশ্যতাকে বর্জন করে বুকে টেনে নিয়েছিলেন অন্ত্যজদের। ঠিক সেইভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠের কঠোর শরিয়তি ধারার বাইরে এসে সহজ জীবনবোধের মারফতি ধারা গ্রহণ। মারফতি ধারার একটি সরল ব্যাখ্যা পাওয়া যায় সুফিদের কথা থেকে— 'সকল রকম মালিন্য থেকে মুক্ত।' যেন বাংলা জনপ্রিয় গানটির লাইন উঠে এসেছে 'তুমি নির্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম মুছায়ে।' সুফি মারুখ-আল-বারখির কথায় মুক্তির পথ হল ভক্তি। ঈশ্বরের করুণা না থাকলে তা মেলে না। সাউফ হল সত্য বস্তুসমূহের উপলব্ধি। সুফিবাদ হল ইসলামের একটি ধারা তারা প্রকাশ্যে বা বহিরাঙ্গিকে ধর্মাচরণ পছন্দ করে না। অন্তরীণ থেকে ধর্মচর্চাই তাদের ধর্ম—এই ধাবাকে 'তওসাফুল' ও বলা হয়।

অপরদিকে কঠোর ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগল ভেঙে বেরিয়ে এসে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি। বৌদ্ধরা প্রচলিত জাতিভেদ প্রথা ভেঙে ভেদাভেদহীন এক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করেন। প্রচলিত দেবভাষার পরিবর্তে কথ্য ভাষা পালিতে ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়। এইরকম ধর্ম বাংলার অন্ত্যজ মানুষকে স্নিগ্ধ মৃদুমলয় স্পর্শে মোহিত করবে এতে আশ্চর্যের কিছু নেই। হিন্দু ধর্মের জাতিভেদ প্রথায় নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষরা যারা পেশাগতভাবে কৃষক, ক্ষুদ্র কারিগর ও নিচু কাজ করেন তারা দলে দলে বৌদ্ধধর্ম ক্রমান্বয়ে অধঃপতিত-বিভাজিত ও জীবনী শক্তিহীন হয়ে পড়ে। যে তন্ত্র সাধনাকে বুদ্ধদেব অত্যন্ত ঘৃণার চোখে দেখতেন সেই তন্ত্র সাধনা, গুহ্য সাধনা বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কাছে প্রধান সাধনমার্গ হয়ে ওঠে। ধর্ম মহাসংঘ বজ্রযান-মহাযান-হীনযান এ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই আদর্শ পরিত্যক্ত হলেও বাংলার অন্ত্যজ মানুষের কাছে মরমিয়া ভক্তিবৎসল ও বর্ণগত সাম্যের আলো পৌঁছেছিল। নূতন করে উষার আলো প্রকাশিত হয় শ্রীচৈতন্যের ধর্মআন্দোলনের সময়। বৈষ্ণব ধর্ম তার ভৌগোলিক সীমারেখা খুব বেশিদূর প্রসারিত করতে সক্ষম হয়নি। এর পেছনে ছিল শাক্তদের তীব্র বিরোধিতা নির্যাতিত অন্ত্যজ যারা বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে নিরাপত্তা পেয়েছিল, তারা আশ্রয়হীন হয়ে ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দুদের কাছে নিগৃহীত হতে লাগল। বাংলার পিররা বৌদ্ধ ধর্মের অবসানের পর এই অন্ত্যজদের নিরাপত্তা দিয়ে প্রাণের ঠাকুর হয়ে ওঠেন। তুর্কি-বিজয়ের সূত্র ধরে এদেশে পিরদের প্রবেশ। আকবর ও আরও কয়েকজন রাজপুরুষ সুফিদের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করলে ভারতে বিশেষত বাংলার মাটিতে পিরদের শিকড় প্রসারিত করতে সাহায্য করে। ভারতের এই ধরনের সুফিদের মধ্যে বিখ্যাত খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি, হজরত নিজামুদ্দিন আউলিয়া প্রমুখ। এখানে ক্ষিতিমোহন সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য 'ভারতে মুসলমান সাধকদের বাদশা হলেন খাজা মৈনুদ্দিন চিস্তি।'[১০]

এই আলোচনায় প্রথমেই যে কথা স্মরণে রাখতে হবে পিররা আসলে লোকায়ত দেবতা। এখানে পিররূপী মানবদের দেবতায়ন হয়েছে। মৈত্রীর সর্বোচ স্তর 'দিবে আর

নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে।' এই ভাবনা ছাড়া একদিকে নিরাকার অদ্বৈতবাদী অপরদিকে বহুত্ববাদী পৌত্তলিকতা এই দুই ধারার সঙ্গম হতে পারে না। পির শব্দের আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধ বা প্রাচীন আধ্যাত্মিক গুরু। তত্ত্বগতভাবে ইসলামের অসহিষ্ণুতা এবং হিন্দু ধর্মের মধ্যেকার অস্পৃশ্যতা দোষে দুষ্ট দুটি বিপরীত ধারার মিলন অসম্ভব; যা এখানে পল্লবিত হয়েছে। আমরা এখানে সেই সমস্ত পির-সুফিদের নিয়ে আলোচনা করব যারা সমাজ-সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে প্রকাশ করেছিল মিলনের গাথা এবং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে সমানভাবে পূজ্য ও সমাদৃত হয়েছিল।

প্রথমেই পির সাহিত্যের বিশেষত্ব ও বাংলার লৌকিক ধর্ম সাহিত্যের সাথে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করব :

(১) পির মঙ্গলকাব্য বা পাঁচালি বাংলার অন্য পাঁচালি সাহিত্যের মতো ত্রিপদ ছন্দে রচিত।

(২) পির বন্দনা সঙ্গীত যা প্রধানত বাউলাঙ্গে রচিত গান।

(৩) পির লোক কথা যা প্রধানত গল্প বলার ঢঙে লোকমুখে প্রচারিত হয়, 'কথকতা' বাংলার একটি প্রাচীন লোকশিল্প। রামায়ণ-মহাভারত থেকে মঙ্গলকাব্য ব্রত কথা সবই এই আঙ্গিকে পরিবেশিত হয়ে আসছে। এখানে উল্লেখ করা দরকার রামায়ণ-মহাভারত বা মঙ্গলকাব্যগুলি যেমন পদ্য ছন্দে পরিবেশিত হয় তেমন কথকতা শিল্পের মধ্যে দিয়েও পরিবেশিত হয়েছে। কথকতাকে বাংলা গদ্যের উৎপত্তিস্থল বললে অত্যুক্তি হবে না। পির কাহিনিও সেই ভাবেই পরিবেশিত হয়েছে। পির কথায় অবশ্য কথ্য ভাষার সাথে আরবি-ফারসি-হিন্দুস্থানি শব্দও মিশেছে। 'আশ্চর্যের বিষয় বাঙ্গলায় লেখা প্রথম মহাভারত কাহিনি পাইতেছি তাহা এক মুসলমান সেনাপতি শাসন কর্তার অভিপ্রায়ে তাহারই সভা কবির রচনা।'[১১]

পির সাহিত্যে ও আরাধনা উৎপত্তির কারণ সমূহের অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্রাজ্ঞ সুকুমার সেনের মতে—

> 'পির পূজার উৎপত্তি অকস্মাৎ অথবা কোনও নির্দিষ্ট শতাব্দীতে ঘটে নাই। তুর্কি অধিকারের সূত্রপাত হইতেই এদেশে মুসলমান সাধুর ও ধর্মপ্রচারকের প্রতিষ্ঠার আরম্ভ। এমনকী শেখ শুভদয়ার গৌণ স্বাক্ষ্য অগ্রাহ্য না করিলে তুর্কি অধিকারের কিছুকাল আগে হইতেই মুসলমান সাধু ও সুফিপিরের আগমন ঘটতে থাকে।'
> '...সেই সঙ্গে কোনও কোনও মুসলমান সাধুর মাহাত্ম্য ও সেকালের জনসাধারণের মনে পিরের প্রতি ভয়ভক্তি জাগাইতে শুরু করিয়াছিল সুফি সম্প্রদায়ের গুরু নিষ্ঠা গুরুভক্তি সেকালের বাঙ্গালির মনে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। ইহার পক্ষে মনের অনুকূলতা খানিকটা কাজ করিয়াছিল। বাঙ্গালির মনেব সেই

অনুকূলতা হইল দৈব নির্ভরতা ও জ্যোতিষে বিশ্বাস। তাহার পর চৈতন্যের ধর্ম বন্যা আসিয়া হিন্দু মুসলমানের ভেদের বাঁধ ভাঙিয়া গেল। সুফি মতের প্রভাবে চৈতন্যের যেমন দৃঢ়তার সঞ্চার্র করিল তেমনি গুরুবাদেরও প্রতিষ্ঠা করিল। হরিদাসের মর্যাদা স্বীকার করিযা সনাতন রূপকে শাস্ত্রকাররূপে নির্দিষ্ট করিয়া এবং ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরনাম নিষ্ঠা প্রচার করিয়া চৈতন্য মুসলমান পিরের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীর খানিকটা বিভেদ ঘুচাইতে চেষ্টা করিলেন। মুসলমান সাধুর ("জিন্দাপিরের") কাছে দীক্ষা লইতে অথবা তাঁহাকে ভক্তি দেখাইতে হিন্দু শিষ্য-ভক্তের আর গুরুতর সামাজিক বাধা রহিল না। সেই হইতে জনসাধারণের মনে পিরভক্তি সঞ্চারিত হইতে থাকে।'[১২]

সুকুমার সেন পূর্বেই উদাহরণ সহযোগে দেখান যে সংস্কৃতির জগতে জীবনচর্চায় সে সময় মিলনের ধারার প্রভাব অত্যন্ত গভীর ছিল।

'...হিন্দু স্মার্ত পণ্ডিত ও মুসলমান কাজী গ্রাম সুবাদে পরস্পর আত্মীয়তার স্নেহ সম্পর্ক রাখিতে কোনও অসুবিধা বোধ করে নাই। অজ্ঞিয়া মুলুকের কাজী চৈতন্যকে যে কথা বলিয়াছিলেন তাহা এই প্রসঙ্গে মূল্যবান—

নীলাম্বর চক্রবর্তী হয় মোর নানা
সে সম্পর্কে হও তুমি আমার ভাগিনা।

রাজসভাশ্রিত উচ্চতর সমাজে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে সাংস্কৃতিক আপোস কিছু হইয়াছিল। ইহার পিছনে দরবেশ-ফকিরদেরও প্রভাব ছিল এবং সেই সূত্রে গৌরীয় বৈষ্ণব ধর্মে সুফিভাবের কিছু প্রভাব পড়িয়াছিল বলিয়া মনে করি।[১৩]

এখানে আবার প্রশ্ন তোলেন ঐতিহাসিক ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সামাজিক ইতিহাসের ঘটনা এই যে, মুসলমান শাসনের কাল হইতে বৌদ্ধদের আর কোনও সংবাদ পাই না। তাহারা এখন গেলেন কোথায়? ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, গৌড় ও মগধে ব্রাহ্মণ্যবাদের পুনরুত্থান হইয়াছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মীয় রাজাদের সময়ে অব্রাহ্মণ্য ধর্মসমূহ পদদলিত বা সংখ্যাহীন হইতেছিল তৎপরে মুসলমান শাসনকালে গণসমূহ নানা কারণবশত দলে দলে মুসলমান ধর্মগ্রহণ করিতে থাকে।[১৪] এর স্পষ্ট সমর্থন আছে শহীদুল্লার শূন্য পুরাণের ভূমিকায়—

'যে দেশে বৌদ্ধ ধর্মের এত নিবিড় প্রভাব ছিল, সে দেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম লুপ্ত হইল কেমন করিয়া— এই প্রশ্ন অনেকের মনে উঠিতে পারে। ...মোটের উপর বাঙ্গলার বিশাল হিন্দু মুসলমান মণ্ডলী এই বৌদ্ধগণকে গ্রাস করিয়া লইয়াছে। ...মুসলমানগণের মধ্যে তাহাদিগকে বেদাত্রী ফকির (আরবি বিদ সাৎ নতুনত্ব, নবসৃষ্টি) বা নেড়ার ফকির বলা হয়। তাহাদের মধ্যে অনেকটা সহজ সিদ্ধির ভাব দেখা যায়। আমার মনে হয় সত্যপির নিরঞ্জনের এবং মানিকপির গোরক্ষ পথেরই প্রকারভেদ।[১৫]

বৈষ্ণব ধর্মের উদ্দেশ্য হিন্দু মুসলমানকে প্রেম ধর্মে একত্রিত করা। ব্রাহ্মণে যবনে মিলে করিতে কোলাকুলি, পরতকে চাহ একবার' দীন কৃষ্ণদাস অথবা বর্ণভেদের বিরুদ্ধে 'জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বানে'— দেবকী নন্দন, বৈষ্ণব বন্দনার মধ্যে দিয়ে মিলনের সাহিত্যর একটা ছবি পাওয়া যায়।[১৬]

(৪) পিরদের মহিমা কীর্তনের জন্য সৃষ্ট লোকনাটক। যার মধ্যে দিয়ে পিরদের অলৌকিকত্ব প্রমাণ করা হত।

(৫) পির প্রবাদমালার মধ্য দিয়ে পিরদের অলৌকিক ক্ষমতা, তাদের অবজ্ঞা করার ফল। কখনও সম্প্রীতির ভাব প্রকাশ করাই এর উদ্দেশ্য। প্রবাদ গড়ে ওঠে জীবনচর্চার মধ্য থেকে। চলমান সমাজে সবই ক্ষয়িষ্ণু, তার মধ্যে অনেক বিশ্বাস অনেক জীবন বোধ, গতিশীলতা লাভ করে ও অনেক দিন ধরে টিকে থাকে। সেগুলি পর-প্রজন্মের কাছে প্রবাদ বলে আখ্যায়িত হয়। যেমন রামকৃষ্ণ কথামৃতে আছে হিন্দুর নির মুসলমানদের পির।

আমরা সেই পিরদের প্রসঙ্গে আলোচনায় আসব যারা হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে পূজ্য হয়ে এসেছে, এবং যে পিরদের নিয়ে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই নিকট বিশ্বাসে উপনীত হয়েছে।

সত্যপির বা সত্যনারায়ণ

প্রথমেই এই পিরকে আনার কারণ, এত বেশি জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বাংলার উভয় সম্প্রদায়ের কাছে কোনও পিরই পাননি। যে পির আজও ঘরে ঘরে পূজা পেয়ে আসছেন তিনি সত্যপির তথা সত্যনারায়ণ। কৃষ্ণহরি দাসের বর্ণনায় তাই মূর্ত হয়ে আছে—

'হিন্দুর দেবতা আমি মুসলমানের পির
দুই কুলে সেবা লই হইয়া জাহির।'

এই সত্যপির হিন্দু না মুসলমান বাঙালি না পারস্যদেশীয় এ-প্রশ্নের মীমাংসা আজও হয়নি। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে এখানে পিররূপী দেবতাদের মানবায়ন সংঘটিত হয়েছে। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

> 'সত্যপির আসলে কোনও মুসলমান পির ছিলেন পরে হিন্দু সমাজের স্বীকৃতির পর তিনি নারায়ণের সাথে একাকার হইয়া সত্য নারায়ণের রূপে পরিচিত হন।[১৭]

সম্প্রীতির কোন উচ্চ মার্গে পৌঁছলে পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের সমন্বয়ে ঘটে যা ভাবলে আজও আমাদের, বিস্মিত করে। এই কারণেই ড: দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন বহুদিন একত্রে বাস নিবন্ধন হেতু উভয় সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্ম সম্পর্কে কতকটা উদারভার অবলম্বন করেছিলেন। সত্যপির নামক মিশ্র দেবতার আবির্ভাব সেই উদারতার ফল। হরিঠাকুর এই

উপলা ফকিরি আলখাল্লা গায়ে পরেছেন ও উর্দু জবানে বক্তৃতা দিতেছেন,—

বিশ্বনাথ বিশ্বাসে বুঝায়ে বলে বাছা।
দুনিয়ামে এসভি আদমি রয়ে সাঁচা।।
জাওত সত্যপির মেরা জাওত সত্যপির।
তেরা দুঃখ দুর করতও হাম ফকির।।

জয়নারায়ণ সেনের হরিলীলায় বর্ণনা আছে বাংলার নবাব হোসেন শাহর দৌহিত্রই প্রকৃত সত্যপির। গৌড়াধিপতি হোসেন শাহ্ অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন এবং হিন্দু মুসলমান উভয়কেই সমান চোখে দেখতেন। সেই সময় তাঁর উদারতার কথা লোকমুখে ফিরত। অনেকে মনে করেন তাঁর পৃষ্ঠপোষকতায় এই পূজা প্রবর্তিত হয়। কবীন্দ্র পরমেশ্বর তাঁর মহাভারতের অনুবাদে লিখেছেন—

'নৃপতি হুসেন শাহ্ হয় মহামতি
পঞ্চম গৌড়েতে যার পরম সুখ্যাতি
অস্ত্র শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মহিমা অপার
কলিকালে হৈল যেন কৃষ্ণ অবতার।।'

কারো মতে বাগদাদের বিখ্যাত সুফি-সাধক মনসুর আল্ হাল্লাজ যিনি নির্দ্বিধায় "আলিই সত্য" ঘোষণা করে কিছু মুসলিমের হাতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তিনি নাকি মূল সত্যপির।[১৮] অবশ্য এই প্রাপ্ত তথ্য থেকে সত্যপিরের জনপ্রিয়তা ঘরে-ঘরে পূজিত হবার কারণ পরিষ্কার বোঝা যায় না। সুকুমার সেনের মতে, আরবি 'হক' শব্দ থেকে সত্য কথার উৎপত্তি।

> তবে আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে সত্যনারায়ণ মূলত সত্যপির নামক মুসলমান পির হওয়া সত্ত্বেও তাহার সম্পর্কিত রচনা বা সত্যনারায়ণের পাঁচালি হিন্দু কবিরই রচনা কারণ হিন্দু সমাজেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইয়াছিল। তবে পিরের মাহাত্ম্যসূচক রচনা মুসলমান কবিগণও রচনা করিয়া ছিলেন।[১৯]

সুকুমার সেন আমাদের দেখিয়েছেন—

> পিরের গাথা পিরের ব্রতকথা রীতিমতভাবে রচনা শুরু হয় সপ্তাদশ শতাব্দীতে। ...তাহার পর শতাব্দীর শেষ দুই দশক হইতে পির নারায়ণের একাত্ম মূর্তি— যাহা কৃষ্ণর দেখাইয়াছিলেন— তাহা পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গে নূতন দেবতা সত্যনারায়ণ অথবা সত্যপির রূপে আবির্ভূত হইল। 'সত্য' এখানে আরবি 'হক' এর প্রতিশব্দ। সুফি গুরুরা ঈশ্বরকে এইনামে নির্দেশ করিতেন। ...ফকিরবেশী ধর্মঠাকুর পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে ধীরে ধীরে সত্যপিরে বা সত্যনারায়ণে মিশিয়া গিয়াছেন।'[২০]

সত্যনারায়ণ বা সত্যপিরের উদ্ভব নিয়ে যতই মতদ্বৈধতা থাকুক না কেন, সমন্বয়ের মধুর ধ্বনি বিভিন্ন পাঁচালিকার ছত্রে-ছত্রে তুলে ধরেছেন তার তুলনা মেলা ভার।

যেমন— 'মক্কায় রহিম আমি
অযোধ্যায় রাম
কলিতে সম্প্রতি
আমি সত্যনারায়ণ।'

আবার— 'সত্যপির বলি সবে শিরে দিবে হাত
নারায়ণ বলিয়া করিবে প্রাণপাত।'

অথবা 'মক্কায় বসিয়া পির হাসেন নারায়ণ
এতদিনে আমারে বুঝিলেন লালমোন।'[২১]

পির-দেবতার রূপ কল্পনায়ও এক মিশ্র রূপ পরিলক্ষিত হয়—

'অর্ধেক মাথায় কালা
একভাগে চূড়া টানা।
বনমালা ছিলিমিলি তাতে
ধবল অর্ধেক কায়
অর্ধনীল মেঘ প্রায়
কোরান পুরাণ দুই হাতে।'

একই মিশ্ররূপ মুনশি ওয়ায়েজ আলির বর্ণনায়

'হেন কালে সত্যপির সুন্দর লইয়া
সন্ন্যাসীর বেশ ধরি পৌঁছিল আসিয়া
সর্বাঙ্গে তিলক তার কপালে গোর ফোটা
হাতেতে জপনমালা মাথা ভর জটা

শুধুমাত্র মৈত্রীর কথাই নয় ব্রাহ্মণাধিপত্য ও ইসলামের বৈষম্যের কথা বলা হয়েছে। কোরান পড়লে জাত যায় কারণ তার প্রথেমেই 'বিসমিল্লাহ' এই হরফ রয়েছে।

'নূর নদীতে স্নান করিতে গিয়া বালক সত্যপির একদিন ঘাটে কোরানের পুঁথি কুড়াইয়া পাইয়া ঘরে আনিয়াছিলেন। কোরান লইয়া কুশলের সঙ্গে সত্যপিরের তর্ক উঠিল। ব্রাহ্মণ বলিল কোরান জলে ভাসাইয়া দাও গিয়া। বালক বলিল কেন? ব্রাহ্মণ বলিল কোরান পড়িলে জাত যায়। সত্যপির বলিলেন কি আছে কোরানের মাঝে। জাত যাবে কীসে। ব্রাহ্মণ বলিল কোরানের প্রথমেই 'বিছমিল্লা হরফ' আছে।'

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বিছমিল্লা কয়
শেষকালে সেইজন বৈকুণ্ঠ না পায়।''

'সত্যপির যুক্তি দিয়ে বুঝাইলেন—

"এক ব্রহ্ম বিনে আর দুই ব্রহ্ম নাই
সকলের কর্তা এক নিরঞ্জন গোঁসাই
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যার নাম জপে
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যার এক লোম কূপে
হস্ত নাহি পদ নাহি ধরেছে সংসার
মুখ নাই আছে তার করিতে আহার
কর্ণ নাহি কথা শোনে। চক্ষু নাহি দেখে
চিনিতে না পারে কহে সর্বঘটে থাকে
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়।"[২২]

সত্যপিরকে নিয়ে পাঁচালি রচনার বিষয় বস্তুতে, আঙ্গিকে সম্প্রীতির দখিনা দুয়ার যে খুলে গিয়েছিল তাতে কোনও সংশয় নেই। এরকম ভাব বিনিময়ের নজির-এর তুলনা মেলা ভার। ফৈজুল্লা বলে একজন সত্যপিরের রচয়িতা বলে ড: সুকুমার সেন উল্লেখ করেছেন, তার কাহিনি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কাব্যের সাথে অভিন্ন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ধর্ম সংস্কৃতিতে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু-মুসলমান পরস্পর কতটা এক সংস্কৃতির দ্বারা আবদ্ধ হয়েছিল তার মূল্যবান প্রমাণ পাওয়া যাবে নীচের বন্দনায়—

'সেলাম করিব আগে পির নিরঞ্জন
মুহাম্মদ মুস্তাফা বন্দে আর পঞ্চানন
সেরআলি ফতেমা বন্দো একদা করিয়া
হাঁচেন পেয়দা হৈল যাহার লাগিয়া
রছুলের চারি ইয়ার বন্দো শত শত
চারি দহ ইমামের লব কত।
এবরাহিম খলিলের পায়ে করি নিবেদন
বেটারে করবানি দিল দীনের[২৩] কারণ
করবানি করিয়া দিল এসমাল করিয়া
সেই হৈতে নিকে বিভা হইল দুনিয়া
আম্বিয়ার হাসিল বন্দো পাল আন দুইজনে
এসমালি গাজি বন্দো গড়-মন্দারনে
...পাঁড়ুয়ার সাফি-খায়ে করি নিবেদন
অবশেষে বন্দির সত্যপিরের চরণ।
সম্বল জাহানে বন্দিব পির আছে যত

এক লাখ আশি হাজার পিরের নাম লব কত।
বিবি ফতেমার কদমে বন্দিব শত শত।
হিন্দুর ঠাকুরগণে করি প্রণিপাত
খানাকুলের বন্দিব ঠাকুর গোপীনাথ
নামেতে বন্দিয়া পাইব ধর্ম নিরঞ্জন
যার ধবল খাট ধবল পাট ধবল সিংহাসন।
যমুনার তটে বন্দো রাস বৃন্দাবন
কৃষ্ণ-বলরাম বন্দো শ্রীনন্দের নন্দন।
নবদ্বীপে ঠাকুর বন্দো চৈতন্য গোসঞি
শচীর উদরে জন্ম বৈষ্ণব গোসঞি।
কামারহাটি পঞ্চাননে করি নিবেদন
দশরথের পুত্র বন্দো শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দো গঙ্গাভাগীরথী।
সীতা ঠাকুরানি বন্দো আর যত সতী।
দৈবকী রোহিনী বন্দো শচী ঠাকুরানি
যার গর্ভে গোরাচাঁদ জন্মিল আপনি।
শুনহ ভকত লোক হন একচিত
সত্যপির সাহেব সভার করে হিত।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজি আপনি আসরে দেহমন।
ভকত না একের তার মোকেদ হইয়া
আসিয়া দেখহ পির আসরে বসিয়া
ছাড় গাজি মজ্জার স্থান আসরে দেহমন
গাইল ফৈজল্য কবি সত্য পদে মন।'[২৪]

একারণেই ড: সুকুমার সেনের মত—

'পাঁচালির সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কাহিনি পশ্চিমবঙ্গে উদ্ভূত হইয়া অন্যত্র বিস্মৃত হইয়াছে। এমনকি অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণে প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুরাণে রেবা খণ্ডে যে কাহিনি আছে তাতে ফকিরের স্থান লইয়াছে বৃদ্ধ।'[২৫]

এখানে একটি বিশেষ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে সত্যপির বা সত্যনারায়ণকে নিবেদিত প্রসাদে অবশ্য নিবেদিত অর্ঘ্যর নাম শিন্নি বা সিন্নি কথাটি এসেছে ফারসি শিরনী বা শীরণী; সিরণী [চলন্তিকা ও বাংলা একাডেমী অভিধান] শব্দ থেকে। ফারসি শিরণি মানে ক্ষীর ভোগ [সুকুমার সেন : বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৪১১

পৃষ্ঠায় টীকা দ্রষ্টব্য]। এখনও সত্যনারায়ণের পূজার প্রধান প্রসাদ শিরনি।

'জনম অবধি আমি অন্ন নাহি খাই
কাঁচা দুধ আটারম্ভা ফল-মূল আদি
তাহা খাইতে শিখিয়াছি জনম অবধি।

[ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর]

প্রধান আলোচ্য বিষয় এখানে পিরদের মহিমা কীর্তন নয়, পিরদের কেন্দ্র করে উভয়ের সাহিত্য সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সমন্বয় গড়ে উঠেছিল তার রূপ তুলে ধরা সত্যপিরের কৃপায় সপ্ত ডিঙা সহ বধূ মালতিকে নিয়ে কুঞ্জবিহারী ঘরে ফেরার কাহিনির সাথে মঙ্গল কাব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

'সাধু বলে জননী গো ঘরে যাও তুমি।
সত্যপিরের নামে আগে সিন্নি দেই আমি।।
কলিঙ্গনগর যেন হইল সুরপুরি
প্রতিদিন পূজে পির কুঞ্জবিহারী।।

কবি শ্রীবল্লভ আনুমানিক ১২৩০ সাল নাগাদ রূপকথার আকারে সত্যপিরের পাঁচালি লেখেন—

'পাথরের গোর এক ভাসায়ে দরিয়ায়।
নৃত্য করে নর্তকী কিন্নরে গীত গায়
দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব শোভা পায়।
মৃগছাল পানির উপরে জল্যা দিয়া
চারি ফকির নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা।'

প্রায় সতাধিক সত্যপির ও সত্যনারায়ণের পাঁচালির সন্ধান পাওয়া যায়। এর মধ্যে অনেক রচনাকারের নাম জানতে পারা যায় না। পূর্বেই কবি ফৈজুল্লা, ওয়ায়েদ আলি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের নাম উল্লেখিত হয়েছে, শ্রীবল্লভের নামও উল্লেখ আছে। সুকুমার সেন এর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে সমস্ত পাঁচালিকারের নাম উল্লেখ করেছেন তারা হলেন— 'সর্বাপেক্ষা পুরোনো পাঁচালিগুলি হইতেছে—'

> 'ভৈরব চন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী) ফকির রাম দাস বিকল ভট্টের।... ঘনরাম ও গিরিধর ছাড়া বর্ধমান অঞ্চলের অপর সত্যনারায়ণ-পাঁচালি রচয়িতা হইতেছেন পাটুলির নিকটে নারায়ণ পুর নিবাসী মৌক্তিরাম ঘোষাল, কৃষ্ণকায় শিবচরণ, সাতসইকা পরগনায় সাহাপুর নিবাসী রামশঙ্কর সেন দেবগ্রাম নিবাসী "দ্বিজ" কৃপারাম, নাসিগ্রাম নিবাসী কাশীনাথ ভট্টাচার্য সার্বভৌম, "দ্বিজ" রামধন এবং "দ্বিজ" নন্দরাম।
>
> অন্যান্য সত্যনারায়ণ-পাঁচালি লেখক হইলেন— অযোধ্যারাম রায়, কবি

চন্দ্র। "দ্বিজ" রাম ভদ্র। "দ্বিজ" বিশ্বেশ্বর, ভারতচন্দ্র রায়, "দ্বিজ" জনার্দন। "দ্বিজ" অমর সিংহ, "দ্বিজ" রামচন্দ্র। দুর্গাপ্রসাদ ঘটক। ঈশান গোস্বামী, নরহরি, মধুসূদন, "দ্বিজ" কালিদাস, "দ্বিজ" বিশ্বনাথ গোবিন্দ ভাগবত, শিবচন্দ্র সেন, বিপ্রনাথ সেন "দ্বিজ" রাম কিশোর, লালা জয় নারায়ণ সেন, "দ্বিজ" রামনন্দ, "দ্বিজ" রঘুনাথ, "দ্বিজ" রামকৃষ্ণ, ফকিরচাঁদ, "দ্বিজ দীনরাম, নয়নানন্দ, "দ্বিজ" রঘুরাম, "দ্বিজ" হরিদাস, বিজয় ঠাকুর, শিবরাম রাজা, দেবকীনন্দন, গঙ্গারাম, শিবনারায়ণ, কুমদানন্দ দত্ত।[২৬]

আবদুল করিম কর্তৃক তাঁর পুঁথি পরিচিতি গ্রন্থে পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়— ওয়াজেদ আলি, শেখ তনু সেরবাজ চৌধুরী, গরীবুল্লাহ, আবার পঞ্চানন মণ্ডলের পুঁথি পরিচয়ে চৌদ্দটি পুঁথির সন্ধান পেয়েছেন তার মধ্যে তিন জনের নাম পাওয়া যায় খোকন রাম দাস, দ্বিজরাম প্রসাদ, হরেকৃষ্ণ দাস চক্রবর্তী ছাড়া বাকি এগারো জনের নাম অজ্ঞাত বলে উল্লেখ করেছেন। এছাড়া আরো যে সমস্ত পাঁচালির সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে আরিফ, দ্বিজ গুণনিধি, লালমোহন (চন্দ্র কেতুপালা), দয়াল [শঙ্কর গুড্যা পালা] শঙ্কর আচার্য (১০৬২ মল্লাব্দ, এছাড়া ভনিতায় এক ছোট পৃথক পাঁচালিও পাওয়া যায়), কৃষ্ণ হরিদাস, রঘুনাথ সার্বভৌম, তারিনী শঙ্কর ঘোষ, নন্দরাম মিত্র, দ্বিজ শুকদেব, বেচারাম, কৌতুকরাম চট্টোপাধ্যায়, কালাচাঁদ, জৈমিনী, কালীচরণ, মথুরেশ, নায়েক ময়াজ গাজী, রামানন্দ উল্লেখযোগ্য, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এর গ্রন্থ তালিকায় সত্যনারায়ণ বা সত্যপিরের কথা, ব্রতকথা বা পাঁচালি নামে চব্বিশটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। লেখকরা অক্ষয়কুমার বিদ্যাবিনোদ, মেঘনাদ ভট্টাচার্য, সরোজাক্ষ চক্রবর্তী, বৃন্দাবন চক্রবর্তী, যোগেন্দ্রনাথ কাব্য বিনোদ, রাধানাথ মিত্র, রাধামণি গঙ্গোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, বীরচন্দ্র চক্রবর্তী, গণপতি চক্রবর্তী, দ্বিজ কৃষ্ণধন, রাজকৃষ্ণ রায়, ঋষিকেশ দত্ত প্রমুখ।

বর্তমানে আরও দুটি পুঁথি পাওয়া গিয়েছে সম্পাদনা করেছেন কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন ও কুমুদবিহারী বসু।[২৭]

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শেষ কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরও সত্যনারায়ণ ব্রতকথা রচনা করেন। তাঁর কাব্যের ছত্রে ছত্রে দুই ধর্মের কথা তুলে সত্যনারায়ণ বন্দনা করেছেন; ঈশ্বরচন্দ্রর লেখা থেকে জানা যায় রামচন্দ্র মুনশির বাড়িতে ভারতচন্দ্র ফারসি ভাষা শিখতে যেতেন। আর বাড়িতে সত্যনারায়ণের পূজার জন্য একটি পুঁথি দরকার কোথাও পুঁথির খোঁজ না পাওয়া গেলে ভারতচন্দ্র বলেন তার বাড়িতে একখানা পুঁথি আছে, পূজার সময় তিনি বাড়ি থেকে পুঁথি এনে পাঠ করবেন। এরপর তিনি বাড়ি গিয়ে সত্যনারায়ণের পাঁচালি রচনা করে এনে ওই স্থানে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের পড়ে শোনান। যাহারা সেই কবিতা শ্রবণ করিলেন, তাহারা তাহাতেই মোহিত হইয়া সাধু সাধু ও ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন।'[২৮]

ভারতচন্দ্রের সত্যনারায়ণ ও বেশভুষায় উভয় সম্প্রদায়ের বলে প্রতিভাত হয়। যেমন—

'তেজঃ পুঞ্জ যেন রবি, মুখে বাকি পির নবি
নমাজে দর্গার চুমে মুনি।'

একই সুরে দরবেশ ও বাউল গেয়ে ওঠেন—

বাতেক বন্দেগী মোর সত্যপিরের পায়
তোমার আদেশে গান কৃষ্ণহরি দাস।

ডঃ সুকুমার সেন অবশ্য বলেছেন 'মুনি দেব দেবরস শশী হবে।'[২৯]

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তর মতে—

'বাংলায় সত্যপির বা সত্যনারায়ণের পূজাতে উভয় ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার ভাবটিই ধরা পড়ে। সত্যনারায়ণ ব্রতকথায় আছে—

"অতঃপর বন্দিব রাম রহিম রূপ
কোরান কেতাব আর কালিমা সংহতি।
সুবিখাঁ পিরের পায় প্রচুর প্রণতি
জয় জয় সত্যপির
সনাতন দস্তগীর
দেবাদেব জগতের নাথ।
পূর্বে হয়ে দশমূর্তি
করিলে আপন কীর্তি
সত্যপির হইলে ইদানীং।"[৩০]

মধ্যযুগের অন্ধকারময় ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার দিনে এইসব মুক্তমনা ও প্রগতি চিন্তার লেখকদের সাহসিকতা ও উদারতার কথা ভাবলে আজও আমাদের মুগ্ধ হতে হয়। এই মুগ্ধতায় আধুনিক বাংলা কাব্যের জগতের ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এই পাঁচালির কথা নতুন করে লেখেন ফুল ও শির্নি কবিতায়—

'গুল গুল আর গুলাবের বাস
মিলাও ধূপের ধূমে
সত্যপিরের প্রচারে প্রথমে
মোদেরি বঙ্গভূমে।
পূর্ণিমা রাতি পূর্ণ করিয়া
দাওগো হৃদয় প্রাণ
সত্যপিরের হুকুমে মিলেছে
হিন্দু মুসলমান।
পিরপুরাতন নূরনারায়ণ

সত্য সে সনাতন
হিন্দু মুসলমানের মিলনে
তিনি প্রসন্ন হন।'[৩১]

বনবিবি, দক্ষিণা রায় বা বড়-খাঁ-গাজি

হিন্দু-মুসলমান মিলনের আরও এক প্রতীক বনবিবি, দক্ষিণা বায়ু, বা গাজি খাঁ। পূর্বেও আলোচনায় এসেছে বাংলার মানুষ একই প্রাকৃতিক বাতাবরণে জীবন যাপন করার ফলে একই সমস্যা হিন্দু-মুসলমানকে বিদ্ধ করেছে, বাধ্য করেছে একসাথে সমস্যার মোকাবিলা করতে। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও কোমলতা বাঙালির জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছে। বৈচিত্র্যর কারণেই এখানে পির বা দেবতাদের এক লোকায়ত রূপ সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে বাংলায় এক বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ছিল, এর মধ্যে সুন্দরবন অঞ্চলও আছে। একথা প্রত্যেকেরই জানা আছে সুন্দরবন অঞ্চলের পৃথিবী বিখ্যাত 'রয়েল বেঙ্গল টাইগার' স্বভাবগতভাবে জন্ম থেকে হিংস্র এবং মানুষ খেকো। জিম করবেট দেখিয়েছেন বাঘ সাধারণভাবে মানুষ খায় না, কিন্তু সুন্দরবনের বাঘ তার ব্যতিক্রম। সুন্দরবন সংলগ্ন অঞ্চলে এই পির বা দেবতাদের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই অঞ্চলের মানুষকে কৃষিক্ষেত্রে, মাছ ধরতে বা অরণ্য সম্পদ সংগ্রহ করতে, প্রতি পদক্ষেপে জীবন হাতে নিয়ে চলতে হত। কারণ জলে কুমির ডাঙায় বাঘ-সাপের উপদ্রব এখানকার মানুষকে যেমন মরিয়া করেছে, তেমন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়ানো সমস্যাকুল উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ খুঁজে নিয়েছে তার লোকায়ত দেবতাকে। কবির ভাষায় ধরা পড়েছে এই মানুষদের জীবন সংগ্রাম।

বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া আমরা বাঁচিয়া আছি
আমরা হেলায় নাগের খেলায় নাগের মাথায় নাচি।

এ প্রসঙ্গে আহমদ সফির উক্তি প্রণিধানযোগ্য 'পির নারায়ণ সত্যর চেলা দেবতা হচ্ছে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণা রায়। বড়খাঁ গাজী, কুমির দেবতা কালু রায়, কালু গাজী-বনদেবী বনবিবি, ওলাদেবি, ওলা বিবি প্রভৃতি অনেক। এ পির নারায়ণ সত্য আশ্রয়ী হিন্দু-মুসলিমের মানসিক, আচারিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক মিলন হয়েছিল দক্ষিণ ও পশ্চিমবঙ্গে। আর নামে হিন্দু বা মুসলিম হলেও অভিন্ন ছিল আধ্যাত্মিকভাবে ও জীবনযাত্রায় বিভিন্ন গুরুবাদী বাউলরা।'[৩২] সুকুমার সেনের এ প্রসঙ্গে উক্তি স্মর্তব্য—

'পির খাঁ গাজীকে লইয়া দক্ষিণা রায় এবং পার্শ্ববর্তী সুন্দরবন অঞ্চলে অনেকগুলি গাথা কবিতা ছড়া লেখা হইয়াছিল। সুন্দরবনে হিন্দুর দেবতা দক্ষিণা রায় পির বড়খাঁ গাজির বিরোধ লইয়া বড় আকারের "গাজির গান" অর্থাৎ 'গাজি মঙ্গল' গুলি লেখা সুতরাং মুসলমান কবির গাজি মঙ্গল নিবন্ধককে হিন্দু কবির রায় মঙ্গল নিবন্ধের প্রতিরূপ বলা চলে। এই দুইজনের মধ্যে

সাধারণের ভূমিকা কালুর। কালু গাজী মঙ্গলে বড়খাঁর দোস্ত। রায়মঙ্গলে দক্ষিণা রায়ের মিত্র। রায়মঙ্গলে কালু কুম্ভীর দেবতা গাজীর মঙ্গলে তাহা নয় বটে, তবে জলের সঙ্গে একেবারে সম্পর্ক শূন্যও নয়। শিশু কালুকে পাওয়া গিয়াছিল সমুদ্রর তীর মাঞ্জসে। রায় মঙ্গলে হিন্দু ও মুসলমান দেবতার তুল্য মাহাত্ম্য ও সখ্য দেখাইয়া কাহিনি শেষ হইয়াছে, গাজী মঙ্গলে দক্ষিণা রায়ের পরাজয় স্বীকার। হিন্দুকে মুসলমান হিন্দু কন্যাকে মুসলমানের পাণিগ্রহণ করাইবার চেষ্টা গাজী মঙ্গলে প্রকট ইহা অবশ্য এই ধরনের কোনও কোনও আখ্যায়িকার সাধারণ লক্ষণ।'

'হিন্দু মুসলমান দেবতত্ত্বের অদ্ভুত খিচুড়ি পাকানো হইয়াছে আবদুল গফুরের রচনায়, গঙ্গা-দুর্গা-পদ্মা-শিব হইতে শাখোট বাসিনী বনদেবী পর্যন্ত প্রায় সব লৌকিক হিন্দু দেবতা গাজীর আত্মীয়রূপে উপস্থাপিত। প্রচুর বিকৃতি সত্ত্বেও জনপদ সংস্কৃতিতে একদিকের ভালো নমুনা হিসাবে এই কাহিনির মূল্য আছে।'[৩৩]

আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে—

'অতএব একান্তভাবে এই কাব্য ও দেবতা বাংলার বিশেষ একটি অঞ্চলের কল্পনা প্রসূত। নিম্নবর্গের মুসলমান সমাজকে আশ্রয় করিয়া বড় গাজি খাঁ, কালু গাজি, বনবিবি প্রভৃতির সঙ্গে দক্ষিণা রায় আজিও বাঁচিয়া আছেন। হিন্দু সমাজে বড়গাজি খাঁ, কালু গাজি খাঁর যেমন প্রতিপত্তি, তদ্দেশীয় মুসলমান সমাজে দক্ষিণা রায়েরও তেমন প্রতিপত্তি রহিয়াছে। সমগ্র চব্বিশ পরগনা ও মেদিনীপুরের দক্ষিণভাগে বড় গাজি, কালু গাজি ও দক্ষিণা রায় বাঘের দেবতা বলিয়া হিন্দু ও মুসলমান সমাজে সমভাবে শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন। সেই জন্য এই দেবতার সম্পর্কিত লোক সাহিত্য এই সমাজেরই উপাদানে গঠিত হইয়াছে।'[৩৪]

মোহম্মদ মুনশি 'বনবিবি জহুরা' নামে পুঁথি রচনা করেন। সে সময় ভাঙর অঞ্চল ছিল সুন্দর বন সংলগ্ন অঞ্চল। পির ভাঙর শাহ্ অনেক পথ অতিক্রম করে জল জঙ্গল অধ্যুষিত দক্ষিণবঙ্গের ভাঙর অঞ্চলে এসে অধিষ্ঠিত হলেন। এখানে উল্লেখ্য যে, অনেকে মনে করেন ভাঙর অঞ্চলের নামটি তাঁর নাম থেকে এসেছে। আলাহ'র নির্দেশে বনবিবিকে বঙ্গের দক্ষিণের জঙ্গলে জন্ম নিতে হয়। পির ভাঙর শাহর নিকটে এলে তিনি বলেন—

'কহেন ভাঙর শাহ্ শুন দিয়া মন।
এই তো ভাটির দেশ আইলে এখন।।'

বাঘ-সাপ ও কুমিরের হাত থেকে বাঁচার আশায় বনোপজীবীরা (কাঠ, মধু, মাছ সংগ্রহকারী) প্রবেশের পূর্বে ও পরে পির ভাঙর শাহর দরগায় পূজা দিতেন বিপদের প্রতি পদে পদে জীবনের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণে মানুষ লোকায়ত বিশ্বাসের কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ

করে। মনসামঙ্গলের উৎপত্তিস্থল দক্ষিণবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চল। নেতি ধোপানির ঘাট সহ বেশ কিছু লৌকিক নিদর্শন এখনও বর্তমান। এ অঞ্চলের মুসলমান ওঝারা সাপের বিষ নামাতে মনসার গান করেন, এ ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বর্তমান লেখকের আছে। এই অঞ্চলের একশ্রেণির গুণিন বা ফকির দেখা যায় যারা মন্ত্রের দ্বারা ভয়াল বন্য প্রাণীদের বশীভূত করতে পারে বলে স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস। একে 'বাঘ বন্ধন' বলে। ইছামতী নদীর চরে বনবিবির যান আছে—

'বহু দেখে বনবিবি রওয়ানা হইল
ভুর্কুণ্ডায় আপনার আসনে বসিল।'

মদিনা শহর ত্যাগ করে পির ভাঙর শাহ, জল জঙ্গলের দেশে এসেছিলেন সেকথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়ে ভাঙর শাহ যা বললেন, তার মধ্যে আছে সম্প্রীতির সুর।

এইত ভাটির দেশ আইলে এখন
নামেতে দক্ষিণা রায় ঈশ্বর ভাটির।
এসব জঙ্গল জান তাহার জায়গীর।।
চান্দখানি রায়মঙ্গল শিবদাহ আর।
প্রথমে এসব ঠাঁই কর এক্তিয়ার।।
তা বাদে জুড়িতে গিয়া আসন করিবে
সেথা হইতে খবরদার আগে না বাড়িবে।।[৩৩]

বনবিবি নাটকের রচয়িতা সতীশচন্দ্র চৌধুরী। এটি ১৩১৬ সালে লেখা। পঞ্চমাঙ্কের এই নাটকে গানের মাধ্যমে পির বা দেবতার স্তুতি আছে।

'আর যত পির ফেরেশতা আছে ত্রিভুবন।
নত শিরে আজ্জি দীন করে আবাহন।'

দেব স্তুতি করতে গিয়ে অপর একটি নাটিকায় উল্লেখিত হয়েছে, এটি সম্ভবত বয়নুদ্দিন রচিত বনবিবির জহুরানামার শেষাংশ।

'বন্দি মাতঃ বনবিবি বিপদবারিণী।
আশীষ যাচে মা দীন তাপিত তারিণী।।
মূঢ়মতি হীনগতি
না জানি মা স্তুতিনতি,
(ওমা) দাসে দয়া দান সতী জগৎজননী।।
(দীন) সতীশ সভয়ে স্মরে মহিমা বাখালি।।

হিন্দু মুসলমান উভয়ের উপাচারেই এই পূজা সম্পন্ন হয়, তাই এই পূজা মিলিয়েছে উভয় সম্প্রদায়-কে। অবশ্য কুমির দেবতাকে ক্ষেত্র পাল অথবা পির বানানো বাংলা দেশেরই

বিশেষত্ব নয়। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন,— 'করাচীয় তিন ক্রোশ উত্তার মগর (কুম্ভীর) পির নামক এক উপত্যকা আছে তাহা দর্শনীয়।'[৩৬] হারাধন দত্ত কৃত গড় মান্দারন ও জাহানাবাদের ইতিবৃত্ত প্রবন্ধে (জন্মভূমি জ্যৈষ্ঠ ১৩০২) দেখা যায়—

> 'বাঙ্গালার প্রাচীন পির স্থানের সংলগ্ন দীর্ঘকায় পূর্বে পোষা কুম্ভীর থাকিত এবং লোকে মানসিক করিয়া হাঁস মুরগী উপহার দিত।'[৩৭]

সাধারণত, বনভূমির উপর প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল, প্রতি পদক্ষেপে যাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেঁচে থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না, সেই সুন্দরবন সংলগ্ন অন্ত্যজ মানুষ এইসব লোকদেবতাকে গ্রহণ করেছিল। সুকুমার সেনের ভাষায়—

> 'চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অংশে অনেক গ্রামেই দক্ষিণা রায়ের থান আছে; সাধারণত বনাঞ্চলের মউল্যা মলঙ্গী। পোদ, বাগদি, কাঠুরিয়া, শিকারি, বুনো, নৌজীবী প্রভৃতি লোকই ইহার পূজা করে। ইঁহার পূজাবিধিও বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ওই অঞ্চলে মুসলমানেরা ইহাকে পির গাজীর ন্যায় ভক্তি করে পূজা দেয়।'[৩৮]

পূজা শেষে ব্রাহ্মণ পূজারি বা মুসলমান ফকিররা পাঁচালির মতো সুর করে বলেন—

> 'গাজি মিঞা হাজোতে সিন্নি সম্পন্ন হল
> হিন্দুগণে বলো হরি মোমিনে আল্লা বলো।।'

গোরাচাঁদ পির

গোরাচাঁদ পির মাহাত্ম্য কথা—

> মহাতীর্থ বারাসত কামদেবপুর।
> তাহাতে বসতি নিত্য করেন ঠাকুর।।
> অধি-ব্যাধি লয়ে সবে ছুটে যায় যবে।
> ঠাকুর বলেন তাহা কীসে ভালো হবে।।
> জর্জরিত অস্থিসার ক্ষীণকায় দেহ।
> মুহূর্তে সজীব হয় পেয়ে তাঁর স্নেহ।।
> হতবুদ্ধি উন্মাদের ফিরে আসে জ্ঞান।
> সবে তাই করে নিত্য ঠাকুরের ধ্যান।।
> মহাশক্তি কালিকার করো মানসিক।
> ঠাকুর বলেন সবই হয়ে যাবে ঠিক।
> ভক্তিভরে পূজ সবে কর গো প্রার্থনা।
> আপনি পুরিবে জেনো সকল কামনা।।

শ্রদ্ধাভরে দেবতায় যদি ডাকি সবে।
অমনি শুনিবে কীসে ব্যাধি মুক্ত হবে।।
ত্রিতাপে তপিত যারা এস নতশির।
এখানে আছেন প্রভু গোরাচাঁদ পির।।
সেবাইত নিত্য তাঁর বাবাজি ফকির
সদাহাস্যময় আর অতি নম্রধীর।।
সকলি যেন তাঁর আপন সন্তান।
বরাভয় দেন তিনি দিয়ে মন প্রাণ।।
যার যা অব্যর্থ সেই মহা মহৌষধ।
অকাতরে দেন তিনি ঘুচাতে আপদ।।
পার্যদ তাঁহার যাঁরা তাঁরাও অতুল।
সবাই মিলায়ে যেন অকূলের কূল।।
এসো তবে মুক্ত করে বলি সবে ভাই।
চরণে তোমার পির দাও মোর ঠাঁই।।
জীবন কল্যাণে তুমি হয়ে আবির্ভূত।
করেছ আপন দুঃখ নিত্য তিরোহিত।।
ঈশ্বর আল্লার তুমি পূণ্য অবতার।
কহিছ আপন শিরে মহাগুরু ভার।।
অভিষ্ট পুরাও তুমি ওগো শক্তিমান।
সমূহ বিপদ হতে করো পরিত্রাণ।।
কৃপা করে সংশয়ের ঘুচাও সংশয়।
ধিক্কৃত জীবন পুনঃ কর মধুময়।।
তোমার মাহাত্ম্য রচি হেন সাধ্য নাই।
চরণে তোমার শুধু দাও মোরে ঠাঁই।
বাণীতে তোমার দাও অমৃতের স্বাদ।
ক্ষুদ্র মতি আমাদের ঘুচাও প্রমাদ।।
আশীর্বাদ কর যেন ভক্তি আসে প্রাণে
চিত্ত হয় মুখরিত তব জয়গানে।।

১৫ই ফাল্গুন ১৩৭০সাল

কৃপাধন্য
সত্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

এই প্রশস্তি পত্রটি বারাসাত কামদেবপুর গোরাচাঁদ পিরের মাজারের দেওয়ালে খোদিত আছে। কথিত আছে উক্তব্যক্তি এই মাজারের ওষুধ খাবার পর তার মস্তিষ্ক বিকৃতি সেরে গেলে তিনি এই প্রশস্তি পত্রটি লেখেন। শুনে আরও আশ্চর্য হতে হয় এই মাজারের প্রধান সেবায়েতের নাম সূর্যকান্ত মাইতি।

শোনা যায় পির গোরাচাঁদ আনুমানিক ১৩০২-২২ খ্রিস্টাব্দে আরও একুশ জন সুফির সাথে এদেশে বগলান্ডা পরগনায় আগমন করেছিলেন। সেইসময় গৌড়ের সুলতান ছিলেন সামসুদ্দিন ফিরোজ শাহ। মহিউদ্দিন ওস্তাগর লিখিত শাহ ঠাকুর বর নামক পুস্তক থেকে জানা যায় তিনি চিরকুমার ছিলেন এবং হজরত শাহ জালালের কাছ থেকে তিনি কাদারিয়া তরিকার সুফিমতে দীঘা নিয়ে ২৪ পরগনা জেলার বারাসাত সংলগ্ন অঞ্চলে ধর্মপ্রচারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন।

পির গৌরাচাঁদ দেউলার স্বাধীন রাজা চন্দ্রকেতুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাতে সক্ষম না হলেও তাঁর প্রভাবে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা চন্দ্রকেতু অভিশপ্ত হয়ে সপরিবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পির গোরাচাঁদ অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে ১৩৭৩ সালের ১১ ফাল্গুন আকানন্দ বাকানন্দের সাথে যুদ্ধে নিহত হন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল আশি বছর। জটার দেউলের কাছে প্রাপ্ত তাম্রলিপি থেকে জানা যায় ৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে জয়ন্তচন্দ্র নামে জনৈক রাজা এই মন্দিরটি নির্মাণ করেছিলেন।[৩৯] এ সম্পর্কে অবশ্য ভিন্ন মতও প্রচারিত আছে। প্রথমোক্ত কাহিনি থেকে যে মত প্রতিষ্ঠিত হয় তা হল, মুসলমানের পির গোরাচাঁদ পরে হিন্দুর আরাধ্য দেবতা হয়ে ২৪ পরগনা ও বর্ধমান জেলায় উভয় দেবতার কাছে পূজিত হয়ে আসছেন। অপর মতটি হল পির গোরাচাঁদ প্রথম জীবনে হিন্দু ছিলেন পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যায় 'গোরাচাঁদের মূর্তি আছে কিন্তু বিরল। গোরাচাঁদের যোদ্ধা মূর্তিই দেখা যায়, আকৃতি বেশ সুন্দর ও বীরোচিত [পরিধানে চোগা চাপকান মাথায় পাগড়ি হাতে তলোয়ার বাহন ঘোড়া] ব্যাঘ্র বাহন মূর্তি বর্তমানে অতি বিরল।'[৪০] এখানেও সমস্ত ধর্মের সমন্বয়ের গান ধ্বনিত হয়ে আসছে। বাংলা ১৩৭২ সালের ১২ ফাল্গুন তারিখে শালিপুর গ্রাম নিবাসী মহম্মদ নরিম মোল্লা যে প্রার্থনা কবিতা নিম্নরূপ—

'বারুই ফাল্গুন গোরাচাঁদ বাবার
সমাধি মাঝার শরিফের ডাক
এস প্রেম বুল বুল করো নাকো ভুল
আব্বাস আলি ওরফে গোরাচাঁদ বলে
কণ্ঠ ফাটিয়ে ডাক।।
এস এস ইংরাজ এস খ্রিস্টান
এস হিন্দু মুসলমান।।

একই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ আমরা
পাক পবিত্র সমান।'[৪১]

১২ ও ১৩ ফাল্গুন পির গোরাচাঁদের উরস-এ সকল ধর্মমতের মানুষ সমবেত হন। একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার, মুনশি আহম্মদ শাহজি তাঁর গ্রন্থে বলেছেন 'পূজা বা হাজোতের কর্তা সব ক্ষেত্রেই মুসলমান ফকির', এর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ কামদেবপুর মাজারের পূর্বে উল্লিখিত সেবায়েত সূর্যকান্ত মাইতি। একটি বন্দনা গানে পির গোরাচাঁদের হত্যাকারী অকানন্দ বাকানন্দকে রাবণের শ্যালক বলে বর্ণনা করা হয়েছে। হিন্দু সমাজে রাবণ দুষ্কৃতি হিসাবে বর্ণিত হয়ে আসছে।

গোরাচাঁদ একদিন রহিল অনেক দূর।
গোরা গেল বালান্ডায় একদিন আনারপুর।।
হেতে গড়ে যেতে গোরার মা দিয়েছে বাধা।
হেতে গড়ে যায় না গোরা আছে হারামজাদা।।
মায়ের বাধা গোরাচাঁদ না শুনিল কানে।
আকনের সঙ্গে যুদ্ধ হইল হেনকালে।।
আকানন্দ বাকানন্দ রাবণের শালা।
তার সঙ্গে যুদ্ধ হল আড়াই পক্ষ বেলা।।
কি জানি আল্লার মর্জি নসিবের ফের
চোকাবানে গোরচাঁদের কাটা গেল ছের।।[৪২]

সমগ্র বারাসাত ও বসিরহাট অঞ্চলে গোরাচাঁদ পিরের অনেক মাজার বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে রয়েছে, হাড়োয়াতে পিরের সমাধি স্থলেও রয়েছে একটি বড়ো মাজার সব সম্প্রদায়ের মানুষ মুশকিল আসান হবে এই প্রত্যাশায় পিরের মাজারে ধূপ জ্বালিয়ে শিরনি দেয়। কিছুকাল পূর্বে, বছর তিরিশ-চল্লিশ পূর্বেও কলকাতার অনেক পল্লিতে সন্ধ্যার সময় এক শ্রেণির ফকির দেখা যেত। তাদের পরিধানে থাকত কালো রঙের আলখাল্লা, পায়জামা মাথায় টুপি গলায় পুঁতির মালা, এক হাতে আশদণ্ড বা ময়ূরপুচ্ছের চামর অপর হাতে ধূমায়িত ধুনুচি। তারা সকলের বাড়ির সামনে পির গোরাচাঁদ মুশকিল আসান বলে পাঁচালির সুরে ছড়া গাইত। গোরাচাঁদ পিরের মাজারগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ও জাগ্রত বলে কামদেবপুরের খ্যাতি আছে। বালক বয়সে একটা জনশ্রুতি এই দরগা নিয়ে শুনেছি। বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয়তম অভিনেত্রী সুচিত্রা সেন লিউকোমিয়া (ব্লাড ক্যান্সার) রোগে আক্রান্ত হয়ে এই দরগায় এসে শিরনি দেন। জনশ্রুতি বিদেশে চিকিৎসা করিয়ে আসা সুচিত্রা এর পর আরোগ্য লাভ করেন।

হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি গোরাচাঁদ পিরকে নিয়ে কোন পর্যায়ে পৌঁছেছিল তার উদাহরণ নিম্নোক্ত গানে পাওয়া যায়। ১৯৬৯ সালের ১২ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বারাসাত

চাঁপাডালির মোড়ে এক সমাবেশে শাসন গ্রামের তৈয়র আলি নিজেকে পির গোরাচাঁদের ফকির বলে বর্ণনা করে গানটি গাইলেন।

মরুতে এলেন মোহাম্মদ মথুরাতে এলেন শ্যাম।
ইমাম খেলা খেলেন রসুল লীলা খেলেন ঘনশ্যাম।।
মা খোদেজা পাগল হল নবীর প্রেমে মদিনায়
বাঁশীর সুরে পাগল হয়ে রাধা চলে যমুনায়।।
দুই রাখালে মজিয়ে মন গরু আর ভেড়া চড়ায়।।
আয়রে তোরা দেখে যারে হিন্দু আর মোছলমান।
মদিনা আর মথুরা হয় যে সেথা যুগল মিলন।।
বলরাম আর বসুরাম, রঘুরাম আর বলরাম।
ইমান খেলা খেলেন রসুল লীলা খেলেন ঘনশ্যাম।।
একই মায়ের দুগ্ধ পিয়ে মোরা হিন্দু-মুসলমান।।
ভুলে গিয়ে রেষারেষি হিন্দুস্থান আর পাকিস্তান।
ভুলে গিয়ে রেষারেষি পড় কুরান আর সে পুরাণ।
মরুতে এলেন মোহাম্মদ মথুরাতে এলেন শ্যাম।
ইমান খেলা খেলেন রসুল লীলা খেলেন ঘনশ্যাম।

বদর পির

'চাই দিক মানি আমি মন কৈলাম স্থির।
মাথার উপরে মানস আশি হাজার পির।।
'আশি হাজার পির মানস লাখ পেকাম্বর।
শিবের উপরে মানস চাটীগাঁর বদর।'

বাংলা নদীমাতৃক দেশ। এই নদীকে কেন্দ্র করে বাংলার সভ্যতা-সংস্কৃতি বিকশিত হয়েছে। উত্তাল দরিয়ায় বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ বক্ষে উথাল পাথাল নাওকে রক্ষা করতে হিন্দু মুসলমান মাঝিরা বিপদের ত্রাণ কর্তা ভেবে 'বদর-বদর' বলে পিরকে স্মরণ করে।

সমুদ্র তীরবর্তী বন্দর চট্টগ্রাম শহরে আবির্ভাব বদর পিরের। অপর একজন সুফির সাথে তিনি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে উপনীত হন। তাঁর নাম মখদুম শাহ্ বদরুদ্দিন বদর আলম জাহিদি। বদল খান গাজীর সমসাময়িক দরবেশ বদর আলম এবং মখদুম শাহ বদর আলম জাহিদি একই ব্যক্তি বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক,— কারণ উভয়ের আগমনের সময়কাল এক। শাহ্ বদরকে চট্টগ্রামে ইসলাম বিজয়ের অগ্রগণ্য পথিকৃৎও বলা হয়। চট্টগ্রামে আনোয়ারি থানার বটতলি গ্রামে মহসীন আউলিয়ার বটতলি গ্রামে মহসীন

আউলিয়ার মাজারে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, পির বদরশাহ ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে জীবিত ছিলেন। চট্টগ্রাম শহরের মধ্যবর্তী বকশিবাজারের দক্ষিণে তাঁর প্রসিদ্ধ দরগাহ বর্তমান। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই এই দরগায় শ্রদ্ধা জানায়। চট্টগ্রামের ভক্তগণ তাঁকে 'ওলি' (অভিভাবক) বলে সম্বোধন করেন। পূর্ববঙ্গের মাঝি মাল্লারা তাঁর নামে নদী-সমুদ্রে পাড়ি দেন। বর্তমান চট্টগ্রামের যে পাহাড়টি পির পাহাড় নামে প্রসিদ্ধ, কথিত আছে তিনি সেখান থেকে জিন-পরিদের তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই পাহাড়টি এককালে আরাকানের মগদস্যুদের আড্ডা ছিল। অনুমিত হয় যে ওই অঞ্চল থেকে জিন-পরি নয় মগ দস্যুদের বিতাড়ন কালে পির বদরের সাথে তাদের সংঘর্ষ হয়েছিল।[৪৩] মগ দস্যুদের বিতারণের শুধুমাত্র মাঝিমাল্লাই নয় জলপথ স্থলপথে বাণিজ্যকারীরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। অনেকদূর পথে বাণিজ্য করার সুবাদে যেমন তাদের ধনাগম হল তেমনই তাঁদের রক্ষাকারী বদর পিরের নাম দেশদেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে ব্যবসায়ীরা তাদের সম্পদ রক্ষা পাওয়া তারা বদর পিরকে মেনে নিল। মাঝি-মাল্লারা নির্ভয়ে নৌকার পাল উড়িয়ে দিল ও সেই সাথে বদর পিরের মহিমা কীর্তন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে দিল।

মানিক পির

মানিকপির হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছে সমানভাবে পূজ্য। বাংলার এই লোক দেবতা গৃহপালিত পশু বিশেষত গো-ধন রক্ষার দেবতা বলেই পূজিত হন। বৈচিত্র্যের দিক থেকে মানিক পির অন্য পিরদের থেকে ভিন্ন। অনেক গবেষকের মতে মানিক পিরের সাথে বাংলার কোনও সম্পর্কই নেই। সুফিদের সকলের স্বীকৃত এই এসেছে গ্রিক শব্দ মানিকি থেকে। ড: সুকুমার সেনের মতে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় শতাব্দীতে জরুথ্রুস্টীয় ও খ্রিস্টীয় ধর্মের সংমিশ্রণে এই ধারার প্রবর্তন হয়—

> 'সত্যপির যেমন জোরাতালি (composite) দেবতা মানিকপির তেমন নয়, মানিক সুফিদের স্বীকৃত এক পির। তিনি অনেকটা যিশুর স্থানীয়। কখনও কখনও তিনি যিশুর ("ইশা"নবির) সঙ্গে অভিন্ন। মানিক পিরের নামে (মাণিক্য) শব্দের কোনও সম্পর্ক নাই। ইহা আসিয়াছে মানিকি (Manichee, গ্রিক Manıkhaios) হইতে। (ইনি ইরানের লোক ছিলেন এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শতাব্দীতে জরুথ্রুস্টীয় ও খ্রিস্ট ধর্মের সংমিশ্রণে নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করিয়াছিলেন সুফিরা মানিকিকে পির বলিয়া এবং যিশুর মতো দয়ালু ও ব্যাধিনিবারক মহাপুরুষ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।'[৪৪]

গিরীন্দ্রনাথ দাস লিখছেন 'কেহ বলেন মানিকপির হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁর পিতার নাম

মনোহর সওদাগর।[৪৫] আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্যেও মানিক পিরের উল্লেখ আছে। দীনবন্ধু মিত্রের "জামাই বারিক" নাটকে মানিকপিরের উল্লেখ আছে।

ধুয়া : মানিকপির, ভবপারে যাবার লা।
জয়নাল ফকিরি নেলে, ফেনি খালে না।।[৪৬]

মানিকপিরের পুঁথিতেও পাওয়া যায় সমন্বয়ের ধারা—

মানিকের নামে তোমরা হেলা করো না।
মানিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না।
ভক্তের ভগবান তিনি অভক্তের নয়
ভক্তিভাবে যেবা ডাকে তার বাড়ি যায়
মানিকের নামে চাল পয়সা যে করিবে দান
তাইলে হবে গরু-বাছুর খেতে ফলবে ধান।।

বারুইপুরের মোহাম্মদ পিজিরুদ্দিন মানিকপিরের পাঁচালির একজন রচয়িতা। এছাড়াও জয়রুদ্দিন, নসর শহিদ, বয়নদ্দিন ও নওয়াজ প্রমুখ পাঁচালি, কেচ্ছা, পুঁথি লেখেন। লোককাহিনির মধ্যে ক্ষুদ্র স্বার্থপরায়ণতার সাথে মানবিকতা ও উদারতার দ্বন্দ্ব দেখানো হয়েছে। পির এক বৃদ্ধা গোয়ালিনির কাছে দুধ চাইলে তিনি এক শতছিদ্র ভাঁড়ে করে যতবাব দুধ এনে দেয় ততবার ভাঁড় শূন্য থাকে। শেষে অতিথি অভুক্ত থাকবে এই ভেবে বৃদ্ধার দয়াশীলা পুত্রবধূ একটা ছোটভাঁড়ে করে দুধ এনে দেয়। ভাঁড় পিরের হাতে দেওয়া মাত্র ওই দুধ কয়েকগুণ হয়ে যায়। পির ও অন্য ফকিররা সেই দুধ তৃপ্তি সহকারে পান করে বধূকে আশীর্বাদ করেন।

'জন্মাবধি থাক তুমি এয়ো স্ত্রী হইয়া
যেই মাত্র মানিক জেন্দা মাথায় হাত দিল
দেখিয়া সে গোয়ালিনি বড় গোস্সা হইল।'

বৃদ্ধা গোয়ালিনি ও গোরু মরার পর বধূর প্রতিক্রিয়া—

'ঘরে মৈল গোয়ালিনি বাইরে মৈল গাই।
কতেক বাছুর মৈল লেখা-জোখা নাই।।
সনকা বলে আমি কি বলিব আর।
মানিকের তল্লাসেতে যাই এইবার।।[৪৭]

অথবা 'মানিকপির শাহাপির বন্দো দুই ভাই
মারিয়া মাঠের গাভী দিয়াছে জীবাই।'[৪৮]

এই অংশ উল্লেখের প্রধান কারণ হিন্দু গৃহস্থ গোরুকে দেবজ্ঞানে পূজা করে। আর এই পূজা বা গো-ধন রক্ষার চেষ্টা শুধু হিন্দু একা নয় মুসলমান সম্প্রদায়েও সদা তৎপর থাকে। গ্রামীণ কৃষিনির্ভর অর্থনীতিতে গোরু একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। হিন্দু-

মুসলমান সবকৃষকের ঘরেই আবশ্যিকভাবে গোয়াল থাকত। গোরু যেমন দুধ দেয়, তেমন বলদ ভিন্ন কৃষিকাজ সে যুগে অসম্ভব ছিল। গোয়ালারাই শুধু নয় কৃষিজীবী পরিবারও দুধ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করত। বাংলায় দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন দ্রব্যের যত রকম প্রকার ভেদ আছে তা বিশ্বের আর কোথাও পাওয়া যাবে না। দুগ্ধজাত মিষ্টান্ন দ্রব্যের চাহিদা বাংলার উৎসবে পার্বনে চিরকাল ছিল। সুতরাং গোরু গ্রামীণ অর্থনীতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। প্রয়োজনে পির সাহিত্য তাই মঙ্গল চণ্ডীকেও আহ্বান করে।

'মহিমাই চণ্ডী ঠাকুরানি তোমাকে বুঝাই
আজি যদি বাঁচি মাগো কালির ঘরে যাই।'

লোকায়ত ধর্মের মহিমাই এখানে অন্ত্যজ দরিদ্র মানুষ প্রয়োজনে সাম্প্রদায়িক বাধার দেওয়াল ভেঙে মিলনের গাথা সৃষ্টি করে, আর তার মহত্ত্বও এরমধ্যেই নিহিত থাকে। সত্যেন রায় সংগৃহীত শেষ অনুচ্ছেদে তা পরিষ্কার বোঝা যাবে।

'মানিকের নামে তোমরা হেলা করো না
মানিকের নাম থাকলে বিপদ হবে না।।
ভক্তির ভগবান তিনি অভক্তের নয়।
ভক্তিরূপে যেবা ডাকে তার বাড়ি যায়।।
মানিকের নামে চাল পয়সা যে করিবে দান
তাইলে হবে গোরু-বাছুর খেতে ফলবে ধান।' (সংগ্রহ : সত্যেনরায়)

মাদার পির

বর্তমান প্রবন্ধে সেই সব পির বা লোকায়ত দেবতাদের কথা আলোচিত হচ্ছে, যাদের হিন্দু মুসলমান উভয়েই পূজা দেয়, মাদার পির তাদের মধ্যে একজন। মাদার পির সম্পর্কে যে লোককথা আছে তা সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন সুকুমার সেন ইসলামি বাংলা সাহিত্য পর্যালোচনায়। এটি অবশ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন ছায়াদ আলি খোন্দকারের শাহ মাদারের কাহিনি থেকে। আল্লার প্রিয় ফেরেনি হারুত আর মারুত। একদা তাদের খেয়াল হল আদম ও হাওয়ার মধ্যে সম্পর্ক কেমন জানতে। এ কৌতূহলের প্রশ্রয় দিতে আল্লা তাদের নিষেধ করলেন। তারা আবদার ছাড়ল না। আল্লার ফরমানে ফেরেশতা দুজন আসমান থেকে জমিনে পড়ল।[৪১]

'হারুত হইল মরদ মারুত আওরত
দুই জনা জরু খছম হইল খুবহরত।'

মাদার পির সুফি তরিকার অন্যতম বিভাগ মদারিয়া তরিকার প্রবর্তক, ড: এনামুল হক প্রমুখ পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, ফরিদপুর জেলার মাদারিপুর, চট্টগ্রাম জেলার মাদার

বাড়ি এবং মাদারশা ইত্যাদি এলাকা মাদার পিরের স্মৃতি বহন করছে [সুফিবাদ ও আমাদের সমাজ : শেখ শরফুদ্দিনের প্রবন্ধ]

আল্লাহ হুকুমে গর্ভ হল কিন্তু তা আর মোচন হয় না। মুশকিল মনে করে আল্লার নাম করে কেঁদে গড়াগড়ি দিতে লাগল, শুনে আল্লার দয়া হল।

'মগরবের ওক্তে হুকুম হৈল ফেরেশতায়
আচ্ছা করে বান্ধ কসে মজবুত দোহায়
...মজবুত করিয়া জিঞ্জির হাতে পায়ে দিবে
দুইজনে একসাথে মড়স্বা করিবে।'

একথা শুনে ভয়েই মারুতের গর্ভপাত হল। নবজাত শিশুকে একটা মাদার গাছের তলায় ফেলে রেখে তারা দুজনেই পালায়। হজরত আলি তাকে কুড়িয়ে পেয়ে ফতেমাকে মানুষ করতে দেন। এখানে একটা জিনিস লক্ষ করবার আছে মুসলিম মাইথলজিতে এই ঘটনার হদিশ নেই, বাংলায় এসে এ গল্প পল্লবিত হয়েছে। মাদার গাছের তলায় শিশুকে কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল বলে শিশুর নাম হল মাদার। পরে কঠোর সাধনার দ্বারা তিনি মাদার পির হন। উত্তর ২৪ পরগনার শাসন অঞ্চলে এই পিরের একটা বড় মাজার আছে। এর দুজন সেবায়েত ভুলু মণ্ডল ও মুজিত আলি। এই মাজারে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায় মানত করে, শিরনি দেয়, পূজা করে।

কলেরা-বসন্ত প্রভৃতি মহামারি থেকে পরিবারবর্গ ও গ্রামকে বাঁচানোর জন্য মাদার পিরকে মানত করা হয়। কলেরা (এই রোগজীবানুর উৎপত্তিস্থল বাংলা) বসন্ত রোগে প্রতি বছরই গ্রামের পর গ্রাম উজার হয়ে যেত। রোগ প্রতিরোধের কোনও সক্রিয় ব্যবস্থা মানুষের হাতে ছিল না, তাই সমর্পণ করত লোকায়ত দেবতাদের কাছে। অবশ্য কলেরার জন ওলা বিবি বসন্তব জন্য শীতলা নামক লৌকিক দেবতা ছিল যা এই নিম্নবর্গের মানুষদেরই সৃষ্টি। সাধারণের কাছে মাদার পিরের শ্রেষ্ঠত্বের দোঁহা যা মাদার পিরের গান বলে প্রচারিত। এই গানের শিল্পী ও শ্রোতা হিন্দু মুসলমান উভয়েই। মূল গায়ক ছাড়াও এইদলে দু-তিন জন দোঁহারও থাকে। উল্লেখযোগ্য যে, এই গানে শ্যামাসঙ্গীতের কথা ও সুর ব্যবহৃত হয়।

মাদার পির সম্পর্কে একটি প্রচলিত লোককথা বলে এ প্রসঙ্গে শেষ করব। 'বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ গ্রামের সাধারণ ভক্তগণ জনৈক মৌলবির পরামর্শে মাদার শাহের প্রতি কোনও এক প্রকারের অসম্মান প্রকাশ কারণ। পরের ঘটনা এই যে মালঞ্চ গ্রামের পার্শ্ববর্তী নদীতে তীব্র আকারের ভাঙন দেখা দেয়, তার তীব্রতা এতই যে গ্রামের অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে। গ্রামের অধিবাসীগণ এই বিপদের কারণ অনুসন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে আসেন মাদার পিরের দরগায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলে এই বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে গ্রামের মানুষ পিরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলে ভাঙন রোধ তো হয়ই, এমনকী ভাঙা অংশ পূরণ হয়ে যায়।'[৫০]

একদিল পির শাহ

গোরাচাঁদ পিরের সাথে যারা ভারতে বিশেষত বাংলায় প্রবেশ করেছিলেন বলে কথিত আছে, তাঁদের অনেকেই হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের কাছ থেকে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম একজন হলেন একদিল পির। গোরাচাঁদ পিরের মতো তাঁরও জন্ম সময় ও স্থানের ঐতিহাসিক কোনও ভিত্তি নেই। তিনিও বারাসাত অঞ্চলে দরবেশ হয়ে সুফি মত প্রসারের কাজ করতেন।

> 'সুফি সম্প্রদায় প্রধানত দুভাগে বিভক্ত হয়—বা-শরা অর্থাৎ যারা ইসলামি আইন-কানুন (শর) অনুসরণ করতেন এবং বে-শরা অর্থাৎ যাঁরা শরার দ্বারা আবদ্ধ ছিলেন না। ভারতে দ্বিতীয় দলভুক্ত ছিলেন দরবেশরা। যদিও এইসব দরবেশ কোনও সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেননি তবুও তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমান বা হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ের শ্রদ্ধার পাত্র।'[৫১]

কথিত আছে এ অঞ্চলের অত্যাচারী দস্যু চাঁদ খাঁর অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হন। শুধু তাই নয় চাঁদ খাঁর উদ্যোগে এক বিশাল মসজিদ নির্মাণ কার্য চলছিল। তিনি স্থানীয় মানুষদের সাথে নিয়ে দস্যুর তৈরি এই মসজিদ নাজায়েজ এই অভিযোগে নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন। যদিও গোঁরা শরিয়তি মুসলমানরা পিরের এই কাজ ইসলাম বিরোধী মনে করতেন। কিন্তু একদিন পিরের এই অসাধারণ দৃঢ়তার জন্য অত্যাচারিত হিন্দু মুসলমানের গভীর আস্থা অর্জন করলেন। জনতার সম্মিলিত প্রতিরোধে চাঁদ খাঁর দলবল পিছু হঠতে বাধ্য হয়। এর ফলে হিন্দু সমাজের এতখানি আস্থা অর্জিত হয়েছিল যে স্থানীয় জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁর মাজার তৈরির জন্য নশো উনত্রিশ বিঘা জমি দান করেছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি এ অঞ্চলের হিন্দু মুসলমান সমন্বয়ের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। বহুকাল থেকে এখানে চালু প্রথা আছে যে, উরস-এর সময় প্রথম শিরনি চরান উক্ত জমিদার বাড়ির লোকজন। শোনা যায় রাজা রামমোহন রায়ের প্রপৌত্র প্যারিমোহন রায়ের দত্তক পুত্র ধরণীমোহন রায় একাজ করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর সেরেস্তা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন।

উরস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত গানের মধ্যে দিয়ে পির মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়। এখানে উল্লেখ্য যে পির মাহাত্ম্য পুঁথিতে ও গানে বৈষ্ণব পদাবলির ভাব বাংলার লোক ধর্মমঙ্গল কাব্যের ভাব ধারা তুলে ধরা হয়েছে। যেমন পাঁচালির ঢঙে বলা হয়েছে—

> 'আল্লা নবীর নাম হবে বল সর্বজন
> একদিনের জন্ম পালা হৈল সমাপন।'

শুধু কৃষিজীবী নয় সমস্ত বাঙালি হিন্দুর গৃহেই লক্ষ্মীদেবীর অধিষ্ঠান। তিনি এখানে পির সম্বলিত গানেও অধিষ্ঠিত।

'পিরের দোয়ায় আর লক্ষ্মীর বরেতে
যেমন আছিল ধান হইল সেই মতে।'

গ্রাম বাংলার সমাজচিত্রের বর্ণনাও এই পুঁথিতে আছে—

'আর এক বাঘ এল কপালে তার চিত
কেড়ে খায় কোলের ছেলে বসে গায় গীত
তার পাছে আসে বাঘ খেতের আলে
এছা কিল মারে যেন বোরে ধান্য রোয়।'

বিদ্যাপতির মঙ্গল কাব্যের ঢঙে বলা হয়েছে—

'তুমি তো জান না স্বামী নারীর গোঁসাই।।
তুমি বিনে নারীদের কোনও লক্ষ্য নাই
শীতের ওড়ন স্বামী গিরীশের বাও
অসমের কান্ডারি সেতারের নাও।'

একই সাথে বৈষ্ণব পদাবলির ভাব ও ছন্দ আছে

'মরির মরিব সখি মরিব নিশ্চয়ই মরিব
কানু হেন গুণ নিধি কারে দিয়ে যাব!'[৫২]

সম্প্রীতির এই উদারতা, মিলনের গাথা বাংলা ও বাঙালির বাইরে আর কোথাও ভাবা যায় না।

পঞ্চ পির

পরিশেষে; বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আত্মজর মঙ্গল কামনায় হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে 'পঞ্চপির'কে স্মরণ করে। মাঝিরা অকূল দরিয়ায় নাও ভাসানোর আগে 'পঞ্চপির'কে স্মরণ করে বদর-বদর বলে হাঁক মারে। অনেকে পঞ্চপিরকে পঞ্চপাণ্ডব বলে মনে করেন, যদিও এর কোনও সত্যতা নেই। জেমস ওয়াইজ এই পঞ্চপিরের নাম বলেছেন— 'যাদের নাম উল্লেখ করেছেন তারা হলেন, সিলেটের শাহ জালাল ছাড়াও পঞ্চপির মান্না শাহ দারইস এবং সোনারগাঁর খোন্দকার মোহম্মদ ইউসুফ, মীরপুরের শাহ আলি বাগদাদি, চট্টগ্রামের বদরপির, ঢাকার শাহ জালাল দক্ষিণী এবং বিক্রমপুরের আদম শহিদ।'

আহমদ শরিফের মতে 'চট্টগ্রামের বদর-ই আলম, বর্ধমানের কালনার বদর সাহেব, দিনাজপুরের হেতমাবাদের বদরউদ্দিন বদর ই আলম এবং বদর মোকামখ্যাত বদর শাহরা বা বদর আউলিয়া আর মাঝি মাল্লার পাঁচ পিরের অন্যতম পির বদর সম্ভবত অভিন্ন ব্যক্তি। চট্টগ্রামে এর অবস্থিতিকাল কারো মতে ১৩৪০ আর কারো ধারণায় ১৪৪০

খ্রিস্টাব্দে'।[৫৩] পঞ্চপিরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কারণ সম্পর্কে আজিজুর রহমান মল্লিকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য।

> 'কৃষক পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য পেলে কৃতজ্ঞতা স্বরূপ মাজার শরিফে একগুচ্ছ পাকা ধান উপহার দিত। আপদ-বিপদে, অসুখে-বিসুখে মাজারে মিষ্টান্ন দেওয়া হত। রোগমুক্তির আশায় সেখানে প্রার্থনা করা হত। হিন্দুরা পূর্ব থেকেই এই ভোগ দান প্রথায় আস্থাশীল। সুতরাং মুসলমানদের মতো তারাও এ ব্যাপারে যত্নশীল ছিল।'[৫৪]

আজকের ভেদবুদ্ধির সুতীব্র কোলাহলের সময়ে পির-দরবেশদের প্রসঙ্গে উপস্থাপিত করছি শৈশবের ব্যক্তিগত স্মৃতিচারণ। ইছাপুরের অন্তেবাসী গ্রাম কমলপুর পাশের মুসলমান পাড়ার নাম পলতা পাড়া, ওই গ্রামে একজন দরবেশ সম্প্রদায়ের পির ছিলেন, নামও দরবেশ মণ্ডল। গ্রামের লোকের কাছে দরবেশ মোড়ল বলে পরিচিত ছিলেন। এই সুফি অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমান সকলের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। গ্রামে থাকলে প্রায় প্রতিদিনই তিনি এই নিবন্ধকের পিতার কাছে সকাল নয়টা থেকে দশটার মধ্যে আসতেন। এবং বিভিন্ন বিষয়ের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা করতেন। আমার মা-ঠাকুমার সাথে বসেও বিভিন্ন পরামর্শ দিতেন। শুভ্রকেশ গেরুয়া আলখাল্লা পরিহিত, পায়ে কাঠের খড়ম হাতে ছড়ি, শরীরের গড়ন রোগা ছিপছিপে লম্বা উঁচু চেহারা, গাত্র বর্ণ ধবধবে ফর্সা, চোখে একটা অদ্ভুত উজ্জ্বলতা ছিল। একজন হিন্দু সন্ন্যাসীর সাথে পার্থক্য টানা ভার ছিল, আর ব্যতিক্রম শরিয়তি নিয়মে দাড়ি ছিল না। অত্যন্ত উদার এই মানুষটির আচরণে কোনও মালিন্য ছিল না। আমাদের বাড়িতে ঘোমটা প্রথার চল ছিল। মা-কাকিমা বা দিদিরা তাকে পান সেজে দিতেন, সে সময় তিনি মা সম্বোধন করে পাশে বসিয়ে নিয়মিত গল্প করতেন সুপরামর্শ দিতেন। হিন্দু ব্রাহ্মণ বাড়িতে খাদ্য গ্রহণেও কোনও অসারতা বা ছুৎমার্গ ছিল না। শরিয়তি মতের অনেক প্রথা (যেমন মহরমে লাঠি খেলা)-কে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর পিতার নির্দেশে বাগানের ফুল দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানোর সময় অশুচি হওয়ার ভয়ে তাঁর পরিবারবর্গ বা অগণিত শিষ্যবা কেউই আপত্তি করেনি। ধর্মীয় কূপমণ্ডূকতার তীব্র বিরোধী এই দরবেশের বহু শিষ্য ২৪ পরগনা নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে ছড়িয়ে আছে। এখনও তাঁর মাজারে ১০ আশ্বিন মৃত্যু দিবসের উরসে প্রতিবছর ভক্ত সমাগম হয়। ভক্তরা খিচুরি, পোলাও ও জরদা রান্না করে গ্রামের মানুষকে বিতরণ করেন, নিজেরাও খান। বিশ্বদর্শী সৈয়দ মুজতবা আলি সমন্বয়ের এই ধারা দেখে বিমুগ্ধ চিত্তে স্মরণ করেন— 'সুফিমত তাহার নানা শাখা প্রশাখায় কাদেরিয়া, কসমিয়া, নকশাবন্দি নানা সম্প্রদায় এদেশে প্রসার লাভ করিল। বাঙালি সুফিরা জিকর বা ভজন করেন, বারংবার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে 'হাল' দশা প্রাপ্ত হন, সেতার বা একতারা যোগে মধুর গান করেন, পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া সমাধিস্থ হন। এককথায় বাঙালি সুফি ইরান ও উত্তর ভারতের সুফি ঐতিহ্য সঞ্জীবিত রাখিলেন।

কিন্তু ইহাদের প্রভাবে অত্যন্ত নিম্নশ্রেণির হিন্দুমুসলমানের ভিতর যে রসধারার সৃষ্টি হইল তাহা অপূর্ব ও আধ্যাত্মিক জগতে তাহাদের যে মিলন হইল পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার স্থান পাওয়া উচিত। আউল, বাউল, মুরশিদিয়া, দরবেশি, সাঁই, মরমিয়া, জারিগান, গাজির গীত সমাজের নিম্নতম স্তর হইতে উঠিয়াছে তথাপি সে গীতে বাঙালি ভক্তের আধ্যাত্মিক অনুভূতির যে পরিচয় পাই তাহার সহিত কোনও দেশেরই ইউরোপ বলুন আর এশিয়ায় বলুন লোক-সাহিত্যের তুলনা হয় না।'[৫৫]

এ সম্পদের সম্পূর্ণ আহরণ এখনও হয় নাই। যেটুকু সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার বিশেষ লক্ষণ তাহাতে সর্বধর্ম সমন্বয়ী।

আপনার আপনিরে মন না জানো ঠিকানা
পরের অন্তর কেটে সমুদ্দুর কি যে যাবে জানা?
পর অর্থে পরম ঈশ্বর আত্মারূপে করে বিহার
দ্বিদল বারামখানা, শতদল সহস্রদল অনন্ত করুণা,
সিরাজ সাঁই বলরে লালবা গুরুপদে ডুবে আপন
আত্মার ভেদ জেনে নে মা
আত্মা আর পরমাত্মা নিত্য জেনে নে না।[৫৬]

উপনিষদ, মায়াবাদ, মনসুর আল-হল্লাজের "আনল হক" সব একাকার হয়ে যায় এই লোকায়ত ধর্ম বিশ্বাসে।

তথ্যসূচি

১. ভারত দর্শন সম্ভার, ১ ন্যায় সূত্র : দেবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও মৃণাল বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদীত পৃ. vii;

২. বাংলার মুসলমানের কথা— কাজী আবদুল ওদুদ; বঙ্গদর্পণ ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬৯

৩. গীতবিতান— প্রথম খণ্ড, পৃ. ২৬৫

৪. মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের— সৈয়দ মুজতবা আলি; বঙ্গদর্পণ ১ম খণ্ড পৃ. ২৮১

সুফিদের ইসলাম ধর্ম ভারতে প্রবেশ করে কত বৈচিত্র্যময় হয়েছিল তার প্রমাণ পাই লেখকের লেখায় হিন্দু মুসলমান মিলনের চেষ্টা সাধুরা করিয়াছিলেন প্রেমের দ্বারা। আরেক দল চেষ্টা করিলেন ধর্ম বিশ্বাসের সম্মেলন দ্বারা। তাহা হইতে খোজাদের ধর্মের সৃষ্টি হইল (আগা খান এই দলের ইমাম বা গুরু)। খোজারা শিয়া কিন্তু বিশ্বাস করে যে বিষ্ণু নয়বার পৃথিবীতে মৎস, কূর্ম, বরাহ ইত্যাদি রূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু সেখানে বৈষ্ণবরা বিশ্বাস করে যে ভবিষ্যৎকালে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। সেখানে খোজারা বিশ্বাস করে যে আলি (শিয়াদের প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম) কল্কিরূপে মক্কায়

অবতীর্ণ হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, মৃত্যুর পরে তাঁহার আত্মা তাঁহার পুত্র হাসান তৎপর হুসেন ও বংশানুক্রমে অবতীর্ণ হইয়া আগা খানে আসিয়াছে। আগা খান তাই শুধু পির বা ইমাম নহেন তিনি সাক্ষাৎ কল্কি। খোজারা তাই কুরান পড়ে না, তাহাদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ তাহাদেরই এক পির কর্তৃক গুজরাতিতে লেখা 'দশাবতার'। খোজারা জাকাত দেয় না— আগা খানকে 'দশোন্দ' দেয়, হজে যায় না। আগাখানকে প্রদর্শন করে— তাঁহাকে প্রায়ই বোম্বাই আসিতে হয়। রমজান মাসে উপবাস করে না ও নমাজ পড়ে তিনবার, তাও আরবিতে নয়, হয় কচ্ছি নয় গুজরাতিতে। পঞ্চরাত্রে যে সব দেবদেবীর নাম উপাসনার সময় স্মরণ করে। বিষ্ণুর নয় অবতারকে বিশেষ ভক্তি নিবেদন করে আর আগাখান তো স্বয়ং বিষ্ণু।

নওসারির মতিয়া গুজরাতিরা মুসলমানের একতার চেষ্টার ফল। তাহারা রমজানে উপবাস করে, কিন্তু নমাজ পড়ে না বিবাহে ব্রাহ্মণকে ডাকে কিন্তু মৃতদেহ দাহ করে না, গোর দেয়, সে সময় ডাকা হয় মোল্লাকে।' (তদেব পৃ. ২৮৫-২৮৬)

৫. সুফিবাদ ও আমাদের সমাজ : সংকলন গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

৬. বাংলা পির সাহিত্যের কথা— গিরীন্দ্রনাথ দাস, সুবর্ণরেখা; পৃ. ১৫

৭. বাংলার মুসলমানের কথা— কাজী আবদুল ওদুদ; পৃ. ২৬৯

৮. মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের— সৈয়দ মুজতবা আলি, তদেব; পৃ. ১৮২

৯. বাঙ্গালার সংস্কৃতি— সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়; পৃ. ১০

১০. ভারতের সংস্কৃতি— ক্ষিতিমোহন সেন; পৃ. ৫৯

১১. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয়খণ্ড— সুকুমার সেন; পৃ. ২০৮

১২. তদেব; পৃ. ৩৯৬-৩৯৭

১৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড— সুকুমার সেন; পৃ. ২০৫

১৪. ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি— ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (দ্বিতীয় খণ্ড); পৃ. ১৩৯

১৫. শূন্যপুরাণ : চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, ভূমিকা ড: শহীদুল্লাহ; পৃ. ১৩

১৬. বৈষ্ণব পদাবলী উদ্ধৃতি : ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি; পৃ. ১৪২, লেখক পাদটিকায় লেখেন— 'বৈষ্ণব আখড়ায় আজও মুসলমান ভেক লইলে স্থান পান।'

১৭. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস— আশুতোষ ভট্টাচার্য; পৃ. ১০৭

১৮ মুনশি আবদুল করিম সম্পাদিত কবি বল্লভের সত্য নারায়ণ পুঁথির ভূমিকা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে রচিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা-১৩২২

জয়নারায়ণ সেনের হরিলীলা, রচনাকাল ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ. দীনেশচন্দ্র সেন ও বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-১৯২৮

১৯. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস— আশুতোষ ভট্টাচার্য; পৃ. ১০৬

২০. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)— সুকুমার সেন: পৃ. ৩৯৮

২১. তদেব; পিরের গাথা ও গান; পৃ. ৪০৫

২২. তদেব; পৃ. ৪০৬

২৩. আরবি দীন বা দ্বীন শব্দের অর্থ ধর্ম— সৈয়দ মুজতবা আলি রচনাবলি তৃতীয় খণ্ড টুনিমেম দ্রষ্টব্য পৃ. ১৬৪

২৪. ফৈজুল্লা— 'পাঁচালি রচয়িতার নাম বিভিন্ন বানানে পাওয়া যায়। যথা ফেজুল্লা ফয়জুলা, ফউজুল্লা, ফউজুল্ল্যা ফউজুল্ব বা ফউজুলু ইত্যাদি মূল বানান যা-ই থাকুক-মনে হয় লিপিকারগণের মাধ্যমে বানান-ভেদ হয়েছে। (বাংলা পির সাহিত্যের কথা তদেব, পৃ. ৩৩৬)

২৫. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস; প্রাগুক্ত

২৬. তদেব; পৃ. ৩৯৯

২৭. বাংলা পির সাহিত্যের কথা, তদেব; পৃ. ৩৬৪-৩৬৬

২৮. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তর উদ্ধৃতি : বাংলা পির সাহিত্যের কথা; তদেব; পৃ. ৩৪৩

২৯. তদেব; পৃ. ৩৬৭

৩০. ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি : ড: ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, ৩য় খণ্ড; পৃ. ১২২

৩১. ফুল ও শিরনি : সত্যেন্দ্র কাব্যগুচ্ছ; পৃ. ১৬৪-১৬৫

৩২. আহমদ সফীর উদ্ধৃতি : হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও নতুন ভাবনা-পঞ্চানন সাহা; পৃ. ৫৯-৬০

৩৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস : দ্বিতীয় খণ্ড, সুকুমার সেন; পৃ. ৪৭২-৪৭৩

৩৪. বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস— আশুতোষ ভট্টাচার্য; পৃ. ৭৬৭

৩৫. বাংলা পির সাহিত্যের কথা— তদেব; পৃ. ১৯২

৩৬. আমার বাল্যকাল ও বোম্বাই প্রবাস (১৯৯৫) : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর; পৃ. ১১৭

৩৭. বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড-সুকুমার সেন; পৃ. ২৬২

৩৮. তদেব (ব্যোমকেশ মুস্তাফির প্রবন্ধ থেকে সংগৃহীত); পৃ. ২৬৫

৩৯. বঙ্গ সংস্কৃতি কথা— প্রসিত রায় চৌধুরীর গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত

৪০. শহিদ হজরত আব্বাস আলি পুঁথি— মুনশি আহম্মদ শাহজি গ্রন্থে দ্রষ্টব্য

৪১. উদ্ধৃতি বাংলা পির সাহিত্যের কথা : তদেব; পৃ. ১০৭

৪২. বাংলার লৌকিক দেবতা : শ্রী গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু উদ্ধৃতি; তদেব; পৃ. ৯৯

৪৩. বাংলা পির সাহিত্যের কথা; তদেব; পৃ. ১৮৩

৪৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় খণ্ড : সুকুমার সেন; পৃ. ৪০৮

৪৫. বাংলা পির সাহিত্যের ইতিহাস : তদেব; পৃ. ২৮৩, লেখক গাজিকালু চন্দ্রাবতী : গোলাম খয়রায় ও আবদুর রহিম গ্রন্থ থেকে তথ্যসূত্র দিয়েছেন

৪৬. দীনবন্ধু মিত্রের রচনা সংগ্রহ : জামাই বারিক নাটকের ৩য় অঙ্ক

৪৭. মানিক পিরের গান : সত্যেন রায় উদ্ধৃতি বাংলা পির সাহিত্যের কথা; পৃ. ৩৯৫

৪৮. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড) : তদেব; পৃ. ৪০৯

৪৯. তথ্য সূত্র ৩৮-এ উল্লেখ আছে

৫০. বাংলা পির সাহিত্যের কথা : তদেব; পৃ. ২৮২

৫১. মধ্যযুগে ভারত, প্রথম খণ্ড : সতীশচন্দ্র; পৃ. ২০৫-২০৬

৫২. ভারতের সুফি, প্রথম খণ্ড : মোবারক করীম জওহর; পৃ. ৬৩-১০৪

৫৩. মধ্যযুগে বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতি : আহমদ শরিফ; পৃ. ১৯৩

৫৪. ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান : আজিজুর রহমান মল্লিক; পৃ. ১২

৫৫. মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের : সৈয়দ মুজতবা আলি; বঙ্গদর্পণ ১ম খণ্ড; পৃ. ২৮৯-২৯০

৫৬. মতিলাল দাস কৃত গীতি বসুমতী, শ্রাবণ ১৩৪১ : প্রাগুক্ত

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অগ্রণী সৈনিক —কাজী নজরুল

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাঙালি মুসলমান তার আত্মপরিচয়ের দ্বন্দ্বে দীর্ণ। বাঙালি মুসলমান সমাজ— তার আত্মপরিচয় কী, তার দেশ জাতি মাতৃভাষাই বা কী এ-প্রশ্নে আলোড়িত হতে থাকে। ১৯০৬ সালে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে মুসলিম লিগ গঠন, তার পূর্বে ওয়াহাবি বিদ্রোহ এবং মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা, বাঙালি মুসলমানকে আরও বেশি প্রশ্নের সম্মুখীন করল। বাংলার মুসলমানের মাতৃভাষা কী হবে এই প্রশ্নে আরও বেশি সংশয়ান্বিত করে ঢাকা ও কলকাতার আশরফি মুসলমানেরা। ঢাকা ও কলকাতার উচ্চবর্ণের এই মুসলমানেরা জন্ম সূত্রে কেউই বাঙালি নয়, তারা বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুর দাবি করলেন। অবশ্য এ দাবি করার সময় তারা জানতেন না প্রাচীন বাংলা সাহিত্য সৃষ্টিতে বাঙালি মুসলমান লেখকদের ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রকৃতপক্ষে আশরফিদের নবাবি শাসনের পুরোনো ঘি-এর গন্ধ আর নিজেরা আরব জাত এই অহংবোধ, নিম্নবর্গীয়দের প্রতি ঘৃণাসূচক মনোভাব ও তাদের প্রকৃত ইসলামি শিক্ষা দেবার ধারণা থেকে তারা সাধারণ মুসলমান সমাজকে সংশয়াচ্ছন্ন করে তুলেছিল। অবশ্য এর পিছনে অন্য গূঢ় উদ্দেশ্য কাজ করেছিল। দরিদ্র মুসলমান কৃষকদের অজ্ঞতার অন্ধকারে রেখে তাদের প্রতারণা করে সমস্ত সুযোগ কুক্ষিগত করাই ছিল এর গূঢ় উদ্দেশ্য। এর অনেক পরে সংক্ষুব্ধ সৈয়দ মুজতবা আলি এক পত্রে ক্ষোভ ব্যক্ত করেন।

> 'যাহারা এসলাম গ্রহণ পূর্বক মোসলমান নামে বিখ্যাত হয়েন, তাহাদের গভীর প্রেম, জন্ম, স্নেহ ও স্বদেশ বাৎসল্য সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়া যায়, কেবল তৎসমুদয়ের স্থানে এক সামান্য রূপ সাম্প্রদায়িক সহানুভূতির সঞ্চার দৃষ্ট হয়।'
>
> '...মাতৃভূমি ও জন্মভূমি ঘটিত ভাষার প্রতি তাঁহাদের মমতাজ্ঞান নাই, প্রত্যুত তৎসম পরদেশ ও পরভাষা বলিয়া অবিরত উপেক্ষিত হইতেছে। তাহাদের স্বদেশ ও নিত্যভাষা বলিয়া অপর কোনও পৃথক বস্তু দৃষ্ট হয় না, অথবা তাঁহারা মুসলমান সমাজ ও ধর্মকে ঐক ভাষার অধীনে স্থাপন করিতে উদ্যত।'[১]

এ প্রসঙ্গে সমাজ সচেতন বুদ্ধিজীবী আহমদ শরিফের উক্তিও স্মর্তব্য—

> 'তারা নিজেরা গ্রামীণ উপভাষাকে বা বুলিকে তাদের প্রাজন্মক্রমিক ঘরোয়া ভাষা বলে জেনেও তারাই সভায় ও মুদ্রিত লেখায় বাংলাকে হিন্দুর ভাষা বলে শুনে দেখে ও জেনে তাদের ১৯৩০ সন অবধি মুদ্রিত নিজেদের ভাষা উর্দু কি বাংলা নিরুপণ করতে না পেরে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগেছে।'

এ সূত্রে তিনি আরও বলেন যে, 'মাদ্রাসায় ক্রমে বাংলাভাষীরা পড়তে শুরু করলেও (নিউ স্কিম মাদ্রাসা) আবু নসর ওয়াহেদের প্রচেষ্টায় চালু হওয়ার পূর্ববিধি বাঙলা ভাষা পড়ানো হত না, ফলে সাতেরো-আঠারো-উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম দশক অবধি আরবী শিক্ষার্থী মোল্লা মৌলবিরা ও ফারসী শিক্ষার্থীরা বাংলা হরফ চিনত না।'[২]

বাংলা ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিজাত মুসলমানেরা সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে চলছিল। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় দৃঢ়তার সাথে ব্যক্ত করেছেন, 'ভাষা না হইলে nation বা জাতি হয় না, এবং ভাষা সম্বন্ধে সচেতন না হইলে, জাতীয়তা বোধও আসে না।'[৩] প্রায় শতাব্দী কাল ব্যাপী উর্দুকে বাঙালি মুসলমানেরা ভাষা হিসাবে চাপিয়ে দেবার অপচেষ্টায় বিরক্ত সৈয়দ মুজতবা আলির বক্তব্য—

> 'উর্দুর জন্ম উত্তরপ্রদেশের প্রাকৃত মায়ের কোলে।... শাজাহানের আমলে উর্দুভাষা সৃষ্ট হয়েছে ও অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখতে পাই ফার্সী আস্তে আস্তে হটে গিয়ে উর্দুর জন্য জায়গা করে দিচ্ছে। আজকের দিনে পরিস্থিতিটা কি? ফার্সীর লীলাভূমি দিল্লী লক্ষ্ণৌয়ে এখন সাহিত্য সৃষ্ট হয় উর্দুতে। ফার্সী সেখানে আরবী এবং সংস্কৃতের মতো মৃত ভাষা বা "ডেড ল্যাঙ্গুইজ"।... বাংলার মতো সমৃদ্ধ ভাষার উর্দু থেকে নেওয়ার কিছু নেই।'[৪]

আবদুল লতিফ, আবদুল আলি ও আমির আলিরা মুসলমান বাঙালিকে আরবি-উর্দুতে বাঁধতে চেয়েছেন।

> 'এছাড়া বোধকরি একমাত্র মুসলমান ঐতিহাসিক আবদুল আলি বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম প্রসঙ্গে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এ হেন আবদুল আলি মুসলিম Institute Journal-এর সম্পাদক। মুসলমানদের আধুনিকতার পথে পরিচালনা করার সাহস পাননি। সেই আরবি উর্দুতে বাধা পড়েছেন। ভারতীয় মুসলমানের জীবনে এই হল সবচেয়ে বড় ট্রাজিডি।'
>
> 'এই ট্রাজিডির নিষ্পত্তি করতে চেয়েছিলেন অনেকেই। মুসলমান সমাজের ভেতব থেকেই সর্বাগ্রে চান নবাব আবদুল লতিফ। লতিফের প্রতিষ্ঠিত মহামেডান লিটারেরী সোসাইটিতে জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হয়। সোসাইটির সব আলোচনা চলত পার্সী ও উর্দুতে। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে Bengal Social Science Association-এ বক্তৃতা করেন লতিফ। বিষয় ছিল মুসলমান সমাজে শিক্ষা, তাদের

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি বিতৃষ্ণা। তাঁর ভাষণের শেষ : I beg most respectfully to suggest the establishment of a purely Arabic Institution or rather the retention of the existing one up on an improved basic.

লতিফ ফরিদপুর জেলার সন্তান। কিন্তু তিনি পার্সী ও উর্দুর চর্চা করতেন। বাংলার মুসলমানরা বাংলা চর্চা করুন সে উপদেশটি তিনি দিয়েছেন এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বিচারপতি সৈয়দ আমীর আলি সেই পথ বেছে নেন। এ পথ মুসলমানের পথ। পরে বিচ্ছিন্নতার পথ।'[৫]

এর বিরুদ্ধে ক্ষুদ্র একদল বাঙালি মুসলমান অনুভব করতে সক্ষম হলেন সম্ভ্রান্ত মুসলমানেরা সাধারণ বাঙালি মুসলমানদের জাতীয় জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চাইছেন। বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষা চর্চা না করলে বাঙালি মুসলমান সমাজের শিকড়, কখনওই বাংলার সমাজ সংস্কৃতির মাটি স্পর্শ করতে পারবে না। বাংলা ভাষা সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস পর্যালোচনায় তাঁরা দেখতে পেলেন— বাঙালি মুসলমানের অবদান বড় কম নয়, সুতরাং বাঙালি মুসলমানকে সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হতে হবে। একাজে যারা পথিকৃৎ হয়ে এগিয়ে এলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ড: মহম্মদ শহিদুল্লাহ, মুজফ্‌ফর আহমেদ, মীর মোশারফ হোসেন প্রমুখ। নজরুলের সাহিত্য জগতে আগমন এদের পরে। তাঁর প্রায় সমসাময়িক মহিয়সী এক মহিলা, বাংলা সাহিত্য জগতে ধর্মীয় কূপমণ্ডুকতা, ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে ও মুসলমান নারীর স্বাধিকারের দাবিতে সোচ্চার হন তিনি বেগম রোকেয়া। বাঙালি মুসলমানকে বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির মূল ধারায় যুক্ত হবার জন্য দু'ধারায় সাহিত্যকৃতির নেতৃত্ব দেন প্রধানত দুজন সাহিত্যিক প্রথমজন মীর মোশারফ হোসেন, দ্বিতীয়জন কাজী নজরুল ইসলাম। সম্পূর্ণ ভিন্ন আর্থ-সামাজিক অবস্থা থেকে আসার কারণেই কখনও তাঁদের মত পথের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়।

মীর মশারফ হোসেনের জন্ম এক সামন্ত পরিবারে। শিক্ষিত ও সজ্জন হওয়ার কারণে মুসলমান শিক্ষিত সমাজের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ছিল। সাহিত্য সাধনায় প্রবেশ করেই তিনি অনুভব করলেন আধুনিক বাংলা সাহিত্য জগতে সব হিন্দুলেখক হওয়ার কারণে মুসলমান সমাজের কথা উপেক্ষিত হচ্ছে। হিন্দু পুরাণ ইত্যাদির উপর অনেক লেখা থাকলেও মুসলমান ধর্মীয় কাহিনির উপর লেখা অনুপস্থিত। যদিও প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দৌলত কাজী, আলাওল বিরচিত অনেক লেখায় এবং লোক সাহিত্যে মুসলমান ধর্মীয় কাহিনির অনেক উল্লেখ আছে। সাহিত্য চর্চায় প্রবেশ করে তিনি এই অপূর্ণ জায়গাই পূরণ করলেন না, বেছে নিলেন মুসলমান ধর্ম প্রসারের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী কাহিনি কারবালার যুদ্ধ ও হজরত মহম্মদের দুই নাবালক দৌহিত্র হাসান-হোসেন এর মর্মান্তিক হত্যা। বাংলা সাহিত্য পেল এক নতুন ঐশ্বর্য 'বিষাদ সিন্ধু'। বাঙালি মুসলমান সমাজে 'বিষাদ সিন্ধু'র মতো গ্রহণযোগ্যতা আছে এমন উদাহরণ মেলা ভার। এর জনপ্রিয়তা আজও মুসলমান

সমাজে সমান অমলিন। গ্রামে গঞ্জে মুসলমানদের রামায়ণ মহাভারতের মতো বিষাদ সিন্ধুর পাঠে সাধারণ মুসলমান কৃষকদের হাপুস নয়নে কাঁদতে দেখেছি। গ্রামে গঞ্জে বহু অল্প শিক্ষিত সুন্নি মুসলমানদের এজিদের প্রতি ঘৃণাবোধ থেকে তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষাবলম্বী বলে অস্বীকার করতে দেখেছি। বরং একটা যন্ত্রণার গর্ববোধ থেকে দাবি করতে দেখছি তারা হজরত ইমাম হাসান ও হোসেনের পক্ষাবলম্বী বলে। মোশারফ হোসেন বাঙালি মুসলমান সমাজকে বাংলায় ইসলামি সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে উর্দু সংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়তে প্রয়াস জোগান।

শুধু মাত্র এই পরিচয় দিলে তা হবে একদেশদর্শী। তিনিই প্রথম জমিদার দর্পণ নাটকে সাধারণ কৃষকদের দুর্দশা ও তাদের উপর জমিদারদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন। কৃষক সমাজের কাছে এই নাটকের জনপ্রিয়তা দেখে ভীত বঙ্কিমচন্দ্র "জ্বলন্ত আগুনে ঘৃতাহুতি হবে" বলে এই নাটক বন্ধ করতে বলেন।[৬]

অপর ধারার নেতৃত্বে আসেন কাজী নজরুল ইসলাম। যদিও তার আগে মুজফ্‌ফর আহমদ মহম্মদ শহীদুল্লাহরা বাংলা সাহিত্য চর্চায় ব্রতী হন। এই উদ্দেশ্যে মুসলমান সাহিত্য সমিতি গঠিত হয়, ১৩২৫ বঙ্গাব্দর বৈশাখ মাসে (১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে) সমিতি একখানা ত্রৈমাসিক মুখপত্র প্রকাশ করে, নাম দেওয়া হয়েছিল 'মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'। কাগজ সম্পাদনার কাজে মুজফ্‌ফর আহমেদের সাথে যুক্ত ছিলেন মহম্মদ শহীদুল্লাহ ও মহম্মদ মোজম্মেল হক। পত্রিকা প্রকাশের প্রায় সমস্ত কাজ করতে হত মুজফ্‌ফর আহমেদকে। মুসলমান যুবকদের কলকাতায় সাহিত্যকৃতির পথিকৃৎ এই কাগজ।[৭] এরপর 'গণবাণী' কাগজ প্রকাশিত হয় মুজফ্‌ফর আহমেদের নেতৃত্বে। অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের সন্তান নজরুল। মাত্র নয় বছর বয়সে পিতাকে হারান। অর্থের অভাবে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে মসজিদের ইমামতি মাজারের খাদেম গিরিও করেন। অল্প বয়স থেকে লোটোর গানের দলে নাম লেখান। এই গ্রাম্য গানগুলোর মধ্যে গ্রাম্য জীবনের সমস্যাবলি, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও দেশাত্মবোধের স্পষ্ট ছোঁয়া ছিল। এখান থেকেই মুসাফিরের এক দীর্ঘ পথ পরিক্রমা, আর বন্ধুর পথেই তিনি সংগ্রহ করেছিলেন 'চলার পথের আনন্দ গান', সম্প্রীতির শিক্ষা। ১৩২৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'মোসলেম ভারত' পত্রিকায় নজরুলের কবিতা 'মুক্তি' প্রকাশিত হয়। ১৯২০ সালে করাচি থেকে কলকাতায় এসে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির অফিসে মুজফ্‌ফর আহমেদের সাথে বসবাস শুরু করেন। শুরু হয় নতুন পথের যাত্রা। আজীবন তাঁকে লড়তে হয়েছে একদিকে মুসলমান সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে অপরদিকে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। বহুমুখী এই আক্রমণে নজরুলের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হলেও তিনি সেই ক্লান্তিহীন চির 'মহাবিদ্রোহী'। প্রকৃতপক্ষে নজরুলের জীবন পরিক্রমা আজও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দিশারি। আর এ কারণেই সমন্বয়ের প্রশ্নে রেজাউল করিম মত প্রকাশ করেন--

'ভারতের হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা Common Culture সৃষ্টি করিবার প্রয়াস বরাবরই হইয়া আসিয়াছে। প্রথমে ভাষার মাধ্যমে এই চেষ্টা হইয়াছিল। আজ যেমন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছেন, মধ্যযুগেও সেইরূপ হিন্দু মুসলমান লেখক ও কবিগণ সর্বত্র সমানভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইতেন।'[৮]

বন্ধুর বিয়েতে বরযাত্রী হয়ে যোগদান করলেও মুসলমান হওয়ার জন্য কনেপক্ষের আপত্তিতে বিবাহ বাসরে যোগদান করতে পারেননি। একা ঘরে বসে থাকতে হয়েছে। সেইসময় তাৎক্ষণিকভাবে কবিতা লিখে তাতে সুর দিয়েছেন ও রাতে বাসরঘরে বসে গেয়েছেন তার অন্যতম কালজয়ী গান।

'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছ জুয়া
ছুঁলেই তোর জাত যাবে? জাত ছেলের হাতের নয় তো মোয়া
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি ভাবিল এতেই জাতির জান
তাইতো বেকুব করলি তোরা একজাতিকে একশ খান।'

(বিষের বাঁশি)

হিন্দু মুসলমান পুরাণ শাস্ত্রের উপর তার জ্ঞানের অপরিসীম ব্যাপ্তি ছিল। একই কলমে প্রস্ফুটিত হয়েছে। যেমন— 'রমজানের ওই রোজার শেষে এল খুশির ঈদ'

অথবা— বলরে জবা বল
কি করে পেলি তুই
শ্যামা মায়ের চরণ তল।

এসব গান থেকে এ মূল্যায়নে আসা যায় না তিনি নাস্তিক বা ধর্মদ্রোহী ছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর সুগভীর ঘৃণা ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মান্ধতার প্রতি। যেখানেই ধর্মান্ধ শক্তির হাতে মানবিকতা লাঞ্ছিত হতে দেখেছেন সেখানেই গর্জে উঠেছে তাঁর আহত অভিমান বোধ। প্রয়োজনে ধর্মের বেড়াও ডিঙিয়েছেন। যে মানব ধর্মে তার বিশ্বাস তা তিনি ব্যক্ত করেছেন তার লেখায় 'মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কিছু মহিয়ান' (সাম্যবাদী)। হিন্দুত্ববাদীরাও তাঁকে কম আক্রমণ করেননি। বাংলার তৎকালীন প্রগতিমনা মুক্ত চিন্তার মানুষের কাছে তিনি রবীন্দ্রনাথের পর অন্যতম মহিরুহ, এবং আজও এর প্রাসঙ্গিকতা ও নজরুলের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। ব্যক্তি জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর মানবাত্মার ভেদহীনতা। নিজে বিয়ে করেছেন এবং অবশ্যই ধর্মান্তরিত না করে নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়ে প্রমীলা সেনগুপ্তকে। আবার তার অন্যতম প্রিয় বন্ধু কমল দাশগুপ্তর অসুস্থতার সময় একইভাবে বিয়ে দিয়েছেন তার প্রিয় শিষ্যা ফিরোজা বেগমের সাথে। এখানে উল্লেখ করা দরকার ফিরোজাও অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় বিভেদের কোনও মালিন্যই তার জীবন ও কর্মকে স্পর্শ করতে পারেনি।

সারা দেশজুড়ে সাম্প্রদায়িকতার ঘনায়মান কালো মেঘের ঘনঘটা দেখে তিনি শুধু কলম ধরেননি সংগঠিত করার চেষ্টা করেছেন জনসাধারণকে। প্রায় সফল অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মাগান্ধী কর্তৃক প্রত্যাহৃত হলে জনমনে ছড়িয়ে পড়ে হতাশা। এর পরিণতিতে দেশ জুড়ে শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯২৩-২৬) এইসময় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টায় স্বরাজ্য দল গঠন করেন।[৯] এই সময়ের নজরুলের রাজনৈতিক অবস্থানের বর্ণনা আছে মুজফ্‌ফর আহমদ-এর লেখায় 'কিন্তু এপ্রিল মাসে শুরু হয়ে গেল কলকাতার হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। কলকাতার সঙ্গে নজরুলের নিত্য যোগাযোগ। জীবনে সে কখনও এইরকম দাঙ্গা দেখেনি। তাই, কলকাতার দাঙ্গা তাকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলল। তার তখনকার লেখা হতে তা বোঝা যায়।'

'...সাম্প্রদায়িকতার এই বিশ্রী আবহাওয়ায় কৃষ্ণনগরে তিনটি সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। নজরুলের দিনগুলি কাজে ভরা। এতটুকুও অবকাশ নেই তার। সে ভলেন্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলছিল অন্য অনেক কাজও করতে হচ্ছিল।'

'...বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য সে লিখেছিল 'কাণ্ডারী হুশিয়ার।'[১০]

এ বছরের (১৯২৬) শেষ দিকে কাজী নজরুল ইসলাম, হেমন্ত কুমার সরকার, কুতুবউদ্দিন আহমেদ ও সামসুদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে গঠিত হয় মজুর ও স্বরাজ্য পার্টি। এর মুখপত্রের নাম 'লাঙ্গল' প্রধান পরিচালক কাজী নজরুল ইসলাম, সম্পাদক মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৬-এর ২ সেপ্টেম্বর গণবাণী পত্রিকায় হিন্দু মুসলমান প্রবন্ধের শুরুতেই লেখেন— 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমার, হিন্দু মুসলমানের কথা উঠেছিল। আমার বারে বারে গুরুদেবের একথাই মনে হয়। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্নও উদয় হয় ল্যাজ যাদের গজায় তা সে ভেতরেই হোক আর বাইরেই হোক তারাই হয়ে ওঠে পশু।'[১১]

'মোহাম্মদী' পত্রিকায় নজরুল মাসখানেক কর্মরত ছিলেন এখানে কাতুকুতু শিরোনামে ব্যঙ্গাত্মক লেখা লিখতে শুরু করেন। মূলত ধর্মান্ধ শক্তিগুলির বিরুদ্ধে। মোহম্মদী এরপর রক্ষণশীল ইসলামি শক্তির পক্ষে চলে যায়। সেই সময় সওগাত বলে একটি কাগজ প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ শুরু হয়। শুরু থেকেই এই প্রচেষ্টার সাথে যুক্ত হন নজরুল। 'সাপ্তাহিক সাওগাত' বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সচিত্র বাংলা পত্রিকা। প্রথম প্রকাশ ১১ মে ১৯২৮ (২৮ বৈশাখ ১৩৩৫ বঙ্গাব্দ), সাওগাত প্রেস ১৯নং ওয়েলেসলি স্ট্রিট কলকাতা থেকে প্রকাশিত, সম্পাদক মোহম্মদ নাসিরউদ্দিন। যে সকল কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী তারা হলেন কাজী নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলি, আবুল মনসুর আহমদ, আবুল কালাম, মোহাম্মদ সামসুদ্দিন, প্রেমেন্দ্র মিত্র, হবিবুল্লাহ বাহার, খান মোহাম্মদ মঈনউদ্দিন, আবুল ফজল প্রমুখ। পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রথম সম্পাদকীয়তে লেখা হয় 'সমাজ সম্বন্ধে উদার মুক্ত ইসলামই আমাদের আদর্শ হইবে। মুসলমানদের একদল পবিত্র ইসলামের নামে সমগ্র সমাজ একেবারে জঞ্জালাকীর্ণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা

শিক্ষিত সমাজের মারফতে ক্রমশ এই জঞ্জাল স্তূপ পরিষ্কার করিয়া মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে কুসংস্কারের নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে চাই। আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির তুলনায় এই ব্রত হয়তো পঙ্গুর গিরিলঙ্ঘনের মতো দুঃসাধ্য প্রতীয়মান হইবে; কিন্তু আমরা ভুলিতে চাহি না যে যাহা দুঃসাধ্য, তাহা যতই কঠোর হউক, কখনো অসাধ্য নহে। সংকীর্ণ মনোভাবের প্রেরণায়, হীন স্বার্থ সাধনের উন্মাদনায় যাহারা সমাজদেহকে শতধা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিতেছেন তাহাদের প্রভাব বিলুপ্ত না হইলে বাংলার মুসলমান কখনো জীবনের পথে জয়যাত্রা করিতে পারিবে না। এজন্য আমরা অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার দূর করিয়া তাহার স্থানে ইসলামের শাশ্বত প্রতিষ্ঠা করিতে ব্রতী হইব।'[১২]

প্রথম থেকেই নজরুলের দাবি ছিল তিনি এ পত্রিকায় শুধু গদ্য লিখবেন, এবং তিনি ব্যঙ্গাত্মক রচনার মধ্য দিয়ে ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে লিখবেন। এই পর্যায়ে নজরুল 'চানাচুর' শিরোনামে সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মান্ধতা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে লেখেন, শুধু তাই নয় ইসলামি সংকীর্ণ তাঁবেদাররা বাংলা ভাষাকে একটি সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করে নজরুল তার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়ান। অবশ্য সওগাতের পরিচালকমণ্ডলী এ বিষয়ে নজরুলকে পূর্ণ মদত দেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন মুসলমান লেখকদের একাংশের ভাষা শিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ দেখে রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হন। সওগাতের আবুল ফজল ও আলতাফ চৌধুরীকে লেখা পত্রে রবীন্দ্রনাথ ক্ষোভ ব্যক্ত করে লেখেন, 'বাংলাদেশের মুসলমানকে যদি বাঙালি বলে গণ্য না করতুম তবে সাহিত্যিক এই অদ্ভুত কদাচার সম্পর্কে নিন্দা ঘোষণা করে সান্ত্বনা পেতে পারতুম।'[১৩] 'চানাচুর' শিরোনামের এই লেখাগুলি নজরুলের কোনও গ্রন্থে কোথাও স্থান পায়নি। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে কাজী নজরুল ইসলাম ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে প্রায় একাই লড়াই চালিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে তাঁর সংকলিত গ্রন্থগুলিতে, এই রচনাগুলি প্রকাশের সাহস কেউই দেখাননি। সওগাতের ধারাবাহিক সংগ্রামের ইতিহাস কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের মহাফেজখানায় স্থান পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের রচনাগুলি প্রথম প্রকাশের উদ্যোগ নেয় পূর্ব পাকিস্তানের 'কেন্দ্র বাংলা উন্নয়ন বোর্ড।' এ প্রসঙ্গে সৈয়দ মুজতবা আলি লিখছেন—

> 'কোথায় না তারা প্রস্তাবিত কর্মে লিপ্ত হবে, না তারা লেগে গেল বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের পরিপূর্ণ গদ্যপদ্য রচনা সম্পূর্ণাকারে প্রকাশ করতে। আমার মনে হয় তখনই তারা ভিতরে ভিতরে আপন অজান্তে জেনে গেছে ঝঞ্ঝা আসন্ন পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে একটা দফারফা করতেই হবে। অতএব বিদ্রোহী কবি কাজীই আমাদের ভরসা। কি সুন্দর তিন ভল্যুম এ যাবত বেরিয়েছে। যিনি সম্পাদনা করেছেন তার নাম বলব না। পাছে না টিক্কা খানের লোক তাকে গুলি করে মারে।'[১৪]

পরবর্তীকালে নজরুল রচনাবলি আরও একটি খণ্ড (চতুর্থ খণ্ড) প্রকাশিত হয়। এই রচনাগুলির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন কবি আবদুল কাদির। ইনি কাজী নজরুল ইসলামের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। শুধু তাই নয় মুজফ্‌ফর আহমদ নজরুলের থেকে দশ বছরের বড়ো এবং অভিভাবক স্বরূপ ছিলেন। মুজফ্‌ফর আহমেদের একমাত্র কন্যার সাথে নজরুলের উদ্যোগে আবদুল কাদিরের বিবাহ হয়। আর পরবর্তীতে যিনি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন, তিনি নজরুল জীবনীকার, নজরুল আকাদেমির ভারপ্রাপ্ত প্রধান রফিকুল ইসলাম। দুজনের কারুরই অজ্ঞাত থাকার কথা নয়, নজরুলেব সাওগাতের লেখা ও ধারাবাহিক সংগ্রামের কথা। মাত্র অল্প কয়টি এই পর্যায়ের লেখা এই রচনাবলিতে স্থান পেয়েছে, তার কোনওটাই নজরুলের সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সংকীর্ণতা বিরোধী লেখা নয়। ইসলামাবাদের বিরোধী তো নয়ই এমনকী হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে লেখাগুলিও স্থান পায়নি। মনে হয় ধর্মীয় মৌলবাদী শক্তিগুলির ভয়েই তাঁরা এ কাজে বিরত হয়েছেন। কলকাতার হরফ প্রকাশনীর আবদুল আজিজ আল আমান সম্পাদিত নজরুল রচনাবলি তো কোনও পূর্ণাঙ্গ রচনাবলিই নয়। নজরুলের রয়েলটি বিক্রি হয়ে যাওয়া লেখাগুলি এতে স্থান পায়নি। আর রচনাবলিটি সু-সম্পাদিত তো নয়ই। স্বাভাবিকভাবেই এই রচনাবলিতে ওইসব লেখা স্থান পায়নি।

মৌলবি মনিরুজ্জামান ইসলামবাদী তার সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক ছোলতান' পত্রিকায় যত্রতত্র আরবি ফারসি ব্যবহার করতেন। মুজফ্‌ফর আহম্মদ ইসলাম আবাদী কথাটি ব্যবহার করেছেন (কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা, পৃ. ১৯১)। তিনি 'স'র পরিবর্তে 'ছ' ব্যবহার করতেন, সেভাবেই সুলতান হয়েছে 'ছোলতান' মুসলমান হয়েছে মোছলমান। তিনি সাধারণ বাঙালি মুসলমানকে 'স'র পরিবর্তে 'ছ' ব্যবহারের পরামর্শ দেন। 'দৈনিক ছোলতান' প্রকাশের জন্য ইস্তাহার প্রকাশ করলে নজরুল তার বিরুদ্ধে লেখনী ধরেন সওগাত পত্রিকায়। চানাচুর কলমকে এই লেখার শিরোনাম ছিল '**নেহাত জরুরী এছতেহার।**'

> 'এত দ্বারায় সর্বসাধারণ ভাই ছাহেবগণকে বিশ্বস্ত সূত্রে জানান যাইতেছে যে, একটী রোজানা কাগজ বাঙ্গালা জবানে না চাইলে মোছলমানের কাজ চলে না। আমাদেরই বা পেট চলে কি বিধায় আমরা সহসা একটী দৈনিক আখবার ছাপিতে লাগিয়া যাইতেছি। একবার দেলের মধ্যে খেয়াল হইল আখবারের নামখানা কি করা যায়? ছোলতান নামখানা খুব ভালো আছিল। অথচ ঐ নামে একটি কাগজ চালু থাকা বিধায় নামখানা লেওয়া গিয়াছিল না। আছ্‌ছা তাতেই বা খেতি কি!! দুইখানা বাখ্‌ছের নাম (বা এছ্‌ম) যখন আকছার একরকম হইয়াছে তখন আমরা ছোলতান নামখানা লইলে হরজ কিছুই হইতে পারিত না। অথচ এয়াদ হইল ছোলতান এ জমানায় তখতে নাই বিধায় বাদহার ছলতনৎ হইতেছে। অতএব আমাদের আখবরটীর নাম "প্রাত্যহিক বাদছাহ" নাম রাখাই সুস্থির হইয়াছে জানিবেন। ...অনেকানেক ওক্তে ঝুটা

ছাচ্চা খবরের তফাৎ জানার মওকা হয় না বিধায় আমরা এই পক্কা ত্যাগ পূর্বক ৩/৪ রোজ পুরানা হইয়া সে ছারাল খবরে এহ্তিক পাক ধরিয়াছে যে. কিঞ্চিৎ পচন ছুরু হইতে লাগিয়াছে কেবল তাঁরাই ছাপা করিয়া ছর্ব্বছাধারণকে খেদমতে হাজের করিয়া ক্রেতার্থ করিব। দ্বিতীয় তারিফ— হেদুয়ানী বাঙ্গালা ভাষাকে আমরা জবাই পূর্বক তাহার গোস্ত খাইয়া বাদছায়ী বাঙ্গালা জবান চালু করিয়া দিতে তৈয়ার হইয়া যাইব। এই ছুরুতের বাঙ্গালা ভাষায় সমাজের ছমাসের কম বেশি ফায়দা ছঙ্গত বিধায় এতদ্বারায় বেরাদারান ছতর্ক হউন যে এই মার্কামারা ছুরতের আশার দেওয়ায় অন্য হেন্দুয়ানী ভাষা পাট করিলে ছমাস হালাক হইবে, হইবে, হইবে? খববদার না? ইহার তৃতীয় তারিফ এই হইতেছে যে এখন আওরতদিগকে বেপর্দ্দা করিবার ও এলম হুপর ছিখপাইবার যে কোয়েশ হইতেছে, ইহা নেহাতই বেজরু রাত কাম বিধায় আমরা ইহার বেহুদ জমালেফৎ করিব। আমাদের আখবরটীর কর্ম্ম কৃতার্থের ভার লইয়া ছর্ব্ব ছাধারণকে ক্রেতার্থ করিয়াছেন মৌ-পাওনা নিমজ্জমান সুবিধাবাদী। ...তিনির মতে আওরতের জন্য মেহনৎ করা বেজরুরৎ কাম এই কারণে হইতেছে যে আওরতের কার্য (যেমন পাকানো, খেলানো, ইত্যাদি ইত্যাদি) সবই boy sarvant বা ছোকরার দ্বারায় হইতে পারে বিধায় আমাদের কওমী কওত অন্য কামে লাগাইলে ভাল হয় অথচ ইহাতে ছমাসের সহসা তরক্কি হওয়া ছম্ভব বিধায় ছকলেরই আনন্দিত হওয়ার কারণ। পরানা হেকমতের কেতাব ছব হেবরু বা এররানি ভাশায় থাকা বিধায় মৌ-পাওনা নিমজ্জমান সুবিদাবাদী একটা হেবরু বিশ্ববিদ্যালয় খুলিয়াছেন পাহাড়ের উপরে সমুদ্রের কেনারায় ও জঙ্গলের মধ্যে। এখানেও স্ত্রী-পুরুষ লেনদেন, তর্কাতর্কি ছম্বন্ধে তিনির খাছ খাছ আদর্শ মোতাবেক কাম হইয়া আসিতেছে যাহাতে কিনা সহসা ছমাজের তরক্কি হইয়া যায় এবং তৎদ্বারা "প্রাত্যহিক বাদশাহর" ও কিছু আমদানি বাড়ে। সুতরাং ছকলে হঠাৎ আমাদের গ্রাহক হইবেন অধিক বয়ান বাহুল্য।

[কোম্পানীর হেচ্ছাদারগণের খোলাছা : মৌ-লাওনা নিমজ্জমান সুবিধাবাদী + হে-কিমিষ্টি গালি বেহদগুলি + মে-লাভী জিঞ্জীর আহমুক্ত (হোমিদী) চা-পান করা]

ইনিদের কলমের ছামনে সহগত একট মস্ত ফজিহতের সুর ফিরোজ লাগল বিধায় ঠেকানা পুছিদা হালে রাখা ছাব্যস্থ কার গিয়াছে ছেজন্য ঘাবরাইবেন মৎ; অথচ সহসা বোধহয় একরোজ জাহের হইবে নিশ্চয় জানিবেন।[১৫]

এই লেখা প্রকাশের সাথে সাথে কলকাতার বিভিন্ন মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলিতে মুসলমান মৌলবাদীদের দ্বারা নজরুলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে নিন্দাবাদ শুরু হয়ে যায়। এই প্রচারের উত্তরে নজরুল লেখেন ইসলামাবাদী সাহেবের প্রচারের জন্য কলকাতায় ১৬টি কেন্দ্র আছে। এক কলকাতা শহরেই যদি এসলামাবাদী সাহেবের নিন্দাবাদের কেন্দ্র সংখ্যা এত হয় তবে সারা বাংলায় লাখ খানেক হবে নিশ্চয়। চানাচুরে অত্যন্ত শ্লেষের সাথে লেখেন—

> 'ছোলতান জমাইয়ত ওলমা নামক প্রতিষ্ঠান খয়ের ও ইছলামাবাদী সাহেবের নিন্দাবাদ প্রচারের জন্য একমাত্র কলকাতা শহরেই ১৬টি কেন্দ্র আছে। মেছুয়া বাজারে ২টি, চিৎপুর রোডে ২টি, চাঁদনিতে ৪টি, সার্কুলার রোডে ২টি, ওয়েলেসলিতে ১টি রিপন স্ট্রিটে ১টি কড়েয়া ও তাঁতি বাগে ২টি নারিকেলডাঙ্গায় ২টি। বাপরে বাপ্। এক কলকাতা শহরেই যদি এছলামাবাদী সাহেবের নিন্দাবাদের কেন্দ্র সংখ্যা এত তবে সারা বাংলায় লাখ খানেক হবে নিশ্চয়। বাকি কেন্দ্রগুলির 'হেছাব' ছোলতানে ক্রমশ বেরোলে পাঠকগণের গাঁটের পয়সা খরচ করে কাগজ কেনা সার্থক হবে।'[১৬]

এই নিবন্ধে আরও লেখেন 'এতগুলো গুপ্তকেন্দ্রের আবিষ্কার করতে নিশ্চয়ই ছোলতানকে বহু গোয়েন্দা নিযুক্ত করতে হয়েছে। আমরা জানতে চাই 'ছোলতান' এ কাজের জন্য সরকারি গোয়েন্দা বিভাগ কি কিছু দিয়ে থাকেন না ছোলতানের একটা নিজস্ব গোয়েন্দা বিভাগ আছে?'[১৭] এরপর ছোলতানের ট্রাস্টি বোর্ড মনিরুজ্জমান ইসলামবাদীকে তহবিল তছরুপের জন্য বহিষ্কার করে ছেলোয়ার হোসেনকে সম্পাদক করে।

মোহাম্মদী পত্রিকাও নজরুলের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। সওগাত পত্রিকা এবং নজরুল ইসলাম তাঁর লেখনীর জোরে অতিদ্রুত মুক্তবুদ্ধির শিক্ষিত যুবকদের আকৃষ্ট করতে সমর্থ হয়। বাংলা ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির দুই প্রাণ কেন্দ্র ঢাকা ও কলকাতার মুসলমান সমাজ দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। এই দ্বন্দ্ব ছিল মূলত রক্ষণশীলদের সাথে প্রগতিশীলদের। এবং অবশ্যই প্রগতিশীল মুসলমান সমাজের নেতা কাজী নজরুল অপর পক্ষে রক্ষণশীলদের নেতা মোহাম্মদীর সম্পাদক মৌলনা আকরাম খাঁ। মোহাম্মদী পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে লেখেন 'মিথ্যার প্রতি আমাদের স্বাভাবিক ঘৃণা আছে এবং অযৌক্তিক কথা বলিতে আমরা বড়ই লজ্জা অনুভব করি।' এর উত্তরে নজরুল লিখলেন 'ওঁদের মিথ্যার প্রতি যেমন স্বাভাবিক ঘৃণা, সত্যের প্রতিও তেমনি অ স্বাভাবিক ঘৃণা। আর অযৌক্তিক কথা বলতে তাঁরা যে বড়ই লজ্জা অনুভব করেন, তাও মোহাম্মদীর বড় বড় মিঞার বড় বড় কান বহুবার রাঙা হতে দেখেই বুঝতে পেরেছে দেশের লোক।'[১৮] মোহাম্মদী পত্রিকা এই সময় প্রগতিশীল মুসলমান যুবকদের বিরুদ্ধে কুৎসিত ভাষায় ও কদর্য আকারে আক্রমণ করে। কোনও আঘাতই চির বিদ্রোহীকে দুর্বল করতে পারে না। তাই নজরুল সবার পক্ষ থেকে আক্রমণ প্রতিহত করার দায়িত্ব নিয়ে চানাচুরে—

"রওগন-ই-কুচন্দর" শিরোনামে লেখেন মোহাম্মদী তার কোষ্ঠনামায় বাঙ্গলার তরুণ লেখকগণের সংসর্গের কথা বলতে গিয়ে মিএগ্রালিন ভাষায় লিখছেন,— "লম্পট, মাতাল, বেশ্যাপদসেবী লোকদের সঙ্গে এদের দহরম মহরম বেশি। ও পাড়ায়ও এদের ঘন ঘন দেখতে পাওয়া যায়।

"মোহাম্মদী" ও পাড়ারও দালালি কচ্ছেন জেনে আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। যাক এতদিনে বুড়োর একটা হিল্লে হল। দেশে যে-রকম দুর্ভিক্ষ লেগেছে, তাতে তো আর অন্য উপায়ে টাকা রোজগারের উপায় নেই।

আর একটা মজার কথা— যাদের সংসর্গের কথা তুলে এই কোষ্ঠনামা, তাদেরকে আমরা প্রায়ই আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ নেতা মৌলনা আকরম খাঁ সাহেবের সাথে ফিরতে এবং তাঁর বাড়িতে যাতায়ত করতে দেখি।[১৯]

এরপরের সংখ্যায় আবার লিখলেন কিন্তু 'মোহাম্মদী'কে মোহামুদি বলে আখ্যায়িত করে লিখলেন 'A good suggestion' শিরোনামে 'সে-দিন ছাত্রদের মধ্যে কথা হচ্ছিল— "মোহামুদির" "কোষ্ঠি নামা" নিয়ে। এক জন ছাত্র বললে "মৌলানা সাহেবের খাস্তা খাওয়া মুখ দিয়ে কী এমন খিস্তি খেউড় বেরুল তাই ভাবছি"। আর একজন বললে "আরে জানিসনে? মিএগ্রা সাহেব যে আজকাল তরজা আর ঝুমুরের দুটো আখড়া খুলেছেন ধাপা মেলের পথের ধারে।" এর ওষুধের কথা উঠলে একটা শান্তশিষ্ট ছেলে বেশ সহজ সুরে বলে উঠলে, "এর একটা মাত্র প্রতিষেধক ওষুধের কথা জানি আমি। যে মুখ দিয়ে অমন নোংরা জিনিস বের হয়, সে মুখে বেশ করে ফিনাইল দিয়ে দেওয়া"।[২০] মোহাম্মদী এই সময় বাংলার প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির মুসলমান লেখকদের সংগঠন 'শিখা' গোষ্ঠীকে নিয়েও কটূক্তি করতে ছাড়লেন না। একই সাথে 'দি মুসলমান' পত্রিকাও সাংবাদিক রাজনীতিবিদ মুজিবর রহমানকে গালিগালাজ করতে থাকে। এর বিরুদ্ধেও কলম ধরেন নজরুল। এক লেখায় লিখলেন বড় মজা হয়েছে এবার ঢাকার মুসলিম হল বা শিক্ষা সম্প্রদায়কে কাছা খুলে গালি দিচ্ছিলেন, মোহাম্মদী মেছুয়াবাজারের প্রতিবেশী।'[২১] পরবর্তীতে আবার লিখলেন—

মোগল পাঠান হদ্দ হল
ফারসি পড়ে তাঁতি।

'বেনেপুকুরের ব্যাঙাচি ল্যাজ না খসতেই দেখছি কান ঝালাপালা করে তুললে তার টরটরানির চোটে। আরে বাপু, একটু বড়সড় হ। প্রাণের আসা ছেড়ে দিয়ে অমন করে চ্যাচালে শেষে পেট ফেটে মরে যাবি যে।

এবার এই কূপমণ্ডুক যে পেশোয়ারি ও বাঙলা মিশ্রিত গালিগালাজ করেছে মুজিবর রহমান সাহেব থেকে আরম্ভ করে "দি মুসলমান" ও "সাওগত" সম্পর্কীয় সমস্ত লেখককে, সে ভাষা আমাদের জানা না থাকায়

আমরা ওর যথাযোগ্য মর্যাদা দিতে পারলাম না।

আমরা রসিকতা করি, একটু চিমটিও কাটি, কিন্তু গায়ে থুতু দিই না। ওতে পৌরুষ নাই। রসিকতা (Humor) ও ব্যঙ্গ বক্রোক্তির (satire) রসের সমঝদার হতে হলে সাহিত্যের সাথে এক আধটু পরিচয় থাকা দরকার। রসজ্ঞান আর ল্যাজ আল্লায় না দিলে টেনে বের করা যায় না।

এই ভদ্রলোক অন্যের শিক্ষা নিয়ে মুখ ভ্যাংচায়। কিন্তু ওর ভাষা জ্ঞানের পরিচয়ও তো দিয়েছি এই কাগজেই। বাঙলা ভাষার এই জ্ঞানটুকু নিয়ে আজকাল যে ম্যাট্রিকও পাশ করা যায় না।

ইনি আমাদের সমস্ত লেখকদের 'কমিনা-জাদা' 'ডাকাত' ইত্যাদি সুমধুর ভাষণে আপ্যায়িত করেছেন। আমাদের এইটুকু সান্ত্বনা যে থুতু উপর দিকে ছুঁড়লে নিজের মুখেই পড়ে।

কোনও মুসলিম লেখক চুরি ডাকাতি খুন করে কিনা, আমাদের এই বে-নজির বন্ধুটি তো সে খবর সবচেয়ে বেশি রাখেন।

আর 'ভাড়াটিয়া লেখক? 'মোহাম্মদী'য় বেদী এই ভদ্রলোকটির মাথা ঠেকিয়ে ঠেলায় যে আজও গর্ত হয়ে আছে! 'মোহাম্মদীর দেয়ালে এঁর ভাড়াটে কলমের কালো ছাপ যে সিলেট চুন ও 'হোয়াইট ওয়াশ' করতে পারবে না।

..আমরা তো জানি, গভর্নমেন্টের দৃষ্টি এর উপরেই একদিন বেশি করে ছিল— কেষ্ট ঠাকুরের যেমন ছিল চন্দ্রাবলীর উপর। ইনি যখন কানুকে না বলেই কাবুলি মেওয়া খেতে গিয়েছিলেন জেলের গোয়াল নিকানোর ভয়ে। তারপর, গোয়াল থেকে ফিরে বে-নজির উপায়ে টাকা জোগাড় করে নওরোজী উৎসব লাগিয়ে দিলেন, তখন রক্তচক্ষু কেষ্ট একেবারে গুঁতোকেষ্ট হয়ে উঠলেন! এরপরেই এঁর কানু প্রীতি উথলে উঠেছে। গুঁতোর মহিমা অপার। কত তো দেখলাম, আরো কত দেখব। আমরা এ পুরানো কাসুন্দি আর ঘাঁটাতে চাইনে। কিন্তু এই পেশায়ারি বাঙালি মেশা দো-আঁশলা ভাষায় যদি ইনি গালিগালাজ করেন, আমরা তা' হলে একেবারে চিচিং ফাঁক করে দেব। গভর্নমেন্টের সঙ্গে আশনাই করতে হয় কর বাপু। কিন্তু দেশ সেবকের নাম বিকিয়ে টিক্‌টিকির কাজ করলে হাটের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে দেবো।'[২২]

এরপর মোহম্মদী পত্রিকায় নজরুল বিরোধিতাকে জোরদার করার জন্য গোলাম মোস্তাফাকে নিয়ে আসে। সওগাতে 'গোলাম মোস্তাফার নতুন উদ্যম' শীর্ষক সংবাদে লেখা হয়— সংবাদ পাওয়া গেল, মৌলবি গোলাম মোস্তাফা বি-এ, বি-টি, সাহেব নজরুলের লেখার অসারত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আর একবার আদাজল খাইয়া লাগিয়া গিয়াছেন শুনিতেছি তাঁহার এই বহু বিনিদ্র রজনীর ফল আবার মোহাম্মদীর নাজির আহমেদ সাহেবের বেনামায়

ছাপা হইবে।'[২৩] এই সময় গোলাম মোস্তাফা তাঁর গর্ভবতী নামক কবিতার শেষ লাইনে লেখেন—

'ওগো সতী
ওগো গর্ভবতী।'

এ নিয়ে নজরুলের সাথে সাহিত্য বিতর্ক চরমে ওঠে, নজরুল শুধু চানাচুর কলমে লেখা লিখলেন না একটি ব্যঙ্গ কবিতাও লিখলেন এবং কবিতার নাম দিলেন গর্ভবান।

দেশ বিখ্যাত অদ্বিতীয় মূল-স্থানীয় অর্থাৎ মৌলিক কবি গোলাম মোস্তাফা সাহেবের কবিতার বিষয় ভাষা ভাব, ব্যঞ্জনা মূর্ছনা সবই অপূর্ব এ আমরা গত সপ্তাহেই বলেছি।...

অর্থাৎ? অর্থাৎ সতী = গর্ভবতী। বাংলা পড়ুয়েদের ভিতর যাঁদের বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও বাপ মা না হবার সম্ভাবনাটুকুও হয়নি আজ পর্যন্ত তাঁরা সবাই মিলে এই অপূর্ব, তথ্যের জন্য যে কবিকে শিরোপা দেবার ব্যবস্থা করবেন, তাতে সন্দেহ কি?'[২৪]

কিছুদিন পরে কবিতাটি প্রকাশিত হয়— **গর্ভবান**

'(হলাম মস্ত বাঃ! ইয়ে, ইটি)
একি ফান (fun)!
ওগো গর্ভবান!
নরম ও 'কৌচে' কেন বিরক্ত বয়ানে
চাপকান চাপান দিয়া শুইয়াছ বি-কচ্ছ শয়ানে?
গর্ভ? সে ত গর্ব তব! সে তো তব কবি কল্পনায়
প্রাত্যহিক প্রেরণা হে! এই বিশ্ব তবলা বাজায়
দিকে দিকে বাজিয়াছে সৃজনের যত, ধুমকিটী
ওগো বিয়ে বিটি
তুমি তাহা আপনার যন্তরের তালে
হস্ত সাধ্যে বস্তা পাতি প্রতি সন্ধ্যা প্রতি-প্রাতঃকালে।...'

দীর্ঘ কবিতার এক জায়গায় লিখলেন— "ফুল" সম্পাদক একা পারেনি বহিতে, তাই নিয়ে তার

রেখেছে তোমারে "হাফ"? তুমি কি
(better half) বেটার হাফ হয়ে
বামে বসি' বামা সম "খয়ের খাঁব" আছ ধামা লয়ে?
হে বি শ্মশ্রু সহকারী,
কাষ্ঠ-মোল্লা কার্যালয়ে তুমি নষ্ট ভার্য্যা কর্মচারী।

"ফুল-কবি"! একি সোজা মান
মহা-মুদি-খানাতে যে হল এর কাব্য-গর্ভাধান।।...

শেষ ছত্রে মোরা শুধু প্রতিমাসে দেখিবারে পাই—
সম্পাদক অশ্ব তব হ্রেষা রবে যা তেখান বিজ্ঞাপি সদাই
অঙ্গুষ্ঠ নির্দেশ করি ছিষ্টি ছাড়া তব যষ্টি প্রতি—
মোরা হেরি, অশ্বডিম্ব পাড়িয়াছ ওগো মন্দা-সতী!'[২৫]

এরপর নজরুল, গোলাম মোস্তাফার বিরুদ্ধে তার কবিতা চুরির অভিযোগ আনেন। আবার চানাচুর এ লেখেন 'ভাব চুরি করতে হয় কর, শব্দ পর্যন্ত বেমালুম চুরি করিতে হল কি কোটেশন মার্কা দিলেও ভদ্রতা রক্ষা হইত। যাঁহার নিকট হইতে চুরি করিয়া বা ধার করিয়া বা ধার লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয় তাহাকেই কি বেশি করিয়া গালাগালি দিতে হয়? চুরি করিবার নূতন কায়দা বটে—

"নিদ মহলা—
গড়িব আমরা পুনঃ নব তাজ
নয়া জমানার।"

এই শব্দ ও ভাব কাহার নিকট হইতে চুরি করা হইয়াছে এই কথা বাংলার সাধারণ পাঠক জানে। হায় নজরুল ইসলাম! অক্ষম অনুকরণের হস্তে রবীন্দ্রনাথের লাঞ্ছনার একশেষ হইয়াছে— এইবার তোমার শুরু হইল।[২৬] এরপর গোলাম মোস্তাফা শুধু 'দিলাম ইস্তফা' বলে নজরুলের বিরুদ্ধে লেখা বন্ধ করেন। এইরকম একটি কবিতা আল মুসলিমে প্রকাশিত হয়।

'বিহগ তুলিছে আকুল কাকলি
পাখিরা গাহিছে গান!"[২৭]

আল মুসলিমের উপর শুধু নজরুল বিরোধী ভূমিকায় নয়, নজরুলকে যেভাবে আক্রমণের ভাষা নামিয়ে আনে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অন্য প্রগতিপন্থী মুসলমান লেখকদের উপর একই কায়দায় আক্রমণ হানলে নজরুলও লেখনী ধরেন এবং বলেন। আমার অকবির মাথায় কয়েকটা লাইন সুড়সুড়ি দিচ্ছে

'ব্যাঙেরা করিছে ঘ্যাঙর ঘ্যাঙর
ভেকেরা ধরেছে তান!
নেড়ি কুত্তারা ডাকে ভেউ ভেউ
সারমেয় হাঁকে ঘেউ
সাগরে ছুটিছে তরঙ্গ রাশি
সিন্ধুতে ছুটে ঢেউ!"

আমাদের কাব্য রসিক 'আল মুসলিমের' পঞ্চরত্নের ইনিই বোধ হয় প্রবাল?[২৮]

আল মুসলিম একটি স্বল্পায়ু-রক্ষণশীল এবং ইসলামবাদী পত্রিকা। এই পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হুগলি ফুরফুরার পিরশাহ সুফি মৌলনা আবুবক্কার সিদ্দিকি ও তাঁর প্রধান ভাবশিষ্য বসিরহাটের মৌলনা রুহুল আমিন। এই কাগজ ঢাকা ও কলকাতার মুক্তবুদ্ধির অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল মুসলমান লেখকদের বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহী কাফের ও নাস্তিকতাব অভিযোগ এনে লেখেন 'বাংলাদেশের তথা কলিকাতা ও ঢাকার একদল ইসলাম শিক্ষা বর্জিত যুবক মনে করেন, মোল্লা আলেম তথা শরিয়তের বিরুদ্ধতা করিতে পারিলেই যেন একটা বড় হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া গেল। এবং পবিত্র কোরান ও হাদিসের বিরুদ্ধাচারণ করিয়া মোল্লাগণকে গালি দিতে পারিলেই যে বড় একটা "ন্যাতা" হইয়া ইসলামের সংস্কার করা হইল। ...এদের এই মোল্লাদ্রোহিতার তথা ইসলামদ্রোহিতা প্রকৃতপক্ষে খোদাদ্রোহিতার নামান্তর মাত্র।'[২৯] এর উপর নজরুল 'চানাচুর' কলামে **'ডোঙ্গরের বলামৃত'** শিরোনামে লেখেন—

> 'আমাদের সদ্যপ্রসূত এক কাষ্ঠ মোল্লাই সহযোগী দিনের আলোক দেখতে না দেখতেই যে রকম হাত পা ছোঁড়া আরম্ভ করেছেন তাতে তার দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে আমরা সন্দিহান হয়ে পড়েছি। হয় তড়কা নয় পেঁচোয় পেয়েছে। মাতৃস্তন্যের অভাবে গাধার দুধ খাওয়ানোর জন্যই বুঝি বেচারির এই দুর্দশা। আমরা বলি কি সহযোগীকে তার অভিভাবক এক বোতল "ডোঙ্গরের বালামৃত" কিনে খাওয়ালে না হয়তো বেঁচে গেলেও যেতে পারে। সেটের বাছা ষষ্ঠি দাস।'[৩০]

আল মুসলিম এক সংখ্যায় যখন লেখে ব্যক্তিগত ব্যবস্থা নয় আসাম, বাংলা ও বার্মার তরুণ মুসলমানদের গ্রাহক হিসাবে পাওযার আশা ব্যক্ত করা হলে, নজরুল 'করুণ আহ্বান' শিরোনামে তার বিখ্যাত ব্যঙ্গ রচনাখানি উপহার দেন।

'আল্লার কিরে, মই হেঁদু

> আমাদের কচি বে-নজির সহযোগী এবারেও গ্রাহকের জন্য একটা সংক্ষিপ্ত আরজ পেশ করেছেন। পাছে লোকে তার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে পারে তাই মাছ দিয়ে শাক ঢাকার চেষ্টার অন্ত নেই। একটা চলতি গল্প মনে পড়ছে।
>
> এক তৃষ্ণার্ত মুসলমান ফকির হিন্দুর গ্রামে গিয়ে সেখানে "পানি" চায়, সেইখানে গিযে দেখে 'জল'। মুসলমানকে কেউ আর জল দিতে চায় না দেখে প্রাণের দায়ে এক বাড়িতে গিয়ে এবার আর "পানি" নয় "জল" চাইলে বাড়ির মেয়েরা মুসলমান সন্দেহে তাঁক জল দিতে অস্বীকার করলে সে চীৎকার করে বলতে লাগল "আল্লার কিরে মা-গো, আমি হেঁদু।"'[৩১]

প্রগতিশীল মুসলমান যুবকদের প্রাণপ্রাচুর্য ও অনমনীয় মনোভাব দেখে ও নজরুলের সাহসিকতা দেখে মোহাম্মদী ও আল মুসলিম দু'রকম আচরণ শুরু করে। মোহম্মদী সুর পাল্টে সচেতন তরুণ ও যুব সমাজের প্রতি হৃদয়বান হওয়ার আহ্বান জানায় ২৪ অগাস্ট ১৯২৮ সংখ্যার 'মোহাম্মদীর তওবা' শীর্ষক সম্পাদকীয় (পৃ. ১-২)

'সমাজে একদল শিক্ষিত চিন্তাশীল ও সত্যান্বেষী তরুণের আবির্ভাব হইয়াছে।... ইহাদিগের আনেকের মনে নানাদিক দিয়া বিবিধ প্রকার জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইয়াছে। আল্লার প্রতি ইহাদের আঘাত বিশ্বাস। কোরানকে তাহারা আল্লার সত্য সনাতন বাণী বলিযা দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করেন এবং হজরত মহম্মদকে সত্যনবী ও শেষ নবী বলিয়া তাঁহার অন্তরের সহিত বিশ্বাস করেন। ...উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ইহাদিগকে পরিত্যাগ করা আর জাতির মস্তিষ্ককে উপেক্ষা করা একই কথা। ...ইহাদিগকে এতদিন ভর্ৎসনা করিযা আসিয়াছি কিন্তু উহাদের অন্তরের আকুল জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করিবার চেষ্টাই আজ পর্যন্ত করি নাই।'[৩২]

মোহাম্মদীর এরপরেও আচরণে কেউ দুঃখ পেয়ে থাকলে তার জন্য দুঃখ ও অনুতাপ প্রকাশ করে। উত্তরে নজরুলও লেখেন। তাহার বুঝিবার অথবা আমাদের বোঝাইবার দোষে মোহাম্মদীর মনঃপীড়ার কারণ হইয়া থাকিলে আমরা সেজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। পরেই আবার লেখেন—

...'এখন শুধু বাকি না দাঁড়ি হওয়ার অর্থাৎ দাঁড়ি চেঁচে ফেলার? তা হলেই আমাদের বুড়ো মিঞা পুরোপুরি তরুণ হয়ে যান, আর বুড়ি 'মোহম্মদী ও দিব্যি কাটে তরুণদের মধ্যে। আমরা বলি— সেই তো মল খসালি বাপু, তবে এত লোক হাসাবার কী দরকার ছিল?[৩৩]

কিন্তু আল মুসলিম নজরুলের বিরুদ্ধে আক্রমণকে ব্যক্তিগত কুৎসার স্তরে নামিয়ে আনে। পরবর্তীতে 'আমার কৈফিয়ত' কবিতায় লেখেন—

'মৌলভী যত মৌলবী আর মোল্লারা কন হাত নেড়ে
দেবদেবী নাম মুখে আনে সবে দাও পাঁজিটার জাত মেরে
ফতেয়া দিলাম কাফের কাজীও
যদিও শহীদ হইতে রাজীও
আম পারা পারা হামাবডা মোরা এখন ও বেড়াই জাত মেরে।

আল মুসলিম লেখে— 'নরাধম ইসলাম ধর্মের মানে জানে কি? খোদদ্রোহী নরাধম নাস্তিকদিগকে পরাজিত করিয়াছে... লোকটি শয়তানের পূর্ণাবতার। ইহার কথা আলোচনা করিতেও ঘৃণা বোধ হয়।... কলমের মুখে যা আসিতেছে, তাই লিখিতেছে খাঁটি ইসলামি আমনাদারী থাকিলে এই ফেরাউন বা নরমুদকে শূলবিদ্ধ করা হইত নিশ্চয়ই। উক্ত পত্রিকায় সম্প্রদায় বিশেষের বাহবা প্রাপ্ত 'অগ্নিবীণা' এবং আরও একখানি বই পড়িয়াছি। উক্ত দুইখানি পুস্তক পাঠ করিয়া উহার লেখক যে একজন ধর্মদ্রোহী কুলাঙ্গার তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।... শিবের পূজা, কালীর স্তব, দুর্গার আরাধনা, সরস্বতীর বন্দনা প্রভৃতি অংশবাদিতায় তাহার লেখা ভরপুর। সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ব্যাপার এই

যে, এই হতভাগ্য ধর্মদ্রোহী পাষণ্ড হজরত ইব্রাহিমের (আ.) সঙ্গে মি.সি.আর দাসের এবং বিবি মরিয়মের সহিত চরিত্রহীনা বারাঙ্গনার তুলনা করিয়া কেতাব, কোরান ও পির পয়গম্বর সম্বন্ধে মরদুদ কাফেরের ন্যায় মুখে যা আসে তাই বলিয়া অভিশপ্ত ইবলিস অপেক্ষা ও পামরতার পরিচয় দিয়াছে।'[৩৪]

এসময় আল মুসলিম নজরুলকে 'কাফের কবি' আখ্যায়িত করেন। মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় নাজির হোসেন চৌধুরী 'এহলান ও নজরুল' শীর্ষক লেখায়ও তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করে। এবার হবিবর রহমান সাহিত্য রত্ন 'ইসলাম দর্শন' লেখেন কাজীর কেরদানি শীর্ষক লেখায় 'নজরুল ইসলামের প্রাথমিক রচনায়—

অনেক সময় ইসলামি ভাব পাওয়া যাইত। তারপর যখন হইতে তিনি বিদ্রোহী সাজিয়া 'বিধাতার বুকে হাতুড়ি' পিটিতে আরম্ভ করিলেন সেই সময় হইতে মুসলমান সমাজ তাঁহাকে বর্জন করিয়াছে। এই স্বেচ্ছাচারিতার ও উচ্ছৃঙ্খলতার অবতারটিকে অনেক হিন্দু কিছুদিন মাথায় করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। তাই তিনি আমি কি হনুরে মনে করিয়া ফুলিতে ফুলিতে ঢোল হইয়া বসিয়াছেন।... আমাদের রোগ আছে সত্য, তজ্জন্য স্থির মস্তিষ্ক অভিজ্ঞ চিকিৎসক চাই। উচ্ছৃঙ্খল পথের পাগলের দ্বারা চিকিৎসার কাজ চলিতে পারে না। বরং তাহারই চিকিৎসার আবশ্যক।[৩৫]

যে কবিতার জন্য নজরুলকে আসামির কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হল কবিতাটির নাম '**ইন্দ্রপতন**'। সত্যানুসন্ধানের জন্য অবশ্যই দেখা দরকার নজরুল তাঁর কবিতায় কী লিখেছিলেন, কেনইবা তাঁকে এই আক্রমণ। বাংলার রাজনীতিতে অসাম্প্রদায়িক ধারার স্রষ্টা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। একারণেই তিনি নজরুলের কাছে পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন। এ আলোচনার শুরুতে লিখেছি নজরুল কৃষ্ণনগরে ১৯২৬ সালে অন্যদের সাথে মজুর স্বরাজ্য পার্টি গঠনের উদ্যোগ নেন, এ ব্যাপারে তাদের সবার আদর্শ ছিলেন দেশবন্ধু। নজরুল প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে আসেন দুজনের অনুপ্রেরণায়। প্রথমজন মুজফফ্র আহমদ হলে দ্বিতীয় জন অবশ্যই বাংলায় হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির রাজনীতির পথিকৃৎ ও কান্ডারি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। স্বাভাবিকভাবে দেশবন্ধুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে অনেকের মতো নজরুল ও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। কবি তার শোক ব্যক্ত করেন কাব্যের ভাব ব্যঞ্জনায়। কোনও ধর্মীয় রক্ষণশীল রক্তচক্ষু পারে না ভাবপ্রকাশকে স্তব্ধ করতে। পাঠকদের পর্যালোচনার জন্য বিতর্কিত সূত্রগুলি এখানে উল্লেখ্য হল।

'পয়গম্বর অবতার যুগে জন্মিনি মোরা কেহ,
দেখিনিক মোরা তাঁদের দেখিনি দেবের জ্যোতির্দেহ,
কিন্তু যখনি বসিতে পেয়েছি তোমার চরণ তলে
না জানিতে কিছু না বুঝিতে কিছু নয়ন ঝরেছে জলে।'

'ইবরাহিমের মতো বাচ্চার গালে খঞ্জর দিয়া
কোরবানি দিলে সত্যর নামে, হে মানব নবী হিয়া
ফেরেশতা সাব করিছে সালাম, দেবতা নোয়ায় মাথা
ভগবান বুকে মানবের তরে শ্রেষ্ঠ আসন পাতা।'[৩৬]

বহুমুখী আক্রমণের বিরুদ্ধে নজরুল না হলেন ক্লান্ত, এমনকী আহতও হলেন না। সব্যসাচীর মতো একের পর এক তীব্রব্যঙ্গের শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করতে লাগলেন ইসলামি মৌলবাদী শক্তিগুলিকে। তার এক একটি লেখা যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের ছ্যাকা লাগতে লাগল মৌলবি মোল্লাদের। আর তার লেখনীর নব নব বারিবর্ষণে সিক্ত হয়ে পল্লবিত হতে লাগল ঢাকা-কলকাতার প্রগতিশীল ছাত্র যুব সমাজ। এইসময় আল মুসলিম কাগজের উদ্যোক্তারা নজরুলের বিরুদ্ধে মিলাদ মেহফিলেও কুৎসিৎ ভাষায় গান রচনা করে গাইতে উৎসাহ দেন। মোহাম্মদী ও আল ইসলামের অশোভন আচরণের পরিপ্রেক্ষিতে মননশীল মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদে গর্জে উঠলেন। প্রখ্যাত মুসলমান বুদ্ধিজীবী ইসমাইল হোসেন শিরাজী সওগাতে এক পত্র লিখে এর প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন—

'মোহম্মদীর গালাগালিতে মোহম্মদীর স্বকীয় নীচতা, জঘন্য হীনতা, নারকীয় পরশ্রীকাতরতা প্রকাশ পাইয়াছে। আপনারা সত্যিকারের ইসলামের সেবার ব্রত লইয়াছেন এজন্য ধর্ম-ব্যবসায়ী উদার স্বর্বস্ব স্বার্থপরগণ আপনাদিগকে "কাফের" "মালাউল" "মরদুদ" বলিবেই। কারণ ভণ্ডের দল চিরকালই পৃথিবীতে এই প্রকার পৈশাচিক অভিনয় করিয়া আসিয়াছে। বিকারের রুগি তিক্ত ঔষধ খাইবার বেলায় মুখ বিকৃতি করে এবং হাত-পা ছুড়িয়ে থাকে। সময় সময় নাকি কান্নাও কাঁদে। ইহাতে আপনাদের বিচলিত হইবার কিছুই নাই। আপনারা আরও তেজের সঙ্গে লেখনী পরিচালনা করুন।'[৩৭]

নজরুল চানাচুর শিরোনামে লিখলেন—

তাও ছাপালি, কাব্যি হল
নগদ মূল্য এক টাকা?

আল মুসলিম আঁতুর ঘর থেকে বেরিয়েই দেশবাসীকে খোশখবরি শুনিয়েছিলেন যে, নজরুল প্রভৃতি কাফের কবির বদলে বহু ইসলামি কবি আবিষ্কার করেছেন।'[৩৮] আবার লিখলেন—

'দেখলাম কত দেখব আর
বাঁদরের গলায় চন্দ্রহার।

'শিয়ালদার মিএগ্রা সাহেব এবার নজরুল ইসলামের কাব্যের অসম আলোচনা করবেন ও একজন "পাকা সাহিত্যিক" দিয়ে করাবেন বলে শাসিয়েছেন। এ তো বাপু তোমাদের নতুন চেষ্টা নয়। নজরুল ইসলামকে টুঁটি টিপে মারবার

জন্য তার প্রথম লেখার দিন থেকে চেষ্টা করেছ এবং করছ— কিন্তু তাতে তোমাদেরই চঞ্চু ও দন্ত বেরিয়ে পড়েছে অস্বাভাবিক বিকৃতি নিয়ে। যে এগোবার সে এগিয়েই চলেছে। সে এখন যেখানে উঠে গেছে, তোমাদের হাতের কাদা সেখানে গিয়ে পৌঁছয় না। আর যে "পাকা সাহিত্যিকের" কথা বলছ তার কোন জায়গাটা পাকা, তা তো আর জানতে বাকি নেই। ওযে ইঁচড়ে পাকা, ওস্তাদ নয়, বেঁড়ে ওস্তাদ! শনিবারের পত্রের গুষ্টি তোমরা শুক্রবারের পত্রিকাতে একবার প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে দেখ। কত কত গেলেন রথী ইনি এলেন চক্রবর্তী! মুক্তোর মালা বাঁদরে তো দাঁত দিয়ে ছিঁড়বেই তাই বলে কি মালার মূল্য কমবে? সবাই আর ২৯ নম্বরের চিড়িয়াখানার জীব নয়!'[৩৯]

হিন্দুত্ববাদী ও হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাকেও তিনি ছেড়ে কথা বলেননি। পূর্বেও এ বিষয়ে কিছু আলোচনা হয়েছে! শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে গিয়ে মোহিতলাল মজুমদার সহ অনেক হিন্দুত্ববাদীর কাছে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতে গিয়ে চোখ রাঙানি শুনতে হয়েছে।

'যবন না আমি কাফের ভাবিয়া
খুঁজিটিকি দাঁড়ি নাড়ি কাছা।'

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে উভয়পথের আঘাত তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে, তা বলে সংগ্রামে পিছু-পা হননি। চানাচুর কলমে ধ্বনিত হয়েছে একই ধারা।

মহাত্মা গান্ধী সবরমতী আশ্রমের একটি দুরারোগ্য গোরুকে যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য মেরে ফেলার নির্দেশ দিলে, দেশ জুড়ে হিন্দুত্ববাদীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ শুরু করে। এর বিরুদ্ধে নজরুল লেখেন—

'গায়ে মাতা কি জয়।'

'সম্প্রতি এক মজার খবর এসেছে গান্ধীজি নাকি তাঁর আশ্রমের একটি রোগ যন্ত্রণা ক্লিষ্টতা বকনাকে সূচিকাভরণ (ইনজেকশন) দিয়ে মেরে ফেলেছেন। এ নিয়ে গুজরাতের হিন্দুরা গুজরাতি হাতির মতো খ্যেপে উঠেছে। যে আর কিছুতেই বাঁচবে না— সে মানুষই হোক আর গরুই হোক তাকে তাড়াতাড়ি ভবযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দেওয়াই বেশি দয়ার কাজ!

কিন্তু গরু মেরে এ জুতো দান গো-মাতার সন্তানদের খুশি করতে পারেনি। গোশতের গন্ধ কি গুজরাতি এলাচের গন্ধে ঢাকা যায়? এর পরেই ওদেশে গুজব রটে গেছে যে, গান্ধীজি এইবার থেকে তাঁর আশ্রমে গোশতের দোকান খুলবেন।

হাসি পায়, যাঁরা গরুর জন্য এমন হাম্বা রবে ক্রন্দন করেন, মানুষের লাঠৌষধি দিতেন।

দুঃখ দেখে তারাই বলেন "যো তো উস্‌কা পূরব জনমকা করম ফল।" গরুর প্রতি এই টান আর মানুষের দুঃখে ঔদাসীন্যকে দেখে এদের সত্যিসত্যিই গো-মাতার সন্তান বলে যারা মনে করে তারা বোধহয় বড় অপরাধ করেন না।'[৪০]

গান্ধীজির আশ্রম নিয়ে আর একটি লেখা বর্তমান সময়েও বেশ প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে। চানাচুর কলমে একই সংখ্যার লেখাটির শিরোনাম

বাঁদরের উৎপাৎ

'আহমেদাবাদের খবরে প্রকাশ, মহাত্মাজী তাঁর সত্যাগ্রহ আশ্রমে বাঁদরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। এর কোনো অহিংস দাওয়াই আছে কিনা তা-ও জিজ্ঞাসা করেছেন।

মহাত্মাজীকে আর কি দাওয়াই বাতলাব, আমরাই কতকগুনে দিশি বাঁদরের উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। ওর অহিংস কোনো রকম ওষুধ অন্তত আমাদের জানা নেই— ওদের উপেক্ষা করা ছাড়া। আর "হিংসা" দাওয়াই দেবার কি উপায় আছে এদেশে? এ হতভাগ্য দেশে বাঁদরের পূজারির অভাব নাই। তারা নাকি সবচেয়ে বড়ো ভক্ত। সেই ভক্তির চিহ্ন পোড়ামুখ তারা আজো দেখিয়ে বেড়াচ্ছে অকুতোভয়ে সকলের নাকের উপর।

কাঁচকলার আলকুশি জল বিছুটি মাখিয়েও ফল পাইনি আমরা। এখন বাকি একটা ওষুধের। সে হচ্ছে মুখের সামনে আয়না তুলে ধরা। আয়নাতে তাদের নিজের কদর্য্য রূপ দেখে তারা হয়তো লজ্জায় দেশ ছেড়ে পালাবে : অবশ্য, যদি বাঁদরের লজ্জা বলে কোনও জিনিস থাকে।'[৪১]

ভাগ্যিস মহাত্মাজী ও নজরুল কেউই বেঁচে নেই! থাকলে দেখতেন লেজছাড়া হনুমান বাহিনী সবরমতী নয় সারা দেশটাকে ছাডখাড করে দিচ্ছে। আয়নায় হবে না, ওদের লজ্জা নেই। মহত্মাজী থাকলে অবশ্য সহিংস লাঠৌষধি দিতেন। 'নারী নর নির্যাতন' শীর্ষক একটি লেখা লেখেন একটি ব্রাহ্ম কাগজে। মুসলমান জাতিকে গালাগাল দেওয়া সম্পর্কে— 'এ মাসে ওই কাগজে হিন্দু জাতিকে' "মুসলমান কর্তৃক লাঞ্ছিতা রমণীদের রক্ষণে অক্ষম" বলে গালিগালাজ করেছেন।

আমরা জানি এবং বেলগাছ থেকে ব্রেহ্মদত্তিরাও জানে যে মুসলমান "পরের" হাতে যতজন হিন্দু নারীর জাত গেছে তার চেয়ে অনেক বেশি হিন্দু "নরের" জাত গেছে ব্রাহ্ম নারীর হাতে এবং আজও যাচ্ছে।'[৪২]

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও ধর্মান্ধতা রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতির লড়াইকে সোচ্চার সমর্থন দিতে তিনি ভুল করেননি। আফগানিস্তানিদের ও ইরানে মেয়েদের পরদা প্রথা উঠে

গেলে তিনি সমর্থন দিতে ভোলেননি। আবার তীব্র শ্লেষ জানাতেও ভোলেননি এর বিরোধী রক্ষণশীল মোল্লাদের। চানাচুরে লিখলেন, শিরোনাম

য়ো ক্যা গজব্ ভাইয়্যা।

'কামাল আমানুল্লার দেখাদেখি ইরানের গজনবি ভায়াও দেখছি ক্রমে ক্রমে হেরেমের পরদা তুলে ধরেছেন। রয়টার খবর দিয়েছেন, সেখানকার মেয়েরা মুখের নেকাব খুলে ফেলেছেন। এমনকী রাজপথে মিএগ বিবিতে হাত ধরাধরি করে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

আমাদের মনে হয় এইসব দেখে যে সব রক্ষণশীল মিএগরা চটে উঠেছেন। তাদের কিছু দোষ দেওয়া যায় না। কেননা "গোলে বকৌলি" "গোলে হরমজ" প্রভৃতি পুঁথিতে যে পরীবিদদের রূপের ব্যাখ্যা না পড়েই ওঁদের দিল বে-চায়ন হয়ে যায়, তাদের জীবন্ত পথে ঘাটে বেড়াতে দেখলে কি রক্ষা আছে। একেবারে কতল হয়ে যেতে হবে যে।

আর আমাদের কথা! দৈবক্রমে আমরা যুবক। আমরা যদি কতল হয়ে যাই। তবু কবির ভাষায় বলব, "সাদায়ে সাফরি নিকলি দাহানে জখমে বিসমিল সে।" অর্থাৎ কিনা আমাদের অর্ধকর্তিত কণ্ঠ থেকেও শব্দ উঠবে— "সাবাস প্রিয় সাবাস।"[৪৫]

এই নজরুলকে, তার চির বিদ্রোহী উদ্দাম চিরচঞ্চল রূপকে, সাবধানী জীবনের সঞ্চয় গড়ে তোলা লোকদের চেনা খুবই কঠিন। কখনও প্রতিভাবান বালকের প্রতিভার অপচয় বলে মূল্যায়নও করতে পারি। কিন্তু সেই অপচয়ের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অমূল্য রতন যা হয়তো ধূলায় পড়ে আছে, আজও আমরা তাকে কুড়িয়ে নিয়ে মালা গাথার চেষ্টা করি। সঞ্চয়ীদের পাপড়িগুলি নিয়ে একটা ফুলও হয় না। আর তাই কাব্য মূল্যের কৌলীন্য নিয়ে যত উপেক্ষার চেষ্টা করি না কেন রবীন্দ্রনাথের পর আমরা আর কোনও কুলীন লেখককে আনতে পারলাম না নজরুল ছাড়া। নজরুলকে আমরা ব্যবহার করেছি যে যার মতো তার নিজের স্বার্থে। কখনও বিদ্রোহী কখনও ভাবুক প্রেমিক কবি, কখনও গায়ক গীতিকার, কখনও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সেনাপতি কখনও ধার্মিক, কখনও নাস্তিক-ধর্মদ্রোহী-কাফের কখনও জাতীয়তাবাদী কখনও আন্তর্জাতিকতাবাদী যখন যেরকম প্রয়োজনে লেগেছে ব্যবহার করেছে ব্যক্তি-রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান তার স্বার্থে। স্বার্থে আঘাত লাগে এমন লেখা ইংরেজ শাসক থেকে কেউই চাননি। অসৎ রাজনীতি আর সম্প্রীতির অবভাসকে ঘৃণার চোখে দেখতেন বলেই তো লিখতে পারেন—

'বদনা গাড়ুতে করে ঠেলাঠেলি
নব প্যাকটের আশ নাই
মুসলমানের হাতে ছড়িনাই
হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই।' (প্যাকট; সঞ্চিতা)

আরও বিস্মিত হতে হয় যখন দেখি কবি জেলে যান কবিতা লিখে রাষ্ট্র-দ্রোহিতার জন্য,

আর সে কবিতা হিন্দু বাঙালির সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী দুর্গাকে নিয়ে। কবিতার নামও অনুরূপ, কিন্তু বিষয়বস্তু শাসকশ্রেণিকে আতঙ্কিত করে।

আনন্দময়ীর আগমনে

'আর কতকাল থাকবি বেটি মাটি ঢেলার মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে, অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল
দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
এর পরেও এলিনে মা, আসবি কখন সর্বনাশী?[৪৪]

মনের উদারতা ধর্ম-নিরপেক্ষতার ব্যাপ্তি কতদূর প্রসারিত হলেও সম্পূর্ণ বিপরীত ধর্মীয় আবেগকে স্বাধীনতার আহ্বানে পরিণত করতে পারেন, বিশেষ, যখন বাঙালি মুসলমান সমাজ, দেশমাতৃকাকে মাতৃরূপে, দেবী রূপে বন্দনা করাকে শুধু আপত্তির কারণ হিসাবে দেখেননি দেখেছেন ধর্ম বিরোধী রূপে। তখন হিন্দু বাঙালি নন্দিত দেবী দুর্গাকে দিয়ে নিন্দিত অত্যাচারী ইংরেজ অসুরকে দমনের (বধ করার) আহ্বান করেন, তখন তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে হন ধর্মদ্রোহী, ইংরেজ শাসকের কাছে চিরদ্রোহী হলেও হিন্দুর কাছে ধার্মিক এমন আখ্যা তিনি পান না। প্রকৃতপক্ষে তাঁর ভাবনার ঘেরাটোপে ঘুরে মরতে হয় বারবার। কী ভেবেছিলেন সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা? সেকুলারিজম? তাই বা বলি কীভাবে তিনি ভগবান বুকে পদচিহ্ন এঁকে দিতে চেয়েছেন। আমরা কি তাঁকে নাস্তিক এই মূল্যায়নে ভূষিত করব না তিনি একজন প্রকৃত সমাজ বিপ্লবী যার মধ্য দিয়ে মূর্ত হয় 'আমরা এই বিশ্বের মাঝে গরব রঙমহল', এক নতুন সমাজ! হোসেনুর রহমান আমাদের নজরুলের মূল্যায়নের হারিয়ে যাওয়া এক দলিল উদ্ধার করে দিয়েছেন। পূর্ব তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অধ্যাপক জিল্লুর রহমান চৌধুরীর কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর মুল্যায়ন স্মর্তব্য—

> 'নজরুল ইসলামের কবি প্রতিভা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ প্রথম থেকেই আছে। এখনও এ প্রশ্নে সবাই একমত নন। ...নিশ্চিতভাবে দশজনের মধ্যে তিনি কি-না সেটা প্রশ্ন সাপেক্ষ। তাঁর বর্তমান ও ভবিষ্যৎ খ্যাতি নির্ভর করছে মূলত গীতিকার হিসেবে তাঁর বিপুল ও বিশিষ্ট সৃষ্টির উপর। তাঁর প্রতিভা যেমন বিতর্কের উর্ধ্বে সেই প্রতিভার অপচয় জনিত পরিণাম হীনতা তেমনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মর্মন্তুদ সত্য। শেষপর্যন্ত তিনি থেকে যান এক বিস্ময়কর সম্ভাবনার প্রতীক পরিচয়ে। কিন্তু তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ হয় না। অনেক আবেগ জমা হতে থাকে তাঁকে অবলম্বন করে। আমাদের বাংলাদেশে প্রকৃত বিগ্রহের অভাবে তাঁকে দিয়ে অভাব মোচনের চেষ্টা করা হয়। এবং যারা এই বিগ্রহের প্রয়োজনে তাড়িত হয়ে তাঁকে ব্যবহার করে, তারা তাঁকে ইচ্ছে মতো

ভাঙে ও গড়ে, তাঁক সম্পূর্ণ অবিকৃত থাকতে দেয় না। এ সবই তারা করে রাষ্ট্রানুকুল্যে কারণ রাষ্ট্রের কাছেও তার ব্যবহারিক মূল্য অজানা থাকে না। একদা ধর্মদ্রোহী, নাস্তিক, হিন্দুয়ানিভাবাপন্ন কবি এক মুসলিম অধ্যুষিত হয়ে যান জাতীয় কবি পরিচয়ে। এবং এই যুক্তিতে তিনি বাংলার মুসলিম জাগরণের উদ্গাতা। একদা ইসলাম-দ্রোহীকে এই শিরোপা দানের মধ্যে ইতিহাসের কৌতুকবোধ যেমন ধরা পড়ে তেমনি ধরা পড়ে খ্যাতি অখ্যাতির উত্থান-পতনের এক পরিচিত ছবি।'[৪৫]

ইতিহাসের এই নির্মম কৌতুক বোধের কশাঘাতেই সত্য আরও উদ্ভাসিত হয়ে উঠুক!

তথ্যসূচি :

১. সৈয়দ মুজতবা আলির উদ্ধৃতি : দেখা ফিরে দেখা— সুধাংশু সেনগুপ্ত, দীপন সৈয়দ মুজতবা আলি শতবর্ষ সংখ্যা

২. বিশ শতকে বাঙালি : আহমদ শরিফ, পৃ. ৩৭

৩. জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, বঙ্গদর্পণ ১ম খণ্ড পৃ. ২৪৮

৪. উভয় বাংলা— বর্বরস্য : পূর্বরাগ, সৈয়দ মুজতবা আলি রচনাবলি অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৬২-২৬৩ পূর্ব পাকিস্তানে ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি উর্দুভাষা নিয়ে লেখেন 'উর্দু ভাষা জন্মগ্রহণ করে উত্তর প্রদেশের আগ্রা ও তার সংলগ্ন দিল্লিতে।... উর্দু জন্ম নেয় উত্তর প্রদেশের প্রাকৃত মায়ের কোলে।' (তদেব পৃ. ১১৩)

পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধিদের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন 'সিন্ধিদের কথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভাষা বিকশিত, সাহিত্য সমৃদ্ধ। উত্তর ভারতের উর্দুর সঙ্গে সে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে। তাই উর্দু শেখার জন্য তারা কখনও প্রয়োজন বোধ করেনি নিতান্ত কয়েকজন মোল্লা মৌলবি ছাড়া এবং যেহেতু বহুকাল পূর্বে আরবদের সঙ্গে সিন্ধুবাসীর সমুদ্র পথে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও ইসলাম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধি ভাষা সরাসরি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ও ইসলাম সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধি ভাষা সোজাসুজি বিস্তর আরবি শব্দ গ্রহণ করেছিল (পক্ষান্তরে উর্দু তার তাবত আরবি শব্দ গ্রহণ করেছে ফারসি। অতএব কিছুটা বিকৃত রূপে) তাই মোল্লা মৌলবিরাও উর্দুর নামে অযথা বে-এক্তেয়ার হতেন না— গুজরাতি, মারাঠি এমনকী কোনো কোনো বাঙালি মুসলমান যেমন হয়ে থাকেন। তদেব,

পৃ. ১১২-১১৩।

৫. ধর্ম দ্বন্দ্ব ও জাতীয়তাবাদ : হোসেনুর রহমান; পৃ. ৩১-৩২

৬. নব জাগরণের মূল্যায়ন : সুচরিতা সেন, বাংলার রেনেসাঁস; পৃ. ৮৬

৭. কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা : মুজফফর আহমেদ; পৃ. ১ লেখক প্রথমেই কলকাতায় মুসলমান যুবকদের সাহিত্য কৃতির বিষয় আলোচনা করেন।

৮. ভারতীয় মুসলমানের উপর হিন্দু প্রভাব : রেজাউল করীম, বঙ্গদর্পণ ১ম খণ্ড; পৃ. ৩০১

৯. ভারতের ইতিহাস : হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়: পৃ. ৫৩৫; দ্বিতীয় খণ্ড

১০. কাজী-নজরুল ইসলাম স্মৃতি কথা : মুজফ্‌ফর আহমেদ; পৃ. ১৯১-১৯২

১১. প্রাগুক্ত

১২. সাপ্তাহিক সাওগত ১১ মে ১৯২৮, সম্পাদকীয়, পৃ. ১

নজরুলের সাথে এই সময় চুক্তি হয়েছিল তাঁর সবরকম লেখা শুধুমাত্র সওগাতে ছাপতে হবে।

১৩. ভাষাশিক্ষায় সাম্প্রদায়িকতা : রবীন্দ্র রচনাবলি, দশম খণ্ড; প:ব: সরকার সংস্করণ, পৃ. ৭৯০

১৪. চতুরঙ্গ : সৈয়দ মুজতবা আলি রচনাবলি নবম খণ্ড; পৃ. ২৬২-২৬৩

এই পর্যায়ে লেখা শুরু হয় এভাবে 'আপনারা বাঙালদের যত মূর্খ ভাবেন তারা ততখানি মূর্খ নয়। তারা যখন প্যাঁচ কষলে, তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানালে 'আমাদের পাঠশালা ইস্কুলে যেসব টেকসট বই পড়ানো হচ্ছে সেগুলো বড়ই 'অনৈসলামিক ভাবাপন্ন।' অতএব সেগুলো নাকচ করে দিয়ে নয়া নয়া কেতাব লেখা হোক। গাড়োল রাওল পিন্ডি সে ফাঁদে পা দিল। তখন সৃষ্টি হল 'কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ড' কিন্তু ইহা আল্লা রসুল!... (প্রাগুক্ত)

১৫. চানাচুর 'নেহাত জরুরী ইসতেহার' সাপ্তাহিক সাওগত ৬ জুলাই ১৯২৮, পৃ. ১৬

১৬. চানাচুর : সাপ্তাহিক সাওগত ১৩ জুলাই ১৯২৮; পৃ. ১৬

১৭. প্রাগুক্ত

১৮. মোহম্মদীর সম্পাদকীয় উদ্ধৃতি : নজরুলের অপ্রকাশিত ব্যঙ্গ রচনা : ড. সুনীল কান্তি দে; পৃ. ১৫; চানাচুর, সাপ্তাহিক সাওগত ৯ নভেম্বর ১৯২৮ পৃ. ১৬

১৯. চানাচুর, তদেব ১ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ২৯শে ভাদ্র ১৩৩৫ ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১৬

২০. তদেব, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১৬

২১. তদেব, ২৪ আগস্ট ১৯২৮, পৃ. ১৬

২২. তদেব, ৭ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১৬

২৩. সাওগাত, ১৪ ডিসেম্বর ১৯২৮, পৃ. ৪

২৪. চানাচুর, তদেব ৬ জুলাই ১৯২৮, পৃ. ১৬

২৫. তদেব, ২৭ জুলাই ১৯২৮, পৃ. ১৬

২৬. সাওগত বিশেষ সংখ্যায় 'চানাচুর রূপম' বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮১, পৃ. ৩৬০

২৭ ড. সুনীল কান্তি দে, তদেব, পৃ. ১১

২৮. সাপ্তাহিক সাওগত ২৪ আগস্ট ১৯২৮, পৃ. ১৬

২৯. ইসলামদ্রোহিতা বনাম মোল্লাদ্রোহিতা : ফজলুর রহমান দরগাপুরি, আলমুসলিম ১ কার্তিক ১৩৩৬, পৃ. ৩

উদ্ধৃতি : আলমুসলিম ড. সুনীল কান্তি দে, পৃ. ৫

৩০. চানাচুর : সাপ্তাহিক সাওগত ৩রা আগস্ট ১৯২৮, পৃ. ১৬

৩১. তদেব, ১৭ আগস্ট, পৃ. ১৬

৩২. মোহাম্মদীর সম্পাদকীয় উদ্ধৃতি : সুনীল কান্তি দে, তদেব, পৃ. ১৮

৩৩. সাওগাত তদেব ২৪ আগস্ট ১৯২৮, পৃ. ১৬

৩৪. বঙ্গীয় মোসলেম সাহিত্য ও সাহিত্যিক : আবুপুর ইসলাম দর্শন, পৃ. ১৮৮-১৮৯ (ফাল্গুন ১৩৩২)

৩৫. তদেব, মাঘ ১৩৩, উদ্ধৃতি : সুনীল কান্তি দে, পৃ. ১০

৩৬. সঞ্চিতা : কাজী নজরুল ইসলাম পৃ. ১৫২ ইন্দ্রপতন কবিতাটি আত্মশক্তি পত্রিকায় ১২ আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত।

৩৭. সাপ্তাহিক সাওগত ১৬ নভেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১৫

৩৮. তদেব, ১৪ (পৃ. ১৪) ২৫ জানুয়ারি, ১৯২৮ (পৃ. ১৬) ডিসেম্বর ১৯২৮, মোসলেম দর্পণ নামে একটি পত্রিকাও ইন্দ্রপতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান আত্মশক্তি পত্রিকায় ১২ আষাঢ় তারিখের সংখ্যায় কাজী নজরুল ইসলামের 'ইন্দ্রপতন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। কবিতাটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্দেশ্যে লিখিত হইয়াছে। আমরা এই কবিতাটি পাঠে যারপর নাই মর্মাহত হইয়াছি। কারণ ইহাতে যে তিনি গুরুতর স্বেচ্ছাচারিতা, ধর্মজ্ঞান হীনতা ও বিবেক শূন্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে মুসলমান মাত্রই ব্যথিত না হইয়া থাকিতে পারে না। আমরা ইহা স্বীকার করি যে কাজী নজরুল ইসলামের কবিত্ব প্রতিভা প্রশংসনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি সত্য সনাতন ইলসাম ধর্মের গৌরব হানিকর যথেচ্ছ লেখনী পরিচালনা করিবেন, ইহা কখনই সমাজের পক্ষে সহনীয় নহে।...

...'ইন্দ্রপতন' কবিতায় যে ধর্মের অবমাননাকর বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে কবি নজরুল ইসলাম সমগ্র মুসলমান সমাজের নিকট অপরাধী। যাহাতে তিনি ভবিষ্যতে সংযমী হইয়া লেখনী ধারণ করেন, যথার্থই ইসলামের অবমাননাকর কোনও বিষয়ের উল্লেখ না করেন তজ্জন্য তাঁহাকে এক্ষণে যথোচিত শাসিত করা সমাজের কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। ...এ স্থলে ইহাও বলা অতিরিক্ত হইবে না যে যদি তিনি এখন হইতে সতর্কতা

অবলম্বন না করেন বরং পূর্ববৎ যথেচ্ছ লেখনী পরিচালনা করিতে থাকেন, তাহা হইলে বিচারালয়ে আইনের সাহায্যেও তাঁহাকে শাসিত করিতে হইবে। কবির ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে ইসলামের এইরূপ অবমাননা করিলে খোদার গজব সত্বরই নাজেল হইবে। (মোসলেম দর্পণ ১ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা; আগস্ট ১৯২৮)

৩৯. চানাচুর : সাপ্তাহিক সাওগত ২১ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, পৃ. ১৬

৪০. তদেব, ৫ অক্টোবর ১৯২৮ (১৯ আশ্বিন ১৩৩৫) পৃ. ১৬

৪১. প্রাগুক্ত

৪২. তদেব, ১৪শ সংখ্যা ১০ আগস্ট ১৯২৮ (২৫ শ্রাবন ১৩৩৫), পৃ. ১৬

৪৩. তদেব, ২য় বর্ষ ২৪ সংখ্যা, ১ নভেম্বর ১৯২৯ (১৫ কার্তিক, ১৩৩৬) পৃ. ১৬

৪৪. আনন্দময়ীর আগমনে নজরুল রচনাবলি, তৃতীয় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৯৯

৪৫. ধর্মদ্বন্দ ও জাতীয়তাবাদ . হোসেনুর রহমান, পৃ. ৩৮-৩৯

নির্ঘণ্ট